معالم إرشادية لصناعة طالب العلم

তালিবুল ইলম গঠনের আদর্শ রূপরেখা

মূল
মুহাম্মদ আওয়ামা

অনুবাদ
উমাইর লুৎফর রহমান

সূ চি প ত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইলম অন্বেষণের পূর্বে যেসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায় : একজন আদর্শ উস্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

চতুর্থ অধ্যায় : শিক্ষার্থীদের সঠিক ও সুনিপুণভাবে গড়তে শিক্ষকের পালনীয় কিছু পথনির্দেশ

ভূমিকা

মহাজ্ঞানী, সর্বস্রষ্টা ও সর্বনিয়ন্তা আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। শত-সহস্র দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ববাসীর প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরিত শ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। কোনো সন্দেহ নেই, তাঁকে সুশিক্ষকরূপে প্রেরণ করা উম্মতের ওপর আল্লাহর সীমাহীন উদারতা, দয়া ও করুণার বহিঃপ্রকাশ।

প্রতিটি জ্ঞানই নিজ নিজ লক্ষ্যের সর্বোচ্চ চূড়া। উপাত্তের ভিত্তিতেই প্রতিটি জ্ঞানের মর্যাদা নির্ণীত হয়ে থাকে। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপকরণের প্রশ্নে শরয়ি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান। কারণ, শরিয়তের অনুসারী প্রতিটি মুমিনের ঈমান, আমল ও আখলাক প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকে। শরিয়তের এ জ্ঞানের পথ ধরেই ধর্মীয় ও জাগতিক পরিমণ্ডলে পৃথিবীবাসীর যাবতীয় সৌভাগ্য এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

কোনো বিষয়ে জ্ঞানী হতে হলে সে বিষয়ের অন্বেষণের জন্য থাকতে হয় অদম্য স্পৃহা, অসামান্য আগ্রহ এবং সর্বোন্নত অভিলাষ; এটিই সফলতার প্রকৃত রূপরেখা। প্রবল আগ্রহই এর মূলভিত্তি; এ ছাড়া ইলম অন্বেষণ সম্ভব নয়। পাশাপাশি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজন দূরদর্শিতা আর সঠিক দিকনির্দেশনা।

অনুভূতি ও আত্মিক বিষয়ে সফল ব্যক্তিদের অনুসৃত পথের সন্ধান দেওয়াই একজন তালিবে ইলমকে চূড়ান্ত সাফল্যে উন্নীত করতে পারে। এরপর তাঁদের দেখে নতুন শিক্ষার্থীরাও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে পারে।

প্রতিটি জ্ঞানী প্রজন্মকে আগামী শিক্ষার্থী প্রজন্মের উদ্দেশে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা রেখে তাদের সাথে নিজেদের কাজ ও অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করা উচিত; তবেই ভুলের পুনরাবৃত্তি লোপ এবং পুনর্পদস্খলন প্রতিরোধ করা সম্ভব। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

الدين النصيحة.

'দ্বীন মানেই নসিহত।'

দিন দিন আমি এ সকল নির্দেশনা প্রস্তুত করার ঘোর তাগিদ অনুভব করতাম মনে মনে। প্রথমত আমার জন্য; এরপর আমার তালিবুল ইলম ভাইদের জন্য। তবে সমকালীন ভাষাসাহিত্যের সঙ্গে আমি খুব একটা পরিচিত ছিলাম না;

লেখায় সাহিত্যগত মন্দ-অমন্দের সংমিশ্রণ ছিল স্পষ্ট। আমি জানতাম, এ বিষয়ে কলম ধরার জন্য একজন বিজ্ঞ লেখক এবং সুদক্ষ কলামিস্ট প্রয়োজন; যিনি হবেন প্রাচীন অপরিবর্তনশীল জ্ঞানভান্ডারের সঙ্গে নতুন ও আধুনিক শিক্ষারীতির সংমিশ্রণে অভিজ্ঞ। কথায় আছে—বিপরীতমুখী বস্তুর দ্বারাই কোনো বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।'

সে লক্ষ্যে প্রায়ই আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন ও প্রাণপ্রিয় উস্তাদ আল্লামা শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর কাছে বর্তমান প্রজন্মের তালিবুল ইলমদের উদ্দেশ্যে সুসমন্বয়ক একটি পথনির্দেশক উপহার দেওয়ার অভিপ্রায় পেশ করি; ঠিক যেভাবে তিনি صفحات من صبر العلماء এবং قيمة الزمن عند العلماء কিতাব দুটি এর আগে তাদের উপহার দেন। আমার ওই ইচ্ছে পূরণে সম্মত হলেও শেষ পর্যন্ত আর এ বিষয়ে তিনি কিছু লিখে যেতে পারেননি। আল্লাহ তাঁকে রহমতের চাদরে আবৃত করে নিন!

কিংবদন্তিতে আছে—'কোনো বিষয়ে চেষ্টা করে পুরোটা অর্জন না করতে পারলেও তার সম্পূর্ণটা গচ্চা যায় না।' (আমি বলব, ক্ষুদ্রতর কিছুও বর্জিত হয় না!)। তাই أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين রচনাকালে এ বিষয়ে মাঝেমধ্যে কলম ধরার প্রয়াস চালাই। এর আগে أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء বাহাসগুলো রচনাকালেও এ বিষয়ে কিছু লিখতে সক্ষম হই।

শেষ পর্যন্ত এ নগণ্য প্রয়াসীর গবেষণালব্ধ নির্যাসগুলো একত্র ও বিন্যস্ত করতে মনস্থ করি। এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই আমি।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।'

গ্রন্থটি রচনাকালে উপর্যুক্ত গ্রন্থ দুটি থেকে বেশি পরিমাণে প্রতিলিপি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি তালিবুল ইলমদের জন্য উপকারী করুন। পরিশেষে صناعة طالب العلم নামটিই আমার পছন্দ হয়। সম্মানিত পাঠকদের কাছে অধমের জন্য নেক দোয়ার আবেদন রইল।

এ গ্রন্থের মূল আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে চারটি অধ্যায়ে; প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে রয়েছে একাধিক অনুচ্ছেদ বা পথনির্দেশ।

অনুবাদকের কথা

অনুবাদ ও মাদরাসা আমের বিন ফুহাইরার বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমি। ১৪৩৭ হিজরি শিক্ষাবর্ষের গোড়ার দিকে মাদরাসার জন্য একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার তৈরির উদ্যোগ নিই। মাদরাসার নেসাব মাদানি হওয়ায় তালিবুল ইলমদের জন্য বাংলা ও আধুনিক আরবি বইয়ের সমন্বয়ে একটি বড়ো লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা ছিল পরিবেশের দাবি। মাদরাসা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মাশওয়ারা করার পর উদ্যোগটিকে সবাই ইতিবাচক মনে করেন। সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন সবাই।

পুরো প্রস্তুতি নিয়ে রওনা হই ঢাকার পথে। বাড্ডার মাকতাবাতুল আযহার, মাকতাবাতুল ইসলামসহ আশপাশের সব মাকতাবা থেকে প্রচুর আরবি ও বাংলা বই ক্রয় করে নিই। এরপর বাংলাবাজারের ইসলামি টাওয়ারে এসে সেখান থেকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে কিতাব কিনে গাড়িতে পুরি।

সবশেষে আসি মাদানীনগর মাদরাসা সংলগ্ন মাকতাবাতুল হাসানে। শ্রদ্ধেয় এনামুল হাসান ভাইয়ের মুখে আগেই শুনেছি এই মাকতাবার প্রশংসা, তাদের উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতা। নতুন নতুন বই সংগ্রহ ও প্রকাশে সত্যিই তাদের জুড়ি-মেলা-ভার। আগের দিন রাতেই বন্ধুবর রাকিবুল হাসানের সঙ্গে কথা হয়। কখন যাব, কোথায় যাব সবই তিনি বলে দেন আগেই। সেখানে পৌঁছে দুপুর থেকে রাত প্রায় ১০-টা পর্যন্ত তাদের সেই বিশাল মাকতাবাতুল হাসানে পড়ে থাকি। নিজেও পড়ি, শিক্ষার্থীদের জন্যেও সংগ্রহ করি আরবি-বাংলার সমন্বয়ে প্রায় পাঁচ শতাধিক কিতাব। সেদিনই প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বন্ধু রাকিবুল হাসানের সঙ্গে। কিতাব সংগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর সঙ্গে আলাপ চলছিল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তাদের প্রকাশনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা তিনি আমাকে বলছিলেন।

আমিও আমার মনের উদীয়মান বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও পরামর্শ তার সামনে তুলে ধরছিলাম। একপর্যায়ে তাঁদের সংগ্রহ করা অমূল্য ও গুরুত্বপূর্ণ সব আরবি বই দেখে সেগুলো দ্রুত অনুবাদের প্রস্তাব করি। বিশেষত সমকালীন আরবি লেখকদের লেখা ইতিহাসের গ্রন্থগুলো অনতিবিলম্বে ভাষান্তরের উদ্যোগ গ্রহণের অনুরোধ করি। নিজেও ইতিহাসের সবগুলো বই সেখান থেকে কিনে নিই মাদরাসার জন্য।

সেদিন রাতে কিশোরগঞ্জে ফিরে আসার পর থেকে প্রায়ই যোগাযোগ হতো তাঁর সঙ্গে। এর মধ্যে ছোটো ছোটো কিছু বইও করে দিই তাঁকে। সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

এরপর একদিন তিনি ফোন করে ড. মুহাম্মদ আওয়ামার রচিত معالم إرشادية لصناعة طالب العلم কিতাবটি অনুবাদ করে দেওয়ার অনুরোধ করেন। বইটি সম্পর্কে আগেই জানতে পেরেছিলাম আল-মানহালের সম্মানিত শিক্ষাসচিব বন্ধুবর মাওলানা নজিবুল্লাহ সিদ্দীকীর কাছ থেকে। তখন বইটি হাতের কাছে না থাকায় পড়তে পারিনি। কুরিয়ার করে বইটি তিনি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

বইটি হাতে নিয়ে যতই পড়েছি, ততই মুগ্ধ হয়েছি। ড. মুহাম্মদ আওয়ামার ইলমি নৈপুণ্য দেখে যারপরনাই বিমোহিত হয়েছি। অবাক হয়েছি তাঁর ও তাঁর শায়খ ড. আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর মধ্যকার ছাত্র-উস্তাদ সুসম্পর্কের ইতিবৃত্ত পড়েও। এই একটি কিতাবের মাধ্যমে তিনি সালাফে সালেহিনের প্রায় সকল ইলমি বইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কখনো ঘটনার একাংশ বলে বাকি অংশ মূল বইয়ে পড়ে নেওয়ার অনুরোধ করছেন, কখনো শুধু ঘটনার শিরোনাম বলে তার উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, আবার কখনো পূর্বসূরিদের লেখা কোনো কিতাবের প্রশংসা করছেন; তাঁর এ রচনাভঙ্গিটি আমার কাছে সবচেয়ে চমৎকার মনে হয়েছে।

জানতে পেরেছি, তাঁর আদব-আখলাক সম্পর্কে। তাঁর মন-মানসিকতা সম্পর্কে। তার ইলমি উচ্চাভিলাষ সম্পর্কে। উম্মাহ ও তালিবুল ইলমের প্রতি তাঁর সীমাহীন দরদ সম্পর্কে। সচেতনতা, চাতুর্য ও ইলমি তাহকিকের প্রতি তাঁর বিশেষ গুরুত্বদান সম্পর্কেও; যা অনুসরণ করা বর্তমান যুগের তালিবুল ইলমদের জন্য অপরিহার্য। ইলমের পাশাপাশি আমল, মাতৃভাষার ওপর দখল প্রতিষ্ঠা, যুগের কৃষ্টিকালচার ও জনসাধারণের আচার-আচরণ ও চাহিদার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার ওপর গুরুত্বারোপের বিষয়টিও আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, এ ধরনের যুগোপযোগী চিন্তাধারা শিক্ষার্থীদের আরও সচেতন করে তুলবে, একবিংশ শতকের চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে তাদের তীব্র প্রেরণা জোগাবে।

বইটি পড়ে আর অনুবাদের লোভ সামলাতে পারিনি। বাংলাভাষী তালিবুল ইলমদের হাতে হাতে বইটি পৌঁছে দিতে, শায়খ আওয়ামার চিন্তা-চেতনা থেকে তাদের উপকৃত করতে, সালাফে সালেহিনের ইলমি আদর্শের সঙ্গে নতুন করে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে বইটির অনুবাদের কাজে হাত দিই। শত প্রতিকূলতা, বিশ্বে নিরাপত্তাপরিস্থিতির অবনতি, মুসলিম বিশ্বের ওপর ইহুদি-

খ্রিষ্টানদের জুলুম-অত্যাচার, নির্বিচারে বেসামরিক ও নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা এবং সামাজিক মাধ্যমগুলোতে মুসলিম শিশুদের রক্তমাখা আর অনাহারে মৃত লাশের স্তূপ দেখে আমি ছিলাম ভীষণ মর্মাহত, নিতান্ত বেদনাগ্রস্ত।

অর্ধেক করেও রেখে দিয়েছিলাম প্রায় মাস খানেক। যাই হোক, একপর্যায়ে আবার অনুবাদকর্ম শুরু করি। বইটিতে শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা প্রায় চল্লিশটির মতো ‘পথনির্দেশ’ উল্লেখ করেছেন; যেগুলো একাধারে ছাত্র-উস্তাদ সকলের জন্যেই সমান উপকারী। আমার মনে হয়, সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে বাংলাভাষীদের প্রতিটি দ্বীনি মাদরাসার বিশেষভাবে সকল উস্তাদের হাতে এবং ব্যাপকভাবে সকল তালিবুল ইলমের হাতে বইটি থাকা উচিত।

দ্বীনি জামিয়া ও মাদরাসাগুলোতে প্রতিদিন নির্ধারিত একটি সময়ে তালিবুল ইলমদের উদ্দেশে বইটি পাঠ করা যেতে পারে। এর দ্বারা ছাত্র-উস্তাদ সকলেই ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ। পূর্বসূরিদের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং ইলম অন্বেষণের পথে তাদের সীমাহীন আত্মবিলীন ইতিহাস শুনে নিশ্চিতভাবে তারা অনুপ্রাণিত হবেন। জীবনপথের পাথেয় খুঁজে পাবেন।

এ কাজে যারাই আমাকে সহযোগিতা করেছেন, বারবার উৎসাহিত করেছেন, সকলের জন্য অন্তর থেকে দোয়া রইল; বিশেষভাবে আমার আব্বুজান এবং মাদরাসা আমের বিন ফুহাইরার কিতাব বিভাগের ছাত্রদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ, নিয়মিত খোঁজ নিয়ে এবং আমার পাশে থেকে বইটি সমাপ্ত করতে তারা বারবার প্রেরণা জুগিয়েছেন।

বইটি নির্ভুল রাখতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি; তারপরও কোনো প্রমাদ দৃষ্টিগোচর হলে জানানোর অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রয়াস নেব ইনশাআল্লাহ। কোনো সুপরামর্শ লিখে পাঠালে খুশি হতাম, জীবনভর তার জন্য দোয়া করতাম।

আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটি কবুল করুন। আহলে ইলমদের এ থেকে উপকৃত করুন। আমার জন্য পরকালে নাজাতের ওসিলা বানান। আমিন।

উমাইর লুৎফর রহমান
৫ মুহাররাম ১৪৩৮ হিজরি
৭ অক্টোবর ২০১৬ ঈসায়ি

প্রথম অধ্যায়
কাঙ্ক্ষিত 'ইলম'-এর গুরুত্ব ও ফজিলত

প্রথম অনুচ্ছেদ

কোন ইলম এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়?

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

তালিবুল ইলমের জন্য পাঠ্যসূচির গুরুত্ব

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইলম ও আহলে ইলমের মর্যাদা

প্রথম আলোচনা

ইলম ও ইলমি মজলিশের ফজিলত

দ্বিতীয় আলোচনা

আলেমদের মর্যাদা এবং উম্মতের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব

প্রথম অধ্যায়

‘ইলম’-এর গুরুত্ব ও ফজিলত

১ম অনুচ্ছেদ : কোন ইলম এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়?

এ গ্রন্থে যে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা হবে, তা হলো ইলমে শরিয়ত বা শরিয়তের জ্ঞান।

আমরা সবাই জানি, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম শিক্ষক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন; যিনি মানব সম্প্রদায়কে ‘কলম’-এর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। অজানা বিষয়গুলো তাদের জানিয়েছেন। এরপর আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মি জাতির প্রতি শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন। এরপর সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য তাঁকে একমাত্র আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রাণপ্রিয় সেই নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাদের শিক্ষা দিয়েছেন মহাগ্রন্থ (আল-কুরআন) এবং সুমহান হিকমাহ (পবিত্র হাদিস ও তাঁর সুন্নাত)। আল্লাহ বলেন :

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

অর্থ : ‘তিনিই উম্মিদের মধ্য থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন তাদের কিতাব ও হিকমাহ। এর আগে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। এ রাসুল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্য, যারা এখনো তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’[১]

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে শিখিয়েছেন এ আসমানি কিতাব আর সুমহান হিকমাহ। কারণ, এ দুটোই ছিল আল্লাহপ্রদত্ত ওহি, যার মধ্যে নিহিত বিশ্ববাসীর যাবতীয় সৌভাগ্য ও কল্যাণ। আর এটিই মানবজাতির সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। তা ছাড়া সকল উদ্দেশ্য কেবলই নামমাত্র।

---

[১] সুরা জুমুআ (৬২) : ২,৩

ওহি অবতরণের সমসাময়িক হওয়ায় সাহাবিগণ ছিলেন 'ফিকহ' এবং 'উসুলে ফিকহ' উদ্ভাবনের অমুখাপেক্ষী। আল-কুরআনের অর্থ ও মর্ম সরাসরি উপলব্ধি এবং শরিয়ত প্রণয়নের প্রেক্ষাপটগুলোর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্টতার কারণে এগুলো আবিষ্কারে তাঁরা ছিলেন নির্মুখাপেক্ষী। যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্যে তখন তাঁরা সরাসরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হতেন।

আর 'সিরাত' বা মনীষীতত্ত্ব এবং 'আহকামুল মাগাযি' তথা যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনাসমৃদ্ধ জ্ঞানে তো সাহাবিগণই মূল আলোচ্য বিষয়। তাদের মাধ্যমেই এসব ঘটনা ও ইসলামি ইতিহাসের সৃষ্টি।

উপরন্তু আরবিভাষী হওয়ায় তখন তাঁরা আরবি ভাষাতত্ত্ব এবং ভাষাগত মূলনীতি রচনারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না।

ছিলেন না নানান ঘটনা, পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতার মুখে পড়ে পরবর্তী আলেমদের তৈরি 'মানতিক' 'আদাবুল বাহাস' ও 'মুনাযারা' ইত্যাদির মতো প্রাসঙ্গিক বিদ্যা আবিষ্কারের মুখাপেক্ষীও।

ফলে তাঁরা নিরেট আল কুরআন ও হাদিসে রাসুলের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। অপরদিকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর অবতীর্ণ বিধানের যথাসাধ্য প্রচার-প্রসার। আল্লাহ বলেন,

﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

অর্থ : 'যেন আপনি লোকদের কাছে তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়গুলো বর্ণনা করেন।'[২]

তখন অবতীর্ণ গ্রন্থের বিধান মানা এবং তা বর্ণনা করাই ছিল মৌলিক কাজ।

ইলম অন্বেষণ চারটি রুকনের দ্বারা পূর্ণ হয় : ১. কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ২. শিক্ষার্থী। ৩. শিক্ষক। ৪. এ দুজনের মাঝে সৃষ্ট সম্পর্ক।

প্রতিটি রুকন একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝাতে অপ্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থী নিজ থেকে এ পথনির্দেশগুলো মান্য করা এবং সেগুলো অনুসরণ করা এমনকি উস্তাদ থেকে প্রাপ্ত ভিন্ন ধারার উন্নত আঙ্গিকের তারবিয়াতও এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। যেন সহজেই একজন কাঙ্ক্ষিত আদর্শ তালিবুল ইলম গঠন করা সম্ভব হয়। অদূর ভবিষ্যতে সে 'আলিম'-এর পাশাপাশি 'আমিল'-এর মর্যাদা লাভ করে ইহ-পরকালে সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

---

[২] সুরা নাহল (১৬) : ৪৪

আর তাই শুরুর পথনির্দেশগুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে আর শেষের পথনির্দেশগুলো তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। আর এ অধারাবাহিকতা অবলম্বনের কারণে পাঠকদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

প্রতিটি জ্ঞানের মর্যাদা তথ্যের মর্যাদার ভিত্তিতেই নির্ধারণ হয়ে থাকে। আর পাঠকের জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর পবিত্র কালাম এবং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ জ্ঞান দ্বিতীয়টি আর নেই।

ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীর মর্যাদা তার অধ্যয়নরত বিষয়ের মর্যাদার ভিত্তিতে নির্ণীত হয়ে থাকে। শিক্ষকের মর্যাদা শিক্ষাদানকৃত বিষয়ের মর্যাদার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আর শিক্ষার মান তার ফলাফলের মানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

উপর্যুক্ত চারটি ভিত্তি না থাকলে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইসলাম এসে পৌঁছাত না এবং ভবিষ্যতেও কোথাও পৌঁছাবে না।

এ রুকনগুলো ছাড়া কোনো বিজ্ঞ আলিমের অস্তিত্ব কি কল্পনা করা যায়?!

مسند بزار এবং المعجم الصغير-এ আবু বাকরা থেকে (যইফ রেওয়ায়েতে) বর্ণিত আছে, 'যদি পারো আলিম হও বা তালিবুল ইলম হও বা মনোযোগী শ্রোতা হও অথবা ইলমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও; পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না; তবে নির্ঘাত ধ্বংস হয়ে যাবে।[৩]

বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে এর সঙ্গে আমি আরও কিছু উপাদান যোগ করতে চাই—'... বা আহলে ইলমের সেবক হও বা উপকারী কিতাব ছেপে এবং দ্বীনি মাদরাসা নির্মাণ করে তার প্রচারক হও অথবা তালিবুল ইলমের ভরণপোষণের উদ্যোগী হও..!'

এ ইলমের ভিত্তি

আমাদের কাঙ্ক্ষিত ও আলোচ্য জ্ঞান বলতে এখানে শরয়ি জ্ঞান উদ্দেশ্য, বিষয়টি এরই মধ্যে উল্লেখ হয়েছে। আর তার ভিত্তি হলো দুটি–

১ম ভিত্তি : সর্বদা অনন্য ও অদ্বিতীয় উৎস আল-কুরআন ও পবিত্র হাদিস থেকে উদ্ধৃতি খুঁজে বের করা। অথবা আলিমদের ইজমা ও ইজমাসদৃশ উৎসের সাহায্য নেওয়া। অথবা উপর্যুক্ত তিনটির কোনো একটি উৎস থেকে নীতিপ্রসূত কিয়াস (গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ) করা।

---

[৩] مسند البزار : ১৩৪, المعجم الصغير : ৭৮৬

ইমাম ইবনে আবদুল বার বলেন, 'ইমাম শাফেঈ রহ. বলেছেন, ইলম ছাড়া কোনো বিষয়কে হালাল বা হারাম বলার কারও অধিকার নেই। ইলম বলতে তা যা সরাসরি আল্লাহর কালামে বা রাসুলের পবিত্র হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। বা আলেমদের সর্বসম্মত (ইজমা) অভিমতপ্রসূত হয়েছে। এ তিনটি উৎসে না পাওয়া গেলে যথানিয়মে তাতে কিয়াস করতে হবে।'[৪]

তিনি আরও বলেন, 'ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সঙ্গী মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহ. বলেন, চারটি বিষয়কে ইলম হিসেবে অভিহিত করা যায় :

১. যা স্পষ্ট ও পঠিত আল্লাহর কালাম এবং তার সদৃশ।

২. ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণিত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও তার সদৃশ।

৩. সাহাবিদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং তার সদৃশ। আর তাদের মতবিরোধ করা বিষয়গুলোও সামগ্রিক ইলমের বাইরে নয়।

৪. যুগের চাহিদানুসারে মুসলিম নিষ্ঠাবান ফকিহদের আবিষ্কৃত নতুন ও আধুনিক বিষয়ে কুরআন-হাদিসের আলোকে গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত।

এই চারটি সূত্র ছাড়া ভিন্নকিছু ইলম হিসেবে গণ্য হবে না কখনো।'

এরপর ইবনে আবদুল বার রহ.-ইমাম শাফেঈ রহ.-এর বলা 'তার সদৃশ' উক্তি দ্বারা 'কিয়াস' উদ্দেশ্য বলেছেন।

২য় ভিত্তি : উপর্যুক্ত চারটি উৎসের আশ্রয় অবলম্বন তালিবুল ইলমের অন্তরে নুর পয়দা করবে; শিক্ষার্থীর হৃদয়ে আল্লাহর ভয় তৈরি হয়ে প্রতিটি অঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়বে। কথা ও কাজে তার অনুকরণ প্রকাশ পাবে।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, বেশি বেশি জিজ্ঞাসার দ্বারাই ইলম অর্জিত হয় না; বরং ইলম ও হিকমাহ একটি নুর, তা আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা করেন কেবল তাঁকেই দান করেন।'[৫]

রামহুরমুযি রহ. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন : ইলম বেশি করে হাদিস বর্ণনা করার নাম নয়; বরং ইলম তো হলো আল্লাহর ভয়।'[৬]

ইলমের প্রকার

উল্লিখিত এ ইলম অর্জনের এবং তা বৃদ্ধি পাওয়ার দোয়া করতেই আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে আদেশ করেছেন,

---

[৪] جامع بيان العلم : ১৪০৩-১৪০৪

[৫] المحدث الفاصل : ৭৫৫

[৬] المحدث الفاصل : ১৪০০, ১৪০১

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

অর্থ : 'এবং বলুন হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন!'[৭]

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের কাছে এ প্রকার ইলমই প্রার্থনা করতেন এবং সাহাবিদের প্রার্থনা করতে বলতেন। একে তিনি 'ইলমে নাফে' বা উপকারী জ্ঞান হিসেবে অভিহিত করেছেন। উপকার-বিবর্জিত জ্ঞান থেকে তিনি আল্লাহর আশ্রয় চেয়েছেন।

ইবনে আবি শাইবা প্রমুখ উম্মে সালামা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা আছে, প্রতিদিন ফজরের সালাম ফেরানোর পর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

اللّٰهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا طيبا ، وعملا متقبلا.

অর্থ : 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, উৎকৃষ্ট জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল (সম্পাদনের তাওফিক) প্রার্থনা করছি।'[৮]

প্রতিটি মুসলিমই নবির শেখানো এ দোয়াটির মুখাপেক্ষী। সে যদি তালিবে ইলম হয়, শিক্ষার্থী হয়, তবে উপকারী জ্ঞান প্রার্থনা করবে; যদি কর্মজীবী হয়, তবে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা প্রার্থনা করবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মতো নিত্যদিনের আমলগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করবে আর বেশি করে মাকবুল আমলের সামর্থ্য প্রার্থনা করবে। কারণ, অগ্রহণযোগ্য আমল বান্দার ওপর একপ্রকার শাস্তি ও বিপদ।

ইবনে আবি শাইবা ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, প্রায়সময় তিনি সেজদায় গিয়ে বলতেন,

اللّٰهم لك سجد سوادي ، وبك آمن فؤادي ،

اللّٰهم ارزقني علماً ينفعني وعملاً يرفعني.

অর্থ : "হে আল্লাহ, আমার আপাদমস্তক আপনার উদ্দেশ্যে সেজদায় পড়েছে, আমার অন্তর আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। হে আল্লাহ, আমাকে উপকারী জ্ঞান ও উন্নতকারী আমল নসিব করুন।"[৯]

এখানে গ্রহণযোগ্য আমল বলতে আল্লাহর নিকট মর্যাদা উন্নতকারী আমলই উদ্দেশ্য।

---

[৭] سورة طه : ১১৪

[৮] مصنف ابن أبي شيبة : ২৯৮৭৫

[৯] مصنف ابن أبي شيبة : ৪৪০৬

উপকারবিহীন ইলম থেকে সতর্কতা

তালিবুল ইলমকে উপকার-বিবর্জিত জ্ঞানের ফাঁদে পড়া থেকে শতভাগ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, অনেক শিক্ষার্থীই এ ফাঁদে আটকা পড়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ থেকে হাত ধুয়ে বসে। একজন নিষ্ঠাবান তালিবুল ইলমের উচিত, ইলম-পরিপন্থী সকল কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। নিজের কর্ম নিজেই নিরীক্ষণ করা। সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই নিয়তকে নবায়ন করা। অলসতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ইমাম যাহাবি রহ.-এর রচিত بيان زغل العلم والطلب গ্রন্থটি বেশ উপকারী মনে করি আমি। হায়, সমকালীন আহলে ইলম কেউ যদি ইমাম যাহাবি রহ.-এর মতো কিছু লিখে যেত, তবে এ জমানার তালিবে ইলম ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীপ্রজন্মের জন্য তা বড়োই কৃপার কাজ হতো। কারণ, ইসলামি জ্ঞান এবং ফিকাহশাস্ত্রে গবেষণাকারীকে মূর্খতা ও দ্বীনপরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে ভীষণভাবে বেঁচে থাকতে হবে।

তা ছাড়া নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের নিক্ষেপ করে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে, তারা হলো—শহিদ, মুজাহিদ, শিক্ষাদানকারী আলিম এবং ধনী দানবীর।[১০]

আমার রচিত من صحاح الأحاديث القدسية গ্রন্থের চতুর্থ হাদিসও এটি। নিম্নে হাদিসটির একাংশ ও তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করছি :

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বিচারকাজ সম্পাদনের জন্য অবতরণ করবেন। সকল উম্মত সেদিন নতজানু থাকবে। সর্বপ্রথম ডাকা হবে কুরআন সংরক্ষণকারী, আল্লাহর পথে নিহত এবং অঢেল ধনৈশ্বর্যের অধিকারীকে। কুরআনের পাঠককে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার রাসুলের ওপর অবতীর্ণ কিতাব কি আমি তোমাকে শেখাইনি? সে বলবে, অবশ্যই হে প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, তবে তুমি তোমার জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ? সে বলবে, আমি দিনরাত নামাজে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ! ফেরেশতাগণও বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ! আল্লাহ বলবেন, বরং তুমি তো এই উদ্দেশ্যে পড়েছ যে, লোকে তোমাকে কারি বলবে। আর সেটা তোমাকে বলা হয়ে গেছে!'

---

[১০] مسلم : ৩/১৫১৩ (১০২) الترمذي : ২৩৮২ আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত।

এর ব্যাখ্যায় সেখানে আমি (আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন) যা বলেছি, তার সারমর্ম হলো :

ওই তিন ব্যক্তির প্রথম জন যে কুরআনুল কারিম হিফজ করেছে, শিখেছে। কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা প্রমাণ সাব্যস্ত করতে তাকে ডেকে বলবেন, আমার রাসুলের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থ কি আমি তোমাকে শেখাইনি?!' সে বলবে, অবশ্যই হে প্রতিপালক!' কারণ, তা ছিল এক মহা নেয়ামত; দরকার ছিল তার যথাযথ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের। তা ছিল ইলমের নেয়ামত, কুরআনুল কারিমের ইলম; যা সকল জ্ঞানের সমন্বয়কারী মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পবিত্র কালাম। যাতে নিহিত দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ।

ওই ব্যক্তি কখনো নিষ্ঠাবান ছিল না, দুনিয়াতে আল্লাহর যথাযথ অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিল না। এমনকি পরকালে আল্লাহর সামনেও সে সত্যবাদী সাব্যস্ত হয়নি। তাই তো 'তবে আমার শেখানো জ্ঞান অনুযায়ী তুমি কতটুকু আমল করেছ?' প্রশ্নের উত্তরে সে 'আমি দিনরাত নামাজে দাঁড়িয়ে কুরআন পড়েছি' বলবে। সে দাবি করবে– দিনরাত সে কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন ছিল; অথচ কুরআনুল কারিমের রূহ, তার ব্যাখ্যা, তাফসির ও ফিকহ বোঝা থেকে সে ছিল চরম উদাসীন। আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরকে সদা পবিত্র দেখতে চান, সকল কিছুর ওপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বদান কামনা করেন তিনি। আর তাই তো বান্দার প্রকৃত কাজ হলো শুধু তাঁর প্রতিই একনিষ্ঠতা ও মগ্নতা অবলম্বন করা, বিষয়টি বোধগম্য করা থেকে সে ছিল ভীষণ অসতর্ক।

কুরআনের প্রতিটি পাঠক কুরআনের জ্ঞানগত অর্থ ও ব্যাখ্যা হয়তো বোঝে, কিন্তু অনেক সময় উপর্যুক্ত ব্যক্তির মতো আমল ও অনুসরণের সময় আল-কুরআনকে তারা প্রচণ্ড অবহেলা করে। তাই সব সময় আমরা আল্লাহর কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা করব।

এরপর ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ বলবেন—'তুমি মিথ্যা বলছ।' ফেরেশতারাও বলবে, 'তুমি মিথ্যা বলছ।' এরপর প্রতিপালক তার নিয়ত ও মনোভাব ফাঁস করে দিয়ে বলবেন, 'বরং তুমি তো এ উদ্দেশ্যে পড়েছ, যেন লোকে তোমাকে কারি বলে; আর সেটা তোমাকে বলা হয়ে গেছে!' অর্থাৎ, তোমার লক্ষ্য তো দুনিয়াতেই পূরণ হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য সাধন হয়ে গেছে তোমার। আর তো কিছু পাওয়ার বাকি নেই!

সহিহ মুসলিমের বর্ণনা মতে এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ করা হলে ফেরেশতারা মুখ নিচের দিকে করে টেনে-হেঁচড়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, ইলম অন্বেষণে তালিবুল ইলমের কী উদ্দেশ্য থাকবে তবে?

আমি বলব, শুধুই আল্লাহকে পাওয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

শিক্ষা, গবেষণা, ইলমের প্রতিটি যাত্রা এমনকি যাতায়াত; কিতাব ক্রয়, সুহবতের জন্য শায়খ নির্বাচন, যাঁর কথা ও কাজে আল্লাহর পরিচয় মেলে, আল্লাহর স্মরণ হয়; এমনকি তালিবুল ইলমের পোশাক ও সজ্জা নির্বাচনসহ সবক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সব সময় নিয়ত থাকবে তার খাঁটি ও নির্ভেজাল।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যটি প্রতিফলিত হবে তার আমলের মাঝে এবং তার শেখা প্রতিটি কথার দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। আল্লাহ ও রাসুলের কোনো নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তা বাস্তবায়নে সে মনোযোগী হবে। কোনো নিষেধাজ্ঞা জানার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে সে বিরত হবে।

তার প্রতিটি কথা ও কাজে দিন দিন উন্নতি পরিলক্ষিত হবে। এভাবেই একদিন সে একজন নিষ্ঠাবান আমিল আলিম হিসেবে আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত হবে।

তালিবুল ইলমগণ অহেতুক কথাবার্তা, বেশি রকম প্রশ্ন, আড্ডাবাজি, বাগ্‌বিতণ্ডা, দুর্বোধ্য অশালীন বা দুর্লভ বিষয়ে মনোনিবেশ করবে না। উলামার অগ্রহণযোগ্য উৎস থেকে কিছু বর্ণনা করবে না। আলেমদের সংশ্রবে গিয়ে তাদের মুখ থেকে সরাসরি ইলম গ্রহণ না করে নিছক কিতাবনির্ভরশীলতা বা একাকী ইলম অর্জনের বাসনা থেকে বর্তমানকালের তালিবুল ইলমদের বেরিয়ে আসতে হবে।

তেমনি বেঁচে থাকতে হবে উলামায়ে কেরামের সাথে বেয়াদবি এবং পূর্বসূরিদের শানে শিষ্টাচারপরিপন্থী কিছু করা ও বলা থেকে; এমনকি আলিমদের সাথে আদব অবলম্বনকারীর উপহাস ও ঘৃণ্যভাবে তাকে উপস্থাপন করা থেকেও। কিছু মানুষ ভাবে, ইলম তো শুধু কিছু তথ্য-উপাত্ত মুখস্থ করা, গবেষণার কিছু উদ্ধৃতি আয়ত্ত করে সভা-সমাবেশে উপস্থাপন করা অথবা বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতিসহ তালিক রচনা করাকে বোঝায়; যেন তাকে আল্লামা, মুহাক্কিক, স্বনামধন্য, প্রখ্যাত, বরেণ্য ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তেমনি তালিবুল ইলমকে বিরত থাকতে হবে নিছক প্রযুক্তিনির্ভরশীলতা থেকে। ফেতনা সৃষ্টিকারী কম্পিউটারনির্ভর হওয়া থেকে। ল্যাপটপ হাতে নিলেই অনেকে ভাবে, লোকটি আধুনিক আলিম, সবকিছু তার মুখস্থ, মুহূর্তেই সবকিছু বলে দিতে পারে। প্রযুক্তিনির্ভর অনেক আলিম ছোটোবড়ো মাসআলার ক্ষেত্রে শায়খদের শরণাপন্ন হওয়া থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। তারা বুঝতে পারছে না, এগুলো যদি অযোগ্য ও অদক্ষ আলিমদের হাতে পড়ে যায় আর দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল যদি তারা নিজেদের মতো করে বিশ্লেষণ করতে শুরু করে, তবে নিশ্চিতভাবে

তাদের ওপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত সতর্কবার্তা প্রতিফলিত হবে,

اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا فأفتوا الناس بغير علم ، فضلوا وأضلوا.

অর্থ : 'তখন মানুষ মূর্খদের নেতা হিসেবে মেনে নেবে। এরপর তাদের কাছে ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করা হলে মনগড়াভাবে তারা এর সমাধান দেবে। এভাবে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে।'

এর চেয়েও মারাত্মক পরিস্থিতি হলো, অনেকে সাম্প্রতিককালের লিখিত এবং সংকলিত কিতাবসমূহকেই কেবল প্রাধান্য দিচ্ছে; কে তাহকিক করেছে! কোন প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছে, ক'টা বই বের করতে পেরেছে—এটাকেই তারা মূল ও মুখ্য মনে করছে। ভাবছে এ পদ্ধতিই সবার উৎস এবং মর্যাদাশীলদের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে গেছে। জেনে রেখো, এগুলো প্রকৃত ইলম নয়; ইলম এসব থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। ইলম হলো বোঝা ও সংরক্ষণ করার নাম; আমল ও বাস্তবায়নের নাম; সচ্চরিত্রতা ও একনিষ্ঠতা; ধর্মভীরুতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লিপ্সা; সর্বদা কর্মনিরীক্ষণ, সংশোধনের আগ্রহ এবং শ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বোচ্চ অনুকরণ এবং তাঁর সাহাবি ও তাবেঈদের পদাঙ্ক অনুসরণ।

তালিবুল ইলমদের সব সময় পূর্বসূরিদের জীবনচরিত, ইলম অন্বেষণের পথে তাদের ত্যাগ-বিসর্জন, আত্মবিলীনতার ইতিহাস এবং ইলমের সাথে তাদের আমলের অপূর্ব সমন্বয়ের ইতিবৃত্ত পাঠ করা আবশ্যক। বিশেষত খতিবে বাগদাদির রচিত الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع-, ইবনে জামাআর تذكرة السامع والمتكلم, ইমাম গাযালির إحياء علوم الدين-, ইবনে রজব হাম্বলির রচিত شرح حديث أبي الدرداء : من سلك طريقا.. এবং فضل علم السلف على الخلف গ্রন্থগুলো তালিবুল ইলমদের সার্বক্ষণিক অধ্যয়নে থাকা চাই।

কারণ, একনিষ্ঠভাবে উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়নকারী প্রতিটি শিক্ষার্থী সফলদের অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ। পাশাপাশি সত্যনিষ্ঠ আলিমদের সংশ্রব গ্রহণও অপরিহার্য। কারণ, তাঁরাই হলেন জীবন্ত কিতাব।

কেউ যদি প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, সর্বজনস্বীকৃত সমকালীন অনেক আলিম হাফেজ ও ফকিহ তো আপনার এ সংজ্ঞার বাইরে চলে গেছে!

এর উত্তর হলো, ৬৯৯ হিজরিতে ওফাতপ্রাপ্ত بهجة النفوس-প্রণেতা বিখ্যাত ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে আবি জামরাহ আল-আন্দালুসি রহ.-এর প্রদত্ত

উপাধিটিই এমন ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমি ব্যবহার করব, যা তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ইবনুল হাজ المدخل– গ্রন্থে[১১] উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল হাজ রহ. বলেন, আমার প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ আবু মুহাম্মদ ইবনে আবি জামরাহ রহ.-এর কাছে একবার সমকালীন আলিম নামধারী স্বল্প আমলি এক ব্যক্তির ব্যাপারে আলোচনা হলে তা শুনে তিনি বলে ওঠেন, 'নাকেল নাকেল' (সে নকলকারী)। তিনি ইলমকে অপ্রাপ্ত ও অযোগ্যদের দিকে সম্বন্ধ করার আশঙ্কা করেছিলেন। বস্তুত 'নাকেল' যে, সে আলিম হতে পারে না; সে তো অন্যান্য পেশাজীবীর মতো সাধারণ এক পেশাজীবী।[১২]

মুসলিম দেশের বর্তমান সরকারি শরয়ি ও ফৌজদারি কোর্ট-আদালতগুলোতে আপনি এমন অনেক তথাকথিত আইনবিদ পাবেন, যারা লেনদেন ও ব্যক্তিসত্তা সংক্রান্ত বিদ্যায় তালিবুল ইলম ও মাশায়েখদের থেকেও বিপুল জ্ঞানী এবং অসম্ভব পারদর্শী। কিন্তু সেসব উলামা-মাশায়েখ আল্লাহর পক্ষ থেকে নুর ও হেদায়াতের ধারক-বাহক। আর অধিকাংশ অ্যাডভোকেট ও আইনজীবীই তেমনটি নয়। ভালো করে স্মরণ রাখা উচিত– (শরয়ি ইলম বা মুহাম্মদি উত্তরাধিকার নিছক মস্তিষ্কে সংরক্ষণের জন্যে নয়; সভা-সেমিনারের মঞ্চ গরম করার জন্যে নয়; বরং সত্যকে সত্য আর অসত্যকে অসত্যরূপে সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত। প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সঠিক, পবিত্র, গুনাহমুক্ত এবং মনোবৃত্তির প্রভাবমুক্ত পদ্ধতিতে ইলমের উত্তরাধিকারী করার এবং তা প্রচার-প্রসার করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে ইলমে শরিয়ত।)

ইবনু আবি শাইবা (রহ.) যাইদ বিন আরকাম রা., আবু হুরায়রা রা., ইবনে মাসঊদ রা., আনাস বিন মালিক রা., হাবিব ইবনে আবি সাবিত রা. এবং ইবনে উমর রা. থেকে উপকার-বিবর্জিত ইলম থেকে আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।[১৩]

এর পূর্বে জাবের রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি এনে বিপরীতমুখী দুটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন :

سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع.

---

[১১] ১: ১৭

[১২] صحاح الأحاديث القدسية

[১৩] যথাক্রমে : ২৯৭৩৪, ২৯৭৩৬, ২৯৭৩৮, ২৯৭৫৩, ২৯৭৬০ এবং ২৭২৪৮ নং হাদিস

অর্থ : 'তোমরা আল্লাহর কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা করো, উপকারবিহীন ইলম থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও!' অন্যসব হাদিসগ্রন্থ থেকেও এর উদ্ধৃতি খুঁজে দেখা যেতে পারে।

তৃতীয় বিদ্যা হতে সাবধান!

আল্লাহর কাছে উপকারী ইলম প্রার্থনা এবং অনুপকারী ইলম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা সংবলিত হাদিস থেকে বোঝা যায়, এখানে তৃতীয় বিদ্যা নামেও একটি বিদ্যা রয়েছে। আর তা হলো উপকার-বিবর্জিত বা ক্ষতিকর বিদ্যা। যে ইলম উপকারী নয়, উপকারবিহীনও নয়; নিঃসন্দেহে তা ক্ষতিকর ইলম। কারণ, এ ইলমের বাহক নিজের মেধা ও প্রতিভাকে এমনসব পথে ব্যয় করে, যেগুলো আখেরাতে তার কোনো কাজে আসবে না। আর যে বিদ্যা আখেরাতে কাজে আসবে না, তা ক্ষতিকর হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। উপকারবিহীন ইলম থেকে যদি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, তবে ক্ষতিকারক বিদ্যা থেকে তো অগ্রবর্তী পন্থায় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত!

সারকথা, উপকারী ইলম হলো যা আপনাকে আমলে উদ্বুদ্ধ করবে, অধিক পরিমাণে সৎকর্ম করার অনুপ্রেরণা দেবে, অন্তরকে আলোকিত ও জ্যোতির্ময় করবে, আত্মার সংশোধন করবে; প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠ সাহাবিগণ যেভাবে মনোযোগী হতেন; আপনাকেও ছোটো-বড়ো সকল কল্যাণকর কাজে সে রকম মনোযোগী হতে বাধ্য করবে। হে আল্লাহ, আমাদের উপকারী ইলম দান করুন!

হাফেজ ইবনে রজব রহ. فضل علم السلف على علم الخلف গ্রন্থে 'ইলমে নাফে এবং 'ইলমে যার' এবং এ দুটির নিদর্শন সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ তা সেখানেই দেখে নেবেন[১৪]।

ইমাম শা'বি রহ. সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় ব্যক্ত করেছেন ইলমে নাফে-এর একটি শব্দ শিক্ষা করার ফজিলত। তিনি বলেন, কেউ যদি শামের প্রান্ত থেকে সুদূর ইয়েমেনের কোনো দূরবর্তী এলাকায় পাড়ি দিয়ে এমন একটি শব্দ শেখে, যা ভবিষ্যতে তাকে উপকার করবে; তবে আমি মনে করি তার এ ভ্রমণ কিছুতেই বৃথা যাবে না।'[১৫]

* * * *

---

[১৪] পৃষ্ঠা : ৭০

[১৫] الرحلة في طلب الحديث : ২৬

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

তালিবুল ইলমের জন্য পাঠ্যসূচির গুরুত্ব

মানহাজ বা পাঠ্যসূচির সংজ্ঞা

অভিধানে النهج والمنهج والمنهاج এর অর্থ– পথ, প্রণালি, পরিষ্কার পন্থা, অনুসৃত সরল পদ্ধতি ইত্যাদি। নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ সব অভিধানে এ অর্থই দেওয়া আছে–

"الصحاح"و"لسان العرب"و"المصباح المنير" مادة : ن هـ ج ، و"مفردات" للراغب الأصفهاني ، و"التوقيف" للمناوي و"الكليات" لأبي البقاء الكفوي .

প্রাচ্যের আরবরা যেমন .. طريق فلان أو طريق كذا (অমুক পথ) বলে থাকে, তেমনি পশ্চিমের আরবিভাষীরা .. نهج فلان أو نهج كذا ব্যবহার করে থাকে। 'মানহাজ' অর্থ যদি পথ ও পদ্ধতি হয়, তবে মানহাজ নির্ধারণ ছাড়া ইলম অন্বেষণ হলো অস্পষ্ট ও অপরিচিত পথে ভ্রমণের মতো। আর লক্ষ্যহীন গন্তব্যে ছুটে চলা প্রবল ঝুঁকিপূর্ণ; ব্যর্থতাই যার চূড়ান্ত পরিণতি। এ থেকেই আমরা মানহাজ বা পাঠ্যসূচির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি।

পাঠ্যসূচির গুরুত্ব

ওপরে যেভাবে আমরা মানহাজের আভিধানিক অর্থ বুঝেছি, সেভাবে দৈনন্দিন মানবীয় জীবনের নানা দিক থেকেও আমরা মানহাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। কারণ, পার্থিব যে কোনো কাজ যে কোনো ব্যক্তিই সম্পাদন করুক, শুরুতেই উত্তমরূপে সে জন্যে সুপরিকল্পনা ও স্পষ্ট পদ্ধতি নির্দিষ্ট না করলে কোনো কালেই সে তার গবেষণার শিখরে বা সাধনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না। চলুন একটা উদাহরণ বুঝে নেওয়া যাক–

স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের জন্য দুজন ছাত্রকে দুটি থিসিস বা গবেষাণাপ্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। তাদের একজন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দর করে গুছিয়ে যথানিয়মে তা লিখে সম্পন্ন করে। অপরজন আলোচ্য বিষয়-বহির্ভূত নানা অসার ও উপকথা লিখে খাতা জমা দেয়। এখন এ ঘটনা শ্রবণকারী প্রতিটি ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই প্রথমজনের সাফল্যের বিষয়টি নির্দ্বিধায় মেনে নেবেন। দ্বিতীয়জনকে 'ফেল' বা ক্ষতিগ্রস্তরূপে অভিহিত করবেন।

যাই হোক, ইলম অন্বেষণের এ পথ যেহেতু দীর্ঘ ও ক্লান্তিদায়ক, সেহেতু তালিবুল ইলমের জন্য এ কষ্টসাধ্য ভ্রমণকে খানিকটা সহজ করতে কিছু

পথনির্দেশ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করি এগুলো তাকে সঠিক পথের দিশা দেবে এবং তার প্রতিটি পদক্ষেপকে আলোকিত করে তুলবে ইনশাআল্লাহ। আর এগুলোকে আমি معالم বলে নামকরণ করেছি।

معلم এর শাব্দিক অর্থ পথে স্থাপিত পথনির্দেশ, যার মাধ্যমে পথিক ও পর্যটক এলাকা বা জায়গার নাম চিহ্নিত করে থাকে। এ সংজ্ঞাই উল্লেখ করেছেন– صحاح গ্রন্থে আল্লামা জাওহারি রহ.। আর لسان العرب প্রণেতা معلم কে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে– ما جعل علامة وعلما للطرق (অর্থাৎ দিগ্‌ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পেতে পথে বা সড়কে যে নিদর্শন বা দিকনির্ণয়কারী চিহ্ন স্থাপন করা হয়) প্রথম সংজ্ঞাটির সঙ্গে আমার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। তালিবুল ইলমকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করতে এ সকল 'পথনির্দেশ' আমি সংকলন করেছি। আল্লাহ চাহেন তো নিষ্ঠার সাথে এগুলো অধ্যয়নকারী প্রতিটি শিক্ষার্থী নিরাপদে ও নিঃশঙ্কায় নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

আলোচ্য এই মানহাজের অধিকাংশ আলোচনা আমি (আরববিশ্বের) সমকালীন শরয়ি জামিয়া বা ইউনিভার্সিটিগুলোর বাস্তবতাকে সামনে রেখে তৈরি করেছি। কিছু অতিরিক্তও লিখেছি। সাথে সাথে বর্তমান বিদ্যালয় ও ভার্সিটিগুলোর বাস্তব চিত্রও কিছুটা তুলে ধরেছি।

তবে যেহেতু অধিকাংশই বাস্তবতার আলোকে লিখিত, সেহেতু এটা ভাবা উচিত হবে না যে, এ জাতীয় লেখার কোনো দরকার ছিল না বা এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত কম উপকৃত হবে। আমি দেখছি, বর্তমানকালের অধিকাংশ লেখক, প্রভাষক ও গবেষক ইলমপিপাসু নয়। দ্বীনি মাদরাসা বা ইসলামি ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া নয়; বরং এখনো তারা ইলমি জগতের শিশু-কিশোর। তা ছাড়া হালের বিস্তৃত গণমাধ্যম তাদের জন্য হয়ে গেছে এক বিরাট প্রলয়ংকরী ডঙ্কা। ফলে তাদের আওয়াজগুলো তারা সহজেই এবং নির্দ্বিধায় সর্বত্র পৌঁছে দিচ্ছে। নীরবতা অবলম্বনকারী সত্যনিষ্ঠ আলিমদের সামনে তারা বকবক করে বেড়াচ্ছে। তাদের কাণ্ড দেখে আলিমরা শুধু বলছে :

إنا لله وإنا إليه راجعون.. حسبنا الله ونعم الوكيل.

হায়.. তারা যদি জানত..!!

তালিবুল ইলমদের প্রকৃত পাঠ্যসূচি সম্পর্কে না জানার কারণে মানুষ আজকাল অযোগ্য লোকদের মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। অনেক যোগ্য ও সম্মানিত আহলে ইলমকে পদচ্যুত করা হয়েছে। অন্যদিকে ইলমি ময়দানে (শিক্ষার্থীদের মধ্যে)

এমন অনেক লোকের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা ইলমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ থেকে অনেক দূরে।

এ কারণেই শরয়ি ইলম অন্বেষণের সঠিক ও যথাযথ মানহাজ সংকলনকে আমি যুগের অতিপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে মনে করেছি।

এ গ্রন্থ রচনার দ্বিতীয় কারণটি হলো, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদের ওপর পরিচালিত এক জরিপে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিকট ভবিষ্যতে জ্ঞানের রাজ্যে এক মহাবিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। তবে সেটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অনুজ্জ্বল হবে বলে মনে হচ্ছে। মুসলমানদের তা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অনেক দুরভিজ্ঞতার মুখোমুখি করবে বলে ধারণা হচ্ছে।

এ দুটি কারণ সম্পর্কে আরও আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

কারা প্রণয়ন করবে পাঠ্যসূচি?

প্রতিটি শিল্পে এবং প্রতিটি বিষয়ে রয়েছে শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ; বিষয়টি শরয়ি হোক বা পার্থিব উদ্দেশ্যপূর্ণ; শিল্পী ও বিশেষজ্ঞরাই সে বিষয়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা ভালো করে বুঝে থাকে। ডাক্তারই বোঝেন একজন অসুস্থ, জ্বর বা সর্দিতে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তদানে কী রকম স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। আর তাই একজন বিজ্ঞ ডাক্তার কিছুতেই তাকে রক্তদানের অনুমতি দেবেন না; বরং রক্তদানের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি তিনি শুশ্রূষাকারীদের স্পষ্টভাষায় বুঝিয়ে দেবেন; এমনকি স্বয়ং রোগীকেও। আর অনেক মানুষ তো আজকাল ডাক্তারের পরামর্শকেও অবহেলা করে। গুরুত্বহীন মনে করে ডাক্তারের নির্দেশনাকে।

ঠিক তেমনি কারি সাহেবগণ প্রতিটি হরফকে যথাযথ মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করার বিষয়ে ভীষণ গুরুত্বারোপ করে থাকেন। আর অন্যরা এটাকে মনে করে অতিরঞ্জন বা বেশি রকম বাড়াবাড়ি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারিদের কথাই গ্রহণযোগ্য হয়। প্রতিটি জ্ঞান ও প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তদ্রূপ ইলমের জন্য সঠিক ও যথাযথ মানহাজ প্রণয়নের বিষয়েও একই নীতি অবলম্বন করতে হবে। অন্তঃসারশূন্য তথাকথিত ইলমের ধারক-বাহকদের থেকে দ্বীন ও ইলমের বিষয়ে যন্ত্রণাদায়ক বেদনায় জর্জরিত প্রতিটি তালিবুল ইলম এ মানহাজ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করে আসছে। প্রকৃত তালিবুল ইলমগণ পূর্বসূরি আলিমদের অনুসৃত পথে ফিরে আসার এবং ইলম অন্বেষণে তাদের গৃহীত নীতি-পদ্ধতি আর মানহাজ অনুসরণে তাদের সীমাহীন উৎসাহপ্রদানের গুরুত্ব অনুভব করে আসছে। প্রকৃত আহলে ইলমই চায়, মানুষ আবার সত্যনিষ্ঠ ও বিজ্ঞ 'আমিল' আলিমদের মাঝে বসবাস করুক; যারা হবেন

বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি, জীবন্ত ইসলামের দর্পণ, পুরো উম্মাহর জন্য হবেন আদর্শ ও আশার আলো; এমন তালিবুল ইলম নিজের জন্য নয়; জীবন উৎসর্গ করবে উম্মাহর কল্যাণ ও মুক্তির জন্য।

'অন্তঃসারশূন্য' বলে যাদের বুঝিয়েছি, তারাই আজ মানুষের কর্ণকুহর থেকে 'মানহাজ' প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অপসারণের হীন প্রয়াসে লিপ্ত। যেন সাধারণ মুসলমান তাদের প্রকৃতি ও মনোভাব বুঝতে না পারে। সুতরাং এসব লোকদের বিতাড়িত করতে হবে ইলমি অঙ্গন থেকে। ইলমের মর্যাদা কলুষিত করে যারা ইলমের মিম্বারগুলোতে আরোহণ করেছে, সেসব অপরাধীদের ঘাড় ধরে বহিষ্কার করতে হবে। নিম্নোক্ত কবিতাটি তাদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য :

تصدّر للتدريس كل مُهَوَّس ☆ بليدٍ يسمى بالفقيه المدرِّسِ

فَحُقَّ لأهلِ العلم أن يتمثّلوا ☆ ببيت قديم شاع في كل مجلسِ

لقد هُزِلَتْ حتى بدا من هُزالها ☆ كُلاها وحتى سَامَها كلُّ مفلسِ

এর সারমর্ম হলো, প্রত্যেক বোকা ও নির্বোধ শিক্ষকতার কাজে লেগেছে, এদেরই বলা হচ্ছে ফকিহ মুদাররিস। সুতরাং আহলে ইলমের জন্য এখন পূর্বেকার ইলমি মজলিশগুলোতে পঠিত কাব্যকথার অনুসরণ করা দরকার। নিশ্চয় তাকে নিন্দা করা হয়েছে, অতি নিন্দার ফলে তার মূত্রগ্রন্থি বের হওয়ার উপক্রম; এমনকি শুধু দারিদ্র্যপীড়িতরাই তাকে নিতে আগ্রহী হয়েছে।

আল্লাহই আমাদের একমাত্র সহায়। তাঁর কাছেই সকল চাওয়া; তিনি যেন 'হক'কে আহলে হকের কাছে ফিরিয়ে দেন।

* * * *

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইলম ও আহলে ইলমের মর্যাদা

ভূমিকা

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এ বিষয়ে এত বেশি বর্ণনা করেছেন, যা একত্র করা তো দূরের কথা, কখনো গণনা করে শেষ করা যাবে না। শিক্ষাজীবনের সূচনালগ্ন থেকে আমার তীব্র বাসনা ছিল, إحياء গ্রন্থের প্রথম অংশে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি রহ. এ বিষয়ে যা লিখেছেন; شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : "من سلك طريقا يلتمس فيه علما" গ্রন্থে হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলি রহ. যা লিখেছেন[১৬] এবং مفتاح دار السعادة গ্রন্থে ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. এ ব্যাপারে যা লিখেছেন, সবগুলো যদি পৃথকভাবে একটি গ্রন্থে জমা করা হতো, তবে তালিবুল ইলমদের জন্য তা অত্যন্ত উপকারী ও দারুণ ফলপ্রসূ সাব্যস্ত হতো।

আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরিদের মধ্যে এ বিষয়ে আরও কলম ধরেছেন ইমাম বুখারি ও মুসলিম রহ.-এর শায়খ ইমাম আবু খাইসামা বিন হারব আন-নাসাঈ রহ. (১৬০-২৩৪ হি.); তাঁর রচিত المطبوع গ্রন্থটি বর্তমানে মুদ্রিত। অন্য ইমামগণও হাদিসের কিতাবসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন : আব্দুর রাযযাক এবং ইবনে আবি শাইবা রহ. তাদের المصنف-এ। তেমনি বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, ইবনে হিব্বান, হাকিম (رحمهم الله أجمعين) নিজ নিজ হাদিসগ্রন্থে ইলম ও আহলে ইলমের ফজিলত সম্পর্কে দীর্ঘ অধ্যায় রচনা করেছেন।

এরপর বিখ্যাত ‘ফকিহ’ খতিবে বাগদাদি রহ. নিজ গ্রন্থ الفقيه والمتفقه আদাব এবং الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع গ্রন্থেও এ বিষয়ে পৃথক অধ্যায় রচনা করেছেন। তেমনি ইলম অনুযায়ী আমলে উৎসাহিত করতে اقتضاء العلم العمل নামেও একটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ তৈরি করেছেন। ইবনে আবদুল বার রহ. جامع بيان العلم وفضله-তেও এর বিবরণ এনে الإمام أبو سعد السمعاني নামে আলাদা অনুচ্ছেদ তৈরি করেছেন। তা ছাড়া তিনি أدب الإملاء

---

[১৬] উস্তাদ মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব একে شرح حديث أبي الدرداء নামে প্রথম বার তা ছেপে ছিলেন। দীর্ঘদিন পর তা إلى ورثة الأنبياء নামেও মুদ্রিত হয়েছে। এরপর একাধিকবার তা সংস্কৃত হয়েছে

والاستملاء গ্রন্থ রচনা করে তাতেও মূল্যবান ও দুর্লভ-সব তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

হাদিসে নববির এক অমূল্য ভান্ডার مجمع الزوائد গ্রন্থে হাফেজ হাইসামি রহ.-ও সুন্দর ও সুবিন্যস্ত আলোচনা এনেছেন।[১৭]

তারপরও দুটি ভিন্ন অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ে কিছু আলোচনা না করলেই নয়–

১. ইলম ও ইলমি মজলিশের ফজিলত।

২. আলেমদের মর্যাদা এবং উম্মাহর ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

* * * *

---

[১৭] ১/১১৯-২০২

প্রথম আলোচনা

ইলম ও ইলমি মজলিশের ফজিলত

কিতাবুল্লাহতে ইলমের ফজিলত

সুরায়ে বাকারার শুরুর আয়াতগুলোতে আদম আ.-এর সৃষ্টি-ঘটনার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইলমের ফজিলত বর্ণনা করেছেন। ফেরেশতাদের প্রতি আদম আ.-কে সেজদার আদেশ করে আদম আ.-কে এককথায় সমগ্র জিন-ইনসানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর সে শ্রেষ্ঠত্বদান ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে সকল কিছুর নাম শিক্ষাদান এবং তা ব্যক্ত করতে ফেরেশতাদের অপারগতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। যখনই তারা সেসব বস্তুর নাম বলতে অপারগ হলো, তখনই সেসব বস্তুর নাম সম্পর্কে জ্ঞাত আদমকে সেজদা করতে আল্লাহ তাদের আদেশ করেন।

বোঝা গেল, কেবল ইলমের খাতিরেই আদম আ. মর্যাদাশীল হয়েছেন এবং ফেরেশতাদের সেজদালাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন; অন্য কোনো কারণে নয়।

এ সম্মানিত ইলমের বাহক হওয়ার কারণেই তালিবুল ইলমের জন্য ফেরেশতাগণ তাদের নুরের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেয়। যেমনটি হাদিসে এসেছে:

من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم.

অর্থ : 'ইলম অন্বেষণের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি পথ অতিক্রম করে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। ফেরেশতারা তালিবুল ইলমকে খুশি করতে তাদের পাখাগুলো বিছিয়ে দেয়।'[১৮]

ইলম ও আহলে ইলমের ফজিলত সাব্যস্ত করতে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তাদের এ সম্মানপ্রাপ্তিই যথেষ্ট।

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে, ইলমই আহলে ইলমকে ধ্বংস ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। ইলমের দ্বারাই মানুষ মুক্তি পায়, ইলমকে অবহেলার ফলেই মানুষ চিরদিনের জন্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যায়।

---

[১৮] الترمذي : ২৬৮২; ابن ماجة : ২২৩

ইহকালে মুক্তির নমুনা

আল্লাহর নবি সুলাইমান আ. হুদহুদ পাখিকে তার অনুপস্থিতির দরুন কঠিন শাস্তি বা জবাইয়ের হুমকি দিয়েছিলেন, কিন্তু ইলম ও জ্ঞানের কারণে হুদহুদ পাখি সহজেই সে পার পেয়ে যায়।

হুদহুদ বলেছিল,

﴿وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾

অর্থ : 'আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।'[১৯]

হুদহুদের এ সংবাদ-সরবরাহ এবং শুভ-তৎপরতার কল্যাণেই রানি বিলকিস পুরো সম্প্রদায়সহ ঈমান এনেছিল।

পরকালে মুক্তির নমুনা

সুরা আল-কাসাসের শেষদিকে ৭৬-৮৩ নং আয়াতগুলোতে কারুনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সে তার অঢেল ধনৈশ্বর্য এবং অর্থসম্পদের দোহাই দিয়ে বিশ্ববাসীর ওপর বড়াই করত। বলত :

﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي﴾

অর্থ : 'আমি এ ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা লাভ করেছি।'[২০]

অপর দিকে ধর্মভীরু প্রকৃত আহলে ইলমদের উক্তি হয় :

﴿وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾

অর্থ : 'ধিক তোমাদের, যারা ঈমানদার ও সৎকর্মী, তাদের জন্যে আল্লাহর দেওয়া পুরস্কার ও প্রতিদানই উৎকৃষ্ট।'[২১]

এরপর আল্লাহ তাআলা কারুনের পরিণতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ

---

[১৯] سورة النمل (২৭) : ২২
[২০] سورة القصص (২৮) : ৭৮
[২১] سورة القصص (২৮) : ৮০

عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

অর্থ : 'এরপর আমি কারুন ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিই। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারেনি। গতকাল যারা তার মতো হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যূষে বলতে থাকে, হায়, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা রিজিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না। এ পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্যেই শুভ পরিণাম।'[২২]

ইলম ও বুদ্ধির গুণে মুক্তি ও পরিত্রাণ পাওয়া নিয়ে একটি মজার ঘটনা বর্ণিত আছে। শাবিব বিন যাইদ আশ-শাইবানি ছিল খারেজি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ এক লোক। বাদশাহ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে সে নিহত হয়। নিজেকে খলিফাহ বলে দাবি করত। ইতবান আল-হারূরি নামক এক অনুসারী তাকে আমিরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত করে কিছু কবিতা রচনা করে :

فمنّا حُصينٌ والبَطينُ وقَعنب ☆ ومنا أميرُ المؤمنين شبيبُ

হুসাইন, বাতিন, কা'নাব সবাই আমাদের দলভুক্ত; এমনকি আমিরুল মুমিনীন 'শাবিব'ও আমাদের অন্তর্ভুক্ত।

শাবিবের মৃত্যুর পর ওই কবিকে আমিরুল মুমিনীন আবদুল মালিকের কাছে নিয়ে আসা হলে আমিরুল মুমিনীন তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর দুশমন, তুই কি একথা বলিসনি?

فمنا حُصين والبَطين وقعنب ☆ ومنا أميرُ المؤمنين شبيب

হুসাইন, বাতিন, কা'নাব সবাই আমাদের দলভুক্ত; এমনকি আমিরুল মুমিনীন 'শাবিব'ও আমাদের অন্তর্ভুক্ত।

তখন উত্তরে সে বলে, হে আমিরুল মুমিনীন, আমি তো এভাবে বলিনি; বরং বলেছি—

---

[২২] سورة القصص (২৮) : ৮১-৮৩

ومنا- أميرَ المؤمنين- شبيب

(অর্থাৎ أمير শব্দের راء এর ওপর পেশ এর পরিবর্তে যবর দিয়ে ফেলে। তখন أمير শব্দটি উহ্য يا 'হরফে নেদা' থেকে 'মুনাদা মুযাফ' হবে; আর তখন তার অর্থ দাঁড়াবে, হে আমিরুল মুমিনীন, শাবিবও আমাদের দলভুক্ত)

এভাবেই শাবিবকে খলিফা দাবি করার বিষয়টি সে সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। এরপর আবদুল মালিক তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও কৌশলগত উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হন এবং তাকে মুক্ত করে দেন। এখানে ইতবান শুধুই তার মেধা, বুদ্ধি ও ইলমের কল্যাণেই নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

কুরআনুল কারিমেও ইলমের ফজিলত সংক্রান্ত অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। সুরা তাহা'র ১১৪-নং আয়াতে প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন,

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

অর্থ : 'এবং বলুন : হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।'[২৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে ইলম ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের প্রাচুর্য প্রার্থনার আদেশ দেননি। আর তাই নিঃসন্দেহে এ ইলম দ্বারা আল্লাহর ইলম, তাঁর সিফাতসমূহের ইলম এবং আল্লাহর নৈকট্যের পথনির্দেশক ইলমই উদ্দেশ্য।

একটি মারফু হাদিসে বর্ণিত :

اللّٰهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما.

অর্থ : 'হে আল্লাহ, যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আমায় উপকৃত করুন। উপকারী জ্ঞান আমায় শিক্ষা দিন। আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।'[২৪]

সুরা তাওবার শেষের দিকে ১২২-নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

অর্থ : 'আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়। সুতরাং তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ দ্বীনের জ্ঞানলাভের জন্য কেন বের হয়

---

[২৩] سورة طه (২০) : ১১৪

[২৪] الترمذي : ৩৫৯৯, একে তিনি ضعيف বলেছেন, ابن ماجة : ২৫১

না; যেন (ইলম অর্জন করে) ফিরে আসার পর সে সম্পর্কে অবহিত করে স্বজাতিকে, যেন তারাও (আগুন থেকে) বাঁচতে পারে।'[২৫]

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আগত মুসলিম প্রজন্মসমূহের ব্যাপারে এই আয়াতের সারকথা হলো, সকল মুমিনের জন্য জিহাদে গমন করা সমীচীন নয়; বরং তাদের একটি দলকে ইলম অন্বেষণ এবং দ্বীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বের হতে হবে। এরপর ইলম অন্বেষণ শেষে তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে তাদেরও দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেবে। আয়াতে ইলম অন্বেষণের বিষয়টি ইসলামের চূড়ান্ত পদক্ষেপ এবং দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদ পর্যন্ত অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।[২৬]

ইবনে আবদুল বার আবুদ্দারদা রা.-এর দুটি উক্তি নকল করেছেন, যার সারমর্ম হলো, ইলম অন্বেষণ জিহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত অপর বর্ণনায় –ইলম শিক্ষা করা জিহাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ– বর্ণিত হয়েছে।[২৭]

আবুল হাসান আল-কাবেসি আল-মালেকি[২৮] ইমাম ইবনুল ইমাম মুহাম্মদ বিন সাহনুন[২৯] থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, ইবনে সাহনুনের কাছে জনৈক ব্যক্তির পুত্র অধ্যয়নরত ছিল। সেই অভিভাবকটি ছিল কতই-না উত্তম। একদিন সে উস্তাদের কাছে এসে বলল, জীবিকা উপার্জনের সকল কাজ তার ছেলের পক্ষ থেকে আমি নিজে করব; ইলম অন্বেষণের পথে অন্তরায় হয় এমন কিছু তাকে করতে দেব না। উস্তাদ সাহনুনও ছিলেন কতই-না মহান উস্তাদ। তিনি ওই ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি কি জানেন, আপনার এ উদ্যোগের প্রতিদান হজ, রিবাত ও জিহাদের চেয়েও বেশি?! (অর্থাৎ নফল হজ, রিবাতে কিফায়ি ও জিহাদে কিফায়ি থেকে)।

উপর্যুক্ত বর্ণনায় প্রতিটি পিতা এবং প্রত্যেক অভিভাবকের জন্য রয়েছে এক মহান শিক্ষা এবং দারুণ অনুপ্রেরণা, যাদের সন্তানদের আল্লাহ তাআলা ইলম অন্বেষণের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাঁরা সন্তানদের পড়ালেখার পুরো খরচ বহন করছেন, কষ্ট করে তাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করছেন। তারা যদি পার্থিব জীবিকা নির্বাহের কাজে সন্তানদের লাগিয়ে দিতেন, শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ

---

[২৫] سورة التوبة (০৯) : ১২২

[২৬] ইবনুল আরাবি রচিত أحكام القرآن : ২/৬০১ এবং কুরতুবি : ৮/২৯৩

[২৭] الجامع لابن عبد البر : ১৫৯, ১৬১, ১৬০

[২৮] الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين : ৮৯

[২৯] ২০৩-২৫৬ হি.

করে দিতেন; তবে নিশ্চিতভাবেই তারা এ মহা পুরস্কার এবং পুণ্যময় প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতেন।

এখানে আনাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস আমার মনে পড়ল। তিনি বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিল দুই সহোদর ভাই; তাদের একজন দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসত, অপর জন পরিবারের জন্য জীবিকা নির্বাহ করত। একবার জীবিকা-নির্বাহকারী ভাইটি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ইলম অন্বেষণকারী ভাইয়ের (উপার্জনে অবহেলা করে সারাক্ষণ নবিজির দরবারে বসে থাকার) ব্যাপারে অভিযোগ করলে নবিজি বললেন, হতে পারে তাঁর কারণেই তোমাকে রিজিক দেওয়া হচ্ছে।[৩০]

হাফেজ ইবনে রজব রহ. বলেন, 'ইলম হলো সর্বোত্তম জিকির এবং সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ।'[৩১] তিনি আরও বলেন, 'মাযহাবপ্রণেতা চার ইমাম একমত হয়েছেন যে, ইলম অন্বেষণ নফল নামাজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, ইলম হলো মূর্খতার কালো অন্ধকার দূর করার উজ্জ্বল বাতিসদৃশ। এ বাতি ছাড়া যে ব্যক্তি পথ পাড়ি দিতে চাইবে, সে কূপ বা রাস্তার উঁচু-নিচু স্থানে হোঁচট খাবে বা আহত হয়ে যাবে।[৩২]

বুরহান যানজুরি রহ. লেখেন, 'নিশ্চয় ইলম অন্বেষণ একটি মহান কাজ, অধিকাংশ আলিমের মতে তা জিহাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'[৩৩]

হাদিস শরিফে ইলমের ফজিলত

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

'ইলম অন্বেষণ সকল মুসলিমের ওপর ফরজ।'

[ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য হাদিস বিশারদগণ আনাস রা. এবং অপরাপর সাহাবি থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসটির সনদ সহিহ হওয়া নিয়ে এবং এর 'ইবারাত' বিষয়ে আলিমদের থেকে প্রচুর বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে।]

---

৩০ তিরমিজি : ২৩৪৫, একে তিনি حسن صحيح বলেছেন।

৩১ شرح حديث أبي الدرداء : ৩৭

৩২ لطائف المعارف : ১৩০

৩৩ تعليم المتعلم : ৮৩

হাদিসটির সনদ

অনেক সূত্রে এটি সহিহ। ইমাম সুয়ুতি রহ. এ বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা এনে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে তা মুদ্রিত আছে। কেবল আনাস রা. থেকেই ২১জন 'বর্ণনাকারী' হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

হাদিসটির অর্থ দু-রকম ফরজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে

বর্তমান সময়ের জন্য এটি ফরজে আইন। ইসলাম আপনাদের কাছে কী চায়? ধরুন, আসরের নামাজের পূর্বক্ষণে যে সাবালকত্বে উপনীত হলো, তার ওপর আল্লাহর আরোপিত নির্দেশ হলো যথাসময়ে উত্তমরূপে নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে তৎক্ষণাৎ অজু ও নামাজসংক্রান্ত যাবতীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে তার অবগত হতে হবে।

হজের মওসুমে যদি সাবালকত্বে উপনীত হয়, তখন হজ ফরজ হলে তৎক্ষণাৎ তাকে বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে হজে গমনের লক্ষ্যে হজের যাবতীয় বিধি-বিধান আয়ত্ত করতে হবে। জাকাত এবং রোজার ক্ষেত্রেও একই কথা।

তেমনি বালেগ ব্যক্তির যদি পিতা-মাতা জীবিত থাকে, তবে মৃত্যুর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে সরকারি ও গ্রাম্য প্রাচীন নীতি অনুসারে নয়; শরয়ি পন্থায় যথাযথভাবে তাদের অধিকারসমূহ আদায় করতে হলেও তার যথেষ্ট ইলম দরকার। এভাবেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা শরিয়তের মুখাপেক্ষী; বিবাহিত জীবনে, পিতৃ-জীবনে, শিক্ষকতাকালে, বিচারক পদে নিয়োগ হলে...ইত্যাদি ইত্যাদি। এটি সর্বসম্মত একটি নীতি।

ফরজে কিফায়া

আপনি একা যদি তা আদায় করে নেন, তবে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। অন্য কেউ আদায় করে নিলে আপনার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হবে।

ধরুন, মাত্র ১০জন হার্টবিশেষজ্ঞ ডাক্তার পুরো নগরবাসীর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। এ পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি হবে, শহরবাসীর জন্য পরিপূর্ণ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে মুসলমানদের ছেলেদের আরও বেশি করে মেডিকেলে ভর্তি করা হোক। এ দাবি উত্থাপন না করে ঘরে বসে থাকলে পুরো নগরবাসী এক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে।

তেমনি নগরবাসীর চাহিদাপূরণে শরয়ি ইলমে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী, মুসলিম প্রকৌশলী, মুসলিম অর্থনীতিবিদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কেও একই কথা। নগরবাসীর চাহিদা যত বেশি হবে, মুসলমানদের তত বেশি করে স্পেশালিস্ট তৈরি করতে

হবে। বিদেশিদের দিয়ে নয়; এ কোটা শহরবাসীকে তাদের সন্তানদের দিয়েই পূরণ করতে হবে। সংখ্যা ও দেশ হিসেবে তারা যত বেশি ও বড়ো হবে, তত বেশি করে দক্ষ ও বিজ্ঞজন তৈরিতে তাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সামগ্রিক চাহিদার দিকে লক্ষ করলে অনুমান করা যায় যে, মুসলিমদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করতে ধর্মশাস্ত্রের প্রতিটি বিভাগে বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কী পরিমাণ প্রয়োজন!!

কেমন তালিবুল ইলম চায় সমাজ

সামগ্রিক বিবেচনায় প্রত্যেক দেশের প্রতিটি মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য –এমনকি অমুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্যেও– তিন শ্রেণির তালিবুল ইলম প্রয়োজন :

১. ইমাম ও খতিবের দায়িত্বপালনকারী বিরাট একটি শ্রেণি। যারা মেহরাব ও মিম্বারগুলোতে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবে। ইসলামের এ সুমহান ইবাদাত পালনে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করবে। ইমাম ও খতিবের পদশূন্যতা কেয়ামতের অন্যতম নিদর্শন। সে জমানায় মানুষ ইমামতির জন্য যোগ্য লোক না পেয়ে নিজেরা একজন অপর জনকে ইমামতির জন্য ধাক্কাধাক্কি করে এগিয়ে দিতে চাইবে– তুমি যাও..আরে না না..তুমি যাও!

২. দ্বীনি ইলমে সুগভীর পাণ্ডিত্য অর্জনকারী প্রতিষ্ঠিত একদল তালিবুল ইলম; যারা সর্বসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যাবলির সমাধান এবং সব বিষয়ে ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বে থাকবে।

৩. উপর্যুক্ত দুটি দল অপেক্ষা সমাজের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি শ্রেণি হলো, যারা স্বনামধন্য, ইলমি সকল বিষয়ে বিজ্ঞ এবং সমাজ ও মুসলিম-সংস্কৃতির ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে পুরোমাত্রায় জ্ঞাত থাকবে। সকল বিষয়ে মুসলমানদের সব সমস্যা সমাধান করার পাশাপাশি পথভ্রষ্টকারী নাস্তিক-মুরতাদ এবং কাফিরদের থেকে দ্বীনি আকিদা, আল্লাহর কালাম, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও সুন্নাত, ইসলামি ফিকহ, আরবি ভাষাশিক্ষা ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে আরোপিত অপবাদ এবং তাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে। ইসলামের বিষয়ে তাদের উত্থাপিত সকল অপযুক্তি খণ্ডন করবে।

তৃতীয় এ দলটি কেবল একটি রাষ্ট্রে নয়; বরং সকল মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করে স্থানীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় নিরলসভাবে সে কাজ সম্পন্ন করে

যাবে। এ রকম বিশেষজ্ঞ-শ্রেণি তৈরি করা সকল মুসলমানের অপরিহার্য দায়িত্ব। এমনকি দিন দিন সেই শ্রেণিকে করতে হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ, তাদের সংখ্যাধিক্য ঘটাতে হবে অনিবার্যভাবে। কারণ, সমাজে মুসলিমশত্রুতা এবং ইসলামবিদ্বেষ যে হারে বাড়ছে, তাতে এ ধরনের তালিবুল ইলম তৈরি করা শুধু যুগের দাবিই নয়; বিশ্বের বুকে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অনিবার্য ও অসামান্য দায়িত্বও বটে। এ ধরনের তালিবুল ইলম শ্রেণির প্রয়োজনীয়তা, তৈরির পদ্ধতি এবং তাদের ইলম-আমলের ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে সামনে গঠনমূলক বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ।

ইলমের ফজিলত সম্পর্কে আব্দুর রহমান বিন আবযা আলখুযায়ি থেকে (মতান্তরে তার পিতা আবযা থেকে) বর্ণিত হাদিসটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। ছোটো সাহাবি নামে প্রসিদ্ধ এ মনীষী বলেন,

> 'একদিন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ প্রদানের সময় একদল মুসলমানের প্রশংসা করে বলেন, কী হলো ওই সম্প্রদায়ের যারা প্রতিবেশীদের দ্বীন শিক্ষা দেয় না, ধর্মীয় বিষয় তাদের শিক্ষাদান করে না, তাদের ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করে না, সৎকাজের আদেশ করে না এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে না! আর ওই সম্প্রদায়েরই-বা কী হলো, যারা প্রতিবেশীদের থেকে শিক্ষা লাভ করে না, দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে না, ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয় না! আল্লাহর শপথ! অবশ্যই যেন প্রত্যেক সম্প্রদায় তার প্রতিবেশীকে শিক্ষাদান করে, তাদের বোঝায়, অবহিত করে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে; তা না হলে অবশ্যই আমি দুনিয়াতেই তাদের ওপর দ্রুত শাস্তির পতন কামনা করব।'

একথা বলে তিনি মিম্বার থেকে নেমে ঘরে চলে যান।

লোকেরা বলাবলি করতে থাকে, তোমরা কী মনে করো— এ বক্তব্যের দ্বারা নবিজি কাদের উদ্দেশ্য করেছেন? কেউ কেউ বলতে থাকে, মনে হচ্ছে আশআরি সম্প্রদায়কেই তিনি উদ্দেশ্য করেছেন। তারা নিজেরা দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতিবেশী বেদুইন ও জলবাসীরা (ইসলাম সম্পর্কে) চরম মূর্খ। আশআরিদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তারা নবিজির কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি একদল মুসলমানের প্রশংসা করেছেন আর আমাদের মন্দ বলেছেন! আমাদের মধ্যে কোনো ত্রুটি আছে, হে আল্লাহর রাসুল? নবিজি বললেন, অবশ্যই যেন প্রত্যেক সম্প্রদায় তার প্রতিবেশীকে শিক্ষা দান করে, তাদের বোঝায়, অবহিত করে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে। আর প্রত্যেক সম্প্রদায় যেন তাদের প্রতিবেশী থেকে শিক্ষা লাভ করে,

তাদের থেকে বুঝে, অবগত হয়; অন্যথা অবশ্যই আমি দুনিয়াতেই তাদের ওপর দ্রুত শাস্তির পতন কামনা করব।'

তারা বলল, আমরা কি অন্যদের শিক্ষা দেব হে আল্লাহর রাসুল? নবিজি তাঁর কথা পুনর্ব্যক্ত করলেন। তারা আবার বলল, আমরা কি অন্যদের শিক্ষা দেব হে আল্লাহর রাসুল? নবিজি আবারও একই কথা বললেন। এরপর তারা বলল, এক বছর সময় দিন আমাদের। নবিজি প্রতিবেশীদের দ্বীন শিক্ষাদান, তাদের বোঝানো এবং ইসলাম সম্পর্কে প্রতিবেশীদের অবহিত করতে তাদের এক বছর সময় দেন। এরপর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন :

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

অর্থ : 'বনি-ইসরাইলের মধ্যে যারা কাফের, তাদের দাউদ ও মরিয়মের পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে তাদের কৃত মন্দ কাজের কারণে নিষেধ করত না। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।'[৩৪]

'অন্যথা অবশ্যই আমি দুনিয়াতেই তাদের ওপর দ্রুত শাস্তির পতন কামনা করব'। নবিজির এ কথাটি একটি ভীষণ সতর্কবাণী; অন্য কোনো হাদিসে এরকম মারাত্মক ভর্ৎসনাপূর্ণ বাক্য ব্যবহৃত হয়নি। এ কারণেই হাদিসটি উল্লেখ করা এখানে অধিক সমীচীন মনে করেছি।

কারণ, ইলমের দ্বারাই মানুষের ঈমান, আকিদা, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত পরিশুদ্ধ হয়, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধন হয়। কোনো মুসলমানের এ দিকটি সঠিক ও বিশুদ্ধ হয়ে গেলে তার দুনিয়া-আখেরাতও পরিশুদ্ধ হয়ে যায়; তার সকল কাজ ও আচার-আচরণ পবিত্র হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ, ইহজগতে ইলমে-দ্বীন অপেক্ষা অন্য কিছু যদি উৎকৃষ্টতর হতো, কোনো সন্দেহ নেই–তবে নবি-রাসুলগণ সেটিকেই উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে

[৩৪] (সুরা মায়িদা (০৫) : ৭৮,৭৯)। হাদিসটি রেওয়ায়েত করেছেন তাবারানি রহ. তাঁর المعجم الكبير গ্রন্থে। তা ছাড়া أبو نعيم في المعرفة : ১/৩৬৬, ابن الأثير في أسد الغابة : ১/৫৬, ইমাম বুখারিও الوحدان -এ এটি উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া ইবনে আসাকির রহ. এটি আবদুর রহমানের পিতা আবযার সূত্রে বর্ণনা করেছেন : ৩২/৫৮

যেতেন। কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ইলম ছাড়া অন্য কিছু রেখে যাননি উত্তরাধিকার হিসেবে।

ইমাম তাবারানি রহ. معجم الأوسط গ্রন্থে 'হাসান' সনদে হাইসামি থেকে উল্লেখ করেন, একবার আবু হুরায়রা রা. মদিনার বাজারের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে হঠাৎ দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিতে থাকেন, 'হে বাজারের লোকেরা, কিসে তোমাদের বিরত রেখেছে? সবাই বলে, কোন বস্তু থেকে হে আবু হুরায়রা? বলেন, ওই তো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার বণ্টিত হচ্ছে আর তোমরা তা গ্রহণ না করে নিজেদের বঞ্চিত করছ? তারা বলে, কোথায় বণ্টিত হচ্ছে? বললেন, মসজিদে! এরপর দ্রুত তারা মসজিদের দিকে ছুটে যায়। আবু হুরায়রা তাদের ফিরে আসা পর্যন্ত নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা ফিরে এসে বলতে থাকে, হে আবু হুরায়রা, মসজিদে তো উত্তরাধিকার বণ্টনের কোনো দৃশ্য দেখিনি আমরা! তখন আবু হুরায়রা বলেন, মসজিদে কি তোমরা কাউকেই দেখনি? তারা বলে, হ্যাঁ...একদল লোককে নামাজ পড়তে দেখেছি, আরেক দলকে কুরআন পড়তে দেখেছি, আর কিছু লোক হালাল-হারাম সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। আবু হুরায়রা. বলেন, ধিক তোমাদের! ওটাই তো মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার।'

খতিবে বাগদাদি রহ. আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেন– একদিন ইবনে মাসঊদ রা. তাঁর সাথিদের নিয়ে একস্থানে আলোচনারত ছিলেন, এ সময় তাঁর পাশ দিয়ে এক বেদুইন অতিক্রমকালে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, কেন তারা এখানে একত্র হয়েছে? ইবনে মাসঊদ উত্তরে বলেন, নবি করিম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকার বণ্টনের উদ্দেশ্যে।[৩৫]

প্রতিটি তালিবুল ইলম যেন এ মহান মর্যাদা লাভ করেছে ভেবে আনন্দিত হয়, নিজেকে সৌভাগ্যশীল মনে করে। অন্যরা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট– তালিবুল ইলমের জন্য একথা বিশ্বাস করা তো দূরের কথা; কল্পনা করাও হারাম।

---

[৩৫] شرف أصحاب الحديث : ৫৩-৫৪

ইলমি মজলিশের ফজিলত

ইলমি মজলিশ তো হলো ইসলামের নুর, হেদায়াতের আলো; এর দ্বারাই জীবনে নীতি-নৈতিকতা এবং আমলে উৎকর্ষ সাধন হয়। জীবনযাপন হয় লক্ষ্যপূর্ণ ও গতিময়।

খতিবে বাগদাদি রহ. ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি ঘটনার বিবরণ[৩৬] দিতে গিয়ে লেখেন, 'একবার হাদিসশাস্ত্র নিয়ে গবেষণাকারী কিছু লোক তাঁর কাছে আসে। তাদের হাতে ছিল কলম। তিনি ওই কলমগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এগুলোই ইসলামের আলোকবর্তিকা! 'আছার'টি পড়ার সময় ইমাম আহমদ রহ.-এর এ অনুপম তুলনায় মুগ্ধ হয়ে তাতে মন্তব্য যোগ করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু শ্রদ্ধাভাজন আল্লামা ডক্টর আহমদ মুহাম্মদ নুর সাইফের করা[৩৭] যথোপযুক্ত মন্তব্যটিই এখানে উল্লেখ করা অধিক সমীচীন মনে করলাম। তিনি বলেন : 'এটি একটি সুন্দর উপমা। কলম যদিও পাতাকে কালো বানিয়ে দেয়, কিন্তু তার লেখনী দ্বারাই হেদায়াত ও সিরাতুল মুস্তাকিমের নুর উদ্ভাসিত হয়। এর মসি দিয়ে লিপিবদ্ধ ও রচিত কিতাবগুলোতেই যত প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী, জ্ঞানসমৃদ্ধ ইতিহাস, উপদেশ সংবলিত কথা ও বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্ব সংকলিত হয়; যা দ্বারা জীবন হয় আলোকিত, ঘটে মেধার বিকাশ, দূর হয় যত সংশয়-সন্দেহ; দুশ্চিন্তা ও বিষাদগ্রস্ত মানুষ দিশা পায় সত্য ও সঠিক ইসলামের।'

তারগিব-এ দারেমি কর্তৃক ইবনে সিরিন রহ. থেকে বর্ণিত[৩৮] আছারটিও এখানে উল্লেখ করা যায়। ইবনে সিরিন রহ. একবার মসজিদে ঢুকে হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান আল-হিময়ারিকে ইলমের মজলিশ পরিচালনা করতে এবং দ্বিতীয় অপর ব্যক্তিকে অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন কাহিনি বর্ণনা করতে দেখেন। কার মজলিশে বসবেন চিন্তা করে দ্বিধায় পড়ে যান। মজলিশে বসার পর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি বলেন, এরপর স্বপ্নে এক আগন্তুক আমার কাছে এসে বলতে থাকে, 'কার অধিবেশনে বসবে তা নিয়ে তুমি দ্বিধাগ্রস্ত?! যদি চাও, তবে হুমাইদ বিন আব্দুর রহমানের মজলিশে ফেরেশতা জিবরাইলের স্থানটি এই মুহূর্তে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতে পারি!

---

[৩৬] الجامع : ৫১৩

[৩৭] নিজ গ্রন্থ من أدب المحدثين في التربية والتعليم -এ : ২১৩

[৩৮] পৃষ্ঠা : ৩৫৭ / ইবনে আব্দিল বির রহ. الجامع গ্রন্থে ভিন্ন সূত্রে সবিস্তারে এটি বর্ণনা করেছেন : ২৪৮

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত ইলম অন্বেষণকারী এবং ইলমচর্চাকারীদের অধিবেশনকে ফেরেশতাদল কর্তৃক ঘিরে রাখা থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যময় কিছু বিষয় উপর্যুক্ত বর্ণনায় পাওয়া গেছে বিধায় 'আছার'টি এখানে আমি উল্লেখ করেছি।

মুসলিম শরিফে মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে[৩৯] বর্ণিত হয়েছে :

> 'আল্লাহ তাআলা ইলমের মজলিশে আলোচনারত এবং শিক্ষারত ব্যক্তিদের নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ববোধ করেন।' দারেমিতে বর্ণিত অপর হাদিসে এসেছে– 'ফেরেশতাদের নেতা জিবরাইল আ. পর্যন্ত ইলমের মজলিশে উপস্থিত থাকেন।'[৪০]

হাফিজ ইবনে রজব রহ. বলেন, 'ইলম চর্চায় মগ্ন কিছু ব্যক্তি স্বপ্নে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন মসজিদে বসা। মানুষ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত। আর নবিজির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ইমাম মালেক রহ.। নবিজির সামনে একটি মেশক (সুগন্ধীভরা কাঠের পাত্রবিশেষ); সেখান থেকে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু একটু করে নিয়ে মালেক রহ.-কে দিচ্ছেন আর মালেক রহ. সেটি মানুষের মাঝে বণ্টন করছেন।'[৪১]

স্বপ্নটির মাধ্যমে ইমাম মালেক রহ.-এর ইলম চর্চা এবং তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ উদ্দেশ্য বোঝানো হয়েছিল।

ইবাদাতের জন্য ফারেগ হওয়া থেকে ইলমের মজলিশ গঠন শ্রেষ্ঠ

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়াহব রহ.-এর জীবনীগ্রন্থে[৪২] কাজি ইয়ায রহ. আহমদ বিন আব্দুর রহমানের উক্তি বর্ণনা করেন :

> 'একবার আমি চাচা ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহব রহ.-এর সাথে আলেকজান্দ্রিয়ায় যুদ্ধরত ছিলাম। মানুষ তাঁর কাছে এসে ইলম তলব করত, বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করত। তিনি বলতেন, এটি ইবাদাতের শহর; মানুষের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে তো নিজের জন্য কিছুই করতে পারছি না আমি! এরপর তাদের নিয়ে ইলমের মজলিশ গঠন ছেড়ে দিয়ে তিনি

---

[৩৯] পৃষ্ঠা ৪০

[৪০] ইমাম বুখারি রহ. নিজ গ্রন্থ التاريخ الكبير –এ {২/২৬৯৭} ইবনে সিরিন রহ. এর দিকে সম্বন্ধ করে বলেন, হুমাইদ রহ. মৃত্যুর ২০ বৎসর পূর্বে কুফা ও বছরা নগরীদ্বয়ের শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।

[৪১] شرح حديث أبي الدرداء : ৪৮

[৪২] ترتيب المدارك : ১/৫৬০

ইবাদাত ও পাহারাদারিতে আত্মনিয়োগ করেন। দু-দিন পর এক লোক তাঁর কাছে এসে বলতে থাকে, স্বপ্নে নিজেকে আমি মসজিদুল হারামে অবস্থান করি। দেখি, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসা। আবু বকর রা. তাঁর ডান দিকে এবং উমর রা. তাঁর বাঁ-দিকে আর আপনি ঠিক নবিজির সামনে। মসজিদে অনেকগুলো আলোকোজ্জ্বল ও দৃষ্টিনন্দন বাতি ছিল। বাতিগুলোর মধ্যে একটির আলো কমে গিয়ে তা নিভে যায়। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সেটি জ্বালাতে বললে আপনি গিয়ে সেটি জ্বালিয়ে দেন। এরপর আরেকটি বাতি নিভে যায়। এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখি, সবগুলো বাতি নিভে যাওয়ার উপক্রম। আবু বকর রা. নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কী হলো এই বাতিগুলোর, এগুলো নিভে যাচ্ছে কেন হে আল্লাহর রাসুল? নবিজি বলেন, এটা এ আবদুল্লাহর কাজ। সে এ বাতিগুলো নিভিয়ে দিতে চায়।'

স্বপ্নের বিবরণ শুনে ইবনে ওয়াহাব রহ. ভীষণ কাঁদতে থাকেন। লোকটি বলে, আমি তো আপনাকে নবিজির সংশ্রব লাভের সুসংবাদ দিতে এসেছিলাম; আপনি কাঁদবেন জানলে আমি আপনার কাছে আসতাম না! তিনি বলেন, হ্যাঁ.. এ স্বপ্ন আমার জন্য এক মহা উপদেশ। আমি ভেবেছিলাম, ইলমচর্চা এবং তার প্রচার অপেক্ষা ইবাদাত ও প্রহরা উত্তম।' এরপর তিনি ইলম প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এ লক্ষ্যে পার্থিব ও অন্যান্য অনেক কাজ তিনি পরিত্যাগ করেন। কেবল মানুষকে দ্বীন শিক্ষাদান এবং তাদের মাঝে ইলমের প্রচারকেই তিনি একমাত্র কাজ হিসেবে নির্ধারণ করে নেন।

আল্লাহ তাআলা ইলমের মজলিশের মাধ্যমেই তাঁর জীবনের সুসমাপ্তি দান করেন। أهوال القيامة 'কেয়ামতের ভয়াবহতা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে যথারীতি সেটিকে তিনি মানুষের মাঝে পড়ে শুনাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর থেকে আর কোনো কথা বলেননি; তিন দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

ইলমচর্চায় পূর্বসূরিদের একাগ্রতা ও আত্মত্যাগের অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ترتيب المدارك গ্রন্থে কাজি ইয়ায রহ. প্রখ্যাত মনীষী আসাদ বিন ফুরাত রহ.-এর কায়রাওয়ান থেকে মদিনা এরপর মদিনা থেকে বাগদাদের উদ্দেশ্যে করা ইলমি ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেন।[৪৩]

---

[৪৩] ১/৬০৯-৬১৩

আসাদ বিন ফুরাত রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবু ইউসুফ রহ. তাঁর এক সঙ্গীকে বলেন, 'আপনি তাকে নিজের সাথে নিয়ে নিন; হয়তো দুনিয়া ও আখেরাতে সে আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।' আসাদ বিন ফুরাত রহ. বলেন, 'এরপর আমি ওই লোকটির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে যাই। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ বিন হাসান রহ.। এরপর আমি তাঁর সান্নিধ্য অর্জন করি। এমনকি তাঁর ঘনিষ্ঠদের একজন হয়ে যাই।'

আসাদ বিন ফুরাত রহ. বলেন, 'আমি মুহাম্মদ রহ.-কে বলি, আমি তো দূরপ্রবাসী; আপনার কাছ থেকে তো তেমন বেশি ইলমি বিষয় শুনতে পাই না!' তখন মুহাম্মদ রহ. বলেন, 'দিনের বেলায় ইরাকি আলিমদের সংশ্রবে থেকে ইলম অন্বেষণ করো আর রাতের বেলায় একাকী আমার কাছে চলে এসো! আমি তোমাকে শুনাব।' রাতের বেলায় আমি তাঁর কাছে আসতাম, যখনই শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে যেতাম তখনই তিনি আমার চোখে পানি ছিটিয়ে দিতেন।'

কাজি ইয়ায রহ. লেখেন– আসাদ বিন ফুরাত রহ. বলেন, 'একবার ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আমাকে তাঁর সঙ্গে মক্কা সফরের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব শুনে কেমন যেন আমার মনে বিরক্তির ভাব আসে। সাথিরা অনেকে আফসোস করে বলতে থাকে, হায়! দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে হলেও আমাদের যদি তাঁর সঙ্গে মক্কা গমনের সৌভাগ্য হতো!' আমি তাকে বেশি রকম প্রশ্ন করতাম। অনেক সময় তিনি নামাজে থাকতেন। আমার প্রশ্ন শুনে নামাজে আছেন বুঝানোর জন্য তিনি কেরাতের আওয়াজ উঁচু করতেন। আমি বলতাম, কত দেশ পেরিয়ে আপনার কাছে আমি ইলম শিখতে এসেছি, আর আপনি আমাকে বঞ্চিত রেখে নামাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন!! এরপর দ্রুত নামাজ শেষ করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেন; ইলমচর্চায় মনোনিবেশ করতেন।

এরপর কাজি ইয়ায রহ. ইলম অন্বেষণে আসাদ বিন ফুরাতের মিসর ভ্রমণের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। মিসরে তিনি ইবনুল কাসিম রহ.-এর কাছে যান। ইবনুল কাসিম রহ. বলেন, 'প্রতিদিন আমি দুবার আল-কুরআন খতম করতাম। তোমার সাথে ইলমচর্চার কারণে আমি এক খতম বাদ দিয়েছি।'[৪৪]

طبقات الحنابلة গ্রন্থে ইমাম আবু যুরআ রহ.-এর জীবনীতে ইমাম আহমদ রহ.-এর ছেলে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে, (তিনি বলেন,) 'আবু যুরআ যখন আমার পিতার কাছে ইলম অন্বেষণের জন্য আসেন, তখন আব্বু তার সঙ্গে লম্বা সময় ধরে ইলমি আলোচনা করতেন। আব্বুকে একদিন বলতে শুনি : 'ফরজ

---

[৪৪] ২/৫৫

ছাড়া অন্য কোনো নামাজই আজ আমি পড়িনি; আবু যুরআর সঙ্গে ইলমি আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে নফল নামাজ ছেড়ে দিয়েছি।' সুস্থ অবস্থায় প্রতিদিন তিনি প্রায় তিন শ রাকাত নফল আদায় করতেন। আর দুর্বলতা ও বার্ধক্যের কালে নিয়মিত দেড় শ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন।'[৪৫]

مناقب أبي حنيفة গ্রন্থে[৪৬] বর্ণিত আছে : ইমাম আবু ইউসুফ রহ. মানুষের সাথে ইলমি মজলিশে শরিক হতে সকালের জিকির বর্জন করতেন।

المُقَفَّى الكبير গ্রন্থে ইমাম ইবনে দাকিক আল-ইদের জীবনীতে উল্লেখ আছে,[৪৭] 'ইমাম রাফেঈর الشرح الكبير গ্রন্থটি এক হাজার দিরহাম দিয়ে কেনার পর শুধু ফরজ নামাজগুলোই তিনি পড়তেন, আর বাকি সময় শুধু গ্রন্থটির মুতালাআয় মগ্ন থাকতেন।'

নফল নামাজের ওপর ইলমচর্চার অগ্রাধিকারের উদাহরণ হিসেবে আরও উল্লেখ করা যায়– একবার আবু মুসা আশআরি রা. উমর রা.-এর কাছে আসেন ইশার শেষ সময়ে। উমর রা. তাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার আবু মুসা; এ সময় তুমি? বলেন, ইলমচর্চার উদ্দেশ্যে এসেছি! তিনি বলেন, এরপর আমরা গভীর রাত পর্যন্ত ইলমচর্চায় মগ্ন থাকি। একপর্যায়ে আবু মুসা রা. জিজ্ঞেস করেন, নামাজ! তখন উমর বলেন, আমরা তো নামাজেই আছি! তিনি বলেন, এরপর আমরা ফজরের আগমুহূর্ত পর্যন্ত এভাবে ইলমচর্চায় মগ্ন থাকি।[৪৮]

দ্বিতীয় উদাহরণ : ইবনে আবদুল বার আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'ইলমচর্চা নামাজতুল্য'।[৪৯]

বিশিষ্ট ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে যারা রাতভর ইলমচর্চায় নিয়োজিত থাকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন : আবদুর রাহমান বিন মাহদির সাথে ওয়াকি বিন জাররাহ তাদের অন্যতম। ছাত্র হাসান বিন শাকিকের সাথে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর ইলমচর্চার ঘটনাটিও এখানে উল্লেখযোগ্য।[৫০]

---

[৪৫] الحلية : ৯/১৮১
[৪৬] الموفق المكي এর রচিত : ৪৯২
[৪৭] المقريزي এর রচিত : ৬/৩৭৪
[৪৮] آداب الفقيه والمتفقه : ৯৫৪
[৪৯] الجامع : ৯৪
[৫০] الجامع : ১৮৯৯

فتح المغيث গ্রন্থে সাখাভি রহ. ইমাম আহমদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'কোন কাজটি ইলম অন্বেষণ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট হতে পারে?!'[৫১]

ইলম অন্বেষণের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলে তাঁরা ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করতেন। السير গ্রন্থে ইমাম যাহাবি রহ. আবু বকর আল হাযেমির[৫২] বৃত্তান্তে বলেন,

ইমাম আলবাদি রহ.-এর কাছে ইলম অন্বেষণে যাওয়ার পর হাযেমি রহ. প্রতিরাতে কক্ষে প্রবেশ করে রাতভর ইলমচর্চায় মগ্ন থাকতেন। একদিন আলবাদি রহ. খাদিমকে বলেন, 'রাতের বেলায় তাকে বাতি জ্বালানোর জন্য সলতে দিয়ো না; সে যেন একটু বিশ্রাম করতে পারে!'

তিনি বলেন, এরপর রাতের বেলায় খাদেম তার কাছে সলতের ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করলে কক্ষে প্রবেশ করে তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যান। এভাবে ফজর পর্যন্ত নামাজে কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকেন।

শায়খ আলবাদি রহ. তাঁর খোঁজ নিতে গিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন, তিনি নামাজে দাঁড়ানো।[৫৩]

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলা এ নির্দেশই অবতীর্ণ করেছিলেন—

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب﴾

অর্থ : 'আর তাই যখনই অবসর পান পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।'[৫৪]

* * * *

[৫১] ৩/২৯৫

[৫২] ৫৪৮-৫৮৪ হি., الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الآثار গ্রন্থপ্রণেতা

[৫৩] ২১/১৬৭

[৫৪] سورة الشرح (৯৪) : ৭, ৮

দ্বিতীয় আলোচনা

আলিমদের মর্যাদা
এবং উম্মাহর ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব

আচারনিষ্ঠ আলিমদের বিবরণ এবং তাঁদের মর্যাদা আল-কুরআনের বহু আয়াতে বিবৃত হয়েছে। যথা :

﴿شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ﴾

অর্থ : 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। সন্দেহ নেই, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন হলো একমাত্র ইসলাম।'[৫৫]

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, এখানে আল্লাহর সাক্ষ্য, ফেরেশতাগণের সাক্ষ্য এবং আহলে ইলমের সাক্ষ্যের বিবরণ তো এসেছে! তবে নবি-রাসুলদের সাক্ষ্য কোথায়?

এর উত্তর হলো : ইমাম বাগাভি রহ. বলেন[৫৬] أولو العلم দ্বারা এখানে নবি-রাসুলগণই উদ্দেশ্য। সালেহ বিন কাইসান রহ. বলেন, এখানে মুহাজিরিন এবং আনসার উদ্দেশ্য। মুকাতিল রহ. বলেন, আয়াতের দ্বারা আবদুল্লাহ বিন সালামের মতো সত্যপন্থী আহলে-কিতাব মুমিনগণ উদ্দেশ্য। আস-সুদ্দি ও কালবি রহ.-এর মতে, এখানে ঈমানদার সকল আলিম উদ্দেশ্য।

আমি বলব, এখানে বহুমুখী মতের দ্বারা একাধিক শ্রেণি বোঝানো উদ্দেশ্য; বিপরীতমুখী পার্থক্য বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। উল্লিখিত সবগুলো উক্তিই সঠিক। সবচেয়ে বড়ো প্রজ্ঞা হলো, أولو العلم বলে নবি-রাসুলদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আলিমদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাফিজ ইবনে রজব রহ.[৫৭] এ আয়াত উল্লেখ করে বলেন : 'আল্লাহ তাআলা এখানে সরাসরি নবিদের কথা উল্লেখ না করে তাদেরকে আলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আলিমদের সম্মান ও মর্যাদা সাব্যস্ত করতে এতটুকুই যথেষ্ট যে,

---

[৫৫] سورة آل عمران (০৩) : ১৮, ১৯

[৫৬] معالم التنزيل : ২/১৮

[৫৭] شرح حديث أبي الدرداء : ৫০

আল্লাহ তাআলা তাঁদের এমন শব্দের মধ্যে শামিল করেছেন, যার ভেতরে নবিগণের সাথে তাঁরাও অন্তর্ভুক্ত।'

উত্তরাধিকারসূত্রে উম্মাহর ওপর আচারনিষ্ঠ আলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব নিজ নিজ উম্মাহর ওপর নবি-রাসুলদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো। কারণ, উত্তরসূরির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা তো উত্তরাধিকারের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতেই নির্ণীত হয়।

ওলামায়ে কেরাম তাদের গ্রন্থসমূহে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে উম্মাহর ওপর ধর্মনিষ্ঠ আলিমদের শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-আজুররি রহ.[৫৮] তার নাতিদীর্ঘ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ أخلاق العلماء-তে বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাদের ইচ্ছা নির্বাচন করে তাদের ঈমানের পথ দেখিয়েছেন। এরপর মুমিনদের থেকে যাদের ইচ্ছা কিতাব ও হিকমাহ দিয়েছেন, ধর্মীয় বিধি-বিধানে পারদর্শী করেছেন, তাবিলের জ্ঞান শিখিয়ে অন্যসব মুমিনের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠ করেছেন। প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ তাআলা বিজ্ঞ মনীষী তৈরি করে ইলম দ্বারা তাদের গুণান্বিত এবং সম্মানিত করেছেন, প্রজ্ঞা দিয়ে তাদের শোভা বর্ধন করেছেন। তাদের মাধ্যমেই হালাল-হারামের জ্ঞান অর্জিত হয়, হক-বাতিলের পার্থক্য বুঝে আসে, উপকার থেকে অপকার পৃথক হয়, অনিষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট স্পষ্ট হয়।

তাদের স্তর অনেক উঁচু। তাদের মর্যাদা অপরিসীম। তারাই নবি-রাসুলদের উত্তরসূরি। ওলি-আউলিয়ার নয়নের মণি। সমুদ্রের মাছেরা পর্যন্ত তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। ফেরেশতাগণ তাদের জন্য নিজেদের পাখাগুলো বিছিয়ে দেয়। কেয়ামতের দিন নবিদের পর এই আলেমদের সুপারিশই সবার আগে গৃহীত হবে। তাদের মজলিশ থেকে প্রজ্ঞা ও প্রভা বিচ্ছুরিত হয়। তাঁদের কর্ম ও তৎপরতা দ্বারাই উদাসীনরা সতর্ক হয়। সাধারণ ইবাদাতকারীদের থেকে তাঁরা অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ। আল্লাহভীরুদের থেকে উঁচু মর্তবার। তাঁদের জীবন তো অতি মূল্যবান। তাঁদের মৃত্যু জাতির জন্য মহা বিপদ। তাঁরা গাফেলদের সতর্ক করেন। মূর্খদের শিক্ষা দেন। কোনো অনিষ্ট তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। কোনো উস্কানি বা তিরস্কার তাঁদের দমিয়ে রাখতে পারে না। তাঁদের উৎকৃষ্ট আচরণের কারণে অনুরাগীরা তাঁদের সংশ্রবে গিয়ে ধন্য হয়। তাঁদের বাণী ও উপদেশ শুনে অপরাধীরা সজাগ ও সতর্ক হয়।

সকল সৃষ্টি তাঁদের ইলমের মুখাপেক্ষী। বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য ও বিদআত খণ্ডনে তাঁদের কথা এবং কাজই একমাত্র প্রমাণ। সকলের জন্য তাঁদের অনুসরণ

---

[৫৮] মৃত্যু : ৩৬০ হি.

অপরিহার্য। তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ স্পষ্ট পথভ্রষ্টতা। যে তাঁদের অনুসরণ করবে, সে সরলপথ লাভ করবে। যে বিরোধিতা করবে, সে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হবে। ইমামুল মুসলিমীন বা আমিরুল মুমিনীন কোনো বিষয়ে সন্দেহে পতিত হলে তাঁদেরই শরণাপন্ন হবেন; তাঁদের সিদ্ধান্তই কার্যকর করবেন। তাঁদের নির্দেশনা ও মত অনুযায়ী তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। মুসলিম বিচারকরা কোর্ট-আদালতে তাঁদের অভিমত অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। কারণ, তাঁরাই আবিদদের জন্য নুর, দেশবাসীর জন্য আলোকবর্তিকা। তারাই উম্মাহর ভিত্তি ও মেরুদণ্ড। তারাই হিকমার ঝরনাধারা। শয়তানের বিদ্বেষস্থল। তাদের দ্বারাই আহলে হকের অন্তরগুলো জাগরিত হয়, অনিষ্টকারীদের প্রেতাত্মাগুলো ধ্বংস হয়। জমিনের মধ্যে তাঁরা হলেন আকাশের তারকারাজির মতো; জলে-স্থলের গভীর অন্ধকারে এসব তারকার সাহায্যেই মানুষ পথের দিশা পায়; আর তারকাদের অনুপস্থিতিতে মানুষ বিষণ্ন হয়ে যায়, পথ হারিয়ে ফেলে। আবার যখন উদ্ভাসিত হয়, আবার পথের পরিচয় পায়।'

এরপর তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে অনেকগুলো আয়াত, হাদিস ও 'আছার' উল্লেখ করেন।

হাদিসগুলোর মধ্যে :

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

> 'নিশ্চয় জমিনে আলেমদের দৃষ্টান্ত আকাশের তারকারাজির মতো; যাদের দ্বারা জলে-স্থলের গভীর অন্ধকারে মানুষ পথের দিশা পায়। যখনই সেগুলো নিভে যায়, দিশাপ্রাপ্তরা আবার পথভ্রষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়।'[৫৯]

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা তারকারাজির তিনটি উপকার ও অবদানের কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾

অর্থ : 'এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।'[৬০]

আর সুরা মুলকের ৫-নং আয়াতে বলেন :

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ﴾

অর্থ : 'আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো করেছি।'

---

[৫৯] মুসনাদে আহমদ : ৩/১৫৭

[৬০] سورة النحل : ১৬

তেমনি বিশ্ববাসীর জন্য আলেমগণও সত্যের দিকে পথপ্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। পৃথিবীবাসীর জন্য তাঁরাই সৌন্দর্য। পাশাপাশি পথভ্রষ্টকারী মানুষরূপী শয়তানদের জন্য তাঁরা ক্ষেপণাস্ত্রও। মিথ্যাবাদীদের বক্তব্যের তাঁরা দাঁতভাঙা জবাব দেবে। তাদের মুখোশ উন্মোচন করে সর্বস্তরের মানুষের কাছে সত্যকে প্রকাশ করবে। কারণ, মানুষের মাঝে মূর্খতার অন্ধকার যেমন থাকে, তেমন থাকে তাদের মাঝে ভ্রষ্টতার কালো ছায়াও; আলিমের নুর একদিকে যেমন আলো বিকিরণকারী অপরদিকে অসত্যের নির্মূলকারীও। ঠিক যেমন আম্বিয়া আ.-এর নুর একদিকে যেমন ছিল কুফরের অন্ধকার নিশ্চিহ্নকারী অপর দিকে মূর্খতার কালো আঁধার দূরকারীও। আনাস রা. থেকে বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা সেটিই স্পষ্ট হয়।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. নিজ গ্রন্থ جامع بيان العلم -তে 'ইবাদাতের ওপর ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব' শিরোনামের অধীনে অনেকগুলো 'আছার' উল্লেখ করেছেন। খতিব রহ.-ও الفقيه والمتفقه آداب গ্রন্থে বিভিন্ন শিরোনামে কাছাকাছি অর্থে সমপরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি আছার উল্লেখ করেছেন।[৬১]

ইবনে আবদুল বার রহ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি حديث معلق উল্লেখ করেছেন। খতিব রহ.-ও ইবনে আব্বাস রা. থেকে সেটি বর্ণনা করেছেন[৬২] :

শয়তানরা ইবলিসকে লক্ষ করে বলে, কী ব্যাপার একজন আলিমের মৃত্যুতে যতটা খুশি হন, একজন আবিদের মৃত্যুতে ততটা খুশি হন না কেন? আবিদকে পথভ্রষ্ট করা যতটা সহজ, আলিমকে পথভ্রষ্ট করা ততটাই কঠিন—এ কারণে?! ইবলিস বলে, চলো তোমরা আমার সাথে! এরপর তারা একজন নামাজরত আবিদের কাছে এসে বলে, আমরা আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই। এরপর আবিদ নামাজ ত্যাগ করে তাদের দিকে মনোযোগী হয়। ইবলিস তাকে বলে, তোমার প্রভু কি পুরো পৃথিবীকে একটি ডিমের ভেতরে নিয়ে আসতে পারবেন? উত্তরে আবিদ বলে, না। তখন ইবলিস তার সাথিদের বলে, দেখেছ, মুহূর্তেই সে কুফরি করে বসেছে!

এরপর মজলিশে সাথিদের নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত একজন আলিমের কাছে এসে বলে, আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই! তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করো! ইবলিস বলে, তোমার প্রভু কি পুরো পৃথিবীকে একটি ডিমের ভেতরে নিয়ে আসতে পারবেন? আলিম উত্তরে বলেন, হ্যাঁ..! ইবলিস বলে, তা কী করে সম্ভব! বলেন, যখনই আল্লাহ কোনোকিছু ইচ্ছা করবেন, তখন বলবেন,

---

[৬১] ইবনে আবদুল বার : ৯০-১৩২ ; খতিবে বাগদাদি রহ. : ৩০-১৫০

[৬২] ইবনে আবদুল বার : ১২৭ ; খতিবে বাগদাদি রহ. : ৮৯

كن فيكون হয়ে যাও..সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যাবে। তখন ইবলিস সাথিদের লক্ষ করে বলে, দেখেছ..সে সীমালঙ্ঘন করেনি! এ কারণেই আলেমরা আমার দুচোখের বিষ, কোনোভাবেই তাদের আমি সহ্য করতে পারি না। ফলে তাদের মৃত্যুতে আমি যারপরনাই খুশি হই।

আমি মনে করি, ঘটনাটি রূপক ও নির্মিত; 'আছার' নয়। এটির সনদ ও বিশুদ্ধতায় গবেষণা করা প্রয়োজন। আর ইলমবিহীন আবিদদের সাধারণত এ দশাই হবে। আর আলেমগণ তাদের ইলম ও আল্লাহর রহমতের কল্যাণে দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পেয়ে যায়।

ইলমের সঙ্গে থাকতে হবে আমল

ইলমের মাধ্যমেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে, ইবাদত পরিশুদ্ধ হয়। কাজি ইয়ায রহ. ترتيب المدارك গ্রন্থে ইবনে ওয়াহব রহ.-এর জীবনীতে বলেন, ইবনে ওয়াহাব রহ. বলেছেন, ইলম অন্বেষণে মনোনিবেশের আগে আমি ইবাদাতে বেশি সময় কাটাতাম। ঈসা আ.-এর সৃষ্টিরহস্যের ব্যাপারে শয়তান আমাকে প্রায়ই ধোঁকায় ফেলে দিত। কীভাবে আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করলেন, কীভাবে আকৃতি দিলেন.. ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমি আমার শায়খের শরণাপন্ন হলে তিনি আমাকে ইলম অন্বেষণে মনোযোগী হতে বলেন। এটাই ছিল আমার ইলম অন্বেষণে মনোনিবেশের পেছনে মূল কারণ।'

তবে সন্দেহ নেই, ইলম এবং আমল এ দুয়ের সংমিশ্রণেই ঈমানে পূর্ণতা আসে। এটিই প্রত্যেক নামাজে পঠিত ও কাঙ্ক্ষিত 'সিরাতুল মুস্তাকিম'–

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.

> অর্থ : 'হে আল্লাহ, আমাদের সরল পথ দেখান, সেসব লোকের পথ, যাঁদের আপনি নেয়ামত দান করেছেন। তাদের পথ নয়, যাদের ওপর আপনার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'[৬৩]

غير المغضوب عليهم ولا الضالين -এর ব্যাখ্যায় হাদিসের কিতাবগুলোতে আদি বিন হাতিম রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণিত হয়েছে[৬৪]– المغضوب عليهم দ্বারা ইহুদি জাতি আর الضالين দ্বারা খ্রিষ্টান সম্প্রদায় উদ্দেশ্য। কেন?

---

[৬৩] সুরা ফাতিহা (০১) : ৬,৭

[৬৪] তিরমিজি : ২৯৫৩, ২৯৫৪; মুসনাদে আহমদ : ৪-৩৭৮ (১৯৩৮১); ইবনে হিব্বান : ৪৫৩৩

কারণ, ইহুদিরা আল্লাহর বিধি-বিধান শিক্ষা লাভ করেছে বটে; তবে কিছু আমল করেছে, কিছু করেনি আর কিছু বিধানকে বিকৃত করেছে। তাদের এই অপকর্ম এবং ধারাবাহিক সীমালঙ্ঘনের ফলে আল্লাহ তাদের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আর খ্রিষ্টান সম্প্রদায় আল্লাহর আনুগত্য করতে চেয়েছে ঠিক, তবে অদূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিহীনতায় পড়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। ঠিক যেমন মসজিদে গমন করতে গিয়ে অনেকে সঠিক পথ অনুসরণ না করে ভিন্ন পথ অনুসরণের ফলে পথ হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ﴾

অর্থ : 'আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের ওপর ফরজ করিনি...।'[৬৫]

'যাদের ওপর আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন তাদের পথ'–সুরা ফাতেহার এ অংশ দ্বারা সেই ইহুদি জাতি উদ্দেশ্য নয়, যারা জানার পরও আমল করেনি; এবং ওই খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য নয়, যারা আমল করতে গিয়েও ভ্রষ্টতার সম্মুখীন হয়েছে; বরং 'সিরাতুল মুস্তাকিম' দ্বারা এমন পথ উদ্দেশ্য, যা উভয় উদ্দেশ্যকে একত্র করে। সঠিক ইলম অর্জনের পাশাপাশি উৎকৃষ্ট পন্থায় আমলের তাওফিক অর্জনই প্রকৃত 'সিরাতুল মুস্তাকিম'।

হাফিজ ইবনে রজব রহ.-ও شرح حديث أبي الدرداء গ্রন্থে[৬৬] হাদিসটি উল্লেখ করে উপর্যুক্ত তিনটি সাদৃশ্যের বিবরণ দিয়ে বলেন, 'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, আমার সাথিরা আকাশের তারকারাজির মতো; তাদের যে কাউকে তোমরা অনুসরণ করবে, হেদায়াত পেয়ে যাবে।'

বলা হয়, চাঁদের আলো যেমন সূর্য থেকে গৃহীত, তেমনি আলিমের নুরও রিসালাতের নুর থেকে সংকলিত হবে। এ কারণেই আলিমের নুরকে সূর্যের সাথে নয়; চন্দ্রের আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেহেতু নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আলোকোজ্জ্বল সূর্য সদৃশ, যার আলোতে পুরো বিশ্ব আলোকিত হয়েছে, তাই তাঁর উত্তরসূরি এবং প্রতিনিধিগণও হবেন চাঁদ সদৃশ, যা সূর্যের সেই আলোকে পূর্ণতা দেবে।

আলহামদুলিল্লাহ! নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বর্তমান বিশ্বের সকল প্রান্তের সব মুসলমান সত্যনিষ্ঠ আলেমদের দিকনির্দেশনামতেই দ্বীন পালন করছে :

---

[৬৫] سورة الحديد (৫৭) : ২৭

[৬৬] ১৪ ও ৩৩ নং পৃষ্ঠা

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.

অর্থ : 'আমার উম্মতের একটি সম্প্রদায় সব সময় সত্যের ওপর অবিচল থাকবে, বিপক্ষবাদীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; আল্লাহর আদেশ (কেয়ামত) আসা পর্যন্ত তারা এভাবেই (বিজয়ী) থাকবে।'[৬৭]

আহলে ইলমের চেহারায় ইলমে নববির ছাপ

আল্লাহ তাআলার মহা প্রজ্ঞাসমূহের অন্যতম হলো তাঁর সত্যনিষ্ঠ, ধর্মভীরু মুখলিস বান্দাদের চেহারায় তিনি নুর ও দীপ্তি, বিনয় ও নম্রতা এবং ধৈর্য ও স্থিরতা দান করেন। ফলে সহচর ও শিক্ষার্থীদের মাঝেও তা ছড়িয়ে পড়ে। বিষণ্ন ও বিপদগ্রস্তদের জন্য সেখানে থাকে শান্তি ও সহানুভূতি, সৌভাগ্য ও কল্যাণ। তেমনি তাঁরা হন সত্য ও ন্যায়ের ধারক-বাহক; অনুসারীদের জন্য সদুপদেশ দানকারী এবং নীরব পথনির্দেশক। কথা ও কাজের মাধ্যমে তিনি তাদের দ্বীন শিক্ষা দেন। আল্লাহর সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

কবির এ কবিতা থেকেও তাঁরা অনেক ঊর্ধ্বে—

إذا سكتوا رأيت لهم جمالا ☆ وإن نطقوا سمعت لهم عقولا

'চুপ হলে তাঁদের মাঝে আমি অনিন্দ্য সৌন্দর্য দেখি, কথা বললে তাদের থেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা শুনি।'

এ কারণেই ইমাম ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া তামিমি নিসাপুরি রহ.[৬৮] ইমাম মালেক রহ.-এর কাছ থেকে الموطأ কিতাবের শ্রবণ শেষ করার পর উস্তাদের চরিত্র ধারণ ও সাহাবিদের মতো তাকওয়াময় জীবন অবলম্বন শেখার উদ্দেশ্যে ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে এক বছর অবস্থান করার এক চমৎকার রীতি চালু করেছিলেন।[৬৯]

আমাদের সম্মানিত শায়খ তাঁর সোনাঝরা কথার মাধ্যমেও বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে গেছেন। তিনি বলেন : 'কাছে থেকে ব্যক্তিত্ব ও সুন্নাত অবলোকন করা শ্রবণ অপেক্ষা অধিক উপকারী ও বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রবে থেকে এবং সর্বক্ষণ তাঁকে দেখে দেখে

---

[৬৭] সাওবান রা. থেকে মুসলিম শরিফের রেওয়ায়াত : ৩-১৫২৩; ভিন্ন শব্দে মুগিরা বিন শু'বা রা. থেকে বুখারি শরিফের রেওয়ায়াত : ৩৬৪০

[৬৮] মৃত্যু : ২২৬ হি.

[৬৯] ترتيب المدارك : ১/৫৪৪

সাহাবিগণ এ নেয়ামত লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। পরিণত হয়েছিলেন নবি-রাসুলদের পর সর্বোৎকৃষ্ট জাতিতে :

'সত্যনিষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তির দর্শন আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ তাঁর নির্দেশনা, কৃতকর্ম, আলোচনা, চলন-বলন; সকল কিছুতেই থাকে নুর ও জ্যোতি, মানবিকতা ও শিষ্টতা, শান্তি ও সহানুভূতি। ফলে তাঁকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়, তাঁর চেহারা আল্লাহর পথের দিশা দেয়।'

এরপর তিনি হাকিম তিরমিজি রহ.-এর বাণী উল্লেখ করেন, 'পূর্বসূরিদের মাঝে এ বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাপক ও বেশি পরিমাণে ছিল। তাঁদের দেখে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যেই মানুষ তাদের সাক্ষাতে যেত। তাঁদের প্রতি এক পলক দৃষ্টিই আত্মাকে আলোকিত করে দিত। মুহূর্তেই আত্মশুদ্ধি অর্জিত হতো। দ্বীনের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা তৈরি হতো।' ..তাঁর এ কথাগুলো বরং তুমি মূল কিতাবেই দেখে নাও![৭০]

প্রতিটি মুসলমানের উচিত, এই নুর ও নববি উত্তরাধিকার থেকে উপকৃত হওয়ার আশায় সর্বক্ষণ তাঁদের সঙ্গে জুড়ে থাকা, বেশি করে তাঁদের সংশ্রব অবলম্বন করা।

* * * *

---

[৭০] رسالة المسترشدين : ১০২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলম অন্বেষণের পূর্বে যেসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে

প্রথম পথনির্দেশ

ইখলাস বা নিষ্ঠার গুরুত্ব

দ্বিতীয় পথনির্দেশ

তালিবুল ইলমের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপলব্ধি

তৃতীয় পথনির্দেশ

ইলম অন্বেষণে মেধার গুরুত্ব

চতুর্থ পথনির্দেশ

সময়ের মূল্যায়ন ও ইলম অর্জন

পঞ্চম পথনির্দেশ

ইলম অন্বেষণে অদম্য স্পৃহা

ষষ্ঠ পথনির্দেশ

সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি অর্জন

সপ্তম পথনির্দেশ

সাথি-সঙ্গী নির্বাচন ও বন্ধুদের সাহচর্য

অষ্টম পথনির্দেশ

শায়খ বা উস্তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

নবম পথনির্দেশ

উস্তাদ নির্বাচন

দশম পথনির্দেশ

উস্তাদের সুহবত

একাদশ পথনির্দেশ

তালিবুল ইলমের আদব-আখলাক

দ্বাদশ পথনির্দেশ

শিক্ষায় ধৈর্য ও বিরতিহীনতা

ত্রয়োদশ পথনির্দেশ

তাকরার ও মুতালাআর গুরুত্ব

চতুর্দশ পথনির্দেশ

মুজাকারা বা ইলমচর্চার তাৎপর্য

পঞ্চদশ পথনির্দেশ

অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসার মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলম অন্বেষণের পূর্বে যেসব বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে

ভূমিকা : তালিবুল ইলমের জন্য মৌলিক নির্দেশনা সম্পর্কে

ইমামদের থেকে বর্ণিত ছয়টি বৈশিষ্ট্য আমি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। প্রকৃত তালিবুল ইলম হতে হলে এ বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই তাকে অর্জন করতে হবে। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়, যুগের উন্নতি ও উৎকর্ষের সঙ্গে ইলম অন্বেষণের উপকরণগুলোতেও উন্নতি ও উৎকর্ষ ঘটবে। সবগুলো আমি ধারাবাহিকভাবে নিম্নে আলোচনা করছি। কোনো কোনো স্থানে আমারও তালিক থাকবে ইনশাআল্লাহ।

১. ইবনে আবিল আওয়াম ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানি[৭১] থেকে[৭২] বর্ণনা করেন, 'আমাদের এ ইলম তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া অর্জিত হবে না–এর তালিবকে হতে হবে আগ্রহী, মেধাবী ও স্বনির্ভর।'

২. খতিবে বাগদাদি রহ. ইমাম শাফেঈ থেকে বর্ণনা করেন[৭৩] : 'তালিবুল ইলমকে তিনটি গুণ অর্জন করতে হবে : ১. দীর্ঘ সাধনা, ২. ভিন্ন পেশার দিকে নির্মোহতা, ৩. মেধা।'

খতিবে বাগদাদি রহ. এ বক্তব্যে তালিক করতে গিয়ে বলেন, 'প্রথমটি দ্বারা তিনি দীর্ঘ সময় ধরে ইলমের সাথে লেগে থাকা, আলিমের সংশ্রবে থাকা বুঝিয়েছেন। দ্বিতীয়টি দ্বারা তালিবুল ইলমের ভিন্ন পেশাগ্রহণ ও তাতে মনোযোগপ্রদান পরিত্যাগ করা উদ্দেশ্য করেছেন। অল্পেতুষ্ট হলে অনেক কিছু থেকেই সে নির্মুখাপেক্ষী থাকবে।'

পরের পৃষ্ঠায় তিনি লেখেন–'আর যদি আল্লাহ তাকে মেধা ও প্রতিভা দান করেন, তবে সেটি হবে পরম সৌভাগ্য ও দ্রুত লক্ষ্য অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়।' এখানে মেধা বলতে দ্রুত বুঝে উঠা উদ্দেশ্য।

---

[৭১] মৃত্যু : ১৮৯ হি.

[৭২] المناقب : ৮৫৯

[৭৩] آداب الفقيه والمتفقه : ২/১৮৭ (৮৩৭)

ইমাম শাফেঈ রহ.-এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা উপর্যুক্ত সবগুলো বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন। তিনি খুব বেশি দীর্ঘায়ু লাভ করেননি; মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৫৪ বছর। কিন্তু সব সময় তিনি ইলমের সাথে লেগে থাকতেন। ইলম অন্বেষণে মনোযোগী থাকতেন। তাঁর মেধা সমকালীন অনেক মনীষী থেকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও সুতীক্ষ্ণ ছিল।

এরপর খতিব রহ.-নির্ভরযোগ্য এবং বিজ্ঞ তাবেঈ ইমাম আবদুল্লাহ বিন শুবরুমা রহ.-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন[৭৪] :

> 'একলোক তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি তা সুন্দর করে তাকে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু সে বলে, আমি বুঝিনি। তিনি আবারও তাকে বোঝান। লোকটি আবারও বলে, আমি বুঝতে পারিনি। তখন ইবনে শুবরুমা রহ. বলেন, 'যদি প্রকৃতই তুমি না বুঝে থাকো, তবে দ্বিতীয় বার পাঠ ও শ্রবণ দ্বারাই তুমি বুঝে নেবে। এরপরও যদি বোঝার মতো বিষয়টি তোমার বুঝে না আসে, তবে তা দুরারোগ্য এক ব্যাধি।'

বার বার পাঠ ও শ্রবণের দ্বারাও বুঝে না আসাটা একপ্রকার রোগ ও ব্যক্তির মেধাহীনতার লক্ষণ। আর মেধা ও প্রতিভা একটি স্রষ্টাপ্রদত্ত জন্মগত বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় চেষ্টা-সাধনা ও দোয়ার দ্বারাও সেটি অর্জিত হয়ে যায়–এ কথাটিই ইবনে শুবরুমা এখানে বোঝাতে চেয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ, মেধাবী এবং অসাধারণ প্রতিভাধর অনেক মনীষী তৈরি করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

৩. আবু হিলাল আল-আসকারি রহ. বলেন, ছয়টি বিষয় ছাড়া ইলম পূর্ণতা পায় না :

ক. প্রখর মেধা

খ. দীর্ঘ সংশ্রব

গ. যথেষ্ট অর্থ

ঘ. নিরবচ্ছিন্ন সাধনা

ঙ. দক্ষ শিক্ষক

চ. ইলমের প্রতি প্রবল আসক্তি[৭৫]

---

[৭৪] آداب الفقيه و المتفقه : ৮৪২

[৭৫] الحث على طلب العلم و الاجتهاد في جمعه : ৪৭

আমার মনে হয়, 'দক্ষ শিক্ষক' দ্বারা তিনি কাঙ্ক্ষিত ইলমে বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী উস্তাদ বুঝিয়েছেন। তিনি হবেন ইলম শিক্ষাদানে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ।

৪. ইমাম মাওয়ারদি রহ.[৭৬] বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি সমর্থন ও সহায়তা থাকে, তবে শিক্ষার্থীর ইলমকে পূর্ণতা দিতে তালিবুল ইলমের মধ্যে অবশ্যই ৯টি শর্ত থাকতে হবে–

ক. বুদ্ধি

খ. বিচক্ষণতা

গ. মেধা

ঘ. ইলম অন্বেষণে প্রবল আগ্রহ

ঙ. যথেষ্ট অর্থ

চ. অন্যসব কর্ম ও পেশা থেকে নির্মোহতা এবং নিষ্কৃতিলাভ

ছ. দুশ্চিন্তা তৈরিকারী ব্যস্ততা থেকে মুক্তি

জ. দীর্ঘ সাধনা ও সৎ সংশ্রব

ঝ. এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক[৭৭]

৫. হাফিজ ইবনুন্নাজ্জার রহ. নিম্নোক্ত কবিতাটি ইমামুল হারামাইনের[৭৮] দিকে সম্বন্ধ করেছেন :

أَصِخْ : لن تنال العلم الإ بستة ☆ سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ :

ذكاءٍ ، وحرصٍ ، وافتقارٍ ، وغربةٍ ☆ وتلقينِ أستاذٍ ، وطولِ زمانِ

কান পেতে শোনো, ছয়টি বিষয় ছাড়া ইলম অর্জন সম্ভব নয়। এগুলো তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি– মেধা, আগ্রহ, বাসনা, পার্থিব ব্যস্ততা থেকে নিষ্কৃতিলাভ, দক্ষ শিক্ষকের নির্দেশনা এবং দীর্ঘ সাধনা।[৭৯]

৬. ইমাম ইবনুল আরাবি আল-মালেকি রহ.[৮০] বলেন, 'ইলম অর্জনের জন্য প্রায় দুই শ এর ওপরে শর্ত রয়েছে, এর মধ্যে সাতটিকে আমি মূলভিত্তি হিসেবে অভিহিত করেছি :

---

[৭৬] মৃত্যু : ৪৩০ হি.

[৭৭] أدب الدنيا والدين : ১১১

[৭৮] মৃত্যু : ৪৭৮ হি.

[৭৯] ذيل تاريخ بغداد : ১/৮৯

ক. ইখলাস (কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইলম অর্জনের নিয়ত করা)।

খ. ইলমের জন্য বিনয়ী হওয়া, নম্রতা অবলম্বন করা।

গ. মুআল্লিম বা শিক্ষকের সামনে বিনয়ী হওয়া।

ঘ. শিক্ষকের নির্দেশনাগুলো পুরোপুরিভাবে মেনে চলা।

ঙ. নিরবচ্ছিন্নভাবে ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকা।

চ. ইলমের চর্চা করা।

ছ. ইলমকে আমলে পরিণত করা।[৮১]

সাখাভি রহ.[৮২] আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, দ্রুত পঠনশক্তি অর্জন করা, দ্রুত লেখনীশক্তি আয়ত্ত করা, সৎসঙ্গ অবলম্বন করা, বড়োদের সামনে সংশয় প্রকাশ না করা, সময়ের মূল্য দেওয়া...ইত্যাদি। এর ব্যাখ্যাগুলো আপনি মূল গ্রন্থে দেখে নিন।[৮৩]

* * * *

---

[৮০] মৃত্যু : ৫৪৩ হি.

[৮১] قانون التأويل : ৬৩৬

[৮২] মৃত্যু : ৯০২ হি.

[৮৩] الجواهر الدرر : ১/১৬১-১৭০

প্রথম পথনির্দেশ

ইখলাস বা নিষ্ঠার গুরুত্ব
(কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইলম তলব)

হামদ ও ছানার পর প্রখ্যাত ইমাম খতিবে বাগদাদি রহ. তাঁর গ্রন্থে এ অধ্যায়কে اقتضاء العلم والعمل বলে নামকরণ করে নিম্নোক্ত বাণী দিয়ে তার আলোচনা শুরু করেছেন,

'হে তালিবুল ইলম, আমি আপনাকে ইলম তলবে নিয়ত পরিশুদ্ধ করার ও ইলম অনুযায়ী পুরোপুরি আমলে মনোনিবেশ করার ওসিয়ত করছি। কারণ ইলম হলো একটি বৃক্ষ; আমল তার ফল। তালিবুল ইলম যদি ইলমের 'আমিল' না হয়, তবে কখনো তাকে আলিম বলে আখ্যা দেওয়া যাবে না।' আমলের ওপরই নির্ভরশীল প্রতিটি মুসলমানের জীবন ও কর্ম। তা-ই যদি হয় তবে তালিবুল ইলমের চেষ্টা ও সাধনা তো অগ্রবর্তীরূপে আমলের ওপর নির্ভরশীল হবে। ইবনুস সালাহ রহ. তাঁর বক্তব্যকে হাদিস অন্বেষণের আদাব সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন; যথাস্থানে সেগুলো আমরা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। ইবনুল আরাবির বর্ণিত প্রসিদ্ধ সাতটি বিষয়ের প্রথমটিও এটি।

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন, যাতে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

> 'কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ফায়সালাকৃত তিন ব্যক্তির দ্বিতীয় জন হলো সেই লোক, যে ইলম শিক্ষা করেছে, শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে। তাকে ডেকে এনে তার ওপর আল্লাহর দেওয়া সকল নেয়ামতের কথা বলা হবে। সে সব নেয়ামতকে অকপটে স্বীকার করে নেবে। আল্লাহ বলবেন, এতসব নেয়ামত পেয়ে তুমি কী আমল করেছ? সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি; আপনার জন্য আল-কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং ইলম শেখার পেছনে তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে যেন তোমাকে আলিম বলে। কুরআন পড়েছ, যেন তোমাকে কারি বলে। আর সেটা তোমাকে দুনিয়াতেই বলা হয়ে গেছে। এরপর জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ করা হলে নিম্নমুখী করে টেনে-হেঁচড়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[৮৪]

---

[৮৪] মুসলিম : ৩/১৫১৩ ; তিরমিজি : ২৩৮২

তিরমিজিতেও লম্বা ঘটনাসহ আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনায় হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। من صحاح الأحاديث القدسية গ্রন্থে চতুর্থ হাদিসের অধীনে আমার লিখিত ব্যাখ্যাগুলোও আপনি দেখে নিন।

সেখানে আমি ইবনে কুতাইবা কর্তৃক عيون الأخبار গ্রন্থে বর্ণিত আহলে ইখলাসের চমৎকার-সব ঘটনা উল্লেখ করেছি[৮৫]। তিনি বলেন,

'সেনাপতি মাসলামা বিন আবদুল মালিক একবার যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের একটি দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গের ফটক দিয়ে তিনি বাহিনীকে এক এক করে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কেউ ফটক দিয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। এরপর বাহিনীর মাঝখান থেকে এক অপরিচিত যোদ্ধা এসে ফটক দিয়ে প্রবেশ করে। অবশেষে দুর্গটি জয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাদের বিজয় দান করেন। বিজয়ের পর সেনাপতি মাসলামা রা. পুরো বাহিনীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেন, ফটক উন্মোচনকারী ব্যক্তি কোথায়? সামনে এসো! বাহিনী নীরব.. কেউ সামনে আসে না। এরপর ঘোষণা দেন, আমি প্রহরীকে বলে দিচ্ছি, তিনি যে কোনো মুহূর্তে আমার কাছে আসতে পারবেন; আমি আশা করছি অবশ্যই তিনি আসবেন। এরপর নীরবে এক যোদ্ধা প্রহরীর কাছে এসে বলতে থাকে, আমি সেনাপতির সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। প্রহরী জিজ্ঞেস করে, তুমিই কি ফটক উন্মোচনকারী? সে বলে, আমি তাঁর সম্পর্কেই সংবাদ দিতে এসেছি। প্রহরী সেনাপতির কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলে তিনি ওই বক্তিকে প্রবেশের অনুমতি দেন। ভেতরে ঢুকে তিনি মাসলামাকে বলেন, ফটক উন্মোচনকারী আপনার কাছে তিনটি শর্তে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি হয়েছে–

১. খলিফাতুল মুসলিমীনের কাছে লিখিত পত্রে তার নামটি লেখা যাবে না।

২. তাঁর জন্য কোনো বিশেষ আর্থিক সহায়তা বা পুরস্কার চাওয়া যাবে না।

৩. এটাও জিজ্ঞেস করা যাবে না, সে কোন বংশের! সেনাপতি মাসলামা বলেন, ঠিক আছে সবগুলো শর্ত পূরণ করা হবে! তখন ব্যক্তিটি বলে, আমিই সেই ফটক উন্মোচনকারী!'

এ ঘটনার পর সেনাপতি মাসলামা তার সকল নামাজে ও দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ, ওই ফটক উন্মোচকারীর সঙ্গে আমার হাশর করো!

---

[৮৫] الإحياء : ১/১৭২

ইখলাস

আল্লাহর পরিচয়লাভকারী আউলিয়া কিরাম রহ. থেকে এর একাধিক সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে الإحياء গ্রন্থে ইমাম গাযালি রহ. এবং الرسالة গ্রন্থে কুশাইরি রহ.-ও ইখলাসের তারিফ উল্লেখ করেছেন।[৮৬] তারা উভয়েই أبو يعقوب السوسي রহ. -এর একটি উক্তি বর্ণনা করেন–

'ইখলাস হলো ইখলাসহীনতার অনুভূতি' অর্থাৎ আমার মাঝে এখনো পুরোমাত্রায় ইখলাস আসেনি কথাটি বেশি বেশি স্মরণ করা। অপর একটি সংজ্ঞায় তিনি বলেন, 'ইখলাস হলো সব সময় নিজের আমল নিরীক্ষণ করা এবং নিজের অবদানগুলো ভুলে থাকা।'

এরপর ইমাম গাযালি রহ. সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ ছাকাফি রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন[৮৭] : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি কথা বলে দিন যার ওপর সব সময় আমি আমল করে যাব। নবিজি বললেন,

قل ربي الله ثم استقم.

অর্থ : 'বলো আমার প্রতিপালক আল্লাহ এবং এর ওপর অবিচল থাকো!'

ইমাম গাযালি রহ. এ হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন : 'সবচেয়ে স্পষ্ট ও পরিষ্কার বর্ণনাটিই নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কখনো নফস ও কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ো না; নির্দেশিত পথে এক আল্লাহর ইবাদতে মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল থাকো! বোঝা গেল, আল্লাহ ছাড়া সকল কিছু থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে। আর এটিই হলো প্রকৃত ইখলাস।'

তেমনি ইমাম ইবনুস সালাহ ও তার উত্তরসূরিগণও প্রায় একই সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন। তিনি হাদিস অন্বেষণকারীর ২৮নং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'সর্বপ্রথম তাকে ইখলাস অর্জন তথা নিয়তকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জাগতিক কোনো উদ্দেশ্যে ইলম তলব করার মানসিকতা বর্জন করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে তিনি (ইবনুস সালাহ রহ.) ইমাম হাম্মাদ বিন সালামা রহ.-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন,

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হাদিস তলব করবে, এ ধরনের ইলম তার জন্য অভিশাপ হয়ে আসবে।'[৮৮]

---

[৮৬] الإحياء :৪/৩৮১ - الرسالة : ৩/১৩৩ কাজি যাকারিয়া রহ. এর ব্যাখ্যানুসারে।

[৮৭] মুসলিম : ১/৬৫(৬২),তিরমিজি : ২৪১০,নাসাঈ : ১১৪৯০,ইবনে মাজা : ৩৯৭২

[৮৮] الجامع لابن عبد البر : ১১৫৩ / والجامع للخطيب : ২০

ইমাম সুফিয়ান ছাওরি রহ.-এর একটি উক্তিও তিনি উল্লেখ করেন, 'আল্লাহ যাকে তাওফিক দেন, তার জন্য হাদিস তলব অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট কোনো আমল আমি দেখি না।'[৮৯]

হাম্মাদ বিন সালামা ও সুফিয়ান ছাওরি রহ.-এর উক্তিতে কেবল ইলমে হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার কারণ হলো (আল্লাহই ভালো জানেন), তাদের সময় শুধু ইলমে হাদিসের চর্চাই ছিল ব্যাপক। ইলম বলতে তখন কেবল ইলমে হাদিসকেই বোঝানো হতো। তাদের বক্তব্যের দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, ইলমে তাফসির বা এ জাতীয় ইলম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা বৈধ; বরং শরয়ি জ্ঞানের যে কোনো শাখাগত ইলম অন্বেষণে যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি বা পার্থিব কিছু অর্জনকে লক্ষ্য বানাবে, সে চরম অপদস্থ ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

জাবির রা. থেকে মারফু হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'আলিমদের সাথে প্রতিযোগিতা বা গর্ব করার উদ্দেশ্যে অথবা মূর্খদের সাথে বিতর্ক করার লক্ষ্যে তোমরা ইলম অন্বেষণ করো না। মজলিশ গরম করার উদ্দেশ্যে ইলম তলব করো না; যে এরূপ করবে, তার জন্য তো জাহান্নাম.. জাহান্নাম..!'[৯০]

শুরুতেই নিয়ত পরিশুদ্ধতায় ছাড়

ইলম অন্বেষণের সূচনালগ্নে যদি পুরোমাত্রায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত না করে এবং পার্থিব কোনো হীন উদ্দেশ্য অর্জনের বাসনাও লালন না করে; বরং পরবর্তী সময়ে পরিশুদ্ধ করে নেবে বলে ইচ্ছা পোষণ করে, তবে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ত পরিশুদ্ধ করার তাওফিক দিয়ে দেবেন।

ইবনে আবদুল বার রহ. باب الخبر عن العلم-এ বলেন, 'নিশ্চয় ইলম অন্বেষণ সর্বাবস্থায় ব্যক্তিকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যাবে।' প্রখ্যাত তাবেঈ হাবিব বিন আবু ছাবিত রহ.[৯১] থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেন, 'এ ইলমের অন্বেষণকালে আমাদের মনে কোনো নিয়ত ছিল না; পরবর্তীকালে নিয়ত এসে গেছে (পরিশুদ্ধ হয়ে গেছে)।'[৯২]

এর আগে তিনি একাধিক সূত্রে ইমাম মা'মার বিন রাশিদ আল-বাসরি আল-ইয়ামানি রহ.[৯৩] থেকে তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তিটি বর্ণনা করেন, 'শুরুতে আমরা

---

[৮৯] شرف أصحاب الحديث গ্রন্থে প্রায় একই রকম শব্দে বর্ণিত হয়েছে : ১৭৬

[৯০] ইবনে মাজাহ : ২৫৪; ইবনে হিব্বান : ২৮১০

[৯১] মৃত্যু : ১১৯ হি.

[৯২] جامع بيان العلم : ১৩৮০

[৯৩] মৃত্যু : ১৫৪ হি.

গায়রুল্লাহর জন্য ইলম তলব করি, তবে শেষ পর্যন্ত তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই লক্ষ্য হয়ে যায়'।

ইমাম বদর বিন জামা'আ রহ. নিজ গ্রন্থ تذكرة السامع والمتكلم -এ শিক্ষার্থীদের সাথে আলিমের শিষ্টাচার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,[৯৪] 'দ্বিতীয়ত নিয়ত অপরিশুদ্ধ হওয়ায় উস্তাদ ছাত্রদের শিক্ষা দান করা থেকে বিরত হবেন না; কারণ, সন্দেহ নেই, সুধারণা ইলমে বরকত দান করবে। আমাদের পূর্বসূরিগণ বলেন, সূচনালগ্নে আমরা গায়রুল্লাহর জন্য ইলম তলব করি, তবে শেষ পর্যন্ত তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই লক্ষ্য হয়ে যায়। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের ওপর নিয়ত পরিশুদ্ধ করার বিষয়টিকে যদি মৌলিক শর্তরূপে ধার্য করা হয়, তবে অনেক মানুষ এ ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।'

বর্তমানকালের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ব্যাপারে চরম বাস্তবতা হলো, তাদের হয়তো পিতা-মাতা বা নিকট অভিভাবকদের থেকে চাপপ্রয়োগ, উৎসাহদান বা প্রলোভন দেখিয়ে ইলম অন্বেষণে বাধ্য করা হয়। সে সময় নিয়ত পরিশুদ্ধতা এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন থাকে। এ পরিস্থিতিতে নিয়ত পরিশুদ্ধতার বিষয়টি তার পিতা-মাতা এবং অভিভাবকের ওপর বর্তাবে। পিতা-মাতা এবং অভিভাবকের পক্ষ থেকে সম্ভব না হলে উস্তাদ ও শায়খ তাদের ধীরে ধীরে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন।

এ কারণেই ইবনে জামাআ রহ. তার বক্তব্যের শেষ দিকে বলেন, 'পর্যায়ক্রমে শায়খ প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে কথা ও কাজের মাধ্যমে নিয়ত পরিশুদ্ধ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবেন। ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদার বিষয়টি ভালোভাবে বোঝানোর পর তাকে এ বিষয়ে উৎসাহ দেবেন যে, সৎ নিয়তের দ্বারাই লাভ হয় ইলম ও আমলের উন্নত মর্যাদা, বোধগম্য হয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়, বিকাশ ঘটে মেধা ও প্রতিভার, আলোকিত হয় অন্তর, সুদৃঢ় হয় মনোবল, সামর্থ্য লাভ হয় সংকল্প বাস্তবায়নের, বুঝে আসে সত্য, ফিরে আসে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য, প্রতিক্রিয়াশীল হয় কথা ও বক্তব্য এবং সর্বোপরি লাভ হয় পরকালে উন্নত ও উৎকর্ষিত আসন।'[৯৫]

ফাদিল আল-আলমাভি রহ. المعيد في أدب المفيد والمستفيد গ্রন্থে বলেন,

> 'নিয়ত পরিশুদ্ধ হয়নি বলে কারও জন্য শিক্ষাদান বন্ধ রাখা উচিত নয়। শিক্ষা-কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটলে ইলমের বিকাশ ও প্রচারে বিরাট বাধা তৈরি হবে। আশা করা যায়, ইলমের বরকত ও কল্যাণে অচিরেই সে বিশুদ্ধ নিয়তের অধিকারী হয়ে যাবে। পূর্বসূরিদের অনেকে বলেন, 'শুরুতে আমরা

---

[৯৪] পৃষ্ঠা : ৪৭

[৯৫] পৃষ্ঠা : ৪৭

গায়রুল্লাহর জন্য ইলম তলব করি, তবে শেষ পর্যন্ত তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই লক্ষ্য হয়ে যায়।'[৯৬]

সাফল্য অর্জনে বিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজনীয়তা

সফলতা অর্জনে ইখলাসের প্রয়োজনীয়তা দেহের জন্য আত্মার প্রয়োজনীয়তার অনুরূপ। আত্মাবিহীন দেহ যেমন নিথর ও নিষ্ফল, ইখলাস ছাড়া সফলতা অর্জনও তেমন অসম্ভব ও দুষ্কর। বর্তমানে মুসলমানদের অধঃপতন এবং জাতীয় ব্যর্থতার পেছনে একটিই কারণ। তা হলো, ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়তের অনুপস্থিতি। যুগ যুগ ধরে রচিত মুসলিমবিশ্বের ইতিহাস ও ঘটনাবলিই এর পেছনে বড়ো সাক্ষী। কত জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁরা রচনা করেছেন, কত আধুনিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছেন, কত দেশ তাঁরা একের পর বিজয় করেছেন; কত অধিক ছিল তাঁদের বাহিনী ও লোকবল। কিন্তু বর্তমানকালের সাজসরাঞ্জাম এবং উপকরণের সামনে সেগুলো ছিল অতি সামান্য। এরপরও পূর্বসূরিগণ যেসব ক্ষেত্রে এবং যেসকল পর্যায়ে যতটুকু আশাতীত সফলতা অর্জন করেছিলেন, সেসব ক্ষেত্রে এবং সেসকল পর্যায়ে উত্তরসূরিগণ ততটুকুই ধারণাতীতভাবে অকৃতকার্যতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কত ইমাম এবং কত মনীষী ইলম ও প্রজ্ঞায় এমনসব বৃহৎ ও মোটা ভলিয়মের জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা বর্তমানকালের একাধিক ইলমি জনগোষ্ঠী বা একাডেমি মিলেও তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে না। অথচ তাদের উপকরণ, মাধ্যম, দূরত্ব ও আয়তন আমাদের উন্নত মাধ্যম ও উপকরণগুলো থেকে কত পশ্চাদ্‌বর্তী ও সেকেলে ছিল। কেবল ইলম অন্বেষণ ও তার প্রচারে তাদের বিশুদ্ধ নিয়ত এবং আল্লাহ-সন্তুষ্টির অদম্য আগ্রহই এ মহা অসাধ্যকে সাধন করার পথে তাদের জন্য প্রবল সহায়ক হয়েছে।

আর তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে কত যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিলুপ্তি ঘটেছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নয়। ইবনে ফারহুন ইমাম আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান শারিমসাহি রহ.[৯৭]-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,[৯৮] 'তিনি খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহর প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা মুস্তানসিরিয়া'তে শিক্ষকতার পদ লাভ করার পর খলিফা বাগদাদের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্ত শিক্ষক, প্রভাষক ও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সেখানে জমায়েত হওয়ার নির্দেশ

---

[৯৬] পৃষ্ঠা : ৪৫
[৯৭] ৫৮৯-৬৬৯ হি.
[98] الديباج المذهب : ١/٣٨٧

দেন। সকলে সমবেত হওয়ার পর ইমাম আবদুল্লাহ কতিপয় আলিমদের সামনে অগ্রক্রয়-সম্পর্কিত কিছু মাসআলার বিবরণ উল্লেখ করে বলেন, এর স্বপক্ষে আমি আশি হাজার যুক্তি উপস্থাপন করতে পারব। এ কথা শুনে উপস্থিত বাগদাদের সমস্ত ফকিহ ও বিজ্ঞজন অবাক হয়ে যান। এরপর একটি একটি করে তিনি সেগুলো উপস্থাপন করতে থাকেন। প্রায় দুই শ কারণ উল্লেখ করার পর যুক্তি ও প্রজ্ঞা মেনে নিয়ে তাঁর স্তর ও মর্যাদা এবং ইলমি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিষয়টি তারা অকপটে স্বীকার করে নেন।'

* * * *

দ্বিতীয় পথনির্দেশ

তালিবুল ইলমের
দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপলব্ধি

কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের গুরুত্ব বোঝা এবং তার মর্যাদা উপলব্ধি করা একজন তালিবুল ইলমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য দায়িত্ব। এর সঠিক পরিচয় লাভই তাকে নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে। এটি সেই মূল্যবান বীজ, যার সযত্ন ও যথাযথ ব্যবহার তার জন্য, ইসলামের জন্য এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্য সুপরিপক্ব এবং সুমিষ্ট ফল বয়ে আনবে।

তালিবুল ইলম দুটি বিষয়কে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবে

ইলমের মর্যাদা ও সম্মান উপলব্ধি করার পর ইলমের সমুদ্র থেকে এক ফোঁটা অর্জনের তাওফিক তার হয়েছে– কথাটি সে সব সময় স্মরণ রাখবে। বিশ্বাস করবে, যতটুকু সে আহরণ করেছে তা সাগরের এক ফোঁটা পানির মতো। তবেই তার অন্তরে ইলমের মর্যাদা এবং ইলমের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হবে। তালিবুল ইলমকে অবশ্যই যথাযথ ও পরিপূর্ণরূপে ইলম অর্জনের লক্ষ্যে সাধ্যমতো সকল মূল্যবান বস্তুর কামনা-বাসনা বিসর্জন দিতে হবে।

কারণ, উম্মতে মুহাম্মদির লক্ষ লক্ষ সদস্য থেকে বাছাই করে আল্লাহ তাঁকে ইলম অর্জনের জন্য মনোনীত করেছেন।

ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমদ এবং ইবনে হিব্বান রহ.-আবু ইনাবা আল খাওলানি রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته.

অর্থ : ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এ দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এমন সব চারা রোপণ করবেন, যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যের পথে পরিচালিত করবেন সব সময়।’[৯৯]

তাই সর্বাবস্থায় তাকে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন বলেই সে আল্লাহর আনুগত্যে এবং ইলমে দ্বীন অর্জনে মনোনিবেশ করতে পেরেছে।

---

[৯৯] ইবনে মাজা : ৮ ; মুসনাদে আহমদ : ৪-২০০ ; ইবনে হিব্বান : ৪৬১০

২. ভবিষ্যতের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া। কারণ, নিকট ভবিষ্যতেই সে হবে মুসলমানদের ইমাম, খতিব, মুফতি এবং দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণসাধনে তাদের কাছে আল্লাহর বিধান বর্ণনাকারী।

তালিবুল ইলমকে অবশ্যই আল্লাহর এ মনোনয়ন পেয়ে যারপরনাই সন্তুষ্ট হতে হবে। নিজেকে দুর্বল, স্বল্পজ্ঞানী আর শৈশবের সহপাঠীদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররূপে দেখে আত্মতুচ্ছতাবোধ বা হীনম্মন্যতায় ভুগবে না। মনে করবে না, তারা তো অনেক সফল ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আর সে মসজিদের সামান্য ইমাম বা জুমার খতিব। তাকে সব সময় আল্লাহর দেওয়া মর্যাদা স্মরণ রাখতে হবে। কারণ, সব সময় সে আল্লাহর আদেশে মানুষকে আদেশ করছে, আল্লাহর নিষেধে মানুষকে নিষেধ করছে; আল্লাহর বিধান মানুষের কাছে বলে ও প্রচার করে বেড়াচ্ছে। এ মহান কাজ থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আর কোনটি হতে পারে?! সে তো মসজিদের ইমাম, আল্লাহর সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেয়। আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে। তাদের আল্লাহর কথা শোনায়। তার নামাজের দ্বারাই তাদের নামাজ পূর্ণ হয়। তার দোয়ার দ্বারাই তাদের দোয়া কবুল হয়। সে যদি আল্লাহর মহত্ত্ব, বড়ত্ব এবং যথাযথ ইলমের পরিচয় ও মর্যাদা উপলব্ধি করে থাকে, তবে একজন তালিবুল ইলমের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এটিই যষ্টে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন গ্রন্থে মানুষকে ঈমান ও শরিয়তমতে আমলের পথ বলে দিয়েছেন। পবিত্র এ গ্রন্থের প্রচারক ও ব্যাখ্যাকার হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। সেই নবি ছিলেন একজন মানুষ। তাঁর ছিল জীবন ও মৃত্যু। উচিত ছিল, নবিজির পর আল-কুরআনের ধারক-বাহকরূপে তাঁর প্রতিনিধি তৈরি করা। আল্লাহ তাআলা উম্মাহর মধ্যে আলেমদের তৈরি করে তাদের তিনি সেই সম্মানিত নবির স্থলবর্তী ও উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। সাইয়িদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এর বিবরণ দিয়ে গেছেন :

إن العلماء ورثة الأنبياء.

অর্থ : 'নিশ্চয় আলিমগণ নবিদের উত্তরাধিকারী'।

এ মর্যাদার চেয়ে আর কোনটি বেশি শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হতে পারে?! এ তো আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে সৃষ্টির মাঝে তাঁরই বিধান প্রচার করার মর্যাদা। আজকের তালিবুল ইলম, আগামীর আলিম এবং ভবিষ্যতের মুফতিগণই ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর প্রেরিত সেই প্রতিনিধি ও ধর্মপ্রচারক।

তালিবুল ইলমগণ আল্লাহর প্রতিনিধি

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-এর উক্তিটিও সবিস্তারে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি আমি। তিনি নিজগ্রন্থ إعلام الموقعين-এর ভূমিকায় লেখেন, 'আল্লাহর দ্বীন প্রচারের জন্য যেহেতু যথাযথ ও ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ নিষ্ঠা দরকার, সেহেতু কেবল তারাই রিওয়ায়াত ও ফতোয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন, যারা ইলম ও নিষ্ঠার গুণে শত ভাগ গুণান্বিত হবেন। প্রচারিত ইলমে হবেন বিজ্ঞ ও সততাপরায়ণ। পাশাপাশি তিনি হবেন প্রজ্ঞাবান, উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। কথা ও কাজে তা বাস্তবায়নকারী। আচার-আচরণে, চলনে-বলনে এবং গোপনে-প্রকাশ্যে তার ওপর আমলকারী। কোনো দেশের প্রেসিডেন্টের মুখপাত্রের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি কতটুকু হয়, তা আমরা সবাই জানি; তা-ই যদি হয়, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিপতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশ প্রচারকারী এবং প্রতিপালকের মুখপাত্রের মর্যাদা কেমন হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়!!

আর তাই এ মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে অবশ্যই যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, দারুণ তৎপর হতে হবে। অভিষিক্ত পদমর্যাদার যথাযথ কদর করতে হবে। সত্য কথা বলতে এবং তা প্রচার করতে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ করা চলবে না। আল্লাহ তাআলাই তার সহায় হবেন, তাকে পথ দেখাবেন; কেন নয়! আল্লাহ নিজেই তো সেই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন :

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾

অর্থ : 'তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে এবং কুরআনে তোমাদের যা পাঠ করে শোনানো হয় সে সম্পর্কে ফায়সালা দেন।'[১০০]

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾

অর্থ : 'মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে কালালাহ-এর মীরাস সংক্রান্ত ফতোয়া দিচ্ছেন (সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন..)।'[১০১]

---

[১০০] সুরা নিসা (০৪) : ১২৭
[১০১] সুরা নিসা (০৪) : ১৭৬

প্রত্যেক মুফতি যেন ভালোভাবে স্মরণ রাখেন–কার হয়ে তিনি ফতোয়া দিচ্ছেন! অদূর ভবিষ্যতে তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে; আল্লাহর সামনে তাকে দাঁড় করানো হবে!

এ পদে সর্বপ্রথম সমাসীন হলেন সাইয়িদুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকিন, খাতামুন্নাবিয়্যিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ছিলেন আল্লাহপ্রেরিত ওহির বার্তাবাহক এবং মানুষের কাছে সৃষ্টিকর্তার মহান দূত।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. উপর্যুক্ত আলোচনায় মুফতিকে সরাসরি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ দিকে লক্ষ্য করেই তিনি তাঁর গ্রন্থের এ অস্বাভাবিক নাম দিয়েছেন إعلام الموقعين عن رب العالمين! (বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ হয়ে কার্যসম্পন্নকারীদের ইতিবৃত্ত) অর্থাৎ মুফতি যখন তাঁর ফতোয়া প্রকাশ করে, তখন তাতে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি সিল মেরে দেন যে, আমি যা বলেছি এবং যা লিখেছি, তা আমার ব্যক্তিগত কোনো কথা বা বক্তব্য নয়; বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা।

আর এই একক ও অদ্বিতীয় মর্যাদাপূর্ণ পদের স্থলবর্তীকে অবশ্যই হতে হবে একনিষ্ঠতা ও পবিত্রতার গুণে গুণান্বিত।

এ মর্যাদা ও স্তরের সর্বনিম্ন পর্যায়ে আসন কামনাকারী তালিবুল ইলমকে অবশ্যই তার সাধ্যানুযায়ী শত ভাগ চেষ্টা ও সাধনা করে যেতে হবে। কারণ, এ হলো আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব বহনকারী স্তর। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার লাভের স্তর। নিশ্চিতভাবেই তা সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বসম্মানিত স্তর।

যেহেতু আজকের তালিবুল ইলমই আগামীর আলিম, ভবিষ্যতের মুফতি এবং জগতের অধিপতি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হয়ে কার্যসম্পাদনকারী সেহেতু আল্লাহপ্রদত্ত এ মান ও পদের মর্যাদা তাঁকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে জীবন ও রক্ত দিয়ে হলেও তাঁকে এর সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

অবশ্যই তাঁকে অন্বেষিত ও শিক্ষাকৃত ইলমের মূল্য বুঝতে হবে। অভিষিক্ত পদের মর্যাদা ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে হবে।

নিশ্চয় ইলম হলো এক সুমহান ও গৌরবময় বিষয়; আল্লাহ তাআলা যাকে মর্যাদাশীল ও প্রিয় করতে চান, তাকেই এ ইলম দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। যে ব্যক্তি ইলমের সাথে অন্যায় ও অবিচার করবে, ইলমবঞ্চিত করে আল্লাহ তাকে চরমভাবে অপদস্থ করে ছাড়বেন। কারণ, এখানে আলোচিত ইলম দ্বারা

কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুল অনুসৃত জ্ঞান উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের দান করে কখনো সেই ইলমকে কলঙ্কিত করবেন না।

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ☆ ولو عظّموه في النفوس لعَظّما

ولكن أهانوه فهانوا ودنّسوا ☆ محيّاه بالأطماع حتى تـَجَهّما

অর্থ : আহলে ইলম যদি তার সুনাম রক্ষা করে, তবে সেও তাদের সুনাম রক্ষা করবে। অন্তরে যদি তাকে পবিত্র ও মহান মনে করে, তবে সেও তাদের পবিত্র ও মহান করবে। কিন্তু তারা তাকে অপমান করেছে, ফলে নিজেরাই অপদস্থ হয়েছে। তুচ্ছ লালসা দিয়ে তার মুখাবয়বে কালিমা লেপন করেছে। শেষ পর্যন্ত তার মুখ গোমড়া হয়ে গেছে।[১০২]

* * * *

---

[১০২] কবিতা দুটি আবুল হাসান আলি বিন আবদুল আজিজ আল-জুরজানি রহ. (মৃত্যু : ৩৯২ হি.)-এর রচিত।

তৃতীয় পথনির্দেশ

ইলম অন্বেষণে মেধার গুরুত্ব

প্রায় সকল ইমাম 'ইলম অন্বেষণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মেধার প্রয়োজন' কথাটি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে ইমাম শাফেঈ, আসকারি, মাওয়ারদি, ইমামুল হারামাইন উল্লেখযোগ্য। তাদের অধিকাংশের উক্তিগুলো আমরা পড়ে এসেছি। ইমাম আসকারি রহ. ইলম তলবের জন্য প্রখর মেধা, বিপুল প্রতিভা, তড়িৎ বোধশক্তি এবং ভীষণ মুখস্থশক্তিকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মাওয়ারদি রহ. ইলম তলবের শর্ত হিসেবে বুদ্ধি, বোধশক্তি এবং মেধার উল্লেখ করেছেন।

আমার বক্তব্য হলো—আল্লাহই ভালো জানেন 'প্রখর মেধা' বলে সকলেই তড়িৎ বোধশক্তি, মুখস্থশক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং কোনো কিছু গবেষণা করে সমাধান বের করার প্রবল যোগ্যতাকে বুঝিয়েছেন।

আরবি ذكاء -এর শাব্দিক অর্থ হলো, তড়িৎ বোঝশক্তি, প্রখর বোধগম্যতা। ইবনে ফারিসও ذكاء -এর একই অর্থ বর্ণনা করেছেন।

মেধা দুই প্রকার

১. জন্মগত বা সৃষ্টিগত মেধা; যা অনেক মানুষ লাভ করে থাকে। ২. উপার্জিত মেধা, যা মানুষের বয়স ও অভিজ্ঞতার সাথে সাথে বিকশিত হতে থাকে। সৃষ্টিগত মেধায় যেমন একজন অপর জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অধিক ধারণকারী হয়, তেমনি উপার্জিত মেধার বেলায়ও অর্জন ও অভিজ্ঞতার আলোকে একজন আরেক জন থেকে উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়। কখনো কখনো এক ব্যক্তির মাঝেই উভয় প্রকার মেধার সমন্বয় ঘটে। জন্মগতভাবে মেধাবী হওয়ার পাশাপাশি কাজে-কর্মে ও অভিজ্ঞতায় সে অধিকতর মেধাবী ও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে। কর্মব্যস্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সে নতুন নতুন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করে।

শায়খ বা উস্তাদের দায়িত্ব হলো, নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের থেকে মেধাবী, বুদ্ধিমান ও উৎকৃষ্টদের খুঁজে বের করা। তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া, নানাভাবে ও বিভিন্ন দিকে কাজে লাগিয়ে তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটানো। তাদের ভালো-মন্দের খোঁজখবর নেওয়া। সারাক্ষণ ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে এবং মেধার অবক্ষয় ঘুচাতে অর্থনৈতিকভাবেও তাদের

সহায়তা করা। এভাবেই তাদের মেধা ও প্রতিভা একদিন বিরাট আকারে এবং সমৃদ্ধ পরিসরে প্রস্ফুটিত হবে ইনশাআল্লাহ।

উস্তাদের আরেকটি দায়িত্ব হলো, দ্বিতীয় প্রকার মেধার অধিকারী বা অর্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের পেছনেও যথেষ্ট সময় ব্যয় করা। বেশি বেশি বুঝিয়ে উস্তাদ নিজেও তাদের থেকে উপকৃত হওয়া। কেননা, উস্তাদ যত বেশি ছাত্রদের বুঝাবেন, ছাত্রদের পাশাপাশি উস্তাদের মনেও আলোচ্য বিষয়টি তত বেশি বদ্ধমূল হবে এবং আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় বোঝা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ইতিহাস সাক্ষী, যেসব ছাত্রের ওপর উস্তাদ ধৈর্যধারণ করেছেন, বেশি করে তাদের ওপর মেহনত ও মুজাহাদা করেছেন, তারাই পরবর্তী সময়ে অভাবনীয় ও গৌরবান্বিত উন্নত ইলমের অধিকারী হয়েছেন। তাদের থেকে অনেকে যুগশ্রেষ্ঠ ইমামও হয়েছেন।

এ রকমই একজন উঁচু মানের উস্তাদের বিবরণ طبقات الشافعية -তে ইমাম রাবি' বিন সুলাইমান আল-মুরাদির জীবনবৃত্তান্তে বর্ণিত হয়েছে।[১০৩] সুবকি রহ. বলেন, কাফফাল তার ফতোয়াসমূহে উল্লেখ করেন, ছাত্রজীবনে রাবি' ছিলেন স্বল্প মেধার অধিকারী। ইমাম শাফেঈ রহ. একটি বিষয় তাকে চল্লিশ বার বুঝিয়েও ব্যর্থ হন। রাবি' লজ্জায় মজলিশ থেকে উঠে গেলে ইমাম শাফেঈ রহ. নির্জনে ডেকে নিয়ে আরও বেশি করে তাকে বোঝান। অবশেষে বিষয়টি তার বোধগম্য হয়। ইমাম শাফেঈ রহ.-কে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন, একজন শিক্ষার্থীকে বুঝাতে গিয়ে তিনি কতই-না সবর ও ধৈর্য এবং সহানুভূতি ও সুশিষ্টাচার অবলম্বন করেছেন। তার জন্য হিতৈষী ও কল্যাণকামী হয়েছেন।

এর ঠিক দু'লাইন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে– ইমাম শাফেঈ তাকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি আমার কতইনা প্রিয় ছাত্র! তিনি আরও বলেন, রাবি' বিন সুলাইমান যতটুকু আমার খিদমাত ও সেবা করেছে অন্য কোনো ছাত্র ততটা করতে পারেনি। শাফেঈ রহ. একদিন তাকে বলেছিলেন, হে রাবি', আমি যদি তোমাকে ইলম খাইয়ে দিতে পারতাম, তবে তা তোমাকে খাইয়ে দিতাম।'

প্রত্যেক উস্তাদের জন্য ইমাম শাফেঈ রহ. হোক একজন আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, এমনটাই আশা করছি। আল্লাহ সকলকে তাওফিক দিন!!

* * * *

---

[১০৩] সুবকী রহ. এর রচিত : ২/১৩৪

চতুর্থ পথনির্দেশ

সময়ের মূল্যায়ন ও ইলম অর্জন

রাগিব স্বীয় গ্রন্থ المفردات -এ حرص শব্দের অর্থ বলেছেন, অধিক পরিমাণে পেতে চাওয়া, ধারণাতীত প্রার্থনা করা। অর্থাৎ শুধু চাওয়া নয়; বরং বেশি করে চাওয়া এবং অন্বেষণ করা।

(এখানে আমরা বেশি করে সময়ের মূল্য দেওয়া এবং সময়কে কাজে লাগানো অর্থ নিয়েছি) অর্থাৎ তালিবুল ইলম তিনটি বিষয়ের প্রতি ভীষণ আগ্রহী হবে–

১. সময়ের মূল্যায়ন।

২. ব্যাপক জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ।

৩. কোনো মুহূর্ত যেন তার নিরর্থক অতিবাহিত না হয়ে যায়।

আর এগুলো সম্ভব কেবল ইলম অর্জনে অদম্য ইচ্ছা এবং ইলমের প্রতি সীমাহীন আসক্তির মাধ্যমেই। তালিবুল ইলম তখন রাতদিন শুধু ইলম নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। চিন্তা-চেতনা এবং তার সমুদয় গবেষণা জুড়ে থাকবে শুধুই নতুন নতুন বিধান এবং মাসআলা জানার বিপুল আগ্রহ। এমনকি শেষ পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ করতে করতে সে হয়ে যাবে পাগল ও দিশেহারা-প্রায়।[১০৪]

---

[১০৪] السير গ্রন্থে (১৫/৪৫৮) যাহাবি রহ. ইমাম আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব আল-আসাম রহ. (২৪৭-৩৪৬) -এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে تاريخ نيسابور গ্রন্থে উল্লেখিত হাকিম রহ.-এর বরাতে বর্ণনা করেন, একবার আমি মসজিদে আবুল আব্বাসের কাছে উপস্থিত হই। এরপর তিনি আসরের আজান দেওয়ার জন্য আজানস্থলে দাঁড়িয়ে সজোরে বলতে থাকেন– أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي (অর্থাৎ সব সময় ইলম ও হাদিস নিয়ে গবেষণায় মগ্ন থাকার কারণে আজান দিতে গিয়েও মুখ দিয়ে হাদিসের সনদ উচ্চারিত হয়ে যায়) এরপর তিনি হেসে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষজনও হেসে দেয়। এরপর আজান দেওয়া শুরু করেন।

খতিব রহ. তার ইতিহাসগ্রন্থে (৪/৩৪৫) উতাইকি রহ.-এর দিকে সম্বন্ধ করে ইবনে শাহিন থেকে বর্ণনা করেন, একবার ইমাম হাফিজ আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন সুলাইমান আল-বাগিন্দি রহ. (মৃত্যু : ৩১৬ হি.) নামাজের ইমামতিতে তাকবির দিয়ে বলতে লাগলেন : حدثنا لوين.. তা শুনে আমরা সকলেই 'সুবহানাল্লাহ' বলে উঠলে তিনি بسم الله الرحمن الرحيم বলে সুরা ফাতেহা শুরু করেন।

ইবনুল জাওযি রহ. المنتظم গ্রন্থে (১৫/১৬২) কাজি আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন মাহমুদ আন্নাসাফি আল-হানাফি (মৃত্যু : ৪১৪ হি.) -এর বৃত্তান্ত বর্ণনা

কবি বলেছেন,

مجانينُ إلا أن سرَّ جنونهم ☆ خفيٌّ على أبوابه يسجدُ العقلُ

অর্থ : তারা তো পাগলসদৃশ, তাদের মধ্যে সুপ্ত থাকে সদা পাগলামি; এমনকি বিবেকও কখনো কখনো তাদের দরজায় সেজদাবনত হয়ে যায়।

সময়ের মূল্যায়ন

প্রতিটি তালিবুল ইলম; বরং প্রতিটি মুসলমানের জন্য সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য বোঝা অত্যাবশ্যক। সময় আল্লাহর দেওয়া একটি বিশাল নেয়ামত। একেকটি মুহূর্ত অতিবাহিত হওয়া মানে তার জীবনের অপ্রত্যাবর্তনযোগ্য একটি অংশ নিঃশেষ হওয়া। সুতরাং সময়কে দুনিয়া-আখেরাতে উপকারী বিষয়ের মাধ্যমে ব্যয় ও ব্যবহার করা জরুরি।

﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

অর্থ : 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে রয়েছে সদা প্রস্তুত প্রহরী।'[১০৫]

ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. তার ছেলের সামনে উক্ত আয়াত পাঠ করেন এবং সেই মূল্যবান উপদেশগুলো তাকে শোনান : দুজন ফেরেশতা তোমার সকল দৃষ্টি ও সব কথা সংরক্ষণ করছে। প্রতিটি জীবিত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের সর্বশেষ

করতে গিয়ে বলেন, তিনি ছিলেন বড়ো মাপের একজন ফকিহ। ছিলেন অল্পেতুষ্ট ও দরিদ্র। একরাতে অভাব ও দরিদ্রতার কারণে তিনি ছিলেন চরম বিষণ্ন। হঠাৎ মাযহাবগত বিষয়ে একটি মাসআলার সমাধান বুঝে উঠে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হয়ে ঘরের ভেতর নাচতে শুরু করেন। বলতে থাকেন, কোথায় রাজা-বাদশাহগণ, কোথায় তাদের বংশধর?! স্ত্রী তাকে এ অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জিজ্ঞেস করলে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি তাকে অবহিত করেন। তা শুনে স্ত্রীও দারুণ পুলকিত হন। তিনি যেন ইমাম মুহাম্মদ রহ.-কেই অনুসরণ করছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ রহ. রাতের বেলায় অধ্যয়নকালে কোনো বিষয়ে সমাধানে পৌঁছলে ভীষণ খুশি হয়ে বলতেন, রাজা-বাদশাহগণ কোথায় পাবে এ আনন্দ! তারা যদি এর স্বাদ বুঝত, তবে অবশ্যই আমাদের তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে দিত।'

এ বিষয়ে সুপ্রিয় পাঠকদের আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর রচিত قيمة الزمن عند العلماء গ্রন্থটি বার বার অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিচ্ছি। সময়ের মূল্যায়নসংক্রান্ত অনেক তথ্য-উপাত্ত এবং ইলম অর্জনের পথে পূর্বসূরিদের সীমাহীন ত্যাগ ও কোরবানির বহু ঘটনা তাতে উল্লেখিত হয়েছে।

[১০৫] সুরা ক্বাফ (৫০) : ১৮

গন্তব্য হলো মৃত্যু। যখনই তুমি নিঃশ্বাস ত্যাগ করো, তখনই তুমি মৃত্যুর দিকে এক পা এগিয়ে যাও! অচিরেই তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হবে।’[১০৬]

বুদ্ধিমানমাত্রই এ কথাটি সব সময় স্মরণ রাখবে।

এখানে আমি দুটি হাদিস উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। একটি দুনিয়াতে প্রযোজ্য এবং অপরটি আখেরাতে। এ দুটি হাদিসে গবেষণা এবং তা বাস্তবায়নের সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হলো তালিব ও আহলে ইলম।

১. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘পাঁচটি বিষয়কে মূল্যায়ন করো অপর পাঁচটি বিষয়ের পূর্বেই– জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে, অবকাশকে ব্যস্ততার পূর্বে, ধনাঢ্যতাকে দরিদ্রতার পূর্বে, যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে এবং সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে।’[১০৭]

এ পাঁচটি উপদেশের প্রত্যেকটিই উক্ত নেয়ামতসমূহের অধিকারী ব্যক্তিদের জন্য মহামূল্যবান রত্ন। এটি সর্বোৎকৃষ্ট উপদেশ এবং শ্রেষ্ঠ নববি পরামর্শ। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা; বিশেষভাবে প্রতিটি তালিবুল ইলমের জন্য এবং ব্যাপকভাবে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য। ‘সদুপদেশই বিক্রয়যোগ্য এবং আল্লাহপ্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে সবচেয়ে দামি।’

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ব্যাপকভাবে প্রতিটি মুসলমানকে সম্বোধন করে মৃত্যুর পূর্বেই জীবনের নেয়ামত এবং ব্যস্ততার পূর্বেই অবকাশের নেয়ামতকে (অবশিষ্ট তিনটি নেয়ামতসহ) কাজে লাগানোর ব্যাপারে এভাবে তাগিদ করে থাকেন, তবে এ পাঁচ নেয়ামত উপভোগকারী তালিবুল ইলমের জন্য উপদেশটি কতটুকু কার্যকর ও প্রয়োজনীয় সাব্যস্ত হবে, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কেয়ামতের দিন কোনো বান্দার দু-পা সামান্যও নড়াচড়ার শক্তি পাবে না যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞেস করা হবে –তার জীবন সম্পর্কে– কোন কাজে তা বিলীন করেছে; তার জ্ঞান সম্পর্কে– সে অনুপাতে কতটুকু আমল করেছে; তার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে –কোত্থেকে

---

[১০৬] لفتة الكبد إلى نصيحة الولد : পৃষ্ঠা ৮

[১০৭] ইবনে আবি শাইবা আমর বিন মাইমুন থেকে مرسلا হাদিসটি বর্ণনা করেছেন (৩৫৪৬০)। হাকিম ইবনে আব্বাস রা. থেকে موصولا বর্ণনা করে শায়খাইনের শর্তে একে সহিহ হিসেবে অভিহিত করেছেন (৭৮৪৬); ইমাম যাহাবিও এতে সহমত পোষণ করেছেন।

উপার্জন আর কোথায় ব্যয় করেছে এবং তার দেহ সম্পর্কে– কী কাজে তা ব্যবহার করেছে।'[১০৮]

কেয়ামতের দিন এ চার নেয়ামত সম্পর্কে সঠিক ও যথাযথ উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত বান্দার পা সামান্য পরিমাণ নাড়ার সুযোগ থাকবে না –এই হলো প্রতিটি মুসলমানের, প্রতিটি ছাত্রের পরিণতি। এ ক্ষেত্রে প্রশ্নকারী হলেন খোদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন; সৃষ্টির কোনো কিছুই যাঁর কাছে গোপনীয় নয়। আর তাই প্রতিটি মুসলিম এবং প্রত্যেক তালিবুল ইলম যেন সে জন্য যথাযথ এবং সন্তোষজনক উত্তর প্রস্তুত করার প্রতি মনোনিবেশ করে।

আর পরকালের প্রশ্নোত্তরপর্বের বর্ণনা-সংবলিত বিভিন্ন হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, সেখানে সকল প্রশ্নই হবে দীর্ঘ এবং বিস্তারিত। সংক্ষেপণের কোনো সুযোগ থাকবে না। তাই এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ খোলা নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা ও দয়ার চাদরে ঢেকে দিন!

আমি আমার প্রাণপ্রিয় সফলতাকামী এবং উন্নত আসনপ্রার্থী তালিবুল ইলম ভাইদের উপদেশ এবং ইলমের রহস্যের সন্ধান দিতে গিয়ে তাঁদের দু-হাত আগলে ধরে বলব : এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় কাম্য–

১. আপনার পক্ষ থেকে; এটি হলো ইলম তলবে আপনার অদম্য ইচ্ছা ও তীব্র বাসনা এবং সময়ের সঠিক প্রয়োগ ও মূল্যায়ন।

২. অপরটি হলো, মহান কৃপাকর্তা ও দয়াময় আল্লাহ কর্তৃক তাওফিক ও সামর্থ্য দান। আপনার মধ্যে ইখলাস, নিষ্ঠা ও সততা থাকলে কিছুতেই আপনাকে বঞ্চিত করবেন না তিনি। এর সঙ্গে যদি সময়ের সঠিক প্রয়োগ ও ইলম অন্বেষণে অদম্য আগ্রহের যোগ হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর ফজলে আপনি আল্লাহওয়ালা আলিম ও আদর্শ ধর্মীয় নেতা হতে যাচ্ছেন।

আমি আরও বলছি, এই ছোট্ট ছোট্ট কথাগুলো অনেক অনেক কিতাব থেকেও বেশি দামি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ﴾

অর্থ : 'যেসব বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটিই তোমাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন।'[১০৯]

---

[১০৮] হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. আবু বারযা আসলামি রা. থেকে (২৪১৭) বর্ণনা করেছেন।

[১০৯] সুরা ইবরাহিম : ৩৪

নিশ্চিত ও নির্ভর থাকুন, উপর্যুক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে পারলে অচিরেই আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করবেন। আপনার প্রার্থনা কবুল করবেন। সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন এবং তালিবুল ইলমের কল্যাণ প্রার্থনার পথে আমাদের পূর্বসূরি এবং গৌরবোজ্জ্বল নক্ষত্র মহাপুরুষদের জীবনচরিতই শ্রেষ্ঠ স্মরণিকা এবং অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

সময়ের মূল্যায়ন সম্পর্কে মনীষীদের যত কথা

সময়ের যথাযথ প্রয়োগ ও মূল্যদান সম্পর্কে ইমাম ইবনুল জাওযি রহ.-কে আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমি আমার নিজের ব্যাপারেই বলি, শৈশব থেকেই ইলম আমার প্রিয় বস্তু। ফলে তখন থেকেই আমি ইলমচর্চার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। কেবল একটি বিষয়ে নয়; বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি গবেষণা করতাম। অনেকগুলো একসাথে পড়তে চাইতাম, কিন্তু সময় আমাকে সে সুযোগ দিত না। সময় যেন কেমন সংক্ষিপ্ত হয়ে যেত।'[১১০]

১৬৩ নং خاطرة (دواء البطالين)-এর অধীনে তিনি লেখেন, 'যখন দেখলাম সময়ই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তখন সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় তা কাজে লাগানোর প্রতি মনোনিবেশ করলাম। সময় নষ্টকারী সাক্ষাৎকামীদের সঙ্গ ত্যাগ করতে লাগলাম। কী করব, অস্বীকার করলে তাদের মনে ঘৃণা জন্মাবে। সুযোগ দিলে সময়ের অপচয় ও অবমূল্যায়ন ঘটবে। সাধ্যমতো আমি তাদের সাক্ষাৎ এড়িয়ে যেতে লাগলাম। কোনোকালে সাক্ষাৎ ঘটে গেলে কথা সংক্ষেপ করে দ্রুত কেটে পড়তাম। এরপর তাদের সাক্ষাতের জন্য একটি নাতিদীর্ঘ সময় নির্দিষ্ট করলাম। যেন অনর্থক কোনো মুহূর্ত অতিবাহিত না হয়ে যায়; সময় শেষ করামাত্রই আবার গবেষণায় মনোনিবেশ করা যায়। তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কাগজ-কলম ও ডায়েরি সাথে নিয়ে যেতাম যেন এক মুহূর্তও নষ্ট না হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সময়ের সঠিক মূল্য বোঝার এবং যথাযথভাবে তা কাজে লাগানোর তাওফিক দান করুন।' এর কয়েক ছত্র পর তিনি লেখেন,

'আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা করেন এবং যাকে তাওফিক দেন, সে-ই শুধু সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং সুস্থতার মান ও মূল্য বুঝতে পারে। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাকে সময়ের যথাযথ মূল্যায়নের সামর্থ্য দিয়েছিলেন।

﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

অর্থ : 'এ চরিত্রের অধিকারী শুধু তারাই হয়, যারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান।'[১১১]

---

[১১০] صيد الخاطر : ৬২

[১১১] সুরা ফুছছিলাত (৪১) : ৩৫

ইলম অন্বেষণে এ ভীষণ আগ্রহ ও অদম্য স্পৃহা এবং সময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নই তাঁকে চার শতকের খিলাফাতের রাজধানী বাগদাদের সর্ববৃহৎ মাকতাবার সন্ধানলাভে বাধ্য করে।

৩৩৭ নং الخاطرة (القدماء أصحاب هم عالية)-পর্বে বলেন, 'আমি আমার সম্পর্কেই বলি : কিতাব মুতালাআয় কখনো আমি পরিতৃপ্ত হতাম না। যখনই নতুন কোনো কিতাব দেখতাম, মনে হতো যেন অমূল্য রত্নভান্ডার পেয়ে গেছি। একবার আমি মাদরাসায়ে নিযামিয়াতে অবস্থিত কিতাবের লিস্ট দেখে ছয় হাজার গ্রন্থের সন্ধান পেলাম। সেখানে আবু হানিফার গ্রন্থসমূহ, হুমাইদির গ্রন্থসমূহ, আমাদের শায়খ আবদুল ওয়াহহাব আল-আনমাতি, ইবনুন্নাসির আস-সালামা ও আবু মুহাম্মদ ইবনুল খাশশাব রহ.. প্রমুখ মনীষীর গ্রন্থগুলোও ছিল; সবগুলোই আমার আগে থেকে অধ্যয়ন করাছিল। বলতে পারি, প্রায় বিশ হাজার গ্রন্থ আমি অধ্যয়ন করেছি। তারপরও এখনো আমি অধ্যয়নরত।'

المغرب في حلى المغرب-এর গ্রন্থকার আবুল হাসান আলি বিন মুসা বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল মালিক বিন সাইদ (মৃত্যু : ৬৮৫ হি.-ইবনে সাইদ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ) তাঁর পিতার বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন[১১২] : 'একবার ঈদের দিন ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম, তিনি লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত। বললাম, আজও কি বিশ্রাম নেবেন না আপনি? এ কথা শুনে আমার দিকে চেহারা লাল করে তাকিয়ে তিনি বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে তুমি কখনো সফল হতে পারবে না। এখনই তো বিশ্রাম এবং লেখালেখির সুবর্ণ সুযোগ। এ রকম অবসর তো আমি আর কোনো দিন পাব না। আশা করি, আল্লাহ তাআলা المغرب গ্রন্থটি শেষ করা পর্যন্ত আমার আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেবেন! আল্লাহ তাআলা তাঁকে রহম করুন, শেষ পর্যন্ত তিনি কিতাব সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তাঁর এ পুত্রই পরবর্তী সময়ে গ্রন্থটি লিখে শেষ করেন।

এই হওয়া উচিত তালিবুল ইলমের আগ্রহ, স্পৃহা এবং ইলমের প্রতি আসক্তি।

هُمُ الرجال وعيبٌ أن يقال لمن ☆ لم يتَّصفْ بمعاني وصفهم : رجلُ

অর্থ : তারা তো বরং 'ব্যক্তিবর্গ', এমন বৈশিষ্ট্যের লোকদের শুধু 'ব্যক্তি' [একবচনে] বলা নিন্দনীয়।

ইবনে আতাউল্লাহ আল-ইস্কান্দারি রহ. الحكم -এ বলেন,

من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة

অর্থ : 'সূচনা যার কষ্টকর নয়, সমাপ্তি তার অনুজ্জ্বল।'

---

[১১২] نفح الطيب : ২/৩৩৪

সময়ের মূল্যায়ন এবং ইলমের প্রতি তাদের সীমাহীন আসক্তির আরেকটি উদাহরণ হলো, ইমাম যাহাবি রহ.-আহমদ বিন আলি আররাক্কাম থেকে বর্ণনা করেন,[১১৩] তিনি ইমাম ইবনুল ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আবি হাতেম আররাযি রহ.-কে জিজ্ঞেস করেন, কীভাবে আপনার পিতা থেকে এতসব হাদিস ও মাসায়িল গ্রহণ এবং শ্রবণ আপনার পক্ষে সম্ভব হলো? উত্তরে তিনি বললেন, কখনো তিনি আহার করছেন আর আমি তাকে হাদিস পড়ে শোনাচ্ছি। কখনো তিনি হাঁটছেন আমি তাকে মাসআলা জিজ্ঞেস করছি। ইস্তিঞ্জায় প্রবেশ করেছেন আর আমি তাকে পড়ে শোনাচ্ছি। কিছু তালাশ করতে ঘরে ঢুকছেন আর আমি তাকে পড়ে শোনাচ্ছি।'

এমনকি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পিতা-পুত্রের এ ইলমি সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। উকবা বিন আবদুল গাফির আল-আযদি রহ.-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে আবি হাতিম রহ. বলেন, 'মৃত্যুশয্যায় আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করি 'উকবা বিন আবদুল গাফিরের কি সুহবত সাব্যস্ত আছে?' তিনি জরাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, না!'[১১৪]

লক্ষ করুন, মুমূর্ষু অবস্থাতেও পিতার কাছ থেকে ইলম অন্বেষণে পুত্রের আগ্রহ কেমন ছিল! আর পিতাকেও দেখুন, মৃত্যুমুহূর্তেও ইলম প্রচার করতে তিনি কোনোরূপ বিরক্তি প্রকাশ করেননি, ছেলের ওপর ক্ষুব্ধ হননি। আল্লাহ তাঁর প্রতি এবং সকল ন্যায়নিষ্ঠ আলিমের প্রতি সন্তুষ্ট হোন!

ইবনে হিলাল আল-আসকারি যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম খলিল বিন আহমদ আল-ফারাহিদি রহ. থেকে তাঁর উক্তিটি বর্ণনা করেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর মুহূর্ত হলো খাওয়ার মুহূর্ত।'[১১৫]

তার সমকালীন অপর মহাপুরুষ এবং আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব ছিলেন দাউদ আত-তায়ি রহ.। আবু নুআইম বর্ণনা করেন, 'একবার ধাত্রী দাউদ আত-তায়িকে লক্ষ্য করে বলল, হে আবু সুলাইমান, আপনি কি রুটি খান না? উত্তরে তিনি বললেন, রুটি চিবানো এবং খাওয়ার সময়ের ভেতরে আমি পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করে নেব।'[১১৬]

---

[১১৩] السير গ্রন্থে : ১৩/২৫১

[১১৪] الجرح والتعديل : ১৭৪২

[১১৫] الحث على طلب العلم : ৮৭

[১১৬] الحلية : ৭/৩৫০

الفنون গ্রন্থপ্রণেতা আবুল ওয়াফা ইবনে উকাইল আল-হাম্বলি রহ.-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনুল জাওযি রহ. লেখেন, আমি ইবনে আকিলের নিজ হাতে লেখা একটি গ্রন্থ পড়েছি, তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন, 'গবেষণা থেকে আমার জিহ্বা এবং অধ্যয়ন থেকে আমার চোখ অপারগ হয়ে গেলেও জীবনের একটি মুহূর্ত অবহেলায় নষ্ট করা আমার উচিত নয়। অবকাশের মুহূর্তগুলোও আমি উত্তমরূপে কাজে লাগাই, ফিকির ও চিন্তা-ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখি। লিখে ভালোভাবে সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আমি উঠি না। জীবনের এই আশির দশকে এসেও বিশ বছরের তরুণের চেয়ে আমি ইলম তলবে অধিক মনোযোগী।'[১১৭]

ইবনুল জাওযি রহ. উজিরের পুত্র উজির বিজ্ঞ আলিম আবু শুজাআ মুহাম্মদ বিন হুসাইন আল-আহওয়াযির বৃত্তান্তে বলেন,[১১৮] 'তিনি ছিলেন শুচিবায়ুগ্রস্ত; পবিত্রতার বিষয়ে বার বার তিনি কুমন্ত্রণায় পড়ে যেতেন। তা জেনে ইবনে আকিল রহ. পানি ও সময় অপচয়ের বিষয়ে সতর্ক করতে এবং সদুপদেশ দিতে গিয়ে তার উদ্দেশে একটি পত্র লেখেন, 'জ্ঞানীদের নিকট সর্বসম্মতভাবে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হলো সময়। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওয়াসওয়াসার দ্বারা ব্যক্তি যেমন কষ্টে পতিত হয়, তেমনি প্রচুর পরিমাণ সময়ও সে নষ্ট করে ফেলে। পবিত্রতা অর্জনে আরও সতর্কতা বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে পানি যেমন বেঁচে যাবে, তেমনি রক্ষা হবে আপনার মূল্যবান সময়ও।'

হাফিজ ইবনে রজব রহ. الفنون গ্রন্থ থেকে ইবনে আকিলের আত্মকথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সাধ্যমতো আমি আমার খাওয়ার মুহূর্তগুলোও বাঁচাতে চেষ্টা করি। এমনকি রুটির চেয়ে নরম কেকজাতীয় খাবার ঝোলমিশ্রিত করে খেতে বেশি পছন্দ করি আমি। কারণ, রুটি খেলে চিবুতে হয় অনেক বেশি, যা মুতালাআর সময়কে কমিয়ে দেয়। অধ্যয়নে বেশি পরিমাণ সময় ব্যয় করতে এবং লেখনীতে আরও বেশি করে মনোনিবেশ করতেই আমি এই পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি।'[১১৯]

ইবনে আবি উসাইবিআ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, 'আল্লাহর শপথ! আহারের সময় মুতালাআ ও ইস্তিফাদার মুহূর্তগুলো আমি ভীষণ

---

[১১৭] المنتظم : ৭/১৮১
[১১৮] المنتظم : ১৭/২২
[১১৯] ذيل طبقات الحنابلة : ১/৩২৫

মিস করি। সেজন্যে অনুতপ্ত হই। কারণ সময় হলো এক মহা মূল্যবান সম্পদ।'[১২০]

যাহাবি রহ.-ইমাম নববি রহ.-এর বৃত্তান্তে তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'দিন বা রাতের কোনো মুহূর্তকেই তিনি নষ্ট হতে দিতেন না। প্রতিটি মুহূর্তই কাজে লাগাতেন। এমনকি পথে-ঘাটেও। সারাদিনে তিনি শুধু এক বেলা আহার করতেন। সাহরির সময় একবার পানি পান করতেন।'[১২১]

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ.- ইমাম আবুল ফাতাহ সুলাইম বিন আইয়ুব রাজি রহ.-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,[১২২] 'তার সম্পর্কে বলা হয়– তিনি প্রতিটি শ্বাস-নিশ্বাস হিসাব করে চলতেন। অযথা ও নিরর্থক কোনো সময় অতিবাহিত হতে দিতেন না। হয় লিখছেন, পড়ছেন নয় পড়াচ্ছেন। লেখালেখি করতেন খুব বেশি।

আমার শায়খ আবুল ফারায আল-ইসফারানি রহ. বলেন, একবার আবুল ফাতাহ রহ. তাঁর বাড়িতে অবস্থান করে ফিরে আসার পর বলেন, পথের মধ্যে আমি এক পারা পড়ে নিয়েছি।' তিনি আরও বলেন, মুআম্মিল বিন হাসান রহ. বর্ণনা করেন, একবার তিনি দেখলেন সুলাইম রহ.-এর কলমটি লেখার অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। তখন কলমটি তিনি মেরামত করছিলেন আর ঠোঁট নাড়িয়ে পড়ছিলেন। যেন সামান্য সময়ও অযথা কেটে না যায়।'

কল্যাণ ও উপকার অর্জনের লিপ্সার বিষয়ে এর চেয়েও বেশি অগ্রগামিতার আরেকটি ঘটনা ইবনে আবিল আওয়াম ইমাম আহমদ রহ.-এর দিকে ইসনাদ করে বলেছেন, 'ইবনুল মুবারক রহ. বায়তুল্লাহর তাওয়াফকালেও বলতেন, অমুক (বর্ণনাকারী) নির্ভরযোগ্য এবং অমুক দুর্বল।;[১২৩] অর্থাৎ তাওয়াফের মুহূর্তেও علم الجرح والتعديل নিয়ে গবেষণায় মগ্ন থাকতেন। দু-দুটি মহান ইবাদাত তিনি একসঙ্গে পালন করেছিলেন।

সাখাভি রহ. তাঁর শায়খ ইবনে হাজার রহ. সম্পর্কে লেখেন, 'ইশার নামাজের পর তিনি যখন ইলমের মজলিশে মুজাকারার জন্য বসতেন, তখন জামার আড়ালে তসবিহ লুকিয়ে রাখতেন। যেন কেউ তা দেখতে না পায়। এভাবে মুজাকারার পাশাপাশি তসবিহের দানাও তিনি চালু রাখতেন। অনেক সময়

---

[১২০] عيون الأنباء في طبقات الأطباء : ২/৩৪

[১২১] تذكرة الحفاظ : ৪/১৪৭২

[১২২] تبيين كذب المفتري : ২৬৩

[১২৩] فضائل أبي حنيفة : ৬১৮

আস্তিনের নিচ থেকে তসবিহ পড়ে গেলে তিনি খুব বিরক্ত হতেন এবং তড়িঘড়ি করে উঠিয়ে তা লুকিয়ে ফেলতেন।'[১২৪]

এর কিছু পূর্বে তিনি উল্লেখ করেন, 'হাফিজ ইবনে হাজার রহ. দামেস্কে প্রায় এক শ দিন অবস্থান করেন। ২১ রমজান থেকে নিয়ে ১ মুহাররাম ৮০৩ হি. পর্যন্ত। এ সময়ে তাঁর পঠিত কিতাব এবং সংগৃহীত হাদিসসমূহের সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন : সর্বমোট পড়েছি ৩০-টি মোটা ভলিয়মের হাদিসগ্রন্থ, যাতে ছিল চার শ পঞ্চাশটিরও বেশি 'হাদিসের জুয'[১২৫]। এ ছাড়াও আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় আমি অধ্যয়ন করেছি।'[১২৬]

তিনি আরও বলেন, এ সময়ে তিনি হাদিসের জুয ও দুর্লভ তথ্যসমৃদ্ধ আটটি ভলিয়মের বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া যিয়া মুকাদ্দিসি রহ.-এর রচিত المختارة গ্রন্থের হাদিসভিত্তিক বিশ্লেষণকাজও তিনি এ সময় সমাপ্ত করেন। এ সম্পর্কে সাখাভি রহ. বলেন, 'দীর্ঘ এ তিন বছরে তিনি যদি শুধু এই একটি কাজই সম্পন্ন করতেন, তবে তা-ই যথেষ্ট ও অনেক বেশি ছিল।'

২. ইলম অর্জনের অদম্য আগ্রহ।

৩. ছুটে যাওয়ার ভয়ে ন্যূনতম ফায়দা অর্জনকেও গুরুত্ব দেওয়া।

ওয়াররাক রহ. থেকে হাফিজ রহ.-এর বলা[১২৭] ঘটনায় ইমাম বুখারি রহ.-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্যও ছিল এটি। তার নাম মুহাম্মদ ইবনে আবি হাতেম আল-ওয়াররাক। তিনি বলেন, শুনেছি তিনি 'বালাযুর'[১২৮] পান করতেন। একবার তাকে একাকী পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মুখস্থশক্তি বৃদ্ধির কোনো ওষুধ আছে কি? তিনি বললেন, জানা নেই আমার! কিছুক্ষণ পর আমার কাছে এসে বললেন, মুখস্থ করার কাজে উপকারী হিসেবে প্রবল আগ্রহ এবং সার্বক্ষণিক ধ্যান-সাধনা ছাড়া অন্য কোনো উপায় আমার জানা নেই।'

مداومة النظر সম্পর্কে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

---

১২৪ الجواهر والدرر : ১/১৭১

১২৫ ৪০ পৃষ্ঠায় এক জুয– যেমনটি السير গ্রন্থের {২০/৫৫৮} হাফেজ যাহাবি রহ. উল্লেখ করেছেন

১২৬ الجواهر والدرر : ১/১৬০

১২৭ مقدمة الفتح : ৪৮৭-৪৮৮

১২৮ পাখির কলিজাসদৃশ লাল-কালো বর্ণমিশ্রিত একটি ফল, ভেতরে রয়েছে রক্তের মতো ঘন তরল পদার্থ

প্রবল আগ্রহ বলতে কোনো কিছু অর্জনে তীব্র বাসনা এবং প্রবল আসক্তি উদ্দেশ্য। এ মহান গুণের লোকেরা কখনো পরিতৃপ্ত হন না। যেমনটি আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

منهومان لا يشبعان : منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع.

অর্থ : দু ধরনের লোভী ব্যক্তি কখনো তুষ্ট হয় না : ইলম অর্জনে লোভী কখনো পরিতৃপ্ত হয় না এবং দুনিয়া উপার্জনে লোভীও কখনো পরিতুষ্ট হয় না।[১২৯]

ইলম অর্জনে তাদের অদম্য লিপ্সার উদাহরণ

যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ইবরাহিম বিন হুসাইন বিন দিযিল আল-হামাযানির[১৩০] বৃত্তান্তে ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, তাকে سِيفَنَّه বলে উপাধি দেওয়া হয়। سِيفَنَّه মিসরের একজাতীয় পাখি, যে কোনো গাছের ওপর সে বসে, গাছের সব পাতা খেয়ে-দেয়ে গাছকে পাতামুক্ত করে দেয়। ঠিক তেমনি ইবরাহিম বিন হুসাইন ইলম তলবের জন্য যে শায়খের কাছেই আসতেন, শায়খের সব ইলম তিনি নিজের মধ্যে পুরে নিতেন।'[১৩১]

ইমাম ইবনে আসাকির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে[১৩২] একদল হাদিসপিপাসু অভিযাত্রী সুফি গবেষকের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন আবুল কাসিম ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ নাসিরাবাদী। ৩৬৭ হিজরিতে মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। ১০৯ পৃষ্ঠায় হজের সফরের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে তার শাগরিদ ও সফরসঙ্গী ইমাম আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামি রহ. বলেন, আমরা যখন কোনো বনের পাশ দিয়ে যেতাম, কোনো কারণে অবতরণের প্রয়োজন হতো, তখন তিনি কলম-খাতাসহ অবতরণ করতেন। বলতাম, হে উস্তাদ, এখানে মানুষ নিজের ওপর থেকে ভ্রমণসামগ্রী কমাতে চাইছে, আর আপনি এগুলো নিয়ে অবতরণ করছেন? উত্তরে তিনি বলতেন, হে আবু আবদুর রহমান, হয়তো বনের কোনো মনোরম দৃশ্য দেখে মনে একটি চিন্তা বা গবেষণার উদয় হবে, আমি সেটি লিখে সংরক্ষণ করে রাখব। পরে তো ভুলেও যেতে পারি?!'[১৩৩]

---

[১২৯] মুস্তাদরাকে হাকিম : ৩১২

[১৩০] বুখারি-মুসলিম রহ.-সহ অনেক মনীষীর সমকালীন ব্যক্তিত্ব।

[১৩১] السير : ১৩/১৮৫

[১৩২] ৭/১০৩

[১৩৩] : ১০৯

ইমামুন্নুরাইন[১৩৪] কাতাদাহ বিন দিআমা সম্পর্কে এর থেকেও আশ্চর্যময় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর শায়খ বিশিষ্ট ইমাম এবং বিজ্ঞ তাবেঈ সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. মদিনা মুনওয়ারার গভর্নর থাকা অবস্থায় আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের দুই পুত্র ওলিদ ও সুলাইমানের হাতে বায়আত গ্রহণ হতে তিনি যখন অস্বীকার করেন, তখন তাঁকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে দাঁড় করিয়ে ষাটটি বেত্রাঘাত করা হয়। বেত্রাঘাতের সময় তিনি ছিলেন নীরব ও স্বাভাবিক।

কাতাদাহ বলেন, 'এ সময় আমি সাইদ বিন মুসাইয়াবের কাছে আসি। পরনে ছিল তাঁর শুধু গুপ্তাঙ্গ ঢাকার জন্য সামান্য পশমের কাপড়। প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় তাঁকে। আমি আমার হাত ধারণকারীকে বলি, তাঁর কাছে নিয়ে চলো আমাকে! (কাতাদাহ ছিলেন অন্ধ) এরপর সে আমাকে তাঁর নিকটবর্তী করলে এ রকম সুযোগ আর পাব না ভেবে তাঁর কাছে বিভিন্ন ইলমি বিষয় জিজ্ঞেস করতে থাকি। তিনি যথাসাধ্য উত্তর দিতে থাকেন। আমাদের এ অদ্ভুত কাণ্ড দেখে মানুষ অবাক হয়ে যায়।'[১৩৫]

ইমাম আসকারি রহ.[১৩৬] বলেন, কুফার প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ সাআলাব সম্পর্কে বলা হয়, তিনি কখনো কিতাব ছাড়া থাকতেন না। কোথাও দাওয়াতে গেলে শর্ত করে দিতেন যে কিতাব পড়ার জন্য তার সামনে বালিশ রাখতে হবে।

তৃতীয় শতকের বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ আবু বকর আল-খাইয়াত সব সময় অধ্যয়নরত থাকতেন; এমনকি পথেঘাটেও। কখনো তিনি অন্যমনস্কতার কারণে ড্রেনে পড়ে যেতেন। কখনো জীবজন্তুর গুঁতো খেতেন।

ইবনুল ফুরাত রহ. প্রতিদিন সকালে কিছু না-কিছু মুখস্থ করতেন; এমনকি স্বল্প পরিমাণ হলেও।

আবু হানিফা রহ.-কে এক লোক জিজ্ঞেস করল, এত মুখস্থশক্তি আপনি কীভাবে অর্জন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন,

البزر البزر – يريد زيت السراج!

অর্থ : প্রদীপে তেল ঢেলে, প্রদীপে তেল ঢেলে!

অর্থাৎ অধিক পরিমাণে রাত জেগে ইলম অন্বেষণ করে। এক ব্যক্তি সাকরাতকে বলল, এত ইলম কী করে আপনি মুখস্থ করলেন? উত্তরে তিনি বললেন,

---

[১৩৪] দুই নুর অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের ইমাম।

[১৩৫] حلية الأولياء : ২/১৭১

[১৩৬] الحث على طلب العلم : ৭৭

أوقدت من الزيت أكثر مما شربت من الماء.

অর্থ : যে পরিমাণ পানি খেয়েছি, প্রদীপে তার চেয়ে বেশি তেল ঢেলেছি!!

একবার ইমাম সারাখসি (মৃত্যু : ৪৯০ হি.) এবং নগরপ্রধান 'উযজান্দ'-এর মাঝে কোনো একটি বিষয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে উযজান্দ তাঁকে একটি গর্তে আবদ্ধ রাখেন। তাকে মেরে ফেলা হবে আশঙ্কায় ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে গর্তের মুখে অবস্থান নেয়। এ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই তিনি الكافي -এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। এ সময় ত্রিশ খণ্ডে বিখ্যাত গ্রন্থ المبسوط–ও তিনি রচনা করেন। আরও রচনা করেন দুই খণ্ডের أصول الفقه । এরপর ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর السير الكبير কিতাবের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাগ্রন্থও রচনার কাজে হাত দেন। এরপর আল্লাহর রহমতে তিনি মুক্তি পান এবং ফারগানা নগরীতে অবশিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থের কাজ সমাপ্ত করেন।

এসব গ্রন্থ রচনা তিনি কেবল মুখস্থ ইলম থেকেই করেছিলেন। কোনো কিতাব হাতে নেওয়ার সুযোগ সেখানে পাননি। তিনি ছিলেন এক জীবন্ত মাকতাবা। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন![১৩৭]

বন্দিত্ব বা শাস্তি ইলমের তলব ও ইশাআত থেকে তাদের বিরত রাখতে পারেনি। শিক্ষার্থীদেরও ইস্তিফাদা অর্জন থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি।

ইমাম আবু হাতিম রাযি রহ. এবং তাঁর পুত্রের মাঝে ঘটিত ইফাদা ও ইস্তিফাদার অনন্য দৃষ্টান্ত আমরা এরই মধ্যে পড়ে এসেছি।

সম্মানিত ভাই ডক্টর মুহাম্মদ মুতি আল-হাফিজের প্রকাশিত : في ربوع الشام دمشق গ্রন্থেও দামেস্কে হাদিসের 'জুযসমূহ' শ্রবণ ও গ্রহণের বিষয়ে তার অনেক অকল্পনীয় ত্যাগের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে :

* শায়খের মৃত্যুর চার দিন পূর্বে শায়খ থেকে হাদিস গ্রহণ করা।

* ৬৪২ হিজরিতে হজের মওসুমে হাজিদের এক কাফেলা কর্তৃক হাদিস গ্রহণ করার ঘটনা, যাদের মধ্যে পাঁচ বছরের ছোট্ট বালিকাও ছিল।

* দামেস্কের গুতায় অবস্থিত 'মাকরি' গ্রামে বিনোদনের জন্য বের হওয়া পরিবারের হাদিস গ্রহণ করা।

* একটি ছোট্ট অভিযাত্রী দলের হাদিস গ্রহণ করার ঘটনা, যেখানে পাঁচদিনের কোলের শিশুও ছিল।

---

১৩৭ الجواهر المضية -তে তার জীবনবৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য : ৩/৭৮

এসব ঘটনাতে হাদিস শ্রবণ এবং হাদিস গ্রহণে ইলমের প্রতি তাদের সীমাহীন আগ্রহ এবং সময়ের মূল্যায়নের বিষয়টিই স্পষ্ট হয়েছে। কেউ বিনোদনে বের হওয়ার সময়, কেউ যুদ্ধবিগ্রহের কালে অবরুদ্ধ অবস্থায়, কেউ ভ্রমণকালে, কেউ হজে গমনকালে, কেউ হাজিদের সংবর্ধনা প্রদানকালে হাদিস গ্রহণ করেছেন!

আরও স্পষ্ট হয়েছে যে দ্বীনি ইলম বিশেষত হাদিস শ্রবণ এবং গ্রহণের বরকত ও কল্যাণ শিশুদেরও ছুঁয়ে যায়। কেউ পাঁচ দিনের শিশু, কেউ আট মাসের, কেউ নয় মাসের...ইত্যাদি।

বোঝা যায়, হাদিসের প্রতি অগাধ ভালোবাসা মজ্জাগতভাবে তাঁদের ইচ্ছা ও অনুভূতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বাচ্চারাও হাদিসের বরকত লাভ করে ধন্য হয়েছিল। অভিভাবকদের বাসনা ছিল, এই বাচ্চারাও যেন বড়ো হয়ে সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পিতা-মাতার নয়নের মণি হতে পারে। হাদিসের ইলম নিয়ে গবেষণা এবং তা প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

যতই দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদ ভর করুক, কোনোক্রমেই সেগুলো ইলম ও আহলে ইলমের থেকে উপকৃত হওয়ার মাঝে তাদের অন্তরায় হতো না। ইলম নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনাই ছিল তাদের জন্য বিপদাপদ থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপকরণ এবং সকল ব্যথা-উপসর্গ নিরাময়ের একমাত্র চিকিৎসা। এর আগে জেলখানায় আবদ্ধ থাকাকালে ইমাম সারাখসির গবেষণা ও ইলমচর্চার ইতিহাস আমরা পড়ে এসেছি। বন্দিত্ব ও নির্যাতনের মুহূর্তেও সাইদ বিন মুসাইয়াবের ইলমপ্রচারের বৃত্তান্ত জেনে এসেছি। মৃত্যুশয্যায় আবু হাতিম রাযির হাদিসের জ্ঞান বিতরণের অদম্য স্পৃহার ঘটনা পড়ে এসেছি।

ইমামুল হারামাইনের গর্বিত পিতা শায়খ ইমাম আবু মুহাম্মদ আল-জুওয়াইনি রা. প্রতিদিন ফজরের নামাজে দোয়া করতেন :

اللّٰهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع.

অর্থ : হে আল্লাহ, ইলম অর্জনের পথে কোনো প্রতিবন্ধক যেন আমাদের বাধা না দেয়। কোনো বারণকারী যেন আমাদের এ কাজ থেকে বারণ না করে! আমিন, আমিন![১৩৮]

মুমূর্ষু অবস্থায়ও ইলমচর্চা

ইমাম বুখারির বিশিষ্ট শায়খদের অন্যতম এবং নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু নুআইম ফাজল বিন দুকাইন থেকে ইবনে আবিল আওয়াম বর্ণনা

---

১৩৮ حكاه السبكي في الطبقات : ৫/৭৪

করেন : 'ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট ছাত্র যুফার রহ.-এর মৃত্যুর সময় আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বলছিলেন, 'এই অবস্থায় তাকে পূর্ণ মোহর দিতে হবে আর ওই অবস্থায় মোহরের এক তৃতীয়াংশ পরিশোধ করতে হবে!' মুমূর্ষু অবস্থায়ও তিনি এভাবে ইলম ও ফিকহচর্চায় মগ্ন ছিলেন।[১৩৯]

ইবনে আবিল আওয়াম[১৪০] ইমাম আবু হানিফার অপর প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর সম্পর্কে ইবরাহিম বিন জাররাহ–এর দিকে তাঁর একটি উক্তি সম্বন্ধ করেন :

'আবু ইউসুফ অসুস্থ হয়ে গেলে আমি তাঁকে দেখতে আসি। এসে দেখি তিনি অচেতন। চেতনা ফেরার পর তিনি আমার উদ্দেশে বলেন, হে ইবরাহিম, এ মাসআলায় তোমার কী অভিমত? আমি বলি, এ মুমূর্ষু অবস্থায়ও আপনি মাসআলা জিজ্ঞেস করছেন?! তিনি বলেন, কোনো সমস্যা নেই; হয়তো এ মাসআলা অনুসরণ করে কেউ মুক্তি পেয়ে যেতে পারে। এরপর বলেন, হে ইবরাহিম, কোনটি উত্তম, পায়ে হেঁটে কঙ্কর নিক্ষেপ করা নাকি আরোহী অবস্থায়? আমি বলি, আরোহী অবস্থায়! তিনি বলেন, ভুল! আমি বলি, তবে পায়ে হাঁটা অবস্থায় করলে সঠিক! এবারও তিনি বলেন, ভুল! আমি বলি, এখন তবে আপনিই বলুন, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! তিনি বলতে থাকেন, দোয়া করার জন্য থামতে হলে পায়ে হেঁটে রামি করা উত্তম; আর থামার ইচ্ছে না থাকলে আরোহী অবস্থায় নিক্ষেপ করা উত্তম। এরপর আমি তার কাছ থেকে উঠে আসি। দরজা পার হতে না-হতেই তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আওয়াজ শুনতে পাই। ফিরে গিয়ে দেখি, তিনি আর বেঁচে নেই। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন!

যারনুজি রহ. বলেন[১৪১] : 'প্রসিদ্ধ আছে, স্বপ্নে একলোক ইমাম মুহাম্মদ রহ.-কে দেখে জিজ্ঞেস করে, মৃত্যুর সময় আপনার অবস্থা কেমন ছিল? বলেন, আমি একটি মাসআলা নিয়ে গবেষণা করছিলাম; কোন দিক দিয়ে যে রূহ বের হয়েছে টেরই পাইনি!'

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে[১৪২] নিম্নোক্ত কথাটি বলে ইমাম আবু মাসঊদ রাজি রহ.-এর বৃত্তান্ত সমাপ্ত করেন, 'মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আলবান্না

---

[১৩৯] فضائل أبي حنيفة : ৬৮১ পৃষ্ঠা

[১৪০] ৭৬৫ পৃষ্ঠা

[১৪১] تعليم المتعلم : ৮৪

[১৪২] ৫/৫৭

বলেন, আমি আবু মাসউদ আহমদ বিন ফুরাত রহ.-কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখি, তিনি বলছিলেন– حدثنا وأخبرنا তা শুনে অবাক হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আখেরাতেও؟ حدثنا وأخبرنا বললেন, হ্যাঁ.. আখেরাতেও حدثنا وأخبرنا

আমার প্রথম শহর আলেপ্পোতে[১৪৩] দু'জন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তাঁরা আমার সকল শায়খের শায়খ, আল্লামা ফকিহ শায়খ মুহাম্মদ সাঈদ ইদলিবি[১৪৪] এবং বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, ইতিহাসবিদ এবং دار نفائس تراث السنة وعلومها -এর সমকালীন প্রকাশক শায়খ মুহাম্মদ রাগিব আত-তাব্বাখ[১৪৫]। দুজনেই একই বছর ইন্তেকাল করেন। থাকতেনও তাঁরা একই মহল্লায়। ইন্তেকালও করেন একই হালতের ওপর।

প্রথম জনকে জিজ্ঞেস করা হলো, মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলে মানুষের কী করা উচিত? তিনি উত্তর দেন, ইলম তলব করা উচিত!

তাঁর মৃত্যুর সময় এমনটিই হয়েছিল। যখনই তিনি জটিল ব্যথা অনুভব করতেন, কাছের লোকদের ডেকে বলতেন, কিতাব নিয়ে এসো! কিতাবই মৃত্যুর সময় তার বুকের ওপর ছিল।

দ্বিতীয় জনের মৃত্যুর সময় তাঁর কাছে একজন তরুণ ছাত্র প্রবেশ করে দেখে, তাঁর আশপাশে অনেকগুলো বালিশ (হেলান দেওয়ার বস্তু) তাতে তিনি আরামের সাথে হেলান দিয়ে আছেন। যুবকটি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, কিতাব নিয়ে এসো! কিতাব নিয়ে আসার পর তিনি নিজ হাতে কিতাবটি ধারণ করেন। ঠিক এমন সময় তাঁর অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে যায়। দ্রুত তাঁর ছেলে এসে যুবকের কাছে মাফ চেয়ে তাকে বাইরে যেতে বলে। এরপর যুবকটি বের হওয়ার জন্য উঠে যায়। দরজা পার হওয়ার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের নিজ রহমতের চাদরে ঢেকে নিন!

* * * *

---

[১৪৩] আল্লাহ তাআলা তাঁকে এবং মুসলমানদের সকল ভূমিকে শত্রুমুক্ত করুন।

[১৪৪] ১২৮৮-১৩৭০ হি.

[১৪৫] ১২৯৩-১৩৭০ হি.

পঞ্চম পথনির্দেশ

ইলম অন্বেষণে অদম্য স্পৃহা

হিম্মত : অনেকেই অনেকভাবে এর সংজ্ঞা বলেছেন। এর মধ্যে প্রজ্ঞাবান মুজাহিদ শায়খুল আযহার মুহাম্মদ খাযির হুসাইন রহ.[১৪৬]-এর দেওয়া সংজ্ঞাটিই সবচেয়ে যথার্থ ও উপযুক্ত মনে হয়েছে আমার কাছে। তিনি বলেন, 'শিষ্টাচারবিদগণ সুন্দরভাবে এর সংজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেছেন, 'প্রতিটি বৃহৎ ও দুঃসাধ্য বিষয়কে ক্ষুদ্র ও সাধ্যের অধীন মনে করার নামই হিম্মত।'

উন্নত বাসনা লালনের প্রতি উৎসাহদান

সৎকাজে সাহস বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন–

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾

অর্থ : 'সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও!'[১৪৭]

অন্য আয়াতে বলেন :

﴿لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾

অর্থ : 'এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।'[১৪৮]

আরও বলেন :

﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

অর্থ : 'এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।'[১৪৯]

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.

অর্থ : 'দুর্বল মুমিন অপেক্ষা শক্তিশালী মুমিন শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর অধিক প্রিয়। আর উভয়ের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। উপকারী বস্তু অর্জনে

---

[১৪৬] ১২৯৩-১৩৭৭ হি.

[১৪৭] সুরা বাকারা (০২) : ১৪৮

[১৪৮] সুরা সাফফাত (৩৭) : ৬১

[১৪৯] সুরা মুতাফফিফিন (৮৩) : ২৬

মনোযোগী হও। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো। অপারগ হয়ে গা ভাসিয়ে দিয়ো না।'[১৫০]

একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে উপকারী বস্তু হলো ইলম। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাগুলো চিন্তা করুন,

احرص ، واستعن ، ولا تعجز.

...প্রতিটি শব্দেই রয়েছে সুউচ্চ অভিপ্রায় এবং অদম্য স্পৃহা লালনের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী এক অলৌকিক শক্তি। শত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক এ মহান রাসুল, কল্যাণের কান্ডারি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।

যামাখশারি রহ. তাঁর বিখ্যাত কবিতায় বলেন,

سَهَرِي لتنقيح العلوم ألـذ لي ☆ من وصْل غانية وطِيْبِ عِناقِ

অর্থ : ইলম অন্বেষণ করা এবং ইলম নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যে রাতজাগা আমার কাছে ধনী লোকদের সাক্ষাৎ এবং বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলিঙ্গন করা থেকে বেশি প্রিয়।[১৫১]

কবিতার শেষ অংশে তিনি বলেন,

يا من يحاول بالأماني رُتْبتي : ☆ كم بين مُسْتَفِلٍ وآخَرَ راقِ

أَأَبيتُ سهرانَ الدُّجى وتَبيتُه ☆ نومًا ، وتبغي بعد ذلك لَحَاقي؟!

অর্থ : ওহে আমার মতো উন্নত মর্যাদার অভিলাষী! শুনে রাখো, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বিরতিহীন উন্নতিকারীর মধ্যে কতই-না ব্যবধান? আমি অন্ধকার রাত্রিগুলো জেগে আছি, আর তুমি তাতে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন.. এরপরও তুমি আমার সাক্ষাৎ ও মিলন প্রার্থনা করছ?!!

আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পর একজন মানুষের প্রধান ও সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষ্য হলো মর্যাদাপূর্ণ এ ইলম অন্বেষণে মনোনিবেশ করা। জনশ্রুতিতে আছে,

مَن يخطُبِ الحسناءَ يستسهلْ مهرها.

অর্থ : সুন্দরী নারীকে যে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তাঁর মহরকে তো সে তুচ্ছই মনে করে [অর্থাৎ মোটা অঙ্কের মহর পরিশোধ করতেও তখন আর সে কুণ্ঠাবোধ করে না]।

বিখ্যাত আরবি ভাষাবিদ ইবনে হিশাম রহ.[১৫২] বলেন,[১৫৩]

---

[১৫০] সহিহ মুসলিম : ৪/২০৫২

[১৫১] صفحات من صبر العلماء গ্রন্থে আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে : ১৩৯

وَمَن يَصطبِرْ للعلم يظفرْ بنَيْله ☆ ومن يخطُبِ الحسناءَ يصبرْ على البذلِ

وَمَن لم يُذلِّ النفسَ في طلب العلى ☆ يسيرًا ، يعشْ دهرًا طويلاً أخا ذلِّ

অর্থ : ইলম অন্বেষণে যে প্রবল ধৈর্যের পরিচয় দেবে, লক্ষ্যপূরণে অচিরেই সে সফল হবে। সুন্দরী নারীকে যে বিবাহের প্রস্তাব দেবে, খরচ এবং ব্যয়েও সে ধৈর্য ও উদারতা প্রকাশ করবে। উন্নত মর্যাদাকামী যদি আত্মত্যাগ ও পরিশ্রম স্বীকার না করে, তবে যুগ যুগ ধরে সে লাঞ্ছনার সঙ্গী হয়েই থাকবে!

ইলমের উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত হতে শুধু ধৈর্য নয়, সীমাহীন ধৈর্য এবং নিরন্তর সাধনার কথা বলা হয়েছে। তালিবুল ইলমমাত্রই সবধরনের বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে ইখলাস ও ইলমের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করার উদ্যোগ নেবে।

আবু হিলাল আল-আসকারি রহ. বলেন,[১৫৪]

'ওহে প্রিয় ভাই, তুমি যদি উন্নত মর্যাদা কামনা করো, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির শিখরে আরোহণ করতে চাও, সেরা মনীষীদের তালিকায় নাম লেখাতে চাও, এমন সম্মান অর্জনে সচেষ্ট হও, যা সময়ের অতিক্রমে কখনো নষ্ট হয় না, কালের বিবর্তন ও পরিভ্রমণে সামান্যও খর্ব হয় না; রাজত্ব ছাড়া ক্ষমতা, অর্থ ছাড়া বিত্ত, অস্ত্র ছাড়া দাপট, বংশ ছাড়া গৌরব, বিপুলসংখ্যক সাথি-সঙ্গী এবং সরকারি প্রক্রিয়া ছাড়াই যদি বাহিনীর গর্বিত সেনাপতি হতে চাও, তবে ইলম অন্বেষণে মনোযোগী হও! সর্বত্র জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করো। দুনিয়ার সকল উপভোগ্য বস্তু বিনামূল্যে তোমার পায়ে এসে পড়বে, শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বস্তু তোমার পদচুম্বন করবে। সে লক্ষ্যে ইলমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক পারদর্শিতা অর্জনের উদ্দেশ্যে অল্প কিছু রাত বিসর্জন দিয়ে গভীর সাধনায় আত্মনিয়োগ করো। এরপর জীবনভর সম্মান ও মর্যাদার সুমধুর স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো; অবশিষ্ট জীবনে উন্নত ও গৌরবময় স্তর উপভোগ করো! মৃত্যুর পরেও সৃষ্টির মাঝে উজ্জ্বল ও স্মরণীয় হয়ে থাকো!'

এরপর হজরত আলি রা.-এর একটি বাণী তিনি উল্লেখ করেন,

قيمة كلِّ امرئ ما يُحسِنه.

'দক্ষতার ভিত্তিতেই প্রতিটি মানুষের মূল্যায়ন হয়ে থাকে।'

---

[১৫২] মৃত্যু : ৭৬১ হি.। ৫৩ বছর বেঁচে ছিলেন। 'বিশিষ্ট আরবি ভাষাবিদ' উপাধিতে ভূষিতে হয়েছিলেন

[১৫৩] الدرر الكامنة : ২/৩০৯

[১৫৪] الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه : ৪৩

আলি রা.-এর এ কথায় তিনি ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য করেন,

> ‘তুমি যদি এ কথাটি চিন্তা করো, অবশ্যই তবে অলসতা ও অবকাশ যাপন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যথাসাধ্য ইলম অন্বেষণে তুমি মনোনিবেশ করবে। কারণ, বুদ্ধিমানমাত্রই কখনো তার মর্যাদা পদদলিত হতে দেয় না; উন্নত আসন লাভের সুযোগ হাতছাড়া করে না।’

المعيد في أدب المفيد والمستفيد গ্রন্থে[১৫৫] আল্লামা আলমাভি রহ. বলেন, ‘প্রতিটি তালিবুল ইলমের হিম্মত ও অভিপ্রায় হতে হবে অনন্য ও সর্বোন্নত। অধিক ইলম অর্জনের সুযোগ থাকতে কখনো সে অল্প ইলমে পরিতুষ্ট হবে না। নবিদের এ উত্তরাধিকার লাভে কখনো সে সামান্যতে পরিতৃপ্ত হবে না। সহজ বিষয় রপ্ত ও আয়ত্ত করতে কখনো সে বিলম্ব করবে না। হতাশা ও নিরাশার কালো ছায়া কখনো তাকে দমিয়ে রাখবে না। কারণ, অলসতা ও কালক্ষেপণের বদভ্যাস তালিবুল ইলমের জন্য মহাবিপদ। ইলম যদি এ বয়সে তুমি অর্জন করে নিতে পারো, তবে নিকট ভবিষ্যতে সে তোমার উপকার করবে। অবসর ও ব্যস্ততার সময় তোমার কাজে আসবে। বাতিলপন্থীদের উত্থাপিত প্রশ্ন ও অভিযোগ শুনে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমুচিত জবাব দিতে প্রবলভাবে তোমাকে সহায়তা করবে।’

উপর্যুক্ত কথা ও বাক্যগুলো খুবই মূল্যবান। এর মধ্যে দুটি বাক্য নিয়ে আমি সামান্য ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করব,

১. ‘নবিদের এ উত্তরাধিকার লাভে কখনো সে অল্পতে পরিতৃপ্ত হবে না।’ বাক্যটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং মহিমাপূর্ণ। ওহে তালিবুল ইলম, তুমি কার মিরাস এবং কার উত্তরাধিকার অন্বেষণ করছ? এ তো নবি-রাসুলদের অমূল্য সম্পদ, তাদের রেখে যাওয়া ধনৈশ্বর্য! এ মহান ও মর্যাদাপূর্ণ সম্পদ কি তুমি অল্প নিয়েই তুষ্ট হয়ে যাবে? না আরও বেশি করে লাভ করতে আগ্রহী হবে?! মুতানাব্বি বলেন,

إذا غامرتَ في شرف مَروم ☆ فلا تقنع بما دون النجومِ

فطعمُ الموتِ في أمر حقير ☆ كطعمِ الموتِ في أمر عظيم

অর্থ : যদি সর্বোন্নত চূড়ায় সমাসীন হতে চাও, তবে তারকাসমূহের নিম্নবর্তী কোনো কিছু পেয়ে তুষ্ট হয়ো না। কারণ, তুচ্ছ ঘটনায় মৃত্যু এবং বিরাট দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু–উভয় মৃত্যুর স্বাদ কিন্তু একই।

---

[১৫৫] পৃষ্ঠা : ৭৬

২. 'হতাশা ও নিরাশার কালো ছায়া কখনো তাকে দমিয়ে রাখবে না।' অর্থাৎ উপকারী জ্ঞান অর্জন থেকে কখনো তাকে বিরত রাখবে না। অনেক পূর্বসূরি থেকে কালক্ষেপণ থেকে সতর্ককারী কিছু উক্তি এখানে উল্লেখ করছি, যেগুলো ইবনে আবিদ্দুনিয়া রহ. নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন :[১৫৬]

১ম উক্তি : আবু ইসহাক আস-সুবাইয়ি রহ. বলেন, আবদে কাইস গোত্রের এক লোকের কাছে আবেদন করা হলো—কিছু উপদেশ করুন! তিনি বলেন, 'অচিরেই' কথাটি পরিহার করো!

২য় উক্তি : আবুল জালদ জাইলান বিন ফারওয়া রহ. বলেন, আমি একটি গ্রন্থে পড়েছি যে, 'অচিরেই' শব্দটি ইবলিস শয়তানের সহচর।

৩য় উক্তি : আনাস বিন মালিক রা. বলেন, 'কালক্ষেপণ এবং বিলম্ব হলো ইবলিস শয়তানের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। তা দিয়ে অসংখ্য মানুষকে সে ঘায়েল করে রাখে।'

প্রতিটি মানুষকে বিশেষত প্রতিটি তালিবুল ইলমকে এ ধরনের কথা ও কাজ থেকে সব সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

ইলমের সঙ্গে দৈহিক বিশ্রাম বেমানান

এ বিষয়ে বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য তাবেঈ 'কুতুবে সিত্তা'-এর প্রসিদ্ধ রাবি আবু নাসর ইয়াহয়া বিন আবু কাসির আল-ইয়ামামি রহ.-এর একটি উক্তি প্রসিদ্ধ আছে, যা অলস ও কালক্ষেপণকারী ছাত্রদের ইলমের প্রতি মনোযোগী ও আগ্রহী করতে সহায়ক হবে বলে আশা করি। তিনি বলেন,

لا يُستطاع العلم براحة الجسم.

'ইলমের সঙ্গে দৈহিক বিশ্রাম বেমানান!'

উক্তিটি مواقيت الصلوات الخمسة অধ্যায়ে ইমাম মুসলিম রহ.-আবু মাসউদ বদরি, আয়েশা ও আবদুল্লাহ বিন আমর রা. হতে তেরো জন শায়খ থেকে বিভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন— কুতাইবা বিন সাইদ আল-বাগলানি,[১৫৭] ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া নিশাপুরি, আবু বকর বিন ইবনে আবি শাইবা আল-কুফি, আমর বিন মুহাম্মদ আন-নাকিদ বাগদাদি আর-রাক্কি, হারমালা বিন ইয়াহইয়া আত-তুজাইবি আল-মিসরি, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমাইর আল-কুফি, আবু গাসসান আল-মিসমাঈ,[১৫৮] যুহাইর বিন হারম আন-নাসায়ি

---

[১৫৬] قصر الأمل : ২০৬-২০৮

[১৫৭] বাগলান আফগানিস্তানে অবস্থিত বলখের এটি গ্রাম।

[১৫৮] তার নাম মালেক বিন আবদুল ওয়াহহাব আল-বাসরি।

আল-বাগদাদি, আহমদ বিন ইবরাহিম আদ-দাওরাকি আল-বাগদাদি এবং আহমদ বিন ইউসুফ আল-আযদি নিশাপুরি।

তিনি এ তেরো জন শায়খের রিওয়ায়াতগুলো উল্লেখ করে বলেন, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমি বর্ণনা করেন, আমাকে আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া ইবনে কাসির রহ. বলেন, তিনি তার পিতাকে বলতে শুনেছেন—

لا يُستطاع العلم براحة الجسم.

'ইলমের সঙ্গে দৈহিক বিশ্রাম বেমানান।'

বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, ভূমিকার অব্যবহিত পর তাঁরা সবচেয়ে বিশুদ্ধ, গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী সনদের হাদিসগুলোই উল্লেখ করেন। কিন্তু সেখানে এ উক্তিটি আনার পেছনে তাদের কী উদ্দেশ্য হতে পারে?

কাজি ইয়ায রহ. বলেন,[১৫৯] অনেকে প্রশ্ন করেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিস না হওয়ার পরও ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর কিতাবের একদম শুরুতে উপর্যুক্ত উক্তিটি কেন উল্লেখ করলেন? এর উত্তরে আমাদের শায়খগণ বলেন, কারণ, ইমাম মুসলিম রহ. ইলম ও হাদিস অন্বেষণে সীমাহীন কষ্ট, পরিশ্রম, ভ্রমণ ও সাধনার বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উক্তিটি তিনি উল্লেখ করেছেন। বুঝতে পারেন, শত ভাগ চেষ্টা ও আত্মত্যাগ স্বীকারের পরই শুধু ইলমের নাগাল পাওয়া যায়। ইলম ও হাদিস গ্রহণের জন্য তিনি আফগানিস্তান থেকে নিশাপুর, কুফা, বাগদাদ, রাক্কা, বসরা, মিসরসহ বিভিন্ন দূরদেশে আদিম ও ধীরগতির বাহনে করে বিরতিহীন ইলমি সফরের অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। যার ফলে ইয়াহইয়া ইবনে কাসির রহ.-এর এই অমূল্য উক্তিটি তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন।

لا يستطاع العلم براحة الجسم.

বাক্যটি যেন তালিবুল ইলমের জন্য তাঁদের আদর্শ অনুসরণের মূলভিত্তি।

যাহাবি রহ.[১৬০] ইমাম ইবনুল ইমাম ইবনে আবি হাতেম রাযি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, 'দীর্ঘ সাতটি মাস আমরা মিসরে অবস্থান করি। ওই সাত মাস (রুটি-গোশতমিশ্রিত) ঝোল বলতে কিছুই খেতে পাইনি। দিনভর শায়খদের সান্নিধ্যে থাকাই ছিল আমাদের রুটিন। রাতের বেলায় চলত লেখালেখি ও তাকরার।'

---

[১৫৯] إكمال المعلم بفوائد مسلم গ্রন্থে : ২/৫৭৭

[১৬০] السير গ্রন্থে ১৩/২৬৬

তিনি বলেন, একবার আমি ও আমার এক সহপাঠী এক শায়খের কাছে এলে তাঁর শিষ্যরা বলল, শায়খ অসুস্থ। সেখান থেকে ফেরার সময় রাস্তায় একটি সুন্দর মাছ দেখতে পেয়ে আমরা তা কিনে নিই। রুমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরসের সময় হয়ে যায়। রান্না করার আর সুযোগ হয়নি। এভাবে তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মাছটির ঘ্রাণ পরিবর্তন হয়ে যায়, এভাবেই সেটি আমরা খেয়ে নিই। মাছটি ভাজি বা রান্না করার মতো কোনো সুযোগ বা অবসর আমাদের ভাগ্যে জোটেনি। এরপর তিনি বলেন, ইলমের সঙ্গে দৈহিক বিশ্রাম বেমানান!'

ইয়াহইয়া ইবনে কাসির রহ.-এর আরেকটি উক্তি প্রসিদ্ধ আছে, 'ইলমের মিরাস সোনা-রুপার মিরাস হতেও উত্তম। সৎ হৃদয় মুক্তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং ইলমের সাথে দৈহিক বিশ্রাম বেমানান।'[১৬১]

অর্থাৎ (আল্লাহই ভালো জানেন) অলসতা, বিলম্ব এবং দৈহিক বিশ্রামকে সঙ্গী করে ইলম অর্জন করা অসম্ভব। তা না হলে তার ইলমও জীবন্ত এবং উপকারী হবে না। ইলম অর্জন করতে হলে শয্যাত্যাগ করতে হবে, দূরদেশে এবং দূর-দূরান্তে পাড়ি জমাতে হবে। ভোগ করতে হবে সীমাহীন কষ্ট ও পরিশ্রম।

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : আসাদ বিন ফুরাত রহ. বলতেন, 'ইলম তলবের জন্য আমরা উটের পিঠে চড়েছি, দূরপ্রবাসে পাড়ি জমিয়েছি, বড়ো বড়ো আলিমদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আর অন্যরা পিতার কোলে এবং মায়ের তাঁতঘরের পেছনে বসে বসে ইলম অর্জন করে একই মর্যাদার দাবি করছে।'

আসাদ বিন ফুরাত রহ. ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ভ্রমণ করেন। দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। তিউনিসিয়ার 'কায়রাওয়ান' থেকে প্রথমে মদিনা মুনাওয়ারাতে, সেখান থেকে ইরাকে, তারপর মিসরে। এরপর নিজ দেশে ফিরে আসেন। সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ইরাক ও হিজাযের ইলমি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। তার এ ইলমি ভ্রমণকাহিনি সুখপাঠ্য এবং নিতান্তই উপভোগ্য, প্রতিটি ছাত্রকে গভীর চেতনা নিয়ে তা পাঠ করার উপদেশ দিচ্ছি। তার জীবনীতে আছে মূল্যবান শিক্ষা এবং আদর্শ তালিবুল ইলমের দৃষ্টান্ত।

ইবনুন্নাজ্জার[১৬২] আবু বকর মুহাম্মদ বিন ইমাম দাউদ যাহেরি রহ.-এর উক্তি বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি প্রবাসের পানি পান করেনি, বিপদের বাহুতলে মাথা গোঁজেনি,

---

[১৬১] تاريخ بغداد : ১১/৩৭৫

[১৬২] ذيل تاريخ بغداد : ১/২০৭

সে ব্যক্তি দেশ ও মাতৃভূমির মূল্য উপলব্ধি করেনি। আহলে ইলম এবং বুজুর্গদের কদর বোঝেনি।'

অদম্য স্পৃহা এবং উচ্চাভিলাষ

নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও বুখারি-মুসলিম রহ.-এর শায়খ উবাইদ বিন ইয়াঈশ আল-কুফি আল-আত্তার থেকে খতিবে বাগদাদি রহ. বর্ণনা করেন, তিনি নিজের সম্পর্কে বলেন : 'ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমি রাতের বেলায় নিজহাতে আহার করিনি। আমি হাদিস লেখায় মগ্ন থাকতাম আর আমার বোন আমাকে খাইয়ে দিতেন।' অর্থাৎ দিনের বেলায় শায়খদের সান্নিধ্যে হাদিসগ্রহণে মগ্ন থাকার কারণে ওই সময় লেখার সুযোগ হতো না।

শায়খ তুনবুকতি রহ. রচিত نيل الابتهاج গ্রন্থে[১৬৩] ইমাম শরিফুদ্দীন আত-তিলিমসানির[১৬৪] বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে, 'একবার তিনি আবু যাইদ ইবনুল ইমাম রহ.-এর তাফসিরের দরসে উপস্থিত হন। দরসে তিনি জান্নাতের সুখ ও নেয়ামত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। তখন শরিফুদ্দীন (সে সময় তিনি ছিলেন বালক) শায়খকে জিজ্ঞেস করেন, জান্নাতে কি ইলমচর্চা থাকবে? তখন শায়খ জান্নাতের অপার ও অশেষ সুখের চিন্তা করে উত্তর দেন, হ্যাঁ..! মনোলোভী এবং নয়নপ্রীতিকর সবকিছুই সেখানে থাকবে। তখন তিনি বলেন, আপনি যদি 'না' বলতেন, তবে আমি বলতাম, জান্নাতে সুখ বলতে কিছু নেই। শিশু শরিফুদ্দীনের এ কথা শুনে শায়খ অবাক হলেন এবং একমত পোষণ করলেন।'

ইলম অন্বেষণে উচ্চাভিলাষী এবং তীব্র প্রয়াসী এ মহাপুরুষ সম্পর্কে তাঁর এক সহপাঠী বলেন, 'তাঁর সঙ্গে চার মাস কাটিয়েছি, কখনো জামা বা পাগড়ি খুলতে দেখিনি। সব সময় তিনি পাঠ ও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ঘুম প্রবল হয়ে গেলে সামান্য ঘুমিয়ে নিতেন। কিছুক্ষণ পর জেগে উঠে বলতেন, নফসের হক আদায় হয়ে গেছে। এরপর অজু করে (অজু ছিল তার সব সময়ের অভ্যাস) দ্রুত পাঠে বা শিক্ষাদানে লেগে যেতেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগারো।'

নিজ শায়খের সঙ্গেও এ শিশু মনীষীর একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত আছে। তুনবুকতি রহ. আরও[১৬৫] বলেন, 'একবার তিনি তাঁর শায়খের সাথে একটি হাদিস নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তাদের মাঝে পাল্টাপাল্টি প্রশ্নোত্তর চলছিল।

---

[১৬৩] ৪৩৩ পৃষ্ঠা

[১৬৪] ৭১০-৭৭১ হি.

[১৬৫] نيل الابتهاج : ৪৩৫ পৃষ্ঠা

শেষ পর্যন্ত ছাত্র বিজয়ী হয়ে গেলে শায়খ তার উদ্দেশে কবিতা আবৃত্তি করে বললেন,

أعلِّمه الرماية كلَّ يوم ☆ فلما اسْتَدَّ ساعده رماني

وكم علَّمته نظم القوافي ☆ فلما قال قافية هجاني

অর্থ : প্রতিদিন আমি তাকে তির নিক্ষেপ করার কৌশল শেখাচ্ছি, যখনই তিরন্দাজিতে সে পারদর্শী হলো, সবার আগে আমার দিকেই তির ছুড়ল। কতবার তাকে কবিতা রচনা শিখিয়েছি, যখনই কবিতা বলা শিখল, সবার আগে আমারই কুৎসা করল।

তার জীবনবৃত্তান্তে আছে অনেক মূল্যবান শিক্ষা। ইলমের প্রতি পরম ভালোবাসা পোষণ করতেন তিনি। ইলম অর্জনে তাঁর ছিল সীমাহীন অভিপ্রায় এবং প্রচণ্ড উদ্দীপনা। সমসাময়িক আলিমগণ তাঁকে 'ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত' বলেছেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাঁর জীবনচরিত পাঠ করা উচিত।

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আল-খাযির হুসাইন রহ. উল্লেখ[১৬৬] করেন : আবু সালেহ আইয়ুব বিন সুলাইমান পুরো العروض কিতাবটি এক জায়গায় অবস্থান করে মুখস্থ করেন। অল্প বয়সে ইলম অর্জনে এত অধিক পরিমাণে মনোনিবেশের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, একবার আমি একদল লোকের কাছে উপস্থিত হলাম, তারা পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ে আলাপরত ছিল। আমার অপমানবোধ হলো যে ইলমি ও উপকারী কোনো বিষয় আমি তাদের সামনে বলতে পারছি না।

সাখাভি রহ. তাঁর শায়খ ইবনে হাজার রহ. থেকে[১৬৭] বর্ণনা করে বলেন : শুরুতে কবিতা রচনা করতাম আমি। কিন্তু العروض গ্রন্থটি তেমন বুঝতাম না। এক লোক আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে العروض-এর ভূমিকাটি একজন অপর জনকে মুখস্থ পাঠ করে শোনাবে। আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এর জন্য দিনকাল নির্দিষ্ট করি। তৎক্ষণাৎ মিসরের আমর ইবনুল আস রা. মসজিদের দিকে রওনা হয়ে যাই। এরপর কায়রোর আল-আযহারে বন্ধু 'বদর আল-বাশতাকি'র সঙ্গে গিয়ে মিলিত হই। তাকে ওই কিতাবের ভূমিকাটি সহজে কোথায় পাওয়া যাবে জিজ্ঞেস করলে তিনি ইঙ্গিত করে কিতাবটি দেখিয়ে দেন। আমি কিতাবটি হাতে নিয়ে এক বৈঠকে কিছুটা পাঠ করে নিই। তার কাছ থেকে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য-

---

[১৬৬] رسائل الإصلاح : ১/৯৯

[১৬৭] الجواهر والدرر : ১/১৩৯

উপাত্ত জেনে নিই। এরপর ফিরে এসে চ্যালেঞ্জকারীকে ভূমিকার আগাগোড়া মুখস্থ শুনিয়ে দিই। তারপর অবশিষ্ট গ্রন্থের ব্যাপারে আর চ্যালেঞ্জ করিনি।'

তিনি বলেন, শায়খ ইবনে হাজার রহ. ইলম অর্জনের প্রতি ছিলেন ভীষণ আসক্ত, দুর্লভ ও আশ্চর্য চেতনার অধিকারী। যার ফলে তিনি ইলমের শিখরে আরোহণ করেন। তাঁর উক্তি ও অভিমত সকলের কাছে নির্দ্বিধায় গৃহীত। তীক্ষ্ণ মেধা এবং অভাবনীয় স্মরণশক্তির অধিকারী হওয়ায় কেউ তাঁর মতামত উপেক্ষা করতে পারত না। কবির নিম্নোক্ত কবিতাটি তার ক্ষেত্রেই বেশি উপযুক্ত মনে হয়–

وكان من العلوم بحيث يُقْضَى ☆ له في كل علم بالجميع

অর্থ : সকল বিদ্যায় তার পাণ্ডিত্য এত যে সকল বিষয়ে সবাই তাঁরই শরণাপন্ন হয়।

সুবকি রহ.-এর রচিত طبقات -এর তা'লিকের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, 'খসরুশাহি রহ.-ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ.-এর মহত্ত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তিনি এবং তার সকল সহপাঠী একদিন বরফঢাকা সকাল যাপন করেন। বেশি পরিমাণে তুষারপাতের কারণে রাস্তাঘাটে বের হওয়াই ছিল কষ্টকর। বাদল ও মেঘে ঢাকা ছিল পুরো শহর। উঁচু-নিচু সব জমি ছিল পানিতে পূর্ণ। এ দুর্যোগময় এবং বৈরী আবহ তাদের ইলম অন্বেষণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। পুরো শহর পানিতে থইথই; তারপরও শায়খের কাছ থেকে ইলম সংগ্রহে তারা সামান্য পিছপা হননি। সূর্য মেঘের আড়ালে চলে গেলেও শায়খের বাণী শোনা থেকে তাদের আড়াল করতে পারেনি এ বৈরী আবহ।

সবাই শায়খের বাড়ির আঙিনায় এসে দাঁড়িয়ে যান। বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে সবাই মাথায় পিচ্ছিল কাপড় পরে নেন। المحصول গ্রন্থ খুলে শায়খের সামনে এক জন এক জন করে পাঠ করতে থাকেন। শায়খ তাঁর ইচ্ছেমতো কারও কারও পাঠ জানালার ছোট্ট ফাঁক দিয়ে শুনে নেন। কারও কারও সাড়া দেন; আবার অনেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে নেন, শায়খ কোনো সাড়া দেন না। এভাবেই তিনি তাদের ইলমের আদাব এবং ইলমের অফুরন্ত মর্যাদার শিক্ষা দেন। বুঝিয়ে দেন, ইলম সব সময় উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ হয়; যদিও অনেক ভণ্ড শিক্ষার্থী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপদাপদে ঝাঁপ দিয়ে মনে করে, তাদের এ কীর্তি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

সুবচন এবং ব্যক্তিত্বগঠনে তার প্রভাব

ইলম অন্বেষণে উচ্চাকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা এক বা দুই অধ্যায়ে বর্ণনা করে শেষ করার মতো নয়। সে জন্য দরকার দীর্ঘ আলোচনা। সেগুলো হলো এমন সব দুঃসাধ্য, অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনা, মানুষের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা যা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি। বেশি লম্বা আলোচনা করব না।

প্রথমত পাঠককে তরুণ মনীষী সানাদ বিন আলির ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। এরপর শাফেঈ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আবু বকর আবদুল্লাহ বিন আহমদ আল-মারওয়াযি আল-কাফফাল আস-সাগিরের[১৬৮] কাহিনি বলব; সেটি معجم البلدان গ্রন্থ থেকে ইয়াকুতের বর্ণনামতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব,

ইয়াকুত রহ. বলেন : মরওয়াশাহজান নগরীর দিকে আব্দুর রহমান বিন আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আবু বকর আল-কাফফাল আল-মারওয়াযির সম্বন্ধ করা হয়। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম এবং খ্যাতিমান ফকিহ। মানুষের মাঝে আলিম হিসেবে আবির্ভূত হয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেন। চতুর্দিকে তার ইলমি প্রতিভার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন শাফেঈ মাযহাবের অন্যতম বড়ো আলিম। অসংখ্য মানুষ এবং অনেক জনগোষ্ঠী তাঁর দরস থেকে উপকৃত হয়েছে। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, তিনি তার ইলমি জীবনের সূচনা করেছিলেন চল্লিশ বছর বয়স থেকে।

মারওয়ায় অবস্থিত 'কানিন' এলাকার কয়েক জন ফকিহ আমাকে বলেছেন, আল-কাফফাল শাশি (একজন প্রকৌশলী হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন; ইমাম ও মুহাদ্দিস হিসেবে নয়) ছিলেন বিখ্যাত তালাচাবি-নির্মাতা। একবার তিনি এক দানিক পরিমাণ ওজনের তালাচাবি নির্মাণ করেন। (এক দানিক হলো এক দিরহামের ছয় ভাগের এক ভাগ অথবা আটটি মাঝারি ধরনের যবের দানার ওজনের পরিমাণ)। তা দেখে মানুষ অবাক ও আশ্চর্য হয়ে যায়। চতুর্দিকে তার সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তা শুনে অপর তালাচাবি নির্মাতা আবু বকর দানিকের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ওজনের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তালাচাবি তৈরি করে মানুষের সামনে প্রকাশ করেন। মানুষ সেটিকে পছন্দ করলেও শাশির মতো ততটা সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়ায়নি তার। একদিন তিনি তার এক বন্ধুকে বলেন, দেখো...একেই বলে ভাগ্য, এরই নাম কপাল! শাশি এক দানিক ওজনের তালাচাবি তৈরি করায় মানুষ তাকে মাথায় তুলে নিয়েছে। আর আমি, দানিকের

---

[১৬৮] মৃত্যু : ৯০ বছর বয়সে ৪১৭ হিজরিতে।

এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ ওজনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তালা-চাবি আবিষ্কার করেছি; কিন্তু কেউ আমাকে স্মরণ করছে না। উত্তরে বন্ধুটি বলে, আরে...প্রশংসা স্তুতি ও মূল্যায়ন তো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে, তালার কারণে নয়![১৬৯]

---

[১৬৯] চিন্তা করুন, আমাদের মুসলিম মনীষীগণ আবিষ্কার ও প্রকৌশলবিদ্যায় কেমন পারদর্শী ছিলেন। মনে সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগতে পারে দু-দুটি লোহার পদার্থ দিয়ে এ সামান্য ওজনের তালা-চাবি নির্মাণ করা মানুষের পক্ষে কী করে সম্ভব?!

আমি আপনাদের কাছে এরচেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক একটি ঘটনা বলি : আমি তখন আলেপ্পোর একটি জামিয়ার শরয়ি বিভাগের সানুবিয়্যা দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মুহূর্তটি ছিল ক্লাসের। ফিকহে হানাফির বিশিষ্ট উস্তাদ ফকিহ শায়খ মুহাম্মদ আস-সালকিনি রহ. ছিলেন সময়ের প্রতি ভীষণ মনোযোগী। ছাত্রদের আসার আগেই তিনি ক্লাসে উপস্থিত হয়ে যেতেন। একদিন ক্লাসে আসতে দেরি হয়ে যায় শায়খের। আমরা শায়খের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি শায়খ 'গুরফাতুল আসাতিযাহ'-এর দিক থেকে দ্রুত হেঁটে আসছেন। ক্লাসে ঢুকে শুরুতেই বিলম্বের কারণে দুঃখ প্রকাশ করেন। এরপর বলেন : মাদরাসায় একজন মেহমান এসেছেন। মেহমানখানায় আমাদের সঙ্গেই তিনি বসা ছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়ে শায়খ আবদুর রহমান যাইনুল আবেদীনের ওপর; ইবতেদায়ি শ্রেণির কিছু ছাত্র তাঁর পাশে জড়ো ছিল। এ দৃশ্য দেখে তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করেন : এ শায়খ এখানে কী করছেন? আমরা বলি, তিনি নাহুর দরস দেন এখানে। এ কথা শুনে তিনি বেদনায় আক্রান্ত ব্যক্তির মতো মাথা নাড়াতে থাকেন। এত সাধারণ সাবজেক্টে তিনি দরস দিচ্ছেন বিষয়টি কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি বলতে থাকেন, তাঁর মতো বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক সাধারণ ইলমে নাহু পড়াবে, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আমরা বলি, হ্যাঁ... তিনি অনেক বিষয়ে পারদর্শী আমরা জানি; আচ্ছা, তিনি কি আশ্চর্য কিছু আবিষ্কার করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, এ লোক একটি সুইকে লম্বালম্বিভাবে ছেদ করতে পারে।' —এ পর্যন্ত বলে শায়খ তাঁর ফিকহি দরস শুরু করেন।

কিছুদিন পর আমি শায়খ আবদুর রহমান যাইনুল আবেদীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁর বাড়িতে যাই ইশার নামাজের পর। তিনি যথারীতি আমাকে ইস্তেকবাল করেন; যেমন ছাত্র, বন্ধুবান্ধব বা অন্য সবার বেলায় করে থাকেন।

এরপর শায়খ আমাকে ঘটনার আগাগোড়া শোনানো শুরু করেন। বলতে থাকেন, একবার একটি ম্যাগাজিনে একজন মার্কিন এবং একজন জার্মান লোকের মধ্যকার একটি কথোপকথন পড়েছিলাম। তাদের একজন একটি সুই লম্বালম্বিভাবে ছেদ করার দাবি করছিল। প্রথমজন যে ক্ষুদ্র নিব দিয়ে সুই ছেদ করেছিল দ্বিতীয় জন সেই নিবটিকেই লম্বালম্বিভাবে ছেদ করে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ করেছিল। কথোপকথনটি পাঠ করার পর আমার পাশে বসে থাকা বন্ধুকে আমি বলি, আমি যদি তাদের মাঝে

এ ঘটনার পর থেকে তিনি ইলম অন্বেষণের পথ বেছে নেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। এরপর তিনি মারওয়ার এক শায়খের কাছে এসে তার আগ্রহ-অভিলাষের কথা জানান। শায়খ তাকে ইমাম মুযানি রহ.-এর রচিত গ্রন্থের প্রথম লাইনটি هذا كتاب اختصرته মুখস্থ করতে বলেন। ঘরের ছাদে গিয়ে ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত এই তিনটি শব্দই তিনি উচ্চ আওয়াজে পড়তে থাকেন। একপর্যায়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে যান। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখেন তার কিছুই মনে নেই। সব ভুলে গেছেন তিনি। মন ভেঙে যায় তার। নিজেকে তিরস্কার করতে থাকেন, শায়খের কাছে কী জওয়াব দেব আমি?'

বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন।

এরপর এক প্রতিবেশীর স্ত্রী তার উদ্দেশে বলতে থাকে : হে আবু বকর, গতরাতে তোমার هذا كتاب اختصرته বলার আওয়াজে আমরা ঘুমোতে পরিনি। এ কথা শুনে তার পাঠ স্মরণ হয়ে যায়। শায়খের কাছে এসে ঘটনা

উপস্থিত থাকতাম, তবে দ্বিতীয়জন যে নিবটি দিয়ে প্রথম জনের নিবকে লম্বালম্বি ভাবে ছেদ করেছে, তাদের সামনে আমি সেটিকেও ছেদ করে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতাম। এ কথা শুনে ওই বন্ধুটি বলে উঠে, কী বলছেন শায়খ আপনি? শায়খ বলেন, তুমি কি বিশ্বাস করছ না? এসো আমার সাথে! হাত ধরে বন্ধুকে তিনি তাঁর বিশেষ কামরায় নিয়ে যান; যেখানে বিভিন্ন ম্যাকানিক্যাল যন্ত্র এবং প্রকৌশল-সামগ্রী রাখা ছিল। শায়খ বলেন, এরপর আমি একটি সুই নিয়ে তা ছেদ করার জন্য একটি ক্ষুদ্র নিব তৈরি করি। এরপর দ্বিতীয় আরেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিব তৈরি করে সেটি দিয়ে প্রথম নিবটি লম্বালম্বিভাবে ছেদ করি। এরপর তৃতীয় আরেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিব তৈরি করে সেটি দিয়ে দ্বিতীয় নিবটিও ছেদ করি। বন্ধু কিছুতেই এ দৃশ্য বিশ্বাস করতে পারছিল না।

পরদিন ওই লোক যার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করছিল, তাকেই শায়খের আশ্চর্য আবিষ্কার ও কীর্তির ঘটনা খুলে বলছিল। শায়খ বলেন, পরদিন ঠিক একই সময়ে কে যেন আমার বাড়ির দরজায় নক করে। দরজা খুলে দেখি গতকালের সেই বন্ধুটি আরেকজন লোককে নিয়ে হাজির। উত্তেজিত এবং অত্যন্ত আবেগীকণ্ঠে বলছিল, শায়খ প্লিজ প্লিজ গতকাল আমাকে যা করে দেখিয়েছেন, তা এই লোকের সামনে আজ একটু করে দেখান! আমার এবং এই লোকের মাঝে এক শ লিরা (সিরীয় মুদ্রা) বাজি ধরা হয়েছিল; আর এখন সে এক লাখ লিরার ওপর বাজি ধরেছে। শায়খ বলেন, এরপর তাদের নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ নতুন করে আবার সেই কাজটি তাদের করে দেখাই।

এ তো বায়ান্ন বছর আগের ঘটনা। তিনি ছিলেন সর্ববিষয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। আশ্চর্যকর-সব সৃষ্টি উপহার দেওয়াই যেন তার শখ ছিল। তিনি জন্মেছিলেন ১৩২৬ হিজরিতে আর মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৪১১ হিজরিতে। রাহমাতুল্লাহি আলাইহি...।

সম্পর্কে তাকে অবহিত করলে শায়খ তাকে এই বলে উপদেশ দেন : ইলম অন্বেষণের কারণে তুমি তোমার পেশা ছেড়ে দিয়ো না! এ দুটো একসঙ্গে করলে কিছুদিন পর অভ্যাস হয়ে যাবে। এরপর তিনি ইলম অন্বেষণের পাশাপাশি পেশাগত দায়িত্বও পালন করতে থাকেন যথাযথভাবে। আশি বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। চল্লিশ বছর মূর্খ অবস্থায় আর বাকি চল্লিশ আলিম অবস্থায়। ইয়াকুত রহ. সামআনি রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ৯০ বছর আয়ু লাভ করে ৪১৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
ইলম অর্জনে বিখ্যাত এ মুসলিম মনীষীর সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণেই চল্লিশ বছর বয়সেও তিনি ইলম অন্বেষণে মগ্ন হয়ে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। অথচ একসময় তিনি কোনটা গায়েবের জমির আর কোনটা হাজিরের জমির সেটাই পার্থক্য করতে পারতেন না। اختصرتُ এর স্থলে اختصرتَ পড়তেন।
আমি বলি, উপরিউক্ত ঘটনায় তালিবুল ইলম এবং উস্তাদের মধ্যকার সুন্দর ও সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। এখানে তিনি সুবচন বা উৎকৃষ্ট কথামালা দিয়ে শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিচ্ছেন। পড়াশুনার পাশাপাশি পেশাদারিত্ব চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি খুরাসান অঞ্চলের বিখ্যাত আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান এবং হাফেজুল হাদিস। ছিলেন তাকওয়া ও আল্লাহভীরুতায় আদর্শ। পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও বহু ইমাম এবং জগদ্বিখ্যাত আলিমের জন্ম হয়। সমকালে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ আলিম দ্বিতীয় জন ছিলেন না। আমরা তাঁকে বলতাম, এ তো মানুষবেশী এক পবিত্র ফেরেশতা।'
এ রকম সুবচন ও উৎকৃষ্ট উপদেশদানের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এরচেয়ে বড়ো ও সুমহান আরও কিছু উদাহরণ ও সুবচনের দৃষ্টান্ত মনে পড়ে গেল।
মুওয়াফফাক মাক্কি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন, 'একদিন আমি ইমাম শা'বির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বসা ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি তার কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কার কার কাছে যাও? আমি বলি, বাজারের লোকদের কাছে! আমার উস্তাদের নামও তাকে বলি। তিনি বলেন, বাজারে গমনের বিষয়ে নয়; বরং আলিমদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। আমি বলি, আলিমদের কাছে আমি কমই যাই। তিনি বলেন, কখনো উদাসীন হবে না; ইলম ও আহলে ইলমের সংশ্রবে থাকার চেষ্টা করবে সব সময়। আমি তোমার ভেতরে

প্রতিভার বিস্ফোরণ লক্ষ করছি। মেধা ও মননশীলতা বিকাশের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাচ্ছি তোমার মাঝে।'

আবু হানিফা রহ. বলেন, তাঁর এ কথাগুলো আমার অন্তরে প্রচণ্ডরকম বিঁধে যায়। ফলে গতানুগতিক আনাগোনা বর্জন করে খাঁটি ইলম অন্বেষণে মনোনিবেশ করি আমি। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর সুবচনের দ্বারা আমাকে উপকৃত করেন।'[১৭০]

ইমাম বায়হাকি রহ. রবি বিন সুলাইমানের উক্তি বর্ণনা করেন, 'আমি ইমাম শাফেঈকে বলতে শুনি, সুবচন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শিখতে মক্কা নগরী থেকে বের হয়ে আমি গ্রামের হুযাইল গোত্রের সংশ্রবে চলে যাই। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করি। সে সময় আমি তাদের সঙ্গেই খেতাম। তাদের সঙ্গেই চলাফেরা করতাম। মক্কায় ফিরে আসার পর প্রায়ই আমি কবিতা আবৃত্তি করতাম। হুযাইল গোত্রের সঙ্গে কাটানো দিনগুলোর স্মৃতি লোকদের কাছে বলে বেড়াতাম। একবার যাহরা এলাকার এক ব্যক্তি আমাকে লক্ষ্য করে বলে, ইলম ও ফিকহের মধ্যে এ রকম অলংকরণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ-বাক্য সংযোজন মনে হয় অনুচিত। আমি বলি, সে রকম আহলে ইলম কি এখনো আছে? সে বলে, হ্যাঁ... আছে, মালেক বিন আনাস! তার এ কথাটি আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এরপর মক্কার এক লোকের কাছ থেকে মুয়াত্তা মালিক ধার করে দ্রুত তা মুখস্থ করে নিই।'[১৭১]

লক্ষ করুন তাঁর সুবচন এবং উৎকৃষ্ট সম্বোধনের প্রতি। দেখুন ইলম অর্জনে মনীষীদের উন্নত আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের উচ্চাভিলাষের নমুনা। উপরিউক্ত ঘটনা দুটোতে ইমাম শা'বি এবং ইমাম যুহরি এক ছত্রের বেশি বলেননি। আর সেই এক ছত্রের দ্বারাই ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফেঈর মতো খ্যাতিমান ও বিদগ্ধ আলিমে দ্বীন তৈরি হয়েছে, যাদের ইলম ও গবেষণা থেকে বিশ্বের মানুষ আজ উপকৃত হচ্ছে; কেয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হবে। আমি বলি, এসব সুবচন ও উপদেশমালা প্রয়োগ হয়েছে সঠিক জায়গায়। সৃষ্টি করেছে অদম্য স্পৃহা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তা ছাড়া উপদেশগুলো বেরিয়েছিল স্বচ্ছ ও পবিত্র আত্মার লোকদের মুখ থেকে। এ রকম ভীষণ প্রভাব সৃষ্টির পেছনে এটাই ছিল মূল কারণ।

ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ এবং মুসলমানদের সকল হকপন্থী ইমামের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। তাদের মেহনত-মুজাহাদা কবুল করুন। সুবচনের জন্য ইমাম শা'বি এবং ইমাম যুহরি রহ.-কে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাদের সুবচনের কারণেই তো আজ এ মহাকল্যাণ সাধিত হয়েছে।

---

[১৭০] مناقب أبي حنيفة : ৫৪

[১৭১] مناقب الشافعي : ১/১০২

প্রতিটি মুসলমানকে এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব সময় কল্যাণ ও মনোবল বৃদ্ধিকারী বচন ব্যবহার করা উচিত। মনোবল ভেঙে দেয়, সংকল্প বিনষ্ট করে দেয় এমন-সব বাকপ্রয়োগ পরিহার করা উচিত।

পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসছি। এরই মধ্যে বিপদ ও দুর্দশার মুহূর্তেও ইলম অন্বেষণে মনীষীদের উচ্চাভিলাষের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করেছি। আরও কিছু ঘটনা উল্লেখের প্রয়োজন মনে করছি।

ইমাম তিরমিজি রহ. আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, একবার নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা বিন যায়েদের কাঁধে ভর করে ঘর থেকে বের হন। তাঁর গায়ে ছিল একটি ইয়েমেনি লাল ডোরাকাটা মোটা সুতি চাদর। এটি পরেই তিনি নামাজের ইমামতি করেন।[১৭২]

আবদ বিন হুমাইদ বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল ফাজল বলেছেন, ইয়াহইয়া বিন মুঈন আমার দরসে বসে সর্বপ্রথম এ হাদিসটি সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে আমি বলি, হাদিসটি হাম্মাদ বিন সালামা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তা শুনে ইয়াহইয়া বলেন, কিতাব দেখে বললে ভালো হতো! এরপর আমি কিতাব বের করার জন্য উঠব, এমন সময় তিনি আমার জামা টেনে ধরে বলেন, হাদিসটি আমাকে লিখে দিন; আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না-ও হতে পারে। এরপর আমি তা লিখে দিই। এরপর কিতাব বের করেও সেটি তাকে পড়ে শুনাই।

উপরিউক্ত আছারের ব্যাখ্যাকার ইমাম ফকিহ আল-বাজুরি রহ. বলেন : মানুষের জীবনে এক মুহূর্তেরও কোনো নিশ্চয়তা নেই। বেঁচে থাকার কোনো ভরসা নেই। জীবন তো একটি ধারালো তরবারির মতো। যেন চোখের পলকে প্রবাহিত এক বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। তা ছাড়া এখানে ইলম অর্জনের উৎকৃষ্ট উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। আশার বাণী শোনানো হয়েছে। সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

খতিবে বাগদাদি রহ. এ ব্যাপারে দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একটি সুফিয়ান সাওরি রহ. থেকে। অপরটি ইয়াহইয়া বিন মুঈন থেকে।

প্রথম ঘটনা

মুহাম্মদ ইবনে কাসির আল-আবাদি রহ. বলেন : একবার সুফিয়ান সাওরি রহ. বসরা নগরীতে এসে হাম্মাদ বিন সালামাকে দেখে বলেন, আবুল উশারার–

لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك.

---

১৭২ الشمائل المحمدية : ৫৯

শিরোনামে বর্ণিত হাদিসটি আমাকে বলুন। হাম্মাদ বলেন, আবুল উশারা তার পিতা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে...(এভাবে হাদিসটি বলে শেষ করেন)। এরপর সুফিয়ান সাওরি উঠে এসে তাঁকে আলিঙ্গন করেন। হাম্মাদ জিজ্ঞেস করেন, কে আপনি? বলেন, আমি সুফিয়ান। জিজ্ঞেস করেন, ইবনে সাইদ? বলেন, হ্যাঁ..! বলেন, সাওরি! বলেন, হ্যাঁ..! বলেন, আবু আবদুল্লাহ! বলেন, হ্যাঁ..! এরপর মুহাম্মদ রহ. বলেন, হাদিস জিজ্ঞেস করার আগে সালাম দিয়ে পরিচিত হয়ে নিলেই তো পারতেন! তখন সুফিয়ান বলেন, আমি আশঙ্কা করেছিলাম হাদিসটি শোনানোর আগেই যদি মৃত্যু এসে যায় আপনার!'[১৭৩]

দ্বিতীয় ঘটনা

আবু জাফর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আন-নুফাইলি রহ. বলেন, একবার আহমদ বিন হাম্বল এবং ইয়াহইয়া বিন মুঈন উভয়ে আমার কাছে আসেন। এরপর ইয়াহইয়া আমাকে আলিঙ্গন করে জিজ্ঞেস করেন : হে আবু জাফর, আতা রহ. থেকে বর্ণিত 'হায়েজের সর্বনিম্ন সময়সীমা একদিন' শিরোনামের হাদিসটি আপনি মা'কাল বিন উবাইদুল্লাহর কাছে কি পড়েছেন? তখন আবু আবদুল্লাহ (আহমদ বিন হাম্বল) বলেন, আগে বসে নিন! উত্তরে ইয়াহইয়া বিন মুঈন নুফাইলিকে বলেন, যদি হাদিসটি শোনার পূর্বেই আপনি মারা যান বা দুনিয়া ত্যাগ করেন?![১৭৪]

হাকিম আবু আবদুল্লাহ রহ. তাঁর বিখ্যাত معرفة علوم الحديث কিতাবের সমাপ্তি টানেন ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ থেকে বর্ণিত একটি ঘটনার মাধ্যমে। ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো– বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালিদ বলেন, শু'বা বাগদাদে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলতে থাকেন, আপনার সাক্ষাৎ না পেলে আমি মরে যেতাম। আপনার কাছে কি বাহির বিন সাইদের কিতাব আছে? আমি বলি, না। তিনি বলেন, তবে ফিরে এসে তা লিখে শেষ করে আমাকে দিয়ে দেবেন!'

এখানে শু'বার উক্তিটি লক্ষ করুন, 'আপনার সাক্ষাৎ না পেলে আমি মরে যেতাম।'

খতিবে বাগদাদি রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে ইমাম বুখারি রহ.-এর জীবনবৃত্তান্তে তার ব্যক্তিগত লেখক মুহাম্মদ বিন আবু হাতিম থেকে বর্ণনা করেন, সফরে প্রায় সময় আমরা এক রুমে ঘুমোতে যেতাম (সব সময়ে সাথে থাকাই তো প্রাইভেট লেখকের কাজ)। গরম বেশি হলে অবশ্য এর ব্যত্যয় ঘটত। দেখতাম একরাতে তিনি বিশ থেকে পঁচিশ বার জাগতেন। প্রদীপে আলো

---

[১৭৩] الجامع للخطيب : ১৬০২ - ১৬০৩

[১৭৪] الجامع للخطيب : ১৬০২ - ১৬০৩

জ্বালাতেন। এরপর হাদিসের পাতা বের করে তাতে টীকা যোগ করতেন। এরপর আবার বিছানায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে যেতেন। সব সময় আমাকে জাগাতেন না। আমি বলতাম, আপনি নিজে এতসব কাজ করছেন! আমাকে জাগিয়ে দিলেই তো পারেন! উত্তরে তিনি বলতেন, তুমি তো তরুণ; আমি তোমার কাঁচা ঘুম নষ্ট করতে চাই না!'[১৭৫]

পরের পৃষ্ঠায় তিনি ইমাম বুখারির বিশিষ্ট ছাত্র মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল-ফিরাবরি থেকে বর্ণনা করেন, 'একরাতে আমি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারির ঘরে ছিলাম। গুনে দেখি, তিনি আঠারো বার ঘুম থেকে উঠেছেন। বাতি জ্বেলে কী যেন পড়েছেন। সংযোজনের কাজ করেছেন।'

আবু নুআইম ইমাম শাফেঈ রহ.-এর বোন থেকে বর্ণনা করেন : কোনো কোনো রাতে প্রায় ত্রিশ বার ওঠে আমি শাফেঈকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসতাম। তিনি শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতেন, গবেষণা চালিয়ে যেতেন। এরপর ডেকে বলতেন, প্রদীপ নিয়ে এসো! প্রদীপ নিয়ে আসা হলে তিনি যা লেখার লিখে নিতেন। এরপর বলতেন, প্রদীপ নিয়ে যাও!' বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞেস করা হয়, প্রদীপ ফিরিয়ে দিতেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন, অন্ধকারই অন্তরের জন্য অধিক জ্যোতির্ময়।[১৭৬]

আবু হিলাল আল-আসকারি রহ. বলেন, 'রবি বিন সুলাইমান ইমাম শাফেঈর কন্যা ফাতেমা থেকে বর্ণনা করেন, একরাতে আমি আব্বুর জন্য সত্তর বার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিই। শাফেঈ রহ. বলতেন, আঁধার হৃদয়ের জন্য অধিক জ্যোতির্ময়।'[১৭৭]

এসব ঘটনার মধ্যে আরও একটি তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। তারা রাতের নামাজ ও তাহাজ্জুদকে নিজেদের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। রাতের একটি বিরাট অংশ তাঁরা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কাটাতেন। সাধারণত রাত লম্বা হলেও ঘুমের কারণে তা ছোটোই মনে হয়। কিন্তু এই ছোট্ট সময়টিকেও তাঁরা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতেন না। ফায়দা হাসিলের জন্যে উঠে-পড়ে লাগতেন। সাধনা ও অধ্যবসায়ে মগ্ন হতেন। কারণ, জ্ঞান তো বিশ্রাম অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

এ সকল ইমাম ও মনীষীর কীর্তিকলাপ এবং তাঁদের জীবনকথা স্মরণ করলে সত্যিই একটি কবিতা মনে পড়ে যায় :

---

[১৭৫] التاريخ : ২/৩২২

[১৭৬] الحلية : ৯/১০৪

[১৭৭] الحث على طلب العلم : ৭৩

بَصُرتُ بالراحة الكبرى فلم أَرَها ☆ تُنال إلا على جسر من التعبِ

অর্থ : মহাশান্তি অর্জন করতে হলে সত্যিই তা অক্লান্ত পরিশ্রমের সেতু পাড়ি দেওয়া ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়।[১৭৮]

আবু নুআইম মুহাম্মদ বিন আবদুর রহিম আল-ওয়াররাকের বৃত্তান্তে বলেন, আমি সালামা বিন শাবিবকে বলতে শুনেছি, একবার আমরা ইয়াযিদ বিন হারুনের কাছে ছিলাম। মানুষ ইলম অর্জনের জন্য তাঁর কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে একটি শিশু তাদের পায়ের নিচে পড়ে যায়। তখন ইয়াযিদ বলতে থাকেন– হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, শিশুটির দিকে তাকাও! আমরা তাকিয়ে দেখি, সে দু-চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এ কঠিন মুহূর্তেও বালকটি বলতে থাকে, হে আবু খালেদ (ইয়াযিদ বিন হারুনের ডাকনাম)! আমাদের কাছে আরও ইলম বর্ণনা করুন! বালকের এ কথা শুনে ইয়াযিদ বলে ওঠেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! হে হাদিসপাগল জাতি, কী মহা মসিবতে পড়েছ তোমরা! ছোট্ট এ শিশু আহত হয়েও আরও বেশি ইলম লাভ করার আবেদন জানাচ্ছে!![১৭৯]

উপর্যুক্ত ঘটনাতে মন্তব্য যোগ করে আমি বলব : এ শিশুটি একদিকে মায়ের দুধ পান করেছে অপর দিকে হাদিস অন্বেষণে মনোনিবেশ করেছে। ফলে অল্প বয়সেই ইলম অর্জনের প্রতি তার সীমাহীন আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এ বাল্যবয়সেই ইলমের মাধুর্য ও মিষ্টতা উপভোগ করেছে। এ কারণেই মানুষের পায়ের নিচে চাপা পড়েও সে ইলম অর্জনের আগ্রহপ্রকাশে বিচলিত হয়নি। অপর দিকে যে ব্যক্তি বিশ্রাম ও আরামের সঙ্গে ইলম অন্বেষণ করতে চায়, ইলমের প্রতি তার আসক্তি প্রকাশ পেলেও তা অন্বেষণে সে অলস বা মৃতপ্রায়! কস্মিনকালেও এভাবে সে ইলম অর্জন করতে পারবে না।

ইমাম আবু সা‘দ সুমআনি রহ. বলেন, আমাদের অনেক পূর্বসূরি কাগজের অভাবে বা তাৎক্ষণিক লেখনীর সুযোগ না থাকায় চামড়া, কাঠের টুকরো, বালি, জুতো, হাতের তালু ইত্যাদির ওপর লিখে ফেলতেন। সেসব ঘটনা আমি أدب الطالب গ্রন্থে সনদ সহকারে উল্লেখ করেছি। আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ সেখানেই তা পড়ে নেবেন।

---

[১৭৮] কবিতাটি আবু তামিমের রচিত; আম্মুরিয়া বিজয় উপলক্ষ্যে মু‘তাসিম বিল্লাহর উদ্দেশে কবিতাটি তিনি রচনা করেছিলেন।

[১৭৯] تاريخ أصبهان : ২/২২৯

কাগজের অভাবে লেখা চালিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে অবাক করা ঘটনাটি উবাইদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বিন শারিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ইলমের মজলিশে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে ছিল মানুষের উপচেপড়া ভিড়। মজলিশ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর পিঠে চুলকানি-জাতীয় কিছু একটা অনুভব করলাম। এরপর আমি মজলিশ থেকে উঠতে চাইলে পেছনে বসা লোকটি আমাকে ধরে বসিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো ভাই? বলল, আপনি বসুন, আজকের দরস আমি আপনার পিঠে লিখে নিয়েছি। এটি প্রতিলিপি না করা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন।'

আমার মনে হয় না أدب الطالب গ্রন্থে ইমাম হাকিম রহ.-এর বর্ণিত[১৮০] ঘটনাটি অনুল্লেখিত হয়েছে। যার সারমর্ম নিম্নরূপ–

প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান মুহাদ্দিস, ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আলহুযালি হলেন ইমাম বুখারি রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদদের একজন। হুযালির পুত্র আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আল হুযালিও ছিলেন বড়ো মাপের মুহাদ্দিস। ছিলেন ইমামের পুত্র ইমাম।[১৮১]

ঘটনাটি হাকিম রহ. المعرفة গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন বিস্তারিতভাবে। ঘটনায় বর্ণিত সনদে এ আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদের নামও আছে। তিনি ইমাম ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমি নিশাপুরি থেকে الموطأ বর্ণনা করেছেন। এরপর হাকিম রহ. পূর্ণ সনদ ও মতনসহ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। শেষদিকে গিয়ে তিনি বলেন, আবু যাকারিয়া বলেছেন, আমি এ হাদিসটি দোকানের চাবির ওপর লিখেছিলাম, কেউ কি এ কথা বিশ্বাস করবে? অথচ সেটিই বাস্তব; কারণ, আমার সঙ্গে কোনো কাগজ ছিল না তখন।'

ইলম লিখন ও সংরক্ষণে পূর্বসূরিদের তীব্র আসক্তির আরেকটি দৃষ্টান্ত

ইমাম বুখারি রহ.-এর শায়খ মুহাম্মদ বিন সালাম আল-বাইকান্দি রহ.-এর বৃত্তান্তে যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন,[১৮২] শায়খের মজলিশ চলাকালে এক লোকের কলম ভেঙে গেলে সে মুহাম্মদ বিন সালামকে ডেকে বলে, এক দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে আমি কলম কিনতে চাই–ঘোষণা দাও! ঘোষণা শুনে মানুষ তার কাছে কলম বিক্রি করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন বিত্তশালী। পূর্ণ এক দিনার দিয়ে একটিমাত্র কলম কেনা তখন সাধারণ লোকদের জন্য ছিল সাধ্যাতীত।

---

[১৮০] তার অমূল্য গ্রন্থ أدب الإملاء والاستملاء : ৪৯০ নং অনুচ্ছেদের আগে।

[১৮১] السير للذهبي : ১২/২৭৩

[১৮২] السير للذهبي : ১০/৬২৯

এটি ইলম সংরক্ষণে তাঁর নিদারুণ আগ্রহ এবং উচ্চাভিলাষের প্রমাণ বহন করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শায়খের সামান্য বক্তব্যও যেন তার ছুটে না যায়। কখনো দিনার সাথে না থাকলে কাপড়ের ওপর লিখে নিতেন বা অন্যদের মতো সামনে বসা ব্যক্তির পিঠে লিখে সংরক্ষণ করতেন।

এ রকম আরেকটি ঘটনা

যারনুজি রহ., ঈসাম বিন ইউসুফ বলখি[১৮৩] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : উপকার হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে তাৎক্ষণিকভাবে লিখে রাখার জন্য ঈসাম বিন ইউসুফ এক দিনার দিয়ে একটি কলম ক্রয় করেছিলেন।'[১৮৪]

মাত্র একটি হাদিস গ্রহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

মাত্র একটি হাদিস গ্রহণে তাদের উচ্চাভিলাষের আলোচনা করতে গেলে অসংখ্য ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কত অবাক করা সব ভ্রমণ। দুনিয়া তাদের জন্য ছিল যেন ছোট্ট একটি ঘর। অনায়াসে এক দেশ থেকে তাঁরা অন্য দেশে ঘুরে বেড়াতেন হাদিস বা হাদিসের সনদ সংগ্রহের জন্য। খতিব বাগদাদি রহ.-এর রচিত الرحلة في طلب الحديث الواحد গ্রন্থে এ ধরনের আরও আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ আছে।

আজকাল মানুষ বলে থাকে, অত্যাধুনিক সব যোগাযোগব্যবস্থা আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী এখন একটি ছোট্ট গ্রামের মতো মনে হয়। তেমনি সে সময়েও তাঁরা বিশ্বকে একটি ছোট্ট ঘরের মতোই দেখতেন। তবে যোগাযোগব্যবস্থা সহজ হওয়ার কারণে নয়; তাদের অদম্য স্পৃহা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে। তাদের অস্তিত্বে মিশে ছিল ইলমের প্রতি সীমাহীন আগ্রহ।

শুধু নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদিস জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং পূর্বসূরিদের থেকে বর্ণিত একটি উক্তির সঠিক বর্ণনাসূত্র বা সনদের মাঝে বাদ পড়া শুধু এক জন বর্ণনাকারীর নাম সংগ্রহের জন্যও তারা এ দুঃসাধ্য সাধন করতেন।

الرحلة في طلب الحديث গ্রন্থে[১৮৫] খতিব রহ. হারুন বিন মুগিরা আল-বাজালি আর-রাযি থেকে বর্ণনা করেন, একবার আলি ইবনুল মুবারক রহ. আমার কাছে আসেন। বাহনের ওপর বসে থেকেই আমাকে তিনি হাসান বসরি রহ. থেকে বর্ণিত لا تشتر مودة ألف رجل بعداوة رجل واحد উক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস

---

[১৮৩] মৃত্যু : ২১০ কি ২১৫ হিজরি, তিনি ছিলেন আবু হানিফার ছাত্রের ছাত্র।

[১৮৪] تعليم المتعلم : ৯১

[১৮৫] পৃষ্ঠা : ১৫৬

করেন। এরপর আমি তাঁর কাছে সেটি বর্ণনা করি। তিনি বলেন, সুদূর মারওয়া থেকে শুধু এই হাদিসটি সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই আমি এখানে এসেছি।'

'রিই' এলাকাটি বর্তমান তেহরানে অবস্থিত। সেখান থেকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বাসস্থান মারওয়ার দূরত্ব প্রায় ১৫০০ কি. মি.। সেখানকার কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তি তেমনটিই বলেছেন আমাকে। আমি ইবনুল মুবারকের এই অসামান্য আগ্রহ এবং হাদিসের প্রতি প্রবল আসক্তি দেখে যারপরনাই অবাক হই।

আমি আরও বলি : হাসান বসরির ইন্তেকাল হয়েছিল ১১০ হিজরিতে। আর ইবনুল মুবারকের জন্ম ১১৮ আর মৃত্যু ১৮১ হিজরিতে। তবে অবশ্যই তাঁর ও হাসান বসরির মাঝে একজন রাবি ছিল। সেই রাবির নাম সংগ্রহের জন্যেই তিনি দীর্ঘ ১৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। আসা-যাওয়া মিলিয়ে হয়েছিল মোট ৩০০০ কিলোমিটার।

ইমাম আবু জাফর আহমদ বিন হামদান আল-হিরি নিশাপুরি[১৮৬]। তাঁর বয়স যখন সত্তরের ঊর্ধ্বে। তখন তিনি সহিহ মুসলিমের ইস্তিখরাজের কাজে হাত দেন। ইমাম মুসলিম রহ.-এর বর্ণনায় সুয়াইদ বিন সাইদের হাফস বিন মাইসারা থেকে বর্ণিত একটি হাদিস পর্যন্ত যখন পৌঁছেন, তখন ইমরান বিন মুসা থেকে সুয়াইদের বর্ণিত অপর বর্ণনাসূত্র সংগ্রহের জন্য তিনি নিশাপুর থেকে জুরজান পর্যন্ত ভ্রমণ করে ইস্তিখরাজের শর্ত পূরণ করেন।

তেমনি ইমাম মুসলিম রহ.-এর বর্ণিত আরেকটি হাদিসের উৎস খুঁজতে গিয়েও তিনি বিপাকে পড়েন। হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. মুহাম্মদ বিন আব্বাদ থেকে, তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনা থেকে, তিনি আমর বিন দিনার থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি তিনি ইবনে আব্বাদের বর্ণনাসূত্রে বহু গবেষণা করেও অন্য কারও থেকে খুঁজে পাননি। এক পর্যায়ে তিনি সংবাদ পান হাদিসটি আবু ইয়া'লা আল-মুসিলির সংগ্রহে আছে, যা ইবনে আব্বাদ থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন। সংবাদ পেয়ে মুসিলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং হাদিসের সনদ সংগ্রহ করতে তিনি মুসেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।[১৮৭]

এখানে পরিষ্কার বোঝা যায়, এ ভ্রমণকালে তার বয়স ছিল সত্তরের ঊর্ধ্বে। শুধু একটি হাদিসের সনদ সংগ্রহের জন্য এ বয়সে নিশাপুর থেকে মুসেল পর্যন্ত ভ্রমণ করা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়।

একই লক্ষ্যে তিনি জুরজানও সফর করেন। দোয়া করি, আল্লাহ তাঁর এ মেহনত কবুল করুন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

---

[১৮৬] মৃত্যু : ৩১১ হিজরি
[১৮৭] পৃষ্ঠা : ৩/১৩৫৯

হাদিসের প্রকৃত সনদ যাচাইয়ের ব্যাপারে আরেকটি ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করছি। হাদিসটি অন্য সনদে সহিহ ছিল। ইচ্ছে করলে আমি সেই হাদিসের উৎসস্থল লিখে পাঠককে সেখানে পড়ে নেওয়ার কথা বলতে পারতাম। কিন্তু শুধু সুন্নতে নববির বাস্তবায়ন এবং এর ওপর আমলের বিষয়টি স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি উল্লেখ করছি :

ইমাম মুসলিম রহ. উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقيم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة.

অর্থ : 'যে কোনো মুসলমান যদি পরিপূর্ণরূপে অজু করে দাঁড়িয়ে চেহারা ও মন লাগিয়ে একনিষ্ঠভাবে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, প্রতিদানস্বরূপ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।'[১৮৮]

ওমর রা. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরেকটু বাড়িয়ে বলেন, তোমাদের কেউ যদি পরিপূর্ণরূপে অজু করে বলে :

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

অর্থ : 'তবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।'

এ সহিহ হাদিসের সনদের বিষয়ে একটি দীর্ঘ ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। ঘটনাটি হলো, হাদিসটির বর্ণনাকারীদের একজনের নাম হলো নাসর বিন হাম্মাদ আল-ওয়াররাক। তিনি শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের ঘরের আঙিনায় বসে নিম্নোক্ত সূত্রে সহপাঠীদের কাছে হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন, ইসরাইল বিন ইউনুস থেকে, আপন দাদা আবু ইসহাক সুবাইঈ থেকে, আব্দুল্লাহ বিন আতা থেকে, উকবা বিন আমের থেকে।

হাদিসটির বর্ণনাসূত্রের ত্রুটি উন্মোচন করতে দেশ-দেশান্তর ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রমকারী শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ ঘরের ভেতর থেকে তার এ বর্ণনা শুনছিলেন। নাসর বিন হাম্মাদের এ বর্ণনা শুনে তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার গালে চড় বসিয়ে দেন। এরপর ঘরে ফিরে গিয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করে পুনরায় বের হন। দেখেন, নাসর বিন হাম্মাদ বসে বসে কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কী জন্য কাঁদছে সে? উপস্থিত একজন বলে উঠে, আপনি তাকে কষ্ট দিয়েছেন বিধায় কাঁদছে! তিনি বলেন, তোমরা শোনোনি, সে

---

[১৮৮] পৃষ্ঠা : ১/২০৯

কীরূপ বর্ণনা করেছে? সে 'ইসরাইল তার পিতা থেকে' সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছে! কারণ, আমি আবু ইসহাককে জিজ্ঞেস করি, হাদিসটি আবদুল্লাহ বিন আতা কি উকবা থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, না! এরপর তিনি রাগান্বিত হয়ে যান। আবু ইসহাকের সাথে তখন মুসঈর বিন কিদামও ছিল। তিনি শু'বাকে বলেন, আপনি শায়খকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছেন! এরপর শু'বা মুসঈরকে লক্ষ্য করে বলেন, অবশ্যই তিনি আমার জন্য হাদিসটির সহিহ বর্ণনাসূত্র উল্লেখ করবেন; না হয় আমি তার হাদিস বিলুপ্ত করে দেব!

এরপর মুসঈর বলেন, আবদুল্লাহ বিন আতা মক্কায় আছেন আপনি সেখানে যান। এরপর আমি মক্কায় চলে যাই হজের উদ্দেশ্যে নয়; তাঁর সঙ্গে দেখা করে হাদিসের সঠিক বর্ণনাসূত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। মক্কায় আবদুল্লাহ বিন আতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেন, সা'দ বিন ইবরাহিম আমার কাছে সেটি বর্ণনা করেছেন। ওই মজলিশে ইমাম মালেকও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে অবহিত করেন, সা'দ বিন ইবরাহিম মদিনায় আছেন। তিনি হজে আসেননি। এরপর আমি মদিনায় গিয়ে সা'দ বিন ইবরাহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হাদিসটির সনদের বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, হাদিসের বর্ণনাসূত্র তো আপনাদের ওখান থেকেই এসেছে। যিয়াদ বিন মিখরাক আমার কাছে এটি বর্ণনা করেছেন। তখন শু'বা বলেন, এ হাদিসের অদ্ভুত বর্ণনাসূত্র কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না– একবার সে কুফি, আরেক বার সে মক্কি, আবার মাদানি, আবার সে বসরি! শু'বা বলেন, এরপর আমি বসরায় ফিরে এসে যিয়াদ বিন মিখরাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হাদিসের বর্ণনাসূত্র আপনার পছন্দ হবে না। আপনি তা গ্রহণ করবেন না। কারণ, হাদিসটির রাবির রেওয়ায়েত দুর্বল। শু'বা জিজ্ঞেস করেন, তবে কে সে? যিয়াদ বলেন, থাক...বলার দরকার নেই! শু'বা বলেন, না...বলুন আমি জানতে চাই! তখন যিয়াদ বলেন, শাহ্‌র বিন হাউশাব আবু রায়হানা থেকে, আর তিনি উকবা থেকে আমার কাছে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন! শাহ্‌রের নাম শুনে আমি বললাম, এ বর্ণনাসূত্রের উদ্‌ঘাটন আমাকে চরম কাহিল করে ছেড়েছে। বর্ণনাসূত্রটি শক্তিশালী হলে হাদিসটি আমার কাছে আমার পরিবার, অর্থসম্পদ এবং পুরো দুনিয়া অপেক্ষা প্রিয় হতো!

আমি বলি, এ বর্ণনাসূত্র ছাড়াও হাদিসটি সহিহ। যেমনটি ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি উল্লেখের নেপথ্যে আমার উদ্দেশ্য হলো, শু'বা ইবনুল হাজ্জাজের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বর্ণনাসূত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তার সীমাহীন দুর্ভোগযাপন এবং দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর ইতিবৃত্ত পাঠকদের স্মরণ

করিয়ে দেওয়া। যেন আমল করতে গিয়ে আমাদের মাঝে কোনো অলসতার ভাব সৃষ্টি না হয়।[১৮৯]

এ ঘটনায় আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, এখানে মুসঈর কুফায় অবস্থান করে শু'বাকে বলেছিলেন, আবদুল্লাহ বিন আতা মক্কায় আছেন, তার কাছে যান! আবার ইমাম মালেক রহ. মক্কায় থেকে শু'বাকে বলেছিলেন, সা'দ বিন ইবরাহিম মদিনায় আছেন, সেখানে যান। অথচ সেকালে ভ্রমণের জন্য আকাশব্যবস্থা ছিল না। বিমান ছিল না। অত্যাধুনিক গাড়ি ছিল না। উন্নত রাস্তাঘাটও ছিল না। বোঝা গেল, ইলম অন্বেষণের জন্য রাস্তার দূরত্ব তাদের কাছে ছিল গৌণ। কষ্ট বা পরিশ্রমের কোনো পরোয়া তাঁরা করতেন না। একজন তালিবুল ইলমকে বিষয়গুলো গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করা উচিত। কারণ, এগুলো কোনো অভিধান ঘেঁটে পাওয়া যাবে না। তাহকিক বা নিরীক্ষণকর্ম দিয়ে অনুমান করা যাবে না। তাঁদের অন্তরে ছিল ইলম ও হাদিসের প্রতি প্রবল আসক্তি। হৃদয়ের গহিনে ছিল ওহির প্রতি সীমাহীন আগ্রহ; যা বর্তমানকালের বিলাসপ্রিয়, বিত্তশালী এবং আধুনিক মডেলের গাড়ির মালিকদের আগ্রহ উদ্দীপনা থেকেও লক্ষ গুণ বেশি। হৃদয়ে যদি আবেগ, উৎসাহ ও প্রেরণা না থাকে, তবে উড়োজাহাজের মালিক হয়েই-বা কী লাভ! এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ আমাদের আজকের কঠিন ও নিরাগ্রহপূর্ণ বাস্তবতা!

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর সঙ্গীদের একজন হলো আরবিদা তামিমি রা.; অধিকাংশ তালিবুল ইলম তার নাম সম্পর্কে অনবগত। তিনি বলেন, যত স্থানে ইলম আছে বলে খবর পেয়েছি, তত স্থানেই আমি তা অর্জনের উদ্দেশ্যে গমন করেছি।'[১৯০]

আযাদ গোলাম মাকহুল শামির একটি উদ্ধৃতিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন আরবিদা রা.-এর কিছুকাল পরের। তিনি বলেন, জমিনের সব জায়গাতেই আমি ইলম অর্জনের লক্ষ্যে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

ভ্রমণে আত্মবিলীনতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা

সুন্নাতে নববির খিদমতে পূর্বসূরিদের আত্মবিলীনতা ও উচ্চাভিলাষের বিষয়ে ইয়াহইয়া বিন মুঈনের ঘটনাটিই আমার কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লাগে। জন্মেছিলেন তিনি বাগদাদে। কিন্তু সব সময় ভ্রমণে থাকার কারণে তাকে নির্দিষ্ট

---

১৮৯ ঘটনাটি অনেক হাদিসগ্রন্থেই স্থান পেয়েছে। আমি তা রামহুরমুযীর রচিত المحدث الفاصل : ৩১৩ নং পৃষ্ঠা থেকে নিয়েছি।

১৯০ العلل للإمام أحمد : ৭২, ৪২৬৩

কোনো এলাকার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা কঠিন। পুরো ইসলামি ভূখণ্ডই, বিশেষত ইলমের চারণভূমি হিসেবে খ্যাত সব অঞ্চলই, তার আবাসস্থল।
হাম্মাদ বিন সালামার কিতাব থেকে হাদিস শোনার জন্য একবার ইয়াহইয়া বিন মুঈন আফফান বিন সালামা আস-সাফফারের কাছে আসেন। আফফান বলেন,[১৯১] এটি কি অন্য কারও কাছ থেকে আপনি শোনেননি? ইয়াহইয়া বলেন, হ্যাঁ.. হাম্মাদের বরাতে সতেরো জন রাবি এটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন! তখন আফফান বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার কাছে বর্ণনা করব না! তখন ইয়াহইয়া বলেন, আমার কাছে এখনো কিছু দিরহাম অবশিষ্ট আছে। আপনি না বললে বসরায় গিয়ে তাবুযাকি বলে খ্যাত মুসা বিন ইসমাইলের কাছ থেকেও তা শুনে নিতে পারব। আফফান বলেন, সেটা আপনার ইচ্ছা! এরপর তিনি বসরায় মুসা বিন ইসমাইলের কাছে চলে আসেন। মুসা বলেন, এটি আপনি অন্য কারও কাছ থেকে শোনেননি? ইয়াহইয়া বলেন, আরও সতেরো জন থেকে সরাসরি শুনেছি; আপনি হলেন অষ্টাদশ। মুসা বলেন, এতগুলো শুনে আপনি কী করবেন? উত্তরে তিনি বলেন, হাম্মাদ বিন সালামা প্রায়ই ভুল করতেন। আমি অন্যদের ভুলগুলো থেকে তাঁর ভুলগুলো পৃথক করার ইচ্ছা করেছি। যদি দেখি, তাঁর সতীর্থ সকলে একইভাবে বর্ণনা করছেন, তবে মন করব, ভুলটি খোদ হাম্মাদের পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যদি দেখি কোনো এক জন ভিন্নরকম বলেছেন, তবে মনে করব, ভুলটি হাম্মাদের নয়; ওই রাবির। এ প্রক্রিয়ায় গবেষণা করলে সহজেই ভুলগুলো বের হয়ে আসবে।'

প্রচণ্ড ক্ষুধাকে ছাপিয়ে গেল উচ্চাকাঙ্ক্ষা

ইলম অন্বেষণে পূর্বসূরিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইতিহাস বর্ণনা করে শেষ করার মতো নয়। সে সময় তাদের মাঝে কোনো বাধা ছিল না বিষয়টি এমন নয়; বরং সব প্রতিকূলতা জয় করে তবেই তারা ইলমের পথে নিজেদের বিলীন করেছেন। ইলম অর্জনের লক্ষ্যে তাঁরা সর্বস্ব বিলীন করেছেন।

খ্যাতিমান ইয়েমেনি শাফেঈ ফকিহ[১৯২] বলেছেন—

قيل للفقر : أين أنت مقيمٌ؟ ☆ قال لي : في عمائم الفقهاءِ

إن بيني وبينهم لإخاءً ☆ وعزيزٌ عليَّ قطع الإخاءِ

---

[১৯১] المجروحين لابن حبان : ১/৩২

[১৯২] মৃত্যু : ৯৩৫ হি.

অর্থ : দারিদ্র্যকে বলা হয়, থাকো কোথায় তুমি? উত্তরে সে বলে, ফকিহদের পাগড়ির ভেতরে! নিশ্চয় আমার ও তাদের মাঝে রয়েছে এক গভীর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন; তার জন্যে জাগতিক সকল বন্ধন ছিন্ন করাও আমার কাছে সহজ।

এ বিষয়ে সবচেয়ে শিক্ষণীয় ঘটনাটি হলো আবু হুরায়রা. রা.-এর। তিনি বলেনঃ এখন মানুষ বলাবলি করে, আবু হুরায়রা বিরাট বিত্তশালী হয়ে গেছে। অথচ আমি এক বেলা পেট পুরে খাওয়ার জন্য নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে বসে থাকতাম। কোনো আটার রুটি খেতে পেতাম না। দামি কোনো কাপড় পরতে পেতাম না। কোনো সেবক-সেবিকা ছিল না আমার। ক্ষুধার জঠরজ্বালায় আমি পেটকে জমিনের সঙ্গে মিশিয়ে রাখতাম। মানুষকে কুরআন পড়ে শোনাতে চাইতাম, যেন তারা খুশি হয়ে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়। এক বেলা খাবার দেয়।'

এভাবেই ক্ষুধা তার সর্বশক্তি খর্ব করে ফেলে। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেন। যেমনটি ইবনে সিরিন রহ. বর্ণনা করেছেন, আমরা আবু হুরায়রার নিকট বসা ছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল কাতানের দুটি লাল ডোরাকাটা কাপড়। তা দিয়ে নাক থেকে শ্লেষ্মা নিঃসরণ করে বলছেন, ছি ছি আবু হুরায়রা কাতানের কাপড় দিয়ে শ্লেষ্মা নিঃসরণ করছে!! অথচ এমন একটা সময় গেছে, যখন আমি আয়েশা রা.-এর ঘর এবং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের মাঝামাঝি স্থানে পড়ে থাকতাম অচেতন অবস্থায়। মানুষ আমার ঘাড়ে পা রেখে নাড়া দিত। আমাকে পাগলের মতো মনে হতো; অথচ কোনো কালেই আমি পাগল ছিলাম না। প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণেই আমার এ অবস্থা হয়েছিল।' আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

তিনি ছিলেন ইলমের প্রতি পরম ভালোবাসা পোষণকারী। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রবকে সব সময় সেই দারিদ্র্যের ওপর প্রাধান্য দিতেন। এমনকি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তার সেই ভালোবাসা উপলব্ধি করেছিলেন। আবু হুরায়রা যখন নবিজিকে জিজ্ঞেস করেন, কেয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের সর্বাধিক অধিকারী কে হবে? তখন নবিজি বলেন, হাদিসগ্রহণে তোমার প্রবল আগ্রহ দেখে আগেই আমি অনুমান করেছিলাম এ প্রশ্ন তোমার আগে আর কেউ করতে পারবে না; কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের সর্বাধিক হকদার ওই ব্যক্তি যে অন্তর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে বলবে, ' لا إله إلا الله '[১৯৩]

---

[১৯৩] সহিহ বুখারি : ৯৯

এ ব্যাপারে ইমাম ও মনীষীদের উক্তিসমূহ

ইবনে আবদুল বার ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেন :

إن هذا الأمر لن يُنال حتى يُذاق فيه طعم الفقر.

অর্থ : 'যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুধার জ্বালার অভিজ্ঞতা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিষয়টি (ইলম) অর্জিত হবে না।'

এ কথা বলে তিনি ইলমের পথে ক্ষুধায় দিন কাটানো তার শায়খ ইমাম রবিআতুর রাইয়ের ঘটনা বর্ণনা করেন। এমনকি তিনি ইলম অন্বেষণের জন্য ঘরের ছাদের কাঠ খুলে পর্যন্ত বিক্রি করেছিলেন। শহরের আবর্জনার স্তূপে ফেলে রাখা খাদ্যদ্রব্য উঠিয়ে খেয়ে কোনোরকমে দিন কাটাতেন।

এরপর ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ রহ.-এর উক্তিটিও উল্লেখ করেন :

من طلب الحديث أفلس.

অর্থ : 'যে হাদিস অন্বেষণ করবে, নিশ্চিতভাবেই সে দরিদ্র হয়ে যাবে।'

এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা আমার প্রিয় শায়খের বিখ্যাত গ্রন্থ صفحات من صبر العلماء -তে উল্লেখ আছে। তা করতে পারলে অবশ্যই তালিবুল ইলমকে আল্লাহ তাআলা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করবেন।

তারা যদি তাদের ইলমি ক্ষুধা এবং সংকীর্ণ জীবনযাপনকে অপমান, লাঞ্ছনা, ঘৃণা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন ভাবতেন, তবে তাদের দুর্দান্ত প্রতিভাগুলো এ পথে ব্যয় না করে তারা পার্থিব জ্ঞানসাধনায় লিপ্ত হতেন। দুঃখ, যাতনা, দুর্দশা ও দুর্ভোগের জীবন পরিহার করে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ ও বিলাসিতার জীবন বেছে নিতেন। কিন্তু তা না করে এই পার্থিব দুর্ভোগময় জীবনের মাঝেই তাঁরা পেয়েছিলেন প্রকৃত সুখের ছোঁয়া। কষ্টের মাঝেই খুঁজে পেয়েছিলেন অপার শান্তি। অভাবের মাঝেই লাভ করেছিলেন সুখময় জীবনের স্বাদ।

নিজেদের তাঁরা অধিক ধনবান এবং অন্যদের দরিদ্র ভাবতেন; বিজ্ঞ আলিম এবং প্রজ্ঞাবান ইমাম খলিল বিন আহমদ আল-ফারাহিদি রহ. পারস্যের গভর্নরের কাছে লেখা চিঠিতে এ কথাটিই চারটি পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। সর্বশেষ পঙ্‌ক্তিটি এরূপ :

الفقر في النفس لا في المال نعرفه ☆ ومثلُ ذاك الغنى في النفس لا المال

অর্থ : আসলে দারিদ্র্য তো হলো অন্তরে, অর্থ-সম্পদে নয়; যেমনটি আমরা ভেবে থাকি। তেমনি ধনাঢ্যও হৃদয়ে; অর্থ-বিত্তে নয়।

তিনি আরও বলেন :

إن الذي شقَّ فمي ضامنٌ ☆ للرزق حتى يتوفّاني

অর্থ : যিনি আমার মুখ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমৃত্যু আমার রিজিকের নিশ্চয়তা দিয়েছেন।[১৯৪]

দারিদ্র্যের কষাঘাত এবং ক্ষুধার নিদারুণ জ্বালাকে তারা পরম ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর ভরসার মাধ্যমে নিবারণ করে দিতেন। ইলম ও মা'রেফাতের জগতে বিচরণ করতেন সব সময়। উপভোগ করতেন এবাদত এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকার অনাবিল স্বাদ। তাদের হৃদয় সব সময় সম্পৃক্ত থাকত প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলার সঙ্গে। তিনিই তাদের রক্ষা করতেন। তাদের জন্য রিজিকের ব্যবস্থা করতেন। মানুষের অন্তরসমূহকে তাদের সেবায় লেলিয়ে দিতেন।

তাদের জন্য আল্লাহর সাহায্যের কিছু নমুনা

হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. নিজ ইতিহাসগ্রন্থে প্রখ্যাত ইমাম ও নির্ভরযোগ্য হাফিজ আবুল আব্বাস হাসান বিন সুফিয়ান নাসাভির একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[১৯৫] তিনি ছিলেন খুরাসানের নাসা এলাকার বাসিন্দা। নব্বই বছর বয়সে ৩০৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইলম অর্জনের জন্য তিনি বহু দেশ সফর করেছেন।

তিনি ইবনে আসাকির আবুল হাসান সাফফারের ভাষ্য বর্ণনা করেন, একবার আমরা বিদগ্ধ মনীষী হাসান বিন সুফিয়ান নাসাভির সান্নিধ্যে ছিলাম। সে সময় তাঁর কাছে ইলম অর্জন এবং হাদিস লেখার জন্য দূরদেশ থেকে আগত কিছু মহান ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল।

একবার তিনি হাদিস লেখার মজলিশে উপস্থিত হয়ে বলেন, লেখা শুরু করার পূর্বে আমি তোমাদের যা বলব, তা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো!

আমি জানি তোমরা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের সন্তান। স্বদেশ ছেড়ে এসেছ, বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করেছ ইলম অর্জনের আশায়; হাদিস জানার বাসনায়। এর দ্বারা তোমরা ইলম শেখার জন্য সত্যিই কিছু একটা বিসর্জন দিয়ে ফেলেছ, দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করে নিয়েছ কখনো তোমরা এমনটি ভেবে বসো না। ইলম অর্জনের পেছনে কেমন কষ্ট ও যাতনা আমরা ভোগ করেছি, তার কিছু ঘটনা আজ আমি তোমাদের শোনাচ্ছি। আর তার বদলে আল্লাহ তাআলা কীরূপ ইলমি বরকত ও কল্যাণ আমার এবং আমার সাথিদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন, তাও তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি।

শোনো, তখন আমি আমার তারুণ্যের স্বর্ণালি সময়ে। ইলম অন্বেষণ এবং হাদিস সংগ্রহের জন্য আমি স্বদেশ ত্যাগ করি। আমি ও আমার নয় জন সাথি

---

[১৯৪] এ কবিতাসংশ্লিষ্ট ঘটনাটি صفحات من صبر العلماء-তে দেখে নিন : পৃষ্ঠা ১৬৬

[১৯৫] পৃষ্ঠা : ১৩/১০৩-১০৫

মরক্কোর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সফর করি। মিসরের মধ্যস্থলে উপনীত হই। আমার সাথিরা সকলেই ছিলেন তালিবুল ইলম এবং হাদিসের মনোযোগী শ্রোতা। সব সময় আমরা সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ আলিমের কাছে গিয়ে হাদিস সংগ্রহ করতাম। ইলম অর্জন করতাম। তাঁরা আমাদের কিছু কিছু করে হাদিস লিখে দিতেন। একপর্যায়ে ইলম অর্জন করতে করতে আমাদের খরচাদি শেষ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের সাথে থাকা অতিরিক্ত কাপড় ও অন্যান্য বস্তু বিক্রি করতে শুরু করি। শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে এক দিনের খাবারও বেঁচে থাকেনি। এরপর তিন দিন পর্যন্ত আমরা না খেয়ে থাকি। দুরবস্থায় জীবনযাপন করতে থাকি। চতুর্থ দিন সকালে ক্ষুধার কারণে আমরা নড়াচড়ার শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি। নিস্তেজ হয়ে যায় দেহ। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আমরা লাজ-শরম উপেক্ষা করে অন্যদের কাছে ভিক্ষা করতে মনস্থ করি। মন চাচ্ছিল না। হৃদয় সায় দিচ্ছিল না। সবাই এ কাজ করতে অস্বীকার করছিল। কিন্তু প্রয়োজন ও পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করেছিল এত নীচু হতে।

কে ভিক্ষা করবে এ নিয়ে সবাই পরামর্শে বসি, সিদ্ধান্ত হয় কাগজে সবার নাম লিখে লটারি দেওয়া হবে। লটারিতে যার নাম আসবে, তাকেই ভিক্ষাবৃত্তির জন্য তৈরি হতে হবে। নিজের ও সাথিদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

লটারিতে আমার নামটিই উঠে আসে। আমি চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। নির্বাক হয়ে যাই। কোনোভাবেই ভিক্ষা করতে এবং এ রকম অপদস্থ হতে মন সায় দিচ্ছিল না। আমি মসজিদের এক কোণে বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে পূর্ণ ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে দু-রাকাত নামাজ আদায় করি। নামাজে আল্লাহর পুণ্যময় নামসমূহ দিয়ে তাঁকে ডাকতে থাকি। দুরবস্থা ঘুচাতে এবং অভাব দূর করতে আল্লাহর কাছে রোনাজারি করতে থাকি।

এখনো আমি নামাজ শেষ করিনি; হঠাৎ একজন সুন্দর ও সুশ্রী তরুণ মসজিদে প্রবেশ করে। গায়ে তার উৎকৃষ্ট পোশাক। সুগন্ধিমাখা বদন তার। সাথে তারই একজন সেবক। সেবকের হাতে রুমাল। মসজিদে ঢুকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মধ্যে হাসান বিন সুফিয়ান কে? এরপর আমি সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বলি, আমিই হাসান বিন সুফিয়ান; কী ব্যাপার? সে বলতে থাকে, গভর্নর 'তুলুন' হচ্ছেন আমার একান্ত ও শ্রদ্ধেয় সঙ্গী। তিনি আপনাদের সালাম বলেছেন। আপনাদের যথাযথ খোঁজখবর না রাখতে পেরে তিনি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি আপনাদের বর্তমান দুরবস্থা ঘোচাতে কিছু হাদিয়া পাঠিয়েছেন। আগামীকাল তিনি নিজে এসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। নিজের মুখে আপনাদের কাছে ক্ষমা

চাইবেন। এ কথা বলে সে আমার সামনে একটি থলে রেখে দেয়। থলেতে আমাদের সকলের জন্য এক শ দিনার করে রাখা ছিল।
আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। যুবকটিকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলতে থাকে, আমি গভর্নর তুলুনের এক নগণ্য সেবক। তাঁর নিকটাত্মীয়দের একজন। আজ সকালে আমরা কয়েকজন সাথি মিলে তার কাছে গিয়ে সালাম নিবেদন করি। তিনি আমাকে এবং সকলকে লক্ষ্য করে বলেন, আজ আমি একটু একা থাকতে চাই। তোমরা নিজ নিজ বাড়ি চলে যাও!
আমরা সকলেই বাড়ি ফিরে আসি। বাড়ি এসে এখনো ভালো করে বসতে পারিনি, এর মধ্যেই দ্রুতবেগে গভর্নরের দূত এসে আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে থাকে, গভর্নর আপনাকে স্মরণ করেছেন! দ্রুত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলেছেন! আমি গিয়ে তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় একটি ঘরে দেখতে পাই। ব্যথায় অস্থির হয়ে তিনি কোমরে হাত দিয়ে রাখেন। তিনি আমাকে দেখে বলেন, তুমি কি হাসান বিন সুফিয়ান এবং তার সাথিদের চেনো? বলি, না! বলেন, দ্রুত অমুক মহল্লায় যাও। অমুক মসজিদে গিয়ে এই থলেগুলো তাকে দিয়ে এসো! তাকে ও তার সাথিদের কাছে আমার পক্ষ হতে সালাম নিবেদন করো! তারা তিন দিন ধরে না খেয়ে আছে। দুঃখ-কষ্টে দিন পার করছে। আমার পক্ষ থেকে তাদের কাছে ক্ষমা চাও। তাদের বলো, আমি আগামীকাল সকালে নিজে এসে তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।
যুবকটি আরও বলে, আমি গভর্নরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, গতরাতে একাকী বিশ্রামের জন্য ঘরে প্রবেশ করে আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি, বিশালকায় এক অশ্বারোহী পুরো আকাশজুড়ে অবস্থান করছে। তার হাতে একটি ধনুক। তাকে দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। দেখতে দেখতে সে আমার ঘরের দরজায় এসে উপস্থিত হয়ে ধনুকের তিরটি সোজা আমার বুকে বিদ্ধ করে দিয়ে বলে– ওঠো, যাও, হাসান বিন সুফিয়ান এবং তাঁর সাথিদের কাছে যাও! তাদের কাছে যাও! তাদের কাছে যাও! তাদের কাছে যাও! তাদের কাছে যাও! তিন দিন ধরে তারা না খেয়ে অমুক মসজিদে পড়ে আছে। আমি বলি, কে তুমি? সে বলে, আমি রিদওয়ান, জান্নাতের অধিবাসী!
যখন থেকে তিরটি আমার বুকে বিদ্ধ হয়েছে, তখন থেকেই আমি শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি। এমনকি এখন আমার নড়াচড়ার কোনো ক্ষমতা নেই। তাই অবিলম্বে এ অর্থগুলো তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো!
হাসান বিন সুফিয়ান বলেন, এ ঘটনায় আমরা সবাই বিস্মিত হয়ে যাই। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহই আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করে

দেন। আগামীদিন গভর্নর নিজে এসে আমাদের সাধুবাদ জানাবেন, আমাদের কাছে ক্ষমা চাইবেন, বিষয়টি আমাদের একদম ভালো ঠেকেনি। ওই রাতেই আমরা মিসর থেকে বেরিয়ে পড়ি; যেন গভর্নর আমাদের খুঁজে না পান। মানুষ যেন আমাদের এ ঘটনা টের না পায়। কারণ, এর মাধ্যমে আমাদের মনে রিয়া বা সুনাম কুড়ানোর লিপ্সা চলে আসতে পারে। আজ আমার সাথি সবাই যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইলম ও মর্যাদার উচ্চাসন লাভ করে ধন্য হয়েছে।

পরদিন সকালে গভর্নর তুলুন মসজিদে এসে আমাদের খোঁজ নেন। আমাদের সরে পড়ার বিষয়টি তিনি টের পেয়ে যান। এরপর পুরো মহল্লা ক্রয় করে সেটি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দিতে এবং অপরিচিত, জ্ঞানপিপাসু ও শিক্ষার্থীদের খরচের জন্য তা নির্ধারণ করে দিতে মনস্থ করেন। যেন ভবিষ্যতে আমাদের মতো কারও এ রকম দুর্দশায় না পড়তে হয়। অভাবে দিন কাটাতে না হয়।

শুনে রাখো, এসব কিছু সম্ভব হয়েছে একমাত্র দ্বীনের খাতিরে। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বাসের কল্যাণে। আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক এবং সকল কল্যাণের ব্যবস্থাপক।[১৯৬]

ঘটনায় ব্যবহৃত তুলুন নামটি আসলে 'ইবনে তুলুন' হবে।[১৯৭]

দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা

তাজ সুবকি আবুল আব্বাস আল-বাকরি (সিদ্দিকে আকবর রা.-এর পুত্র) থেকে বর্ণনা করেন, একবার এক কাফেলায় মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারি, মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন খুযাইমা, মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযি এবং মুহাম্মদ বিন হারুন আর-রুয়ানি একসঙ্গে মিসরে পৌঁছেন। একপর্যায়ে তাদের পাথেয় শেষ হয়ে যায়। কোনো খাদ্যদ্রব্য তাদের কাছে অবশিষ্ট থাকে না। প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে দিনযাপন কষ্টকর হয়ে যায় তাদের জন্য।

ফলে একরাতে তাঁরা তাঁদের ঘরে একত্র হয়ে লটারি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। লটারিতে যাঁর নাম আসবে, তাঁকেই নিজের জন্য এবং সাথিদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে হবে। এরপর লটারিতে ইবনে খুযাইমার নাম আসে। তিনি সাথিদের বলেন, আমাকে একটু সময় দাও। অজু করে দু-রাকাত সালাতুল ইস্তেখারা পড়ে নিই। তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিসরের গভর্নরের পক্ষ থেকে এক দূত এসে দরজায় নক

---

[১৯৬] تاريخ ابن عساكر : ১৩/১০৩-১১৫

[১৯৭] ইবনে আসাকির ও ইবনে আদিমের বর্ণিত ঘটনার এখানে ইতি ঘটেছে। প্রায় এ রকম শব্দ দিয়েই ইমাম যাহাবি রহ. السير গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন : ১৪/১৬১

করতে থাকেন। দরজা খোলার পর তিনি বাহন থেকে নেমে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন নাসর কে? তাঁকে দেখিয়ে বলা হয়, এই তো তিনি! এরপর একটি থলে বের করে তিনি তাঁর হাতে তুলে দেন, যার ভেতরে ছিল পঞ্চাশটি দিনার। এরপর তিনি এক এক করে মুহাম্মদ বিন জারির, মুহাম্মদ বিন খুযাইমা ও মুহাম্মদ বিন হারুনকেও ডাকেন এবং তাদের প্রত্যেককেই পঞ্চাশ দিনারের একেকটি থলি বুঝিয়ে দেন। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, গভর্নর গতকাল দুপুরে কায়লুলা করে ঘুমিয়ে যান। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেন এক অশ্বারোহী এসে তাকে বলছে, চার জন মুহাম্মদ ক্ষুধায় দিন পার করছে! দুঃখ-কষ্টে সময় অতিবাহিত করছে! এ স্বপ্ন দেখার পর আমাকে দিয়ে তিনি এ থলেগুলো আপনাদের কাছে পাঠান। শপথ করে বলেন, এগুলো শেষ হলে আপনাদের একজন যেন গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

দরিদ্রতা ও ক্ষুধা কোনোকালেই ইলম অর্জনের পথে বাধা ছিল না। কিন্তু যারা দুর্বল আত্মার অধিকারী, যারা পরিশ্রম ও পরীক্ষার জন্য সব সময় নিজেদের অপ্রস্তুত ভাবে, তারা কোনোভাবেই সফলতা অর্জন করতে পারে না। এ জন্য প্রতিটি শিক্ষকের উচিত, ছাত্রদের ওপর কোনো বিপদ এলে, পরীক্ষা বা দুরবস্থার সম্মুখীন হলে তাদের ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। তাদের আদরের সঙ্গে বোঝানো, এই তো কয়েকটি দিন...সবর করো, সামনেই সুদিন অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সামনে তাদের পূর্বসূরিদের ইলম অর্জনের পথে সীমাহীন কষ্ট ও যাতনাভোগের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করবেন। এর ফলে তারা কীরূপ মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন, সেটিও তাদের উত্তমরূপে অবহিত করবেন।

খতিব রহ. খ্যাতিমান মনীষী ইবরাহিম নাখঈ থেকে বর্ণনা করেন,

من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه بما يكفيه.

অর্থ : 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু ইলম শিখবে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন।'[১৯৮]

সম্মানিত পাঠক মহোদয়কে আমি বলব, এসব ঘটনাতে গভীরভাবে চিন্তা করুন। এসব ঘটনা কি বাস্তব নাকি উপকথা বা কল্পকাহিনি?! না; বরং চরম বাস্তব ঘটনা এগুলো। এগুলো সেইসব লোকদের গৌরবগাঁথা, যাদের আল্লাহ তাঁর দ্বীনের প্রহরী হিসেবে মনোনিত করেছেন। তাদের দিয়ে আল্লাহ দ্বীনকে শক্তিশালী করেছেন। দ্বীনের মাধ্যমে তাদেরকেও ক্ষমতাবান ও মর্যাদাশীল করেছেন। আল্লাহ বলেন :

---

[১৯৮] الجامع : ٧١

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

অর্থ : 'নিশ্চয় আমি নিজে এ উপদেশগ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।'[১৯৯]

তাঁদের মাধ্যমেই আল্লাহ দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। আখেরাতের আগে দুনিয়াতেই আল্লাহ তাদের মর্যাদা ও আভিজাত্য দিয়ে ভরপুর করেছেন। যদি আল্লাহর এ মহান মর্যাদার কথা না বুঝতেন, অন্তরে তা বিশ্বাস না করতেন, তবে কোনোকালেই তাঁরা এ রকম দুরবস্থা বা দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতেন না। ক্ষুধা ও যাতনায় দিন কাটাতেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের এ খিদমতের ফলে তাদেরকে সুমহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আবুল আ'লার রচিত নিম্নোক্ত কবিতাটি তাদের ক্ষেত্রেই যথার্থ–

جمالَ ذي الأرض كانوا في الحياة، وهم☆بعد الممات جمالُ الكُتْبِ والسِّيَرِ

অর্থ : জীবদ্দশায় তারা ছিলেন ভূপৃষ্ঠের সৌন্দর্য, মৃত্যুর পর তারা হয়েছেন ইতিহাসগ্রন্থের উজ্জ্বল প্রদীপ।

হ্যাঁ...একমাত্র তারাই এ কবিতার যথোপযুক্ত ব্যক্তিত্ব।

এ ব্যাপারে আলোচনা যেমন অনেক দীর্ঘ; ঘটনা যেমন অসংখ্য ও অগণিত, তেমনি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণে মনীষীদের কীর্তিকলাপও প্রচুর।

* * * *

[১৯৯] সুরা হিজর (১৫) : ৯

ষষ্ঠ পথনির্দেশ

সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তিলাভ

ইলম অন্বেষণের পথে বাধা দানকারী সকল কথা, কাজ ও পেশা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া একজন তালিবুল ইলমের সফলতালাভের প্রধান শর্ত।

এগুলো থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত না হলে সময়ের মূল্যায়ন এবং ইলম অর্জনের প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনো উপকারে আসবে না তার।

১. অন্য সব বিষয় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, এমনকি প্রয়োজনীয় অনেক কাজ থেকেও

ইলম অন্বেষণ এবং তা অর্জনের পথে হাজার রকমের বাধা বিপত্তি রয়েছে, যেগুলো হাতে গুনে শেষ করা সম্ভব নয়। কারণ, যা স্মরণ হয়, তাই গোনায় আসে। আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই মানুষ স্মরণ করে থাকে। আর একেকজনের জীবনে একেক রকম প্রতিবন্ধকতা এসে থাকে পরিবার, যোগ্যতা ও সামাজিক অবস্থান ভেদে। মোটকথা, প্রতিবন্ধকতা অনেক হতে পারে। মূলত একজন তালিবুল ইলমকে সব সময় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কড়া নজর দিয়ে তার মূল্যবান সময়কে রক্ষা করতে হবে। ইলম অর্জন থেকে যা তাকে অমনোযোগী করে তোলে, অন্যমনস্ক করে তোলে; বুঝতে হবে সেটাই তার জন্য প্রতিবন্ধকতা, তার প্রধান শত্রু; তালিবুল ইলমকে তা কঠোর হাতে দমন করতে হবে। লক্ষ্যার্জনের পথে একে বিরাট বাধা মনে করতে হবে।

সব রকমের প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন,

العلم شيء لا يعطيك بعضَه حتى تعطيه كلَّك، وأنت إذا أعطيته كلَّك من إعطائه البعضَ على غَرَر.

অর্থ : যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি ইলমের জন্য তোমার সর্বস্ব ব্যয় করে দিচ্ছ, ততক্ষণ ইলম তোমাকে কিছুই দেবে না। যদি তোমার সর্বস্ব তাকে দিতে পারো, তবে আশা করা যায় সে তোমাকে তার কিছু অংশ দেবে।

বিখ্যাত ফকিহ আবু আহমন নাসর বিন আহমদ আল-ইয়াযির বচনও এখানে উল্লেখযোগ্য :

لا ينال هذا العلمَ إلا من عطّل دكانه وخرَّب بستانه وهجر إخوانه ومات أقربُ أهله إليه فلم يشهد جنازته.

অর্থ : 'ইলম অর্জনকল্পে যে দোকান বন্ধ করে দিয়েছে, বাগিচা বিনষ্ট করেছে, ভাইদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, পরিবারের কারও মৃত্যুর পর তার জানাযায় উপস্থিত হতে অপারগ হয়েছে...সে-ই ইলম অর্জনের যোগ্যতা লাভ করেছে।'

ইয়াযির এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমি তার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করব না। তবে পরিবারের কারও জানাযায় উপস্থিত না হতে পারার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি একটি ঘটনার দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন। মুওয়াফফাক আল-মাক্কি—ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেন যে আমার এক পুত্রসন্তান মারা যাওয়ার পর আমি তার কাফন-দাফন করতে পারিনি। আবু হানিফার দরস থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইলম আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে; সে জন্যে জীবনভর আমি আফসোস করব, এই ভয়ে তার কাফন-দাফনের ভার আমার পরিবার ও প্রতিবেশীদের বুঝিয়ে দিয়ে আমি চলে আসি।'[২০০]

ইমাম হাফেজ আল-মুনযিরির ঘটনাও প্রায় একই রকম। তার বাসগৃহ ছিল কায়রোর দারুল হাদিস আল-কামিলিয়্যা মাদরাসার পাশেই। হঠাৎ ত্রিশ বছর বয়সি তার এক পুত্রসন্তান মারা যায়। নাম ছিল তার মুহাম্মদ। অল্প বয়সেই সে ইলম ও প্রজ্ঞায় অনেক সুনাম কুড়াতে সক্ষম হয়েছিল। ইমাম হাফেজ আল-মুনযিরি তখন মাদরাসায় অধ্যয়নরত ছিলেন। তিনি তার প্রিয় পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনেও মাদরাসা থেকে বের হননি। মাদরাসার দরজায় সন্তানের লাশ নিয়ে আসা হলে তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন, হে প্রিয় পুত্র, আল্লাহর কাছেই তোমাকে সোপর্দ করলাম। এ কথা বলে তিনি সন্তানের লাশ বিদায় দিলেন। মাদরাসা থেকে আর বের হননি তিনি।[২০১]

শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ রাগিব তাব্বাখ রহ. সম্পর্কে এ রকমই আরেকটি ঘটনা আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আমাকে শোনান, তার বড়ো ছেলে মুহাম্মদ ছিল তার বিখ্যাত লাইব্রেরি এবং প্রকাশনা বিভাগ المطبعة العلمية-এর সার্বিক দায়িত্বে। সে মৃত্যুবরণ করলে তার কাফন-দাফন শেষ করে পরদিনই তিনি আলেপ্পোর المعهد الديني العريق -এ দরস দিতে চলে আসেন। এদিন ছাত্ররা তার উপস্থিতি দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে যায়। একপর্যায়ে তাদের এ অবাক হওয়ার বিষয়টি তাকে বললে উত্তরে তিনি বলেন, আমি সন্তানহারা হয়েছি, তবে কি ইলমের বরকত থেকেও বঞ্চিত থাকব?!'

---

[২০০] مناقب أبي حنيفة : ৪৭২

[২০১] طبقات للسبكي : ৮/২৬০

পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসি। বুরহান যানজুরি রহ. বলেন : 'তালিবুল ইলমকে এককথায় সবধরনের পার্থিব সম্পর্ক থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। এ কারণেই পূর্বসূরিগণ ইলমের জন্য প্রবাস-জীবন বেছে নিতেন। দূর দেশে পাড়ি জমাতেন। ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ইলমের জন্য দূরদূরান্তে ভ্রমণ করতে হবে। বিপুল পরিশ্রম করতে হবে। মুসা আ. তাঁর ঐতিহাসিক শিক্ষাসফর শেষ করে বলেছিলেন,

﴿لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا﴾

অর্থ : 'এই সফরে আমরা অনেক পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।'[২০২]

বোঝা গেল নিশ্চিতভাবে ইলমের সফর থাকবে কষ্ট-ক্লেশে ভরপুর। পদে পদে দুর্দশা আর যাতনা ভর করবে।[২০৩]

যে এ পথে ধৈর্যধারণ করবে, সকল যাতনা সহ্য করে নেবে, পরবর্তীকালে সে এমন স্বাদ ভোগ করবে, যা পৃথিবীর সব স্বাদকে তুচ্ছ করে দেবে। এ কারণে মুহাম্মদ বিন হাসান রহ. যখন রাত জেগে কোনো মাসআলা 'হল' করতেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠতেন, রাজা বাদশাগণ কোথায় পাবে এ সুখ, কোথায় পাবে আনন্দের এ অনুভূতি?!

তালিবুল ইলমদের জন্য ইলম ছাড়া অন্য কিছুতে মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। মুহাম্মদ রহ. বলেন,

من أراد أن يترك علمنا هذا ساعة فليتركه الساعة، إن صناعتنا هذا من المهد إلى اللحد.

অর্থ : 'যে আমাদের এ ইলমকে এক মুহূর্তের জন্য পরিত্যাগ করতে চায়, সে যেন ওই এক মুহূর্তকে বর্জন করে। কারণ, আমাদের এ সাধনা চলবে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।'

তা ছাড়া ছাত্রদের আরেকটি বিষয় ভাবতে হবে, তাদের প্রয়োজনগুলো হতে পারে দু-ধরনের– দ্বীনি ও কল্যাণকর প্রয়োজন অথবা ব্যস্ততা আনয়নকারী প্রয়োজন। একে আমি ইলমের পথে প্রতিবন্ধক বলব না। তালিবুল ইলমকে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা চাই।

এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো, الطبقات الوسطى গ্রন্থে সুবকি রহ. ইমাম সুলাইম বিন আইয়ুব রাযি রহ.-এর বৃত্তান্তে বলেন, সুলাইম রাযি রহ. যখন ইলম অন্বেষণের জন্য বাগদাদ যান, তখন তাঁর কাছে বাড়ি থেকে যত চিঠি আসত, সেগুলো তিনি

---

[২০২] সুরা কাহফ (১৯) : ৬২

[২০৩] تعليم المتعلم : ৮৩

না পড়ে রেখে দিতেন। এভাবে পড়ালেখা শেষ করা পর্যন্ত যত চিঠি এসেছে সবগুলো একস্থানে একত্র করেন। ফারেগ হওয়ার পর চিঠিগুলো এক এক করে খুলে পড়তে থাকেন। এক চিঠিতে লেখা ছিল, 'তোমার মা ইন্তেকাল করেছেন।' আরেক চিঠিতে এ রকমই কিছু মর্মন্তুদ সংবাদ ছিল। তিনি বলেন, ওই সময়ে এগুলো পড়লে নির্ঘাত আমার ইলম অন্বেষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো।'[২০৪]

এ রকমই একটি ঘটনা আমি আমার ছাত্রজীবনের শুরুর দিকে আলেপ্পোর শ্রেষ্ঠ আলিম শায়খ আহমদ বিন আবদুল করিম আত-তুরমানিনী আল-হালবি[২০৫] সম্পর্কেও শুনেছি। এরপর শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদ শায়খ মুহাম্মদ রাগিব তাব্বাখ রহ.-কে সেটি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে[২০৬] আলোচনা করতে দেখেছি। ঘটনাটি সেখান থেকেই হুবহু কপি করা বেশি সমীচীন মনে করছি,

> 'শায়খ তুরমানিনি আল-আযহার ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘ তেরো বছর অবস্থান করে সেখানে ইলম অর্জন করেন। এ লম্বা সময়ের ভেতর তার কাছে যত চিঠি আসে, তিনি সেগুলো আলমারির ওপর রেখে দেন। ইলম অর্জন শেষে যখন বাড়ি ফেরার ইচ্ছা করেন, তখন চিঠিগুলো খুলে পড়তে থাকেন, দেখেন, অমুক আত্মীয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, অমুক ইন্তেকাল করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ কোনো কিছুই যেন ইলম অর্জনের মাঝে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, সে জন্যেই তিনি এ অভিনব পদ্ধতি বেছে নেন।'

উপরিউক্ত ঘটনা দুটো বর্ণনার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, অবশ্যই তালিবুল ইলম এ ক্ষেত্রে শরয়ি দিকটিকেই বেশি প্রাধান্য দেবে। পিতা-মাতার হক আদায় করবে, নিয়মিত তাদের খোঁজখবর নেবে। তাদের কষ্ট হচ্ছে বা তারা দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছে জানলে সে ইলম অন্বেষণ বাদ দিয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে।

এ বিষয়ে সবচেয়ে সঠিক ফায়সালা এটাই যে, সবদিক বিবেচনা করে নিতান্ত প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে। কেবল শরয়ি অধিকারের ওপর আবেগতাড়িত প্রাধান্যদান নয়; বরং সব সময় বড়ো কল্যাণকর বিষয়কে ছোটো কল্যাণকর বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেবে। (আল্লাহই ভালো জানেন।)

---

[২০৪] الطبقات الكبرى এর তা'লিকের মধ্যে উল্লেখ আছে। পৃষ্ঠা : ৪/৩৮৯

[২০৫] ১২০৮-১২৯৩ হিঃ

[২০৬] إعلام النبلاء : ৭/৩৫২

২. জীবিকা উপার্জন; সন্তান ও পরিবার নিয়ে ভাবনা

এটি ইলম অর্জনের পথে পার্থিব প্রতিবন্ধকতার একটি। খতিব রহ. آداب الفقيه والمتفقه গ্রন্থে[২০৭] باب حذف المتفقه العلائق নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। সে অধ্যায়ের শুরুতে তিনি বলেন, অনেক পূর্বসূরি পার্থিব কোনো বিষয়ই শেখাতেন না কাউকে। বলতেন, অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত হওয়া থেকে ইলম অনেক উর্ধ্বে।'

সাইমারি রহ. নিজ সনদে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করে, পরিপূর্ণ ফিকহ অর্জন করতে হলে কীসের সাহায্য নিতে হবে? উত্তরে তিনি বলেন, দৃঢ় সংকল্প এবং অদম্য স্পৃহার। জিজ্ঞেস করে, দৃঢ় সংকল্প তৈরির জন্য কী করতে হবে? তিনি বলেন, পার্থিব সকল সম্পর্ক ঘুচাতে হবে। আবার জিজ্ঞেস করে, পার্থিব সকল সম্পর্ক ঘুচাতে কী করতে হবে? এবার তিনি বলেন, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করবে; এর চেয়ে বেশি কিছু অর্জনের লিপ্সা বর্জন করবে।'[২০৮]

এ বিষয়ে আলোচনার শুরুতে এখানে একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উক্তি বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি :

إن الولد مَبْخَلَة مَجْبَنَة مَجْهَلَة مَحْزَنَة.

অর্থ : 'সন্দেহ নেই, সন্তান পিতাকে কৃপণ, ভীতু, নির্বিজ্ঞ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে বাধ্য করে।'

মানাভি রহ. এখানে مجهلة শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,...কারণ, সন্তান পিতাকে ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা থেকে বিরত রাখে। তার প্রয়োজন ও খাবার জোগান দেওয়ার কাজে লিপ্ত রাখে।'[২০৯]

ইমাম হাফিজ ইবনে আসাকির রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে খ্যাতিমান ও প্রখর মেধাবী ইমাম আহমদ ইবনুল ফুরাতের[২১০] বৃত্তান্তে তাঁর একটি উক্তি বর্ণনা করেন: একবার আমি ইয়াযিদ বিন হারুনের মজলিশে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে ত্রিশটি হাদিস লিখে দিলে আমি সেগুলো মুখস্থ করে নিই। এরপর বাড়ি ফিরে এসে সেগুলোতে তা'লিক যোগ করতে মনস্থ করি। তিনটি হাদিসের তা'লিক

---

[২০৭] ২/১৮৪

[২০৮] أخبار أبي حنيفة وأصحابه : ২২

[২০৯] فيض القدير : ২/৩০৪

[২১০] মৃত্যু : ২৫৮ হিঃ

যোগ করার পর বাঁদি এসে আমাকে বলে, আটা শেষ হয়ে গেছে মনীব! এ কথা শুনে আমি বাকি সাতাশটি হাদিস একদম ভুলে যাই। যে তিনটি লিখেছিলাম কেবল সে তিনটিই মনে থাকে।'[২১১]

আমাদের উস্তাদ ও মাশায়েখদের মাঝে একটি উক্তি প্রসিদ্ধ ছিল—

لو كلِّفت شراء بَصَلة ، ما تعلمت مسألة.

'পেঁয়াজ কেনার দায়িত্ব দেওয়া হলে আর মাসআলা শেখা হতো না আমার।'

এটি শাফেঈ রহ.-এর উক্তি বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বদর বিন জামাআ।[২১২]

৩. আরও একটি প্রতিক্রিয়াশীল বড়ো প্রতিবন্ধকতা হলো, ভাইদের সঙ্গে বেশি পরিমাণে ওঠাবসা করা। জনসাধারণের সাথে বেশিরকম সম্পর্ক রাখা।

এ রকম প্রতিবন্ধকতার ক্ষতিকর দিকটি ভাইদের আচার-আচরণ এবং জনসাধারণের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। তারা সচ্চরিত্রবান হলে ক্ষতির দিকটি সংকুচিত হয়ে আসে। খুব বেশি সময়ের অবমূল্যায়ন হয় না। খুব বেশি পরিমাণে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হয় না। যারা এ রকম প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত, তারা ইলম শিখবে কী, বন্ধুদের প্রতিশ্রুতিপূরণ এবং তাদের নিয়ে মনোরঞ্জনেই বেশি ব্যস্ত থাকবে। হেলায় ফেলায় সময় নষ্ট করে দেবে।

এ কারণে যারাই তালিবে ইলমদের আদব ও ইলম অর্জন পদ্ধতির বিষয়ে কিছু লিখেছেন, তারা সবাই এ জাতীয় প্রতিবন্ধকতা নিজের কাঁধে চাপানো থেকে তালিবুল ইলমদের কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। সমমনা সচ্চরিত্রবান এবং জ্ঞানপিপাসু তালিবুল ইলমদেরই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে বেশি করে ইলমি মুজাকারা করতে বলেছেন।

একটি প্রবাদতুল্য উক্তি প্রায় সকলেরই জানা—

قل لي مَن تُصاحب، أقل لك مَن أنت.

'জিজ্ঞেস করছ, কার সাথে আমি চলি? আগে বলো তুমি কে?'

তা ছাড়া আবু ইউসুফ রহ.-এর প্রতি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ওসিয়তটিও এখানে উল্লেখযোগ্য :

ولا تُكثر معاشرة الناس إلا بعد أن يعاشروك، وقابلْ معاشرتهم بذِكْر المسائل، حتى إن مَن كان مِن أهله اشتغل بالعلم، ومَن لم يكن مِن أهله يجتنبُك، ولا يجدُ عليك، بل لا يحوم حولك.

---

২১১ تاريخ ابن عساكر : ৫/১৫৫

২১২ التذكرة : ৭১

অর্থ : 'যতক্ষণ না তারা তোমার সঙ্গে মিশতে চাইছে, ততক্ষণ তুমি তাদের সঙ্গে মিশতে যেয়ো না। সম্পর্ক তৈরি করতে হলে তাদের সামনে বেশি করে মাসআলা বর্ণনা করো। তাহলে তাদের মধ্যে কেউ আহলে ইলম হলে সে তোমার সঙ্গে ইলমচর্চায় মনোনিবেশ করবে। না হলে তারা তোমাকে এড়িয়ে চলবে। তোমার ওপর ক্ষুব্ধ হবে না। তোমাকে উত্ত্যক্ত করতে আসবে না; বরং তোমার ধারেকাছেই ভিড়বে না।'[২১৩]

এক যুবকের একটি ঘটনা বর্ণনা করেই এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করছি। মানুষের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দীর্ঘ সময় জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশের কারণে সে কেমন মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছিল। তার জীবনে কেমন তাত্ত্বিক আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, তাই বর্ণনা করছি।

বিশিষ্ট লেখক আবু জাফর আহমদ বিন ইউসুফ বাগদাদি তার বিখ্যাত গ্রন্থ المكافأة -তে উল্লেখ করেন,[২১৪] শুজা বিন আসলাম হাসিব আমাকে সংবাদ দেন, আমি সানাদ বিন আলিকে জিজ্ঞেস করি, কোন ঘটনা আপনাকে সুলতান মামুনের নিকটবর্তী করেছে! যার ফলে আজ আপনি সুলতানের একান্ত আপন, তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী! তিনি বলেন, সব খুলে বলছি তোমাকে :

আমার পিতা সুলতানের কাছের লোকদের সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতেন। '*ইউক্লিড*' গ্রন্থ অধ্যয়নের পর আমি '*অ্যালমেগেস্ট*' গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ি। সুলতান মামুনের আমলে প্রকাশনী বাজারে মারুফ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে এ গ্রন্থটি প্রকাশের কাজ করত। গ্রন্থটি লেখা শেষ হলে বিশ দিনার দিয়ে তা বিক্রি করত। আমি আমার পিতাকে অনুরোধ করি বিশ দিনার দিয়ে গ্রন্থটি কিনে দিতে। তিনি বলেন, কিছুদিন অপেক্ষা করো, কিছু টাকা উপার্জন করে নিই বা কোনো উপহার লাভ করি। কিছু টাকা হাতে এলেই বইটি তোমাকে কিনে দেব।'

এক ভাই ছিল আমার। ইলম ও জ্ঞানের প্রতি তার অমনোযোগিতা ও বিতৃষ্ণা ছিল প্রবল। তবে সে আব্বুর সেবা করত খুব। তাঁর প্রয়োজন পূরণ করত।

এরপর যখন আব্বু আমাকে বই কিনে দিতে বিলম্ব করেন, অনেক দিন পার হয়ে যায়, তখন আর দেরি সইতে না পেরে খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে আমি নিজে রাজদরবারে আব্বুর কাছে চলে আসি। তখন আমার বয়স ছিল সতেরো। প্রহরী এসে বলে, তোমার আব্বু এখান থেকে বেরিয়ে গেছেন। কালক্ষেপণ সইতে না

---

[২১৩] مناقب أبي حنيفة للموفق المكي : ৩৭৩
[২১৪] পৃষ্ঠা : ২১১

পেরে আমি তখন বাজারে এসে খচ্চরটি লাগাম ও অন্যান্য আসবাবসহ মাত্র ত্রিশ দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়ে মারুফের কাছে গিয়ে বিশ দিনার দিয়ে ওই বইটি কিনে নিই।

বাড়িতে আমার জন্য একটি রুম বরাদ্দ ছিল। মাকে এসে বলি, আমি একটি অপরাধ করে ফেলেছি মা! সম্পূর্ণ ঘটনা তার কাছে খুলে বলি। শপথ করি, যদি আব্বু আমাকে এ বই পড়তে না দেন, তবে আমি আপনাদের ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাব। এরপর খচ্চরের মূল্যের অবশিষ্ট তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে বলি, এই আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি; বই পড়া শেষ না করা পর্যন্ত আমি বের হচ্ছি না! বন্দীকে যেমন রুটি দেওয়া হয় তেমনি শুধু আহারের সময় আমার কক্ষে একটি রুটি নিক্ষেপ করে দিলেই চলবে। এরপর আম্মু আমাকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।

ঘরে ঢুকে আমি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিই। এদিকে আমার ভাই আব্বুকে গিয়ে সবকিছু বলে দেয়। তা শুনে আব্বুর চেহারা ক্ষোভে লাল হয়ে যায়। উচ্চবাচ্য শুরু করে দেন। তার বন্ধুরা বলতে থাকেন, কী ব্যাপার, হঠাৎ আপনার চেহারা লাল হয়ে গেছে দেখছি! ক্ষুব্ধ হলেন কী কারণে? আমাদের কাছে ঘটনা খুলে বলুন! এরপর আব্বু তাদের কাছে ঘটনা খুলে বললে তাদের একজন বলে উঠে, আপনার ছেলের এ ঘটনা শুনে তো ভালো লাগছে। এরপর ওই লোকটি তার আস্তাবলে গিয়ে আব্বুর খচ্চরের চেয়ে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট একটি খচ্চর এনে আব্বুকে বুঝিয়ে দেন এবং বলেন, এ খচ্চরটি আপনি ব্যবহার করুন। ছেলেকে কিছু বলবেন না; তার কাজ তাকে করতে দিন!

সানাদ বিন আলি বলেন, এরপর একাধারে তিন বছর আমি এ বইয়ের পেছনে কাটিয়ে দিই। আমার কাছে মনে হলো, যেন এক দিন অতিবাহিত হয়েছে। আব্বু এ তিন বছরের মধ্যে এক দিনও আমার চেহারা দেখেননি। আর আমি '*অ্যালমেগেস্ট*' সমাপ্ত করার বিষয়ে দৃঢ়সংকল্পকারী ও অত্যুৎসাহী ছিলাম। এর মাঝে আমি কিছু বৈজ্ঞানিক ফর্মাও তৈরি করে ফেলি। সেগুলো বগলের নিচে করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। লোকদের জিজ্ঞেস করি, বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো গবেষণাকেন্দ্র আছে কি? লোকেরা বলে, বাদশা মামুনের বন্ধুবর আব্বাস বিন সাইদ আল-জাওহারির ঘরে তারা এ ধরনের গবেষণার কাজ করে থাকে। সেখানেই সব প্রকৌশলী এবং বিশিষ্ট সব বিজ্ঞানী সমবেত হয়ে থাকে। এরপর আমি সেখানে চলে যাই। দেখি, দেশের খ্যাতনামা সব বিজ্ঞানী সেখানে উপস্থিত। সবার ছোটো শুধু আমিই। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর।

আব্বাস আমাকে দেখে বলেন, কে তুমি? কী নিয়ে গবেষণা করো? বলি, আমি আপনাদের অপরিচিত বালক, প্রকৌশল ও জ্যামিতি-বিদ্যা চর্চা করতে পছন্দ করি আমি। তিনি বলেন, কী পড়েছ তুমি? বলি, *ইউক্লিড* ও *অ্যালমেগেস্ট*! জিজ্ঞেস করেন, ভালো করে পড়েছ তো? বলি, হ্যাঁ..! এরপর পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি *অ্যালমেগেস্ট* গ্রন্থের একটি জটিল বিষয় আমাকে জিজ্ঞেস করেন; যার উত্তর আমার আস্তিনে রাখা কাগজগুলোতেই লেখা ছিল। আমি তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিই। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ উত্তর তুমি কার কাছ থেকে শিখেছ? বলি, আমি নিজেই গবেষণা করে তৈরি করেছি; কারও কাছে শুনিনি! এরপর তিনি এবং তার সাথে থাকা অন্য গবেষকগণ আমার আস্তিনে খাতা দেখে বলেন, দাও তো দেখি! খাতার পাতাগুলো উল্টিয়ে তিনি কিছুটা রেগে যান। চেহারায় অস্থিরতার ভাব ফুটে ওঠে। পাশে থাকা সেবকদের বলেন, আমার লেখা গ্রন্থটি নিয়ে আসো তো! গ্রন্থটি আনার পর তা উল্টিয়ে দেখেন যে, সব পাতা ঠিক আছে। সেখান থেকে একটি পাতা বের করে আমার লেখা বিষয়বস্তুর সাথে তা মিলিয়ে দেখেন যে, অর্থের মিল থাকলেও শব্দগুলো ভিন্ন। উভয় লেখার মাঝেই রয়েছে অভিনব সাদৃশ্য।

তিনি বলেন, এ বিষয়টি আমি *অ্যালমেগেস্ট* গ্রন্থ থেকে ব্যাখ্যা করেছি। তোমার খাতা দেখে ভাবি, আমার লেখা চুরি হয়ে গেল কি না! কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখি, তোমার লেখা আর আমার লেখা কিছুটা ভিন্ন; কিন্তু অর্থ ও ভাব একই। এরপর আমার জন্য তিনি খাবারের ব্যবস্থা করেন। স্বর্ণখচিত একটি কক্ষ বরাদ্দ করেন আমার জন্য। ওই রাতেই আমার জন্য তিনি সবকিছুর বন্দোবস্ত করে দেন। এরপর সুলতান মামুনের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে তাঁর একান্ত সঙ্গী বানিয়ে দেন। আমার জন্য মোটা অঙ্কের মাসিক বেতন এবং ঈর্ষণীয় ভাতার ব্যবস্থা করেন।' ঘটনা এখানেই শেষ।

খুব কম লোকই তখন এ রকম ভাতা পেত। ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্যে এ ভাতা চালু করে যান।[২১৫]

এরপর মুসলিম জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর দায়ভার গ্রহণ করে নেয়। এ কারণে তালিবুল ইলম এবং মুয়াল্লিমদের বর্তমান বেতন-ভাতার দায়-দায়িত্ব মুসলিম জনসাধারণের ওপর। তারাই উম্মতের এ শ্রেষ্ঠাংশের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করবে। মহাকল্যাণের কাজে তারা নিজেদের অংশীদার করবে। সে জন্যে

---

[২১৫] এ রকম আরও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে বাগিন্দির লেখা مسند عمر بن عبد العزيز গ্রন্থে : ৩১-৩৩

আল্লাহর কাছেও তারা বিরাট পুণ্য অর্জন করবে ইনশাআল্লাহ। এভাবেই মুসলিম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ আলোকিত হবে। এতিম শিক্ষার্থীরাও অনায়াসে ইলম অর্জন করতে পারবে। আর এতিমের দায়ভার গ্রহণের প্রতিদানে রয়েছে বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি।

কাফের হোক বা মুসলিম, আজকাল সব মানুষই কবলিত দেশগুলোকে বন্যা, দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে সব রকম প্রচারণা চালিয়ে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা আলিমদের মৃত্যুতে এবং তাদের বিলুপ্তির কারণে যে বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে সে ব্যাপারে কেউ কোনো কথা বলছে না। আর মুসলমান নিজেরাও আলিমদের মৃত্যুতে কী যে সীমাহীন বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে, তাও তারা টের পাচ্ছে না! হায়, তারা যদি তাদের মেধাবী সন্তানদের অন্যসব কাজ ও জ্ঞানসাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ মহান শিক্ষার জন্য অর্পণ করত, তাহলেই এই বিপদ এবং বিপর্যয়ের মাত্রা তারা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারত।

ওলামায়ে উম্মতের বিলুপ্তির কারণে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে, তার আলোচনাও যদি আজকাল মুসলমানদের মুখ থেকে উঠে যায়, তবে সেটা হবে দুর্যোগের ওপর দুর্যোগ! বিপর্যয়ের ওপর বিপর্যয়!! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

* * * *

সপ্তম পথনির্দেশ

সাথি-সঙ্গী নির্বাচন ও বন্ধুদের সাহচর্য

একটু আগেই আলোচিত হয়েছে যে জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাপক ওঠাবসা ইলম অর্জনের পথে অন্যতম একটি প্রতিবন্ধকতা। আর এখানে আমি তালিবুল ইলমের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে আলোচনা করব। পাশাপাশি তার সাধনা ও অধ্যবসায়ে তা কী রকম প্রতিক্রিয়াশীল হয়, তাও উল্লেখ করব।

মানুষ পরিবেশের সাথে বেড়ে ওঠে—প্রতিটি বিবেকবান মানুষই তা ভালো করে বোঝে। পরিবেশ তার স্বভাব ও মননশীলতায় গভীর রেখাপাত করে। ওরফ ও সমাজের রীতি-নীতি ধারণ করে প্রতিটি মানুষ। পছন্দ-অপছন্দের ইচ্ছা থাকলেও সে ওই সংস্কৃতি থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারে না। যে মানুষটি সুদূর মরুর বুকে, পাহাড়ের চূড়ায় বা বিচ্ছিন্ন কোনো উপত্যকায় বড়ো হয়, তার আচার-ব্যবহার এবং চলাফেরা কখনো বাগবাগিচা ও সবুজ-শ্যামল প্রান্তে বেড়ে ওঠা মানুষের মতো হবে না। জাহিলিয়াত যুগে ওই পরিবেশে বেড়ে ওঠা কবির কবিতা আন্দালুসের সবুজ-শ্যামল প্রান্তরে বেড়ে ওঠা কবির কবিতার মতো আকর্ষণীয় ও সৃষ্টিশীল হবে না।

বুখারি ও মুসলিম রহ. তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন :

> إن القسوة وغِلَظ القلوب في الفَدَّادين عند أصول أذناب الإبل، والفخرُ والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدّادين أهل الوَبَر، والسكينةُ في أهل الغنم.
>
> অর্থ : ‘কোনো সন্দেহ নেই, যত রুক্ষতা ও রূঢ় আচরণ সব উটের আশপাশে উচ্চবাচ্যকারীদের মাঝে। আর গর্ব ও অহংকার সব অশ্ব ও উট প্রতিপালনকারীদের মধ্যে। উট ও অশ্বের আরোহীরা পশমধারী (অহংকারী) হয়ে থাকে আর ধৈর্য ও স্থিরতা দেখা যায় ছাগলের রাখালদের মধ্যে।’[২১৬]

হাদিসের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, ঘোড়া ও উটের আরোহীরা সাধারণত গ্রাম্য ও বেদুইন হয়ে থাকে। তাদের স্বভাবে থাকে রুক্ষতা, রূঢ়তা। পালিত পশুর কিছু

---

[২১৬] বুখারি : আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত : ৩৭০১ এবং আবু মাসউদ হতে বর্ণিত : ৩৭০২। মুসলিম : ১/৭১

স্বভাব তাদের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে। অপর দিকে ধৈর্য, সহনশীলতা, নম্রতা থাকে রাখালদের স্বভাবে।

মানুষ যদি পরিবেশ, প্রকৃতি ও পালিত পশুর দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, তবে যে পরিবেশে সে বেড়ে উঠছে, যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছায়ায় সে জীবন অতিবাহিত করছে, অবশ্যই তা তার স্বভাবকে প্রভাবিত করবে।

এ ছাড়াও অনেক ছোটো ছোটো বিষয় মানুষকে প্রভাবিত করে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لا تُصاحبْ إلا مؤمنًا ، ولا يأكلْ طعامك إلا تقي.

অর্থ : 'মুমিন ছাড়া কারও সংস্পর্শে যেয়ো না। তোমার (ঘরের) খাদ্য যেন শুধু আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গই খায়।'[২১৭]

এ হাদিসের দ্বারা নবিজি ইঙ্গিত করেন যে দুই ব্যক্তির মাঝে খাদ্য বিনিময় হলে তাদের স্বভাবে এবং আচার-আচরণে তা প্রভাব সৃষ্টি করে। সে সময় খাবার খাওয়ানোকে তারা স্তন্যদানের মতো সম্পর্কস্থাপন বলে মনে করত।

ইমাম বদর বিন জামাআ রহ. তালিবুল ইলমের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীকে সব ধরনের সম্পর্কস্থাপন এবং সংশ্রব অবলম্বন ছাড়তে হবে। তালিবুল ইলমের অন্যতম দায়িত্ব হলো সম্পর্কস্থাপন বর্জন করা। বিশেষত অন্য শ্রেণির লোকদের সঙ্গে, যারা খেলতামাশা পছন্দ করে এবং যাদের চিন্তা-চেতনার অবক্ষয় ঘটেছে। কারণ, তাদের সঙ্গে মিশলে শিক্ষার্থীর মাঝেও তাদের স্বভাব ছড়িয়ে পড়বে। এর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হলো, অযথা সময় নষ্ট হয়ে যাবে প্রচুর।

তাই তালিবুল ইলম অনুপকারী বা বেফায়দা বিষয় থেকে সব সময় নিজেকে বিরত রাখবে। যেসব কাজ তাকে ইলম অন্বেষণ থেকে নির্লিপ্ত রাখে, সময় নষ্ট করে, ক্ষতি করে; সব সময় সেগুলো এড়িয়ে চলবে। কারণ, কোনো অভ্যাসে জড়িয়ে পড়লে তা ছাড়ানো খুবই কঠিন। ফকিহগণ একটি কথা প্রায়ই বলে থাকেন :

الدفع أسهل من الرفع.

অর্থ : 'আগেই এড়িয়ে যাওয়া অনেক সহজ পরে বিচ্ছিন্ন করা থেকে।'

সংশ্রব যদি অবলম্বন করতেই হয়, তবে সৎ, ধর্মভীরু, মেধাবী, হিতৈষী এবং সময়ের সদ্ব্যবহারকারীদের সংশ্রব গ্রহণ করবে; সে হবে এমন ব্যক্তি যে ভুলে

---

[২১৭] আবু দাউদ : ৪৭৯৯ তিরমিজি : ২৩৯৫

গেলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করবে। নসিহত করবে। সান্ত্বনার বাণী শোনাবে। সব সময় ধৈর্যধারণের উপদেশ দেবে।

তাসাউফ-বিশেষজ্ঞদের থেকে এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা বর্ণিত আছে। সুহবতকে তাঁরা আত্মশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। এ ব্যাপারে তাদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশটি ইমাম হাকিম রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে :

لا تصحب من لا يُنْهِضك حاله ولا يدلُّك على الله مقاله.

অর্থ : 'যার হালত তোমাকে জাগ্রত করে না, যার কথা তোমাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় না, তার সংশ্রবে তুমি যেয়ো না।'

কথাটি সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তালিবুল ইলমের বেলায় কথাটি এভাবে বলতে হবে :

لا تصاحب إلا من يُعينك على ما هو في طريق تحصيله.

অর্থ : 'তোমার উদ্দেশ্য অর্জনের পথে যে তোমাকে সহযোগিতা করে না, তার সঙ্গে তুমি ওঠাবসা করো না।'

প্রতিটি ছাত্রই যেন বিষয়টি মনে রাখে যে সমগ্র মুসলিম জাতি তাঁর অপেক্ষায় আছে। আমাদের পূর্বসূরিগণ ইলমের জন্য আত্মনিয়োগ করাকে নফল ইবাদাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

তালিবুল ইলমের সব কাজ যদি নফল নামাজ এবং নফল রোজা অপেক্ষা উত্তম হয়, তবে কী করে সে তাঁর মূল্যবান সময়কে অহেতুক পন্থায় বা হেলা-ফেলায় জীবন ধ্বংসকারীদের সঙ্গে গিয়ে নষ্ট করতে পারে?! আবার তা এক দিন দু-দিনের সঙ্গ নয়; দীর্ঘদিনের সঙ্গ..!! সন্দেহ নেই, এটি নিদারুণ দুর্ভাগ্য এবং সীমাহীন ক্ষতির নিদর্শন!!

হাফেজ সাখাভি রহ. ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর ইলমি প্রতিভা বিকাশের পেছনে ব্যাপক সহায়তাকারী কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেন। এর মধ্যে, তাঁর সঙ্গে ছিল এমন একদল প্রতিভাসম্পন্ন, প্রখর মেধাবী লোক, যারা সব সময় তাঁকে সহযোগিতা করে যেত। তাঁর কাজগুলো গুছিয়ে দিত। একজন পড়ে দিত। আরেক জন লিখে দিত। অপর জন নিরীক্ষণ করে দিত।'[২১৮]

এ রকমভাবে তালিবুল ইলম তার পুরো সময়কে অধ্যয়ন, লিখন, মুজাকারা ও মুখস্থ করার পেছনে ব্যয় করবে। এক শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষার্থীর জন্য সব সময় সহযোগী হবে। পরস্পর হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। উপদেশদাতা হবে।

---

[২১৮] الجواهر والدرر : ١/١٦١

রাতে কে কার আগে উঠতে পারে। কে বেশি করে দীর্ঘ নফল নামাজ আদায় করতে পারে। কে বেশি চাশতের নামাজ আদায় করতে পারে। কে বেশি পরিমাণে কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত করতে পারে.. ইত্যাদি ইবাদাতের কাজে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠবে। আমরা আমাদের উস্তাদ ও শায়খদেরও এরকম পরস্পর প্রতিযোগিতায় মশগুল দেখেছি।

তাছাড়া মুয়াল্লিম, মুদাররিস ও শিক্ষকগণও ছাত্রদের বারবার সতর্ক করবেন, তারা যেন কিছুতেই তালিবুল ইলম ছাড়া অন্য ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি না করে। তাদের সঙ্গে ওঠাবসা এবং মেলামেশা না করে। ছাত্রদের তারা নিয়মিত বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেবেন। তাদের উপদেশ দেবেন। এর ভালো-মন্দ সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> إنما مَثَل الجليس الصالح والجليس السَّوْء : كحامل المسك ونافخ الكِير ، فحامل المسك إما أن يُحْذِيَك - أي: يعطيَك - وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخُ الكير إما أن يَحْرِق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة.
>
> অর্থ : সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত মেশক বহনকারী এবং আগুনে ফুঁ দিয়ে লোহার জং দূরকারী কামার। মেশক বহনকারী হয়তো তোমাকে সুগন্ধি দেবে। অথবা তুমি তার কাছ থেকে সুগন্ধি ক্রয় করবে। তা না হলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও তার সুগন্ধি উপভোগ করবে। আর আগুনে ফুঁ দিয়ে লোহার জং দূরকারী কামার তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে। তা না হলে অন্তত তার থেকে দুর্গন্ধ সহ্য করবে তুমি।'[২১৯]

অন্য এক হাদিসে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত,

> قيل يا رسول الله ، أيُّ جلسائنا خير؟ فقال: مَن ذكَّركم اللهَ رؤيتُه وزاد في علمكم منطقُه وذكَّركم بالآخرة عملُه.
>
> অর্থ : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ধরনের বন্ধু উত্তম? উত্তরে তিনি বলেন, যার দর্শন আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথাবার্তা তোমার ইলমকে বৃদ্ধি করে এবং যার আমল তোমাদের আখেরাত মনে করিয়ে দেয়।[২২০]

---

[২১৯] বুখারি : ২১০১ ও ৫৫৩৪ ; মুসলিম : ৪/২০২৬ আবু মুসা আশআরি রা. হতে..

[২২০] আব্দ বিন হুমাইদ : ৬৩১ ; আবু ইয়ালা : ২৪৩৭

অষ্টম পথনির্দেশ
শায়খ বা উস্তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

উস্তাদ বা শায়খের কাছ থেকে ইলম অর্জনই ইলমে দ্বীনের মূল চাবিকাঠি। এ পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যেই তালিবুল ইলমের লক্ষ্য অর্জন এবং সফলতার রহস্য নিহিত। যে ব্যক্তি শায়খ বা নির্ভরযোগ্য আলিমদের থেকে ইলম গ্রহণ করেনি, তার ইলমের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। এ ধরনের ইলম হয়ে যাবে অন্যসব সাধারণ পেশা এবং জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধির মতো। তার দৃষ্টান্ত ওই ডাক্তার, যে প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারদের থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শেখেনি। সার্জারি শেখেনি। এ ধরনের ডাক্তারদের ওপর কেউ ভরসা করবে না। কেউ রোগী অপারেশন করাতে যাবে না তাদের কাছে। অথবা তাদের দৃষ্টান্ত ওই বিল্ডিং নির্মাণ প্রকৌশলী, যে বিজ্ঞ ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের পাশে থেকে প্রকৌশলবিদ্যা পুরোপুরি রপ্ত করেনি। বিশাল বাড়ি নির্মাণের জন্য কেউ তার দ্বারস্থ হবে না। তার কাছে ড্রয়িং করাতে যাবে না; যদি-না বিদ্যার পাশাপাশি তার থাকে বাস্তব অভিজ্ঞতা। অন্যসব পার্থিব জ্ঞান-বিদ্যার ব্যাপারেও একই কথা।

আল্লাহর এ সুমহান ধর্ম সকল বিদ্যাবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান। তাই আল্লাহর মনোনিত এ ধর্মের আকিদা, এবাদত, মুআমালাত অথবা তাফসির, হাদিসের কোনো ব্যাখ্যা, হাদিসের সহিহ বা যয়িফকরণ ইত্যাদি যাবতীয় ইসলামধর্মসংশ্লিষ্ট ইলম তাকে কোনো বিজ্ঞ শায়খ বা আলিমের সংশ্রবে থেকেই অর্জন করতে হবে। কারণ, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এ ইলম মুসলমানদের সিনা-ব-সিনা চলে এসেছে। মুসলিম মনীষীগণ যুগ যুগ ধরে নিরলস শ্রম-সাধনা আর সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এ ইলম সংরক্ষণ করেছেন।

সর্বপ্রথম তালিবুলইলম-জাতি হলেন সাহাবিগণ। তাঁরা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি হাদিস শুনেছেন অথবা অন্য কোনো সাহাবির মাধ্যমে তা জেনে নিয়েছেন। যে কোনো প্রয়োজনে তাঁরা নিজেদের জ্ঞানমতো কাজ সম্পন্ন করে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতেন। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দিতেন অথবা তাদের শুধরে দিতেন।

এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ইলম সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা চালু ছিল। সাহাবিদের পর তাবেঈন প্রজন্ম। এরপর তাবে-তাবেঈন প্রজন্ম। এরপর তাদের পরবর্তী প্রজন্ম। এরপর প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মীয় গবেষণাকেন্দ্র। দ্বীনি মাদরাসা।

প্রতিটি বিজ্ঞ আলিমকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয় বড়ো বড়ো মাদরাসা। তাঁরাই ছিলেন মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা। দ্বীনি রাহবার। তাদের আধ্যাত্মিক পীর।
এভাবেই মুসলিমসমাজে শায়খদের তালিবুল ইলমদের পিতা ও দাদা সাব্যস্ত করা হতে থাকে। বংশীয় গৌরব আখ্যায়িত করা হতে থাকে। আর যারা শায়খদের থেকে ইলম অন্বেষণ না করে ইলমের দাবি করত, ইলম নিয়ে কথাবার্তা বলত, তার দাবি ভিত্তিহীন ও বংশহীন হিসেবে অভিহিত হতো। আলিম ও শায়েখদের সিলসিলার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম নববি রহ. বলেন,

إنهم أئمتنا وأسلافنا، كالوالدين لنا.

অর্থ : 'তারাই আমাদের ইমাম। আমাদের মহান পূর্বসূরি। আমাদের পিতার মতো তারা।'[২২১]

মুসলিম বিন খালিদ যানজি রহ.-এর বৃত্তান্তে তিনি আরও বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত হাদিসশাস্ত্র বর্ণনায় ইমাম মুসলিম রা. ছিলেন আমাদের অন্যতম পিতামহ।[২২২]
ইমাম আবুল আব্বাস বিন সুরাইজের বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ المجموع-তে লেখেন, ফিকহের ধারাবাহিকতায় তিনি আমাদের অন্যতম পিতামহ।'[২২৩]
শায়খ ও উস্তাদদের তারা মনে করতেন আধ্যাত্মিক পিতা। কারণ তারা জন্মদাতা পিতার চেয়েও উৎকৃষ্ট। হেদায়াতের আলো; ফলে পানাহার দানকারী পিতার চেয়ে অবশ্যই তাঁরা শ্রেষ্ঠ।
ইবনে ওয়াহাব রহ.-এর জীবনবৃত্তান্তে বর্ণিত হয়েছে, একবার এক লোক না বুঝে ইবনে ওয়াহাব রহ.-এর সাথে দুর্ব্যবহার করে ফেলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এক ইরাকি ব্যক্তি তার ওপর প্রচণ্ডরকম ক্ষুব্ধ হয়। লোকটিকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করতে থাকে। একপর্যায়ে সে ইবনে ওয়াহাব রহ. কে লক্ষ্য করে বলে, আপনি তো আমাদের প্রদীপ, আমাদের আলো।'[২২৪]
যাদের কোনো উস্তাদ বা শায়েখ ছিল না, ইলমি জগতে তাদের কোনো মূল্যায়ন ছিল না। তারা ছিল অবহেলিত। তাদের বক্তব্য বা মন্তব্য কোনো গ্রহণযোগ্যতা পেত না ইলমি মজলিশগুলোতে। কারণ, তাদের থেকে ভুল ও সংমিশ্রণের সম্ভাবনা ছিল প্রবল।

---

[২২১] تهذيب الأسماء واللغات গ্রন্থের ভূমিকা : ১/১১
[২২২] আগের উদ্ধৃতি : ২/৯৩
[২২৩] ১/২১৪
[২২৪] ترتيب المدارك : ১/৫৬৩

الإلماع গ্রন্থে কাজি ইয়ায রহ. এবং الصلة গ্রন্থে তাঁর ছাত্র ইবনে বাশকোয়াল ইমাম ইবনুল ফারাযি থেকে বিশুদ্ধ সনদে সালেহ বিন আহমদ থেকে বর্ণনা করেন– আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি حدثنا وأخبرنا বলবে না, সে মানুষ নয়। আর অধিকাংশ মানুষের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। একবার মু'তাসিম আমার পিতাকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি ইবনে আবি দুআদের সাথে কথা বলুন! তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, যাকে আমি কখনো কোনো আলেমের আঙিনায় দেখিনি কীভাবে তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব?[২২৫]

ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, ইলমচর্চাকারীকে অবশ্যই সকল বিষয় নিরীক্ষণ করতে হবে। গবেষককে হতে হবে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ও সুদক্ষ। কিন্তু হাদিসশাস্ত্রবিদগণ এর ব্যতিক্রম। কারণ, তাদের অধিকাংশই সাধারণ মানুষের মতো। অপরাপর বিজ্ঞ আলেম, প্রসিদ্ধ কারি, খ্যাতিমান ফকিহ, ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্যিকদের মতো তারা তেমন প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় নয়। তাঁরা হয়তো হস্তশিল্পিদের কাছ থেকে হস্তলিপি শিখে নিয়ে শুনে শুনে হাদিসগুলো লিখে রাখছে।'[২২৬]

লক্ষ করুন, এখানে তিনি বলছেন আলেমের সামনে তার কোনো প্রাধান্য নেই। যে রকম মর্যাদা তাঁরা লাভ করে থাকেন, তাঁদের কাছে আগ্রহীরা যেভাবে ভিড় করে থাকেন, হাদিসশাস্ত্রবিদ ও হাদিসের লিপিকারদের কাছে শিক্ষার্থীরা তেমন ভিড় করেন না।

আবু জাফর দাউদি আল-আসাদির[২২৭] বৃত্তান্তে কাজি ইয়ায রহ. বলেন, তখনকার কায়রাওয়ানের আলিমদের বনি উবাইদের রাজত্বে বসবাসের বিপক্ষে ছিলেন তিনি। সেখানে তারা বাস করুক তা কিছুতেই চাচ্ছিলেন না তিনি। একবার তার এ অভিমত জানিয়ে তিনি তাদের কাছে চিঠি লিখলে এ বলে তারা উত্তর পাঠান, চুপ করুন! আপনার কোনো শায়েখ নেই।[২২৮]

কারণ, তিনি নিজে নিজে শিক্ষালাভ করেন। বেশির ভাগ জ্ঞানই তিনি প্রসিদ্ধ কোনো ইমামের কাছ থেকে শেখেননি। নিজে যতটুকু বুঝেছেন, সেটাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। বলা হতো, তিনি যদি শায়খের কাছ থেকে শিখতেন, তবে প্রকৃত ফিকহ অর্জন করতে পারতেন। কারণ, ওই অঞ্চলে আলিমদের বসবাস অন্যসব

---

২২৫ الإلماع : ২৮। الصلة : ১/২৫৫
২২৬ البحر الذي زخر للسيوطي : ৩/৪০২
২২৭ মৃত্যু : ৪০২ হিঃ
২২৮ ترتيب المدارك : ৩/৪০২

মুসলমানদের জন্য উপকারী ছিল। ইসলামকে বোঝা এবং ঈমানের ওপর অবিচল থাকার বিষয়ে আলিমদের উপস্থিতি তাদের জন্য সহায়ক ছিল।'

তাদের প্রত্যুত্তরের দিকে লক্ষ করুন, চুপ করুন! আপনার কোনো শায়েখ নেই।' আবার লক্ষ করুন, তিনি যদি শায়খের কাছ থেকে শিখতেন, তবে প্রকৃত ফিকহ অর্জন করতে পারতেন।' এটাই এখানে আমার বলা উদ্দেশ্য। স্বচ্ছ, পবিত্র ও নির্ভেজাল ইলম শিখতে হলে অবশ্যই শায়খের শরণাপন্ন হতে হবে।

বিষয়টি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সকল আলিমদের নিকট প্রসিদ্ধ। পূর্ববর্তীকালের আলিমদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর একটি উক্তি প্রসিদ্ধ আছে।

أدب الفقيه والمتفقه গ্রন্থে[২২৯] খতিব রহ. বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন যে একবার ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে বলা হলো, মসজিদে একটি মজলিশ চলছে, সেখানে ফিকহ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তাদের কোনো উস্তাদ আছে কি? উত্তরে বলে, না! তিনি বলেন, তবে কস্মিনকালেও তারা ফিকহ বুঝে উঠতে পারবে না।'

إسعاف المبطأ গ্রন্থে ইমাম সুয়ুতি রহ. বলেন : ইসহাক বিন মুহাম্মদ আল-ফারভিকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মালেক রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, ইলম তলব করেনি, কারও সংশ্রব অবলম্বন করেনি, এমন লোকদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবে কি? উত্তরে তিনি বলেন, না। জিজ্ঞেস করা হয়, যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য; কিন্তু সে মুখস্থ করে না এবং বোঝে না, তার কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবে কি? উত্তরে তিনি বলেন, যারা হিফজ করেছে, ইলম মুখস্থ করেছে এবং ইলম তলব করতে গিয়ে দীর্ঘকাল শায়েখদের সান্নিধ্যে থেকেছে, ইলম বুঝে তার ওপর যথাযথ আমল করেছে; পাশাপাশি সে ছিল আল্লাহভীরু, কেবল তাদের থেকেই ইলম লিপিবদ্ধ করা যাবে।

এ কারণেই মুখস্থবিদ্যা অর্জনকারী বা আত্মশিক্ষিত জ্ঞানী নিজেও পথভ্রষ্ট হবে অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। ইমাম নববি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি মাত্র দশটি কিতাব থেকে মাসআলা খুঁজবে, তার জন্য ফতোয়া দেওয়া জায়েয হবে না। কারণ হতে পারে কিতাবগুলো মানুষের মনগড়া লেখায় ও মতামতে ভরপুর। দুর্বল সনদে রচিত। যেখানে নেই কুরআন-সুন্নাহর কোনো উদ্ধৃতি।'[২৩০]

---

[২২৯] পৃষ্ঠা : ৭৯০

[২৩০] الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي : ২৭

এই যদি হয় ফতোয়া অন্বেষণকারীর অবস্থা, তবে যে ব্যক্তি শুধু একজন শায়খ থেকে জ্ঞানার্জন করল, তাও আবার গা-ছাড়াভাবে; সংশ্রবের মাধ্যমে নয়, সে তো তালিবুল ইলমদের ঐক্যকেই বিনষ্ট করে ছাড়বে। মুসলমানদের লক্ষ্যচ্যুত করে দেবে। কিতাব ও সুন্নাহের ওপর আমলের কথা বলে হাদিসের সর্বনাশ ডেকে আনবে। সহিহ থেকে যয়িফের পার্থক্য নির্ণয়ের ঐতিহ্য বিলুপ্ত করে দেবে।

ইলম লেখার গতানুগতিক পদ্ধতি নিয়েও অনেক পূর্বসূরি ও ইমাম আফসোস করেছেন। হতাশা ব্যক্ত করেছেন। কারণ, এ পদ্ধতির দ্বারা শায়খদের থেকে ইলম অর্জনের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়ে যাবে। মানুষ শুধু কিতাবনির্ভর হয়ে পড়বে। দারেমি রহ. السنن-এর ভূমিকায় এবং বায়হাকি রহ. المدخل গ্রন্থে ইমাম আওযাঈর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন, যতদিন এই ইলম আলিমদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, ততদিন তা মর্যাদাপূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন কিতাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে তাতে অযোগ্য ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।'[২৩১]

ইবনে আবদুল বার তিন জন নির্ভরযোগ্য মনীষী ইমাম মালেক, সুলাইমান আত-তাইমি ও সুলাইমান বিন হাবিব আল-মুহারিবি থেকে বর্ণনা করেন, লুকমান হাকিম তার সন্তানের উদ্দেশে নসিহতের মধ্যে বলেছিলেন,

> يا بنيَّ، جالس العلماء، وزاحِمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة، كما يُحيي الأرضَ الميتةَ بوابِلِ السماء.
>
> অর্থ : 'হে প্রিয়পুত্র, আলিমদের সঙ্গে ওঠাবসা করো। দুই হাঁটু গেড়ে তাদের সান্নিধ্যে অবিরাম বসে থাকো। কারণ, আল্লাহ তাআলা হিকমাহ দিয়ে মানুষের অন্তরগুলো জীবিত করে দেন, ঠিক যেমন আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে মৃতভূমিকে সজীব করে তোলেন।'[২৩২]

ইলম অন্বেষণের পথে মনীষীদের আত্মত্যাগ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে এর আগে বেশ আলোচনা হয়েছে। এখানে আরও দুটি ঘটনার সাথে তালিবুল ইলমদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

প্রথম ঘটনা

খতিব রহ. জাফর বিন দুরুস্তওয়াই থেকে তাঁর একটি উক্তি বর্ণনা করেন : আমরা আলি বিন মাদিনির দরসলাভের জন্য মজলিশ শুরুর আগের দিন

---

[২৩১] سنن الدارمي : ৪৬৭, المدخل : ৪১০

[২৩২] جامع بيان العلم : ৬৭৪-৬৭৭

আসরের সময় থেকে বসে থাকতাম। নিকটবর্তী জায়গা হারানোর ভয়ে রাতভর অপেক্ষা করে পরদিন তাঁর দরসের অপেক্ষায় থাকতাম। সেখানে এক বৃদ্ধকে দেখেছি চাদরে পেশাব করে তা তার সঙ্গে রেখে দিতে। প্রস্রাব করার জন্য উঠে গেলে যদি আসন হারিয়ে যায়!!

দ্বিতীয় ঘটনা

আবু আলি আল-কালি রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র আবু নাসর হারুন বিন মুসা বিন জান্দাল–আবু আলি সম্পর্কে বলেন, কর্ডোভার বিখ্যাত জামিআতুয-যাহরাতে আবু আলি বাগদাদি النوادر গ্রন্থ লেখার সময় আমরা তাঁর কাছে বিভিন্ন ইলমি বিষয় জানার জন্য উপস্থিত হতাম। তখন ছিল বসন্তকাল। একদিন দরসে যাওয়ার সময় পথের মধ্যে বৃষ্টি এসে যায়। বৃষ্টিতে ভিজেই আমি তার দরসে উপস্থিত হই। সেখানে কর্ডোভার সম্ভ্রান্ত সব লোক এবং জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

শায়খ আবু আলি আমাকে দেখে কাছে ডেকে বলেন, হতাশ হয়ো না হে আবু নাসর! খুব দ্রুতই কাপড় শুকিয়ে যাবে। এর পরিবর্তে তুমি উৎকৃষ্ট পোশাক পরবে।' তিনি বলেন, তখন আমার মনে হয়েছিল, এ কাপড় পরেই যদি কবরে যেতে পারতাম!

এরপর তিনি বলেন, আমি ইমাম ইবনে মুজাহিদ রহ.-এর কাছেও প্রায়সময় যেতাম। একবার আমি তাঁর ঘরের কাছে গিয়ে সেখানে প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ করি। খুব কষ্ট করে কোনোরকম তাঁর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখি, দরজা বন্ধ। খুলতে বিলম্ব হচ্ছে। বলে উঠি, সুবহানাল্লাহ! এত সকালে এসেও এই অবস্থা। এত ভিড়! এরপর একটি ছোটো ঘরের দিকে আমার চোখ পড়ে। সেখানে ছিল আরও বেশি ভিড়। অতি কষ্টে মানুষকে চেপে আমি রুমটির ভেতরে ঢুকে পড়ি। আমার কাপড় ছিঁড়ে যায়। ঘরের কাঠের সঙ্গে লেগে শরীরের এক জায়গায় মাংস বেরিয়ে হাড় প্রকাশ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দরজা পার হয়ে শায়খের মজলিশ পেয়ে যাই।

دَبَبْتَ للمجد والسَّاعُون قد بَلَغوا ☆ جَهد النفوس وأَلقَوا دونه الأُزُرا

فكابَدوا المجدَ حتى مَلَّ أكثرُهم ☆ وعانَقَ المجدَ مَن أوفى ومَن صَبَرا

لا تَحسَبِ المجدَ تمرًا أنت آكِلُه ☆ لن تبلُغ المجدَ حتى تَلعَقَ الصَّبِرا

অর্থ : তুমি মর্যাদার আসন লাভ করতে চাও.. অথচ প্রতিযোগীরা কঠোর পরিশ্রম আর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকাংশ ক্লান্ত-

পরিশ্রান্ত হয়ে অনেক কষ্ট করে মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছে। যারা পরিপূর্ণ শ্রম দিয়ে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে, তারাই কেবল এ সম্মানকে আলিঙ্গন করেছে। এ মর্যাদার বিষয়টিকে তুমি আহারের খেজুর ভেবো না। মনে রেখো, বিপুল ধৈর্য ছাড়া কোনোভাবেই এ মর্তবা লাভ করা সম্ভব নয়।

আবু নাসর বলেন, এরপর আমি النوادر গ্রন্থে উল্লেখের আগেই ঘটনাটি লিখে ফেলি। এগুলো আমাকে ভীষণ তৃপ্তি দেয়। আর ওই ছেঁড়া কাপড়গুলোও আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। আমি আরও বেশি করে ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করি। আমৃত্যু তাঁর সান্নিধ্যে লাভ করে ধন্য হই।'[২৩৩]

এরপর চাঁদ পূর্ণ হওয়ার আগেই শায়খ তাকে দরসদান, লেখালেখি এবং ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দিয়ে দেন। তারপরও নিয়মিত তিনি তাঁর সান্নিধ্যে যাতায়াত করেন; বরং আগের চেয়ে আরও বেশি করে আগমন করতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বয়স ও ইলম তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। বিভিন্ন মনীষীর উক্তিতে ব্যবহৃত طول زمان দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তালিবুল ইলমকে বিরতিহীনভাবে শায়খের দীর্ঘ সংশ্রব গ্রহণ করতে হবে।

এভাবেই শায়খের সংশ্রব অবলম্বনের বিষয়টি ধীরে ধীরে ইলমি বৈশিষ্ট্য থেকে ফিকহি মাসআলায় রূপ নেয়। যেমনটি আমাদের হানাফি ফকিহগণ প্রায়ই বলে থাকেন।

এটা সর্বজনবিদিত যে, নামাজ আদায়ের সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদে হারাম। এরপর মসজিদে নববি। এরপর মসজিদে আকসা। এরপর তাঁরা বলেন মসজিদে কুবা। এরপর যে মসজিদ সবচেয়ে নিকটে। এরপর যে মসজিদ সবচেয়ে বড়ো। যে মসজিদে ইলমি দরস হয়। বিশেষত উস্তাদের মসজিদ। এরপর যে মসজিদে ওয়াজ-নসিহত হয়।

অর্থাৎ তালিবুল ইলমের জন্য উস্তাদের মসজিদ সবচেয়ে উত্তম। তার জন্য কাছের বড়ো মসজিদ থেকে শায়খের মসজিদই শ্রেষ্ঠ। কারণ ওই মসজিদে সে ইলম অর্জন করবে। দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল শিখবে। শায়খের সংশ্রব লাভ

---

[২৩৩] الصلة لابن بشكوال : ৬৫৬ (১৪৪১)। আর কবিতাটি হাওত বিন রিআব আল-আসাদির সৃষ্টি। তিনি ছিলেন মুসলিম কবি। আমার মনে হয় তিনি জাহিলিয়াত যুগও পেয়েছেন। দেখুন : الأمالي لأبي علي القالي : ১/১১৩ এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ سمط اللآلي للبكري : ১/৩৩৯

করবে। এর গুরুত্ব যারা শায়খদের সংশ্রব লাভ করে ধন্য হয়েছে, কেবল তারাই ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন।[২৩৪]

পরিপূর্ণ সংশ্রব অর্জন এবং তা থেকে ফায়দা হাসিলের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রা. ছিলেন এক অনুপম আদর্শ। তিনি সাহাবির ঘরের দরজায় গিয়ে বসে থাকতেন। এরপর ওই সাহাবি বের হলে তাঁর সান্নিধ্য অবলম্বন করতেন। তাকে কাঙ্ক্ষিত বিষয় জিজ্ঞেস করতেন। হয়তো বিশ্রাম করছেন অথবা বিশেষ কোনো প্রয়োজনে আছেন– এ চিন্তা করে কোনো সময় তিনি দরজায় নক করতেন না।

ইমাম মালেক রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র এবং তাঁর খলিফা ইমাম আবদুর রহমান বিন কাসিম আল-উতাকির বৃত্তান্তেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি প্রতিদিন ভোর রাতে ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে এসে একটি, দুটি, তিনটি বা চারটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতাম। ভোর রাতেই আমি ইলমের স্বাদ অনুভব করতাম। সহজেই সবকিছু বুঝে ফেলতাম। একবার তাঁর কাছে গিয়ে তন্দ্রার ঘোরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। এরই মধ্যে ইমাম মালেক রহ. ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে চলে যান। আমি টের পাইনি। কিছুক্ষণ পর তার দাসী এসে পা দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিয়ে বলে, তোমার মনিব বেরিয়ে গেছেন। তিনি তোমার মতো তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না। অমনোযোগী হন না। আজ ৪৯-বছর হলো তিনি ইশার অজু দিয়ে ফজর আদায় করে চলেছেন!![২৩৫]

---

[২৩৪] এই বক্তব্যটি আমার নিজস্ব। أدب الاختلاف গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তা যুক্ত করি। কারণ, সংশ্রবের দ্বারাই ইলমের পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হয়।
একবার আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রাণপ্রিয় শায়খ আবুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর সঙ্গে মসজিদে কুবাতে তারাবিহর নামাজে উপস্থিত ছিলাম। ঘটনাটি ছিল কিতাবের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে। সেখানে আমরা নামাজের ইকামাতের অপেক্ষায় ছিলাম। মুজাকারা করছিলাম যে, مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب। এ কথা শুনে শায়খ আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, উত্তম হলো এভাবে বলা– مذهبنا صواب ويحتمل الخطأ ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب তার এ সতর্কবাণীর কারণে সেদিন আমি অনেক খুশি হয়েছিলাম। বারবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছিলাম। এর অর্থের গভীরতা নিয়ে ভাবছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও চিন্তা করছিলাম, শায়খের সান্নিধ্যে থাকার কারণেই আজ এত সুন্দর একটি বিষয় আমি শিখতে পেরেছি। এভাবেই আমি শায়খের সান্নিধ্যে থাকার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি অধিক উপলব্ধি করতে থাকি।

[২৩৫] ترتيب المدارك : ১/৫৭৩

মনিবের সান্নিধ্যে বেশি বেশি দেখার কারণে দাসী তাকে একজন দাস ভেবেছিল। কারণ, আরামের ঘুম হারাম করে এ ভোররাতে দাস ছাড়া কেউ মানুষের পাশে থাকে না।

আল্লাহ তাঁকে রহম করুন, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!!

আর বর্তমানকালের তালিবুল ইলমরা এক-দুই বছর শায়খের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেই নিজেকে আলিম বলে দাবি করতে থাকে। নিজে নিজে ইলম অন্বেষণ ও বিভিন্ন পত্রিকা-ম্যাগাজিন অধ্যয়ন করা শুরু করে। বিষয়টি আসলেই আশ্চর্যের। এভাবে কস্মিনকালেও ইলম অর্জিত হবে না। ইলমের সুঘ্রাণ সে লাভ করতে পারবে না।

ইবনে আবদুল বার হাকিমুল উম্মাহ আবু দারদা রা. হতে বর্ণনা করেন :

مِن فِقه الرجل مَمشاه ومَدخَلُه ومخرَجه مع أهل العلم.

অর্থ : 'ফকিহ হতে হলে অবশ্যই তার চলাফেরা, ওঠাবসা, আগমন-প্রস্থান সবই হতে হবে আহলে ইলমের সাথে।'[২৩৬]

তাদের ওসিয়ত ছিল–

حيثما كنتَ فكن قربَ فقيه.

অর্থ : 'যেখানেই থাকো, ফকিহের সান্নিধ্যে থাকো।'

একটি ঘটনা : এ ওসিয়তসংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি; যদিও সেটি আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইবনে আবি খাইসামা রহ.-এর রচিত التاريخ الكبير গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : আবদুল্লাহ বিন আবু মুসা আত-তাসাত্তুরি বলেন, আমাকে বলা হয়, তুমি যেখানেই থাকবে, ফকিহের সান্নিধ্যে থাকবে।' তিনি বলেন : এরপর আমি বৈরুতে ইমাম আওযাঈর কাছে আসি। তিনি আমার নিজের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমি আমার সার্বিক অবস্থা তাঁর কাছে খুলে বলি। আরও বলি, এর আগে আমি ছিলাম অগ্নিপূজারি; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমার পিতা কি জীবিত? উত্তর দিই, হ্যাঁ.. ইরাকে আছেন; তিনিও অগ্নিপূজারক। বলেন, তুমি কি এখন তার কাছে ফিরে যেতে পারবে? হতে পারে আল্লাহ তোমার হাতে তাকে হেদায়াত দিয়ে দেবেন! আমি বলি, আপনি আমাকে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন? বলেন, হ্যাঁ..!

---

[২৩৬] جامع بيان العلم : ৮২১

এরপর আমি আব্বুর কাছে ফিরে এসে দেখি তিনি অসুস্থ। তিনি বলেন, বাবা, তুমি কোন ধর্মের ওপর আছ? আমি তাকে আমার ইসলামগ্রহণের বিষয়টি জানাই। তিনি বলেন, তোমার ধর্মটা আমার কাছে উপস্থাপন করো! এরপর আমি তাকে ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্পর্কে অবহিত করি। তিনি বলেন, আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।' ওই অসুস্থতার মধ্যেই তিনি মারা যান। আমি তাঁকে দাফন করে ইমাম আওযাঈর কাছে ফিরে এসে ঘটনার আগাগোড়া বর্ণনা করি।

'যেখানেই থাকবে, ফকিহের সান্নিধ্যে থাকবে' কথাটির তাৎপর্য এখানেই লক্ষণীয়।

উস্তাদের সংশ্রব ও দীর্ঘকাল অধ্যবসায়

বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তাবেঈ নুআইম বিন আবদুল্লাহ আল-মুজমিরের বৃত্তান্তে ইবনে হিব্বান রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক রহ. বলেন : নুআইম আল-মুজমির আবু হুরায়রা রা.-এর কাছে বিশ বছর নিয়মিত যাতায়াত করেছেন। তাঁর সান্নিধ্য অবলম্বন করেছেন।'[২৩৭]

নির্ভরযোগ্য হাফিজুল হাদিস হামিদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালখির বৃত্তান্তে তার সম্পর্কে ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, তিনি পুরো জীবন কাটিয়ে দেন ইবনে উয়াইনার সংশ্রবে।'[২৩৮]

খ্যাতিমান ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন তাবেঈ সাবিত আল-বুনানি রা. সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে তিনি আনাস বিন মালিক রা.-এর সংশ্রবে দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছেন।'[২৩৯]

ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : তাঁদের যুগে একজন শিক্ষার্থী একাধারে ত্রিশ বছর শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করত।'[২৪০] খুব সম্ভবত তিনি নিজের কথাই বলছেন।

কথাটি বলার পর আবু নুআইম ইমাম মালেক রহ.-এর অপর ছাত্র নাফে বিন আবদুল্লাহর একটি উক্তি বর্ণনা করেন : আমি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর মালেক রহ.-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। প্রতিদিন ভোরে তাঁর কাছে আসতাম। আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যেতাম।'

---

২৩৭ الثقات : ৫/৪৭৬

২৩৮ الثقات : ৮/২১৮

২৩৯ السير : ৫/২২২

২৪০ الحلية : ৬/৩২০

مناقب أبي حنيفة-তে বর্ণিত : একবার আবু হানিফা রহ. কে জিজ্ঞেস করা হলো, এ ফিকহ আপনি কোত্থেকে লাভ করেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি বেড়ে উঠেছি ইলম ও ফিকহের প্রাণকেন্দ্রে। সেখানে দীর্ঘদিন আহলে ইলমের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। হাম্মাদ নামক একজন বিজ্ঞ ফকিহের কাছে আমি ফিকহের বিষয়ে উপকৃত হয়েছি। এত দীর্ঘ সময় তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছি যে, আমার মতো এত দীর্ঘ সময় আর কেউ তাঁর সান্নিধ্যে কাটায়নি। আমি খুব বেশি রকম প্রশ্ন করতাম তাঁকে। কখনো কখনো তিনি বিরক্ত হয়ে বলতেন, হে আবু হানিফা, আমার বাহু ফুলে উঠেছে, হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে গেছে।[২৪১]

লক্ষ করুন তাঁর উক্তি—'আমি বেড়ে উঠেছি ইলম ও ফিকহের প্রাণকেন্দ্রে। সেখানে দীর্ঘদিন আহলে ইলমের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি।' বোঝা গেল, উপযুক্ত পরিবেশ পরিপক্ব ইলম অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। সেটি হতে পারে তার পরিবার অথবা বন্ধুবান্ধব। এভাবেই সে ধীরে ধীরে ইলমি পরিমণ্ডলে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে।

এরপর লক্ষ করুন 'সেখানে দীর্ঘদিন আহলে ইলমের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি'। বোঝা গেল, তালিবুল ইলমকে অবশ্যই একজন সত্যনিষ্ঠ ও বিদগ্ধ আলেমে দ্বীনের সান্নিধ্য অর্জন করতে হবে দীর্ঘ সময় ধরে।

ইলম তলবের এ চিরন্তন ঐতিহ্য পূর্ববর্তীকালের মনীষীদের মতো পরবর্তী কালের মনীষীদের মাঝেও প্রচলিত ছিল। আল্লামা ফকিহ আবু নুজাইম[২৪২] বলেন : এ কথার উদ্দেশ্য হলো, ইলম অর্জনের লক্ষ্যে বড়োদের কাছে ভিড় না করলে কোনোভাবেই তার ইলম স্বীকৃত হবে না। ইলম অর্জিত হয় বেশি করে অধ্যয়ন, পুনঃপাঠ এবং শায়খ থেকে গ্রহণের দ্বারা।'[২৪৩]

আর তাই যে ব্যক্তি আলেমদের থেকে ইলম শেখেনি। দীর্ঘকাল তাদের সংশ্রবে কাটায়নি; কী করে তারা আলেমদের সম্মান বুঝবে?! বাক্‌শক্তি ও লেখনীশক্তি অর্জনের পাশাপাশি তালিবুল ইলমকে আদব ও শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত হতে হবে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সর্বক্ষেত্রে উস্তাদের সাথে আদব বজায় রাখতে হবে। এমনকি যারা ইলম লাভ করেনি, তারাও আলিমদের সম্মানের চোখে দেখবে! কারণ, আলিমদের রয়েছে আল্লাহর কাছে বিরাট মর্যাদা। যারা আলিমদের সঙ্গে মহব্বত রাখে, আলিমদের প্রতি সুধারণা পোষণ করে, আলিমদের থেকে উপকৃত

---

[২৪১] مناقب أبي حنيفة للموفق المكي : ৫২-৫৩
[২৪২] মৃত্যু : ৯৭০ হিজরি
[২৪৩] قانون التأويل : ৪৫১-৪৫২

হওয়ার ইচ্ছা রাখে এবং আলিমদের দেখানো পথে চলার চেষ্টা করে, তাদের উচিত আলিমদের সঙ্গে আরও বেশি করে আদব ও শিষ্টাচার অবলম্বন করা।

ইমাম মুহাম্মদ আল হারিসি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, আমি আমার উস্তাদ হাম্মাদ বিন সুলাইমান রহ.-এর সম্মানার্থে তাঁর ঘরের দিকে কখনো পা প্রসারিত করেনি। তাঁর ও আমার ঘরের মাঝে ছিল সাত গলির ব্যবধান।'[২৪৪]

مناقب الشافعي -তে বায়হাকি রহ. ইমাম শাফেঈ রহ.-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেন : আমি মদিনায় এসে মালিক বিন আনাস রা.-এর ইলমি সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি উপলব্ধি করি। ফলে আমার মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আরও বেড়ে যায়। কখনো কখনো তাঁর মজলিশে বসা অবস্থায় পাতা উল্টানোর সময় তার সম্মানার্থে ধীরে ধীরে পাতা উল্টাতাম; যেন পাতা উল্টানোর আওয়াজের কারণে তাঁর দরসে ব্যাঘাত না ঘটে।'[২৪৫]

এরপর তিনি রবি বিন সুলাইমানের উক্তি বর্ণনা করেন : আল্লাহর শপথ! শাফেঈ রহ. আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আর আমি পানি পান করছি, এ রকম সাহস কখনো হয়নি আমার।'[২৪৬]

নিম্নোক্ত বাণী তাঁদের বেলায় যথার্থ মনে হয়–

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ☆ ولو عظَّموه في النفوس لعَظَّما

অর্থ : আহলে ইলম যদি ইলমের মর্যাদা রক্ষা করে, তবে ইলমও তাদের রক্ষা করবে। অন্তর দিয়ে যদি তাঁর প্রতি মহিমা প্রদর্শন করে, তবে ইলমও তাদের মহিমান্বিত করবে।

এই ছিল উস্তাদ ও ইমামদের সাথে তাঁদের শিষ্টাচারের ইতিহাস। শায়খদের সঙ্গে শিষ্টাচার ও আদবি লেহায বজায় রাখলে নিশ্চিতভাবে সেও অন্যদের থেকে একদিন শিষ্টাচার লাভ করবে। যদি তাঁদের মতো শিষ্টাচার অবলম্বন সম্ভব না হয়, তবে অন্তত তাদের সাদৃশ্য ধারণের প্রয়াস চালানো উচিত। আল্লাহই সবকিছু সহজ করে দেবেন, যদি তিনি চান। অপর দিকে যে এসব শিষ্টাচার থেকে বঞ্চিত হয়, সেই তো চিরবঞ্চিত!

---

[২৪৪] عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان : ২৯৩

[২৪৫] মানাকিবুশ শাফেঈ : ২/১৪৪

[২৪৬] المناقب : ২/১৪৫ المدخل : ৩৯০

ইমাম আবু ইসহাক শাতিবি রহ.-এর রচিত الموافقات গ্রন্থে শায়খের কাছে গিয়ে ইলম অর্জন বিষয়ের অনেক তাগিদ বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমি তার সারমর্ম উল্লেখ করছি। মূল ইবারাত অনেক লম্বা। তিনি বলেন :

১২ নং ভূমিকা : লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং কার্যকরী পথ হলো, যে কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষক এবং বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে পুরোপুরি নিয়ম মেনে তা গ্রহণ করা। ইলম অর্জনের জন্য মুআল্লিম দরকার কি না এ ব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে। মতবিরোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে বাস্তবতা নিরীক্ষণ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সুদক্ষ প্রশিক্ষক ছাড়া কোনো বিদ্যাই অর্জন করা সম্ভব নয়। শাখাগত কিছু বিষয়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেও পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষই এটি ভালোভাবে বোঝেন এবং অকপটে স্বীকার করে নেন।'[২৪৭]

তারা বলেন, ইলম একসময় ছিল আলিমদের সিনায়। এরপর তা বিভিন্ন কিতাবে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু এর চাবিকাঠি এখনো আলিমদের কাছেই রয়ে গেছে। এর দ্বারা ইলম অর্জনের জন্য বিদগ্ধ আলিমে দ্বীনের প্রয়োজনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, কিতাব ও শায়খ ছাড়া তাদের সামনে দ্বিতীয় কোনো উৎস নেই।

বিষয়টি একটি হাদিস থেকেই উপলব্ধি করা যায় :

> إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء.
>
> অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মানুষদের থেকে উপড়ে নেওয়ার মতো করে ইলম উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে নিয়ে ইলমের বিলুপ্তি ঘটাবেন।[২৪৮]

বোঝা গেল, বিজ্ঞ আলিমগণই ইলমের স্থপতি, ইলমের সূতিকাগার, ইলমের ধারক-বাহক।

আরও বোঝা গেল, ইলম শুধু মনোনীত ও নির্বাচিত ব্যক্তিদের থেকেই গ্রহণ করা হবে; যিনি হবেন সমকালীন সকল আলিম ও জ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

---

[২৪৭] ১/৯১-৯৯

[২৪৮] البخاري : ১০০ ومسلم : ৪/২০৫৮

একজন বস্তুনিষ্ঠ আলিমের মধ্যে চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি

১. তিনি হবেন ইলমের মূলনীতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত।

২. পরিষ্কারভাবে নিজের ভাবপ্রকাশের ওপর ক্ষমতাবান।

৩. ইলমের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

৪. বিরুদ্ধবাদীদের আরোপিত সকল সংশয় ও প্রশ্ন নিরসনে তৎপর এবং উদ্যোগী।[২৪৯]

পূর্বসূরিদের জীবনেতিহাস ঘাঁটলে আমরা উপরিউক্ত সবক'টি শর্তই তাঁদের মাঝে পুরোপুরিভাবে খুঁজে পাই। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাঁদেরকে আমরা এ সকল গুণে গুণান্বিত দেখতে পাই। তবে ভুলের ঊর্ধ্বে নয় কেউই। ত্রুটি প্রকাশ পাওয়া আলিম হওয়ার পথে কোনো বাধা নয়, ইমাম হওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধক নয়। তবে যে পরিমাণ শর্ত লোপ পাবে, ততটুকু ইলমের মর্যাদা ও স্তর তার থেকে কমে যাবে। শর্তগুলো পূরণ না করা পর্যন্ত কখনো তার স্তর পূর্ণ হবে না।

*** অনুচ্ছেদ**

স্বনির্ভর ও স্বীকৃত আলিম চেনার কিছু নিদর্শন ও আলামত রয়েছে; দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে কিছু কিছু বিষয়ে অমিল দেখা গেলেও উক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তাদের মাঝে পুরোপুরি মিল পাওয়া যাবে।

প্রথম : নিজের জ্ঞান অনুপাতে তিনি আমলে সচেষ্ট হবেন। তার কথার সঙ্গে কাজের পুরোপুরি মিল থাকবে। একটি অপরটির সাংঘর্ষিক হলে কোনোভাবেই তিনি ইমাম হতে পারবেন না। আর আদর্শ হিসেবেও তাকে গ্রহণ করা যাবে না।

দ্বিতীয় : তিনি হবেন কোনো নির্ভরযোগ্য ও সত্যনিষ্ঠ আলিম থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী। শায়খদের প্রতিপালিত ব্যক্তিত্ব। শায়খদের সংশ্রব পেয়েছেন সুদীর্ঘকাল। এ ধরনের ব্যক্তিদের মাঝেই পাওয়া যাবে উপরিউক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য। সালাফে সালেহিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও এটি।

ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবিগণ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবত লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর সকল কথা ও কাজকে তারা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া সকল কথা তারা মুখস্থ করে জীবনভর সেগুলোর প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

---

[২৪৯] الإفادات والإنشادات للإمام الشاطبي : ১০৭

হুদায়বিয়ার সন্ধির মূল সময়ে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে ওমর রা. বলেছিলেন :

ألسنا على حق وهم على باطل؟!

'আমরা কি সত্যের ওপর আর তারা কি মিথ্যার ওপর নয়?!'

এটাই ছিল সংশ্রব ও সঙ্গলাভের প্রধান সুবিধা। যখন চোখ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শুরু করে, ফেতনা ও অন্ধকারে ছেয়ে যায় চারদিক, সংশয় দেখা দেয় সব জায়গায়, তখন আলিমদের অনুসরণ করা এবং তাদের মতাদর্শের ওপর অবিচল থাকার মতো মহান নেয়ামত লাভ হয় এই সংশ্রবের দ্বারাই। সাহল বিন হুনাইফ রা. সিফফিন যুদ্ধের সময় বলেছিলেন :

أيها الناس، اتَّهموا رأيكم، والله لقد رأيتُني يوم أبي جَنْدَل ولو أني أستطيع أن أردَّ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته.

অর্থ : 'হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে এসো! আল্লাহর শপথ! হুদায়বিয়ার সন্ধির মুহূর্তে আবু জান্দালকে কাফেরদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় মনে মনে আমি ভেবেছিলাম, এ মুহূর্তে আমার যদি রাসুলের আদেশ অমান্য করার সামর্থ্য থাকত, আমি তা অমান্য করে হলেও আবু জান্দালকে কাফেরদের হাত থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করতাম।'

কথাটি তিনি সংশয়ের মুহূর্তে দৃঢ় ও অবিচল থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই রাসুলের সিদ্ধান্তের সামনে সীমাহীন ধৈর্যের পরিচয় দেন। অবশেষে মহাবিজয়ের সুসংবাদবাহী আল-কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। সকল সন্দেহের অবসান হয়।

পরবর্তীকালে এ রীতিই মুসলমানদের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়। সাহাবিদের পর তাবেঈনও একই পথ ও পন্থার অনুসরণ করে তাঁদের মতো ধর্মীয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে সফলতার স্বাক্ষর রাখেন।

এ রীতি-সংস্কৃতি প্রমাণ করবার জন্যে এটি উপলব্ধি করাই যথেষ্ট যে আপনি দেখবেন, যত আলিম এবং হাফিজুল হাদিস মানুষের মাঝে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা সবাই সমকালের বিখ্যাত ও আচারনিষ্ঠ আলিমদের সংশ্রবে থেকেছেন দীর্ঘকাল। কথা ও কাজে তাঁদের গ্রহণ করেছেন আদর্শ হিসেবে। খুব কম সময়ই এর ব্যত্যয় ঘটেছে। অপর দিকে অধিকাংশ সুন্নাহবিরোধী ব্যক্তিই এ পদ্ধতি বর্জন করে পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হয়েছে।

এ কারণেই শায়খদের সংশ্রব ত্যাগ করা এবং তাঁদের এ ঐতিহ্য বর্জন করার ফলে ইবনে হাযেম আয-যাহেরি চরম অপবাদ এবং সমালোচনার মুখে পড়েছেন। তার বিপরীতে এ ঐতিহ্য অবলম্বন করে সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞ আলিম মানুষের মাঝে আলো ছড়িয়েছেন, যাদের মধ্যে মাযহাবপ্রণেতা চার ইমামও আছেন।

তৃতীয় : সব বিষয়ে উস্তাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। যেমন সাহাবিগণ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আর তাবেঈগণ করেছিলেন সাহাবিদেরকে। এভাবে প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক শতাব্দীতে মুসলিম মহাপুরুষগণ একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এ ঐতিহ্য অবলম্বনের ফলে ইমাম মালেক রহ. সমকালীন অপরাপর মনীষীদের থেকে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন। মানুষের জন্যে বেশি উপকারী এবং ইলমি ময়দানে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তি হিসেবে সুনাম কুড়িয়েছেন। আর এ পদ্ধতির যখন বিলুপ্তি ঘটবে, তখন নানা দিক দিয়ে বিদআত ও কুসংস্কার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে। কারণ, ইকতিদা বর্জনই হলো প্রধান বিদআত, যার উৎপত্তি প্রবৃত্তিপূজা থেকে।

*** অনুচ্ছেদ**

বোঝা গেল আলিমদের থেকেই ইলম অর্জন করতে হবে। আর তা অর্জনের জন্য রয়েছে দুটি পন্থা–

মৌখিক পন্থা। দুটি কারণে এ পন্থাটি সবচেয়ে বেশি উপকারী, বেশি কার্যকরী এবং বেশি প্রতিক্রিয়াশীল :

প্রথম পন্থা : এটি তালিবুল ইলম ও মুয়াল্লিমের মধ্যে চলমান একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য। ইলম ও আহলে ইলমের সঙ্গে যারাই ওঠাবসা করে, তারাই বিষয়টি ভালো রকম জেনে থাকে। এমন অসংখ্য মাসআলা আছে, শিক্ষার্থী শত বার পড়ে, মুখস্থ করে কিংবা তাকরার করেও বুঝে উঠতে পারে না। যখনই এটি সে উস্তাদের কাছে উত্থাপন করে, উস্তাদ মুহূর্তের মধ্যে তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে সে তা বুঝে নেয়। উস্তাদের সান্নিধ্যে তালিবুল ইলমের যে দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন হয়, তা অন্য কোনো পন্থায় হয় না। উস্তাদের কাছে অবস্থান এবং শায়খের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে তার মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটে। মুসলিম শরিফের হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ উক্তিটিও এখানে স্মরণীয় :

لو تَدومون على ما تكونون عندي وفي الذِّكر لصافحتكم الملائكة على فُرُشكم وفي طُرُقكم.

অর্থ : 'আমার সান্নিধ্যে থাকাকালে এবং জিকির করার সময় তোমাদের যে অবস্থা হয়, তা যদি সব সময় তোমাদের মাঝে থাকে, তবে তো ফেরেশতারা পর্যন্ত বিছানায় এবং পথেঘাটে তোমাদের কাছে এসে মুসাফাহা করতে থাকবে।'[২৫০]

দ্বিতীয় পন্থা : মুসান্নিফদের তাসনিফাত এবং লেখকদের লিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠ। দুটি শর্তসাপেক্ষে এ পন্থাটিও অনেক কার্যকরী :

১. কাঙ্ক্ষিত ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিভাষাগুলো কমপক্ষে এতটুকু বোঝার যোগ্যতা রাখা, যেটুকু কিতাব অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজন। প্রথমে তা বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে মৌখিকভাবে শিখে নিতে হয়। আলিম ও শায়খদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া শুধু কিতাব তালিবুল ইলমের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনবে না। এটিই সমাজে প্রচলিত এবং চিরন্তন রীতি। বোঝা গেল, শায়খদের থেকে ইলম অর্জন ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়।

২. পূর্ববর্তীকালের মনীষীদের (মুতাকাদ্দিমীন) কিতাব থেকে ইলম অন্বেষণ করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ, তাঁরাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরবর্তী মনীষীদের তুলনায় অধিক বিজ্ঞ। বিপুল 'তাজরেবা'র পাশাপাশি 'খবর' সংগ্রহের যোগ্যতাও ছিল তাদের বেশি।

তাজরেবা : এটি সব বিদ্যার ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, পূর্ববর্তীকালের গবেষকগণ যে ইলমি গভীরতা অর্জন করতে পেরেছেন, পরবর্তীকালের গবেষকগণ তা কখনো পেরে উঠতে পারেননি। শরিয়তের বিষয়ে সাহাবিদের ইলম ছিল তাবেঈদের ইলম থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। আর তাবেঈদের ইলম ছিল তাবে-তাবেঈনদের ইলম থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। এ ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত চলে আসছে। মনীষীদের জীবন ও কর্ম অধ্যয়নকারী প্রত্যেকেই বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

খবর : হাদিসে বর্ণিত আছে,

خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.

অর্থ : 'শ্রেষ্ঠ মানুষ আমার শতাব্দীর মানুষ। এরপর যারা তাদের পরবর্তী শতাব্দীতে আসবে। তারপর যারা ওদের পরবর্তী শতাব্দীতে আসবে।'

---

[২৫০] ৪/২১০৬

এ হাদিসে স্পষ্ট ইঙ্গিত এসেছে যে ইলমের ময়দানে পরবর্তীকালের লোকেরা ক্রমেই পূর্ববর্তী কালের লোকদের থেকে দুর্বল ও স্বল্পজ্ঞানী হতে থাকবে।
এ বিষয়ে ইমাম আবু ইসহাক শাতিবি রহ. অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন, এ কারণেই পূর্ববর্তীকালের মনীষীদের লিখিত কিতাব, তাঁদের উক্তি এবং জীবনাচার সব ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালের মনীষীদের তুলনায় অধিক উপকারী এবং বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। বিশেষত এ ইলমে শরিয়তের ক্ষেত্রে, যা একটি শক্ত রশি এবং দুর্ভেদ্য প্রাচীর। আল্লাহই সবকিছুর সামর্থ্যদাতা।'
ইমাম শাতিবি রহ.-এর কথা এখানেই শেষ হলো।

গ্রন্থকে শায়খ বানানো থেকে সতর্ক হন!

প্রতিটি আহলে ইলম বিষয়টি ভালো রকম উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্ববর্তীকালের কিছু আলেম থেকে ইলম বর্ণনায় শাব্দিক ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে। যার ফলে শুধু গ্রন্থ থেকে ইলম অন্বেষণের বিষয়ে তাদের মাঝে চরম সতর্কতা অবলম্বনের রীতি দেখা গেছে। একে তারা দুটি নামে অভিহিত করে থাকেন–

১. সব ধরনের উক্তির বিষয়ে বলে থাকেন التصحيف والتحريف

২. আর বিশিষ্টজনদের ক্ষেত্রে ঘটলে বলে থাকেন المؤتلف والمختلف

নিম্নোক্ত উক্তিটিও তাদের মাঝে প্রসিদ্ধি পেয়েছে–

لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي.

অর্থ : 'কুরআনের জ্ঞান তোমরা আমার মুসহাফ থেকে গ্রহণ করো না। ইলমে দ্বীনকে আমার কিতাব থেকে সংগ্রহ করো না।'

পাশাপাশি কিতাবকেই একমাত্র শায়খ বানানো যাবে না। এ ব্যাপারে চরম সতর্কতা অবলম্বনের বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে মনীষীদের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে।

ইমাম আওযাঈ রহ.-এর বৃত্তান্তে এ সতর্কীকরণ বিষয়ে একটি সুন্দর যুক্তি উপস্থাপন করেছেন ইমাম যাহাবি রহ.। সে যুগে নুকতা ও 'তাশকিলের' রীতি চালু না থাকার কারণে অর্থ ও শব্দ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল।

আমি বলব, হ্যাঁ.. মুদ্রণসংস্কৃতি আসার পর পরবর্তী সময়ে নুকতা ও তাশকিলের পদ্ধতি চালু হয়েছে। কিন্তু এই মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগেও আমরা পূর্বের তুলনায় বেশি প্রমাদ ও ভুল লক্ষ করছি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুদ্রিত হোক বা সম্মিলিত উদ্যোগে–এ রকম ভুল ঘটছে তিন কারণের যে কোনো একটি কারণে–

১. কিছু ভুল তো ক্ষমার যোগ্য; অনিচ্ছাকৃতভাবেই মানুষের অনেক ভুল হয়ে যায়। গবেষক ও প্রকাশকের শত চেষ্টা ও নিরীক্ষণের পরও কোনো-না-কেনোভাবে ভুল থেকেই যায়।

২. অনেক সময় প্রকাশক বা নিরীক্ষকের দুর্বল নিরীক্ষণের ফলেও এ ধরনের মুদ্রণজনিত ভুল থেকে যায়। ফলে তারা আর কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিরীক্ষক ভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ায় অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাতে ভুলের অনুপ্রবেশ ঘটে যায়। বর্তমানের বাস্তবতাই এর প্রধান সাক্ষী।

আমি বলব, আমাদের এই উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ ইলমি রত্নভান্ডারে এ ধরনের বিকৃত সংস্কৃতি চালু হওয়ার ফলে আমাদের ইলমে দ্বীন এখন বিরাট হুমকির সম্মুখীন। দ্বীন ও ধর্ম এখন চরম ক্ষতিগ্রস্ততা এবং বিপদের মুখে।

এখান থেকেই সহিহ সনদে সত্যনিষ্ঠ আলিমদের থেকে ইলমগ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শায়খ বা উস্তাদদের কাছ থেকে যারা ইলম অর্জন করছে, তাদের থেকেই শুধু ইলম অন্বেষণ করতে হবে। কারণ, বাস্তবতা খুবই ভয়াবহ। ইলমি ময়দান এখন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। বিষয়টির দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতেই আমি এ কঠিন ভাষা ব্যবহার করছি।

ভার্সিটি-শিক্ষাকে ইলমে শরিয়তের ওপর প্রাধান্যদান প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী যুগে ইলম অন্বেষণের জন্য শায়খদের কাছে বাহনের ভিড় জমত। উপচেপড়া জনজট দেখা যেত। তালিবুল ইলমরা আলিমদের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে থাকত ইলম শেখার আশায়। সেখানে তারা বিভিন্ন বিষয় শায়খদের কাছে পাঠ করে শোনাত। সব বিষয়ের মৌলিক কথাগুলো মুখস্থ করে নিত। তালিবুল ইলমরা ধীরে ধীরে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠত। তাদের এ অর্জনপন্থা ছিল দু-ভাবে—সরাসরি শায়খদের থেকে শুনে, গ্রহণ করে এবং ব্যক্তিগতভাবে নিরলস অধ্যয়নের মাধ্যমে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শায়খদের থেকে গ্রহণের পর তারা অধিক ব্যুৎপত্তি অর্জনকল্পে বিভিন্ন কিতাব মুতালাআ করত। এভাবেই তারা এ রকম স্তরে পৌঁছে যেত, যেখান থেকে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষার্থী এবং সাধারণ মুসলমান উপকৃত হতো। তাঁদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করত। যদিও পূর্বের তুলনায় পরবর্তী যুগে ইলমি দক্ষতা এবং পারদর্শিতা তুলনামূলক হ্রাস পেয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি আমরা এক কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। যেমনটি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন : يرقق بعضها بعضا

‘সেকালে এক বিষয় অপর বিষয়কে হালকা করে দেবে।’[২৫১]

---

[২৫১] رواه مسلم : ৩/১৪৭২

ভয়াবহ প্রথম পর্যায়

শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতির শর্ত ছাড়াই শরিয়া কলেজগুলোতে ইলমে দ্বীন শিক্ষাদান করা হয়। ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের ওপর সার্বক্ষণিক ক্লাসে উপস্থিত থাকার শর্তারোপ করা হয় না। পাশাপাশি ইলমে শরিয়তের প্রাইমারি এবং মাধ্যমিক শ্রেণিগুলোতেও সে অধ্যয়ন করে আসে না। জেনারেল প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্তর পার হয়ে সরাসরি শরিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে যায়। ইলমে দ্বীনের ভিত্তি এবং তার প্রাথমিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সে থাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

এ রকম শিক্ষার্থীরা ভার্সিটির স্তরে উন্নীত হয়ে শরিয়া বিভাগে ভর্তি হয়। সেখানে চার বছর পড়াশোনা করেই মুদাররিস এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দ্বীনের ধারক-বাহকরূপে বেরিয়ে যায়। নিজেকে সে আলিম ভাবতে থাকে। প্রতিটি মজলিশ ও অধিবেশনেই সে মনগড়াভাবে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে কথা বলতে শুরু করে।

প্রতিটি মানুষের বয়স তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা :

১. জন্ম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সময়ের হিসাবে বয়স।

২. আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা অনুযায়ী তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার বয়স।

৩. ইলমি বয়স; যা শুরু হয় ইলমি অঙ্গনে তার বিচরণের সময় থেকে।

আর তাই যে শিক্ষার্থী শরিয়া বিভাগে চার বছর পড়াশোনা করেছে, তার বয়স তো শুধু চার বছর। কারণ, এর আগে সে ছিল জেনারেল সাবজেক্টের স্টুডেন্ট। ইলমে দ্বীন সম্পর্কে সে ছিল জাহেল। আর সে এই চার বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষের সামনে দ্বীন প্রচার করতে শুরু করেছে। পরবর্তী প্রজন্মকে দ্বীন শেখাতে আরম্ভ করেছে। মজলিশ ভারি করে তুলছে।

অপর দিকে যে ছাত্র প্রাইমারি স্তর থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জন করে আসছে। দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়গুলো সুন্দরভাবে রপ্ত করার পর শরিয়ত বিষয়ে আরও ছয় বছর পড়ালেখা করেছে। ফারেগ হওয়ার পর নিশ্চিতভাবেই তার ইলমি বয়স গিয়ে দাঁড়াবে দশ বছরে।

এ তো গেল পড়াশোনার বয়স নিয়ে আলোচনা।

অন্যদিকে গুরুত্ব, তাৎপর্য ও প্রভাবের দিক থেকেও উভয় ছাত্রের মাঝে থাকবে বিস্তর ব্যবধান। দ্বিতীয় ছাত্রটি যদিও এর আগে ছয় বছর ইলমে দ্বীনের প্রাথমিক শর্তগুলো পূরণ করেছে, কিন্তু উপকার ও প্রভাব সৃষ্টিতে সে দ্বিতীয় জনকে ছাড়িয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। জীবনের প্রাথমিক সময় সে ইলমে দ্বীনের সাথে কাটানোর ফলে এবং অতিরিক্ত ছয় বছর মেহনত মুজাহাদা করার

কারণে তার ইলমি বিকাশ ঘটবে সুনিপুণ ও সঠিকভাবে। আর দ্বিতীয়জন তো সিঁড়ি ছাড়াই ঘরের ছাদে উঠতে চাইছে, যা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এর চেয়েও বড়ো আশ্চর্য ও শঙ্কার বিষয় হলো, শরিয়া বিভাগের শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের এ দুর্বলতা জানা সত্ত্বেও বার্ষিক পরীক্ষায় তাদের সামনে আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, মালেক বিন আনাস ও আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মতামত ও ইজতেহাদ-বিষয়ক প্রশ্ন ছুড়ে দেন। এরপর কোনো ফিকহি বিষয়ে বা বিধানসংক্রান্ত কোনো হাদিসে তাদের মতামত উল্লেখ করা ও 'তারজিহ' দেওয়ার বিষয়টি তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেন!!

এসব শিক্ষার্থী আবার তাদের উস্তাদদের লিখিত কয়েকটি পাতার ফটোকপি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, এগুলোই মুখস্থ করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে এগুলো গ্রন্থে রূপ নেয়। পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। এভাবেই তারা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের সালাফে সালেহিন থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়ার পথ আটকে দেয়। পূর্ববর্তীকালের মনীষীদের উক্তি এবং জ্ঞানভান্ডার থেকে উপকৃত হওয়ার দরজা বন্ধ করে দেয়। তাঁদের সৃষ্ট ইলমি পরিভাষাগুলো থেকে তাদের বঞ্চিত করে দেয়, যেগুলো শিক্ষার্থীদের বোঝা খুব দরকার ছিল। পরবর্তী সময়ে সেগুলোই তাদের ইলমের একমাত্র উৎসে পরিণত হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে আজকের ইলমের ধারক-বাহকদের আমরা পূর্বসূরিদের থেকে পৃথক করে দিচ্ছি। কোনো সন্দেহ নেই, ইলমের জন্য এটি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। তারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে; অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাড়বে।

অমুক গ্রন্থে অমুক মাসআলায় অমুক ফকিহ অমুক কথা বলেছেন এটি বলা আমার কাছে অধিক প্রিয় এ কথা বলা থেকে; 'অমুক ভার্সিটির প্রভাষক অমুক ডক্টর অমুক মাসআলায় অমুক কথা বলেছেন।' তেমনি অমুক হাদিসটি অমুক পূর্বসূরি বিজ্ঞ মুহাদ্দিস সহিহ বলেছেন কথাটি আমার কাছে অধিক প্রিয় এ কথা বলা থেকে; 'অমুক সমকালীন মুহাদ্দিস হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। সমকালীনগণ কোনো বিষয়ে সঠিক বললেও তা পূর্বসূরিদের মতামতের সামনে নিতান্ত দুর্বল বিবেচিত হবে; যদিও তাঁদের মতামতে থাকে ভুলের সম্ভাবনা।

এ ধরনের শিক্ষানীতির ফল আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি। তথাকথিত শরিয়া ভার্সিটিগুলো থেকে যতসব দুর্বল, অযোগ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় ব্যক্তিই ডিগ্রি লাভ করছে; যাদের না আছে কোনো কিছুর যোগ্যতা; না রাখে তারা গবেষণার অধিকার। কিন্তু তার ইলম অর্জনের পেছনে যদি সত্যিই সদিচ্ছা ও বস্তুনিষ্ঠতা থাকে, তবে নিশ্চিতভাবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ও সহযোগিতা লাভ করবে। নিজের ভুল ও দুর্বলতা সে বুঝে উঠতে পারবে। মৌলিক জ্ঞান অর্জনে

মনোনিবেশ করবে। বাহনে আরোহণ করে ইলমের পানে ছুটে চলবে। তবে এ রকম সদিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব কমই..!!

তালিবুল ইলমদের ওপর প্রযুক্তির প্রভাব

ছাত্রদের মধ্যে উপরিউক্ত দুর্বলতা আরও প্রবল করেছে হালের আবিষ্কার কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল, ট্যাব ইত্যাদি যন্ত্রগুলো; বরং তাদের ইলমের রস ও স্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছেড়েছে যুগের এ অত্যাধুনিক আবিষ্কারগুলো। প্রযুক্তি ব্যবহারে যারা দুর্বল, তাদের তারা অদক্ষ, অবিজ্ঞ বলে মনে করতে শুরু করেছে। জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে তাদের অযোগ্য ভাবতে আরম্ভ করেছে। চরমপন্থী ও উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে বুঝতে শুরু করেছে।

তবে হ্যাঁ.. কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন এ ধরনের ভার্সিটি-শিক্ষা এবং প্রযুক্তিপণ্যের উপকারিতার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, তেমনি এগুলো ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের (যারা অনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে) আত্মিক ও বস্তুগত ক্ষতির বিষয়টিও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা যে পরিমাণ অপরাধে লিপ্ত হবে, ঠিক সে পরিমাণ তারা ইলমি পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যাবে, আত্মিক ও বস্তুগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যাবে।

বস্তুগত ক্ষতি

কোনো তথ্যের মৌলিক উৎসে গবেষণা না করে কেবল প্রযুক্তিপণ্যের মাধ্যমে গবেষণা করা কখনো বৈধ হবে না। এ বিষয়ে কথা বললে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

আত্মিক ক্ষতি

ইলমে দ্বীন অন্যান্য জ্ঞান-বিদ্যা থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারণ, ইলমে দ্বীন শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নীতি-নৈতিকতা, আচার-আচরণও শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের। প্রকৌশলীদের জন্য এসব প্রযুক্তিপণ্যের সাহায্য নেওয়া যৌক্তিক; কারণ, তাদের যাবতীয় গবেষণা শুধু ইট, বালু, আর সিমেন্টের মতো জড়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত। অপর দিকে তালিবুল ইলমকে তো ইলম অর্জনের পাশাপাশি নিজ শায়খ থেকে শিখতে হবে আদব-আখলাক এবং মানুষের সঙ্গে শিষ্টাচার ও আচার-আচরণের পদ্ধতি।

প্রযুক্তিপণ্য আপনাকে হয়তো বলবে, নামাজ ফরজ। দলিল হচ্ছে এই..। কিন্তু তার এই কথার মধ্যে কোনো নুর থাকবে না। কোনো বরকত থাকবে না, কোনো প্রভাব তৈরি করবে না; যেমনটি সত্যনিষ্ঠ আলিম ও শায়খদের মজলিশে লাভ হয়। তা ছাড়া কম্পিউটারের নেই কোনো চোখ, যে চোখ দিয়ে সে তার ছাত্রদের

সংশোধন করবে; যেমনটি ইমাম মালেক রহ.-এর সঙ্গে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া নিশাপুরি রহ.-এর ঘটনার দ্বারা বোঝা যায়; অথবা চোখে আঙুল দিয়ে তাদের ভুলগুলো শুধরে দেবে; যেমনটি ইমাম আহমদ রহ. ও তাঁর মেহমান আবু ইসমাত বায়হাকির মাঝে ঘটিত ঘটনার মাধ্যমে বুঝে আসে।[২৫২]

শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর নির্ভরশীলতা এবং উম্মতে মুসলিমার ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব

উম্মতের ওপর এ শিক্ষার নেতিবাচক প্রভাব চরম ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কারণ, তা উম্মতের মাঝে আধ-শিক্ষিত (নিমে-মুল্লা) তৈরি করছে। দিন দিন তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শুধু বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ফারেগ হওয়া শিক্ষার্থীদের ওপর জরিপ করলে দেখা যাবে, তাদের অধিকাংশই ফতোয়া প্রদানের যোগ্য নয়। তা ছাড়া তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছে, যারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাতায়াত করা ছাড়াই এ তালিকায় স্থান পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এও বোঝা যাবে, এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শেষের বছরগুলোতে ফারেগ হওয়া শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার চেয়ে শুরুর বছরগুলোতে ফারেগ হওয়া শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনেক বেশি ছিল।

তারপরও আমি বর্তমানকালের কিছু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং তাদের পাঠদান, সুন্দর ও সুষ্ঠু গবেষণাপদ্ধতিকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারছি না। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ন্যায়পন্থা হলো, তালিবুল ইলমগণ নতুন ও পুরোনো শিক্ষারীতির মাঝে সমন্বয় ঘটাবে। সুষ্ঠুভাবে একে বিন্যস্ত করবে।

আধাজ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিদ্যায় এদের কুপ্রভাব

ইলমে শরিয়তের একটি ভাষ্য—'যে চিকিৎসক হলো, অথচ সে চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করেনি[২৫৩] তার দ্বারা রোগী সুস্থ হওয়া তো দূরের কথা, আরও অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তেমনি ধর্মীয় বিষয়ে যদি অর্ধজ্ঞানী হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই সমাজ ও সাধারণ মুসলমানের জন্য তারা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। জনশ্রুতিতে আছে—'মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে আধাজ্ঞানী, আধাফকিহ, আধাচিকিৎসক, আধাব্যাকরণবিদ।' একজন বারোটা বাজায় ধর্মের, আরেক জন শহরবাসীর, অপর জন ভাষার।[২৫৪]

---

[২৫২] ঘটনা দুটো সামনে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

[২৫৩] আবু দাউদ:৪৫৭৬, নাসাঈ : ৭০৩৪, ইবনে মাজা : ৩৪৬৬, মুস্তাদরাকে হাকিম : ৪/২১২

[২৫৪] من آخر الفتاوى الحموية الكبرى لإبن تيمية رحمه الله ؛ أدب الإختلاف في مسائل العلم والدين : ٦٦

যুগশ্রেষ্ঠ ফকিহ শায়খ মুহাম্মদ আল-হামিদ রহ. একবার তার ভাই হামাতের বিখ্যাত কবি উস্তাদ বদরুদ্দীন আল-হামিদের কাছে আলেপ্পোয় শিক্ষাগ্রহণ শেষে আল-আযহার ভার্সিটি থেকে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে সময় আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বর্ণযুগ পার করছিল। তার ভাই বলেন, কোনো বাধা নেই; তবে তুমি সেখান থেকে ফেরার সময় হয় পূর্ণ জ্ঞানী নতুবা পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে ফিরবে! আধাজ্ঞানী হয়ে ফিরো না!

কারণ, আলিম তার ইলম অনুপাতে কথা বলে। আর জাহেল নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে। তবে আধাজ্ঞানী ব্যক্তি সব সময় নিজেকে পূর্ণ জ্ঞানীই ভেবে থাকে। অথচ সে গণ্ডমূর্খ; নিজেও পথভ্রষ্ট হচ্ছে, অন্যকেও ভ্রষ্ট করে ছাড়ছে। এদের ব্যাপারেই বলা হয় 'জাহেলে মুরাক্কাব'। কারণ, তারা নিজেরা জাহেল হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জাহালাত স্বীকার করতে এবং তা মেনে নিতে একেবারেই নারাজ।

এ শিক্ষারীতি আবিষ্কার করেছে তথাকথিত আরেক শিক্ষারীতিকে। কয়েক বছর যাবৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা ব্যাপক সাড়া ফেলতেও সক্ষম হয়েছে। তা হলো উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শিক্ষার্থীদের খেয়াল-খুশিমতো পাঠদান। কোনো সন্দেহ নেই, এ শিক্ষারীতি নিয়মতান্ত্রিক পাঠদানে তৎপর অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন করে তুলছে। যে অল্প সময়টুকু তারা উস্তাদদের সান্নিধ্যে থেকে কিছুটা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেত, সেটাও তাদের থেকে কেড়ে নেবে নতুন এ শিক্ষারীতি।

এ দুটো শিক্ষাক্রমকে মানুষের কাছে বিজ্ঞাপন আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ইলমি সার্টিফিকেট, বিনা কষ্টে এবং দূর দেশে পাড়ি না দিয়েই তাদের জন্য উত্তম জীবিকা উপার্জনের লোভ দেখিয়ে মানুষকে প্রতারিত করা হচ্ছে। অথচ ইলম অর্জনের জন্যে দরকার ছিল নিবিড় অধ্যবসায়, দূরদেশে পাড়ি এবং উস্তাদের দীর্ঘ সান্নিধ্য।

শিক্ষার্থীরা অর্থনৈতিকভাবে দৈন্যদশায় থাকে সাধারণত। অভাব তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকে সব সময়; এটা অস্বীকার করা যাবে না। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে আজকাল ধীরে ধীরে ইলম উঠে যাচ্ছে। ইলমও আমাদের ত্যাগ করে চলেছে। বলা যায়, প্রাথমিক স্তরে ইলম জন্ম হয়ে দ্বিতীয় স্তরেই সে মারা যাছে।

এ জন্যে আমি বলব, বারবার বলব, আহলে ইলমদের মধ্যে যারা কিছুটা হলেও হুঁশ রাখেন, ইলমের প্রতি দয়ামায়া এখনো যাদের অন্তরে আছে, আপনারা এ নাজুক পরিস্থিতি বুঝতে চেষ্টা করুন! পূর্ববর্তীকালের ইলমি মজলিশগুলো আবার

জাগিয়ে তুলুন, যে মজলিশগুলো থেকে তৈরি হয়েছিল যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন। বিদগ্ধ মনীষী। আইম্মায়ে মুজতাহিদিন। যাঁরা ইলমকে স্থান দিয়েছিলেন হৃদয়ের সর্বোন্নত আসনে। মৃত্যুর এক শ বছর পরেও যাদের ইলম ছিল জীবন্ত।

আমরা তো পূর্ণ আস্থাশীল যে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। কুরআনের হেফাজত করবেন। কেয়ামত পর্যন্ত একদল বিশ্বস্ত লোক তৈরি করতে থাকবেন, যারা এ দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। ইসলামকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। পূর্ণ আমানতের সাথে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা হস্তান্তর করবেন। বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদী নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সে সংবাদ দিয়ে গেছেন।

এ নববি সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীর কখনো ব্যত্যয় ঘটবে না তা আমরা জানি। তবে আমাদের দায়িত্ব হলো, এ কাজের জন্য নিজেদের পেশ করা। এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় নিজেকে উৎসর্গ করা। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم﴾

অর্থ : 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।'[২৫৫]

হাদিসের কিতাবগুলো দ্রুত পড়ে শেষ করার নতুন সংস্কৃতি

উক্ত শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়েছে এক নতুন কুসংস্কৃতি। হাদিসের কিতাবগুলো স্বল্প সময়ে দ্রুত পাঠ করে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে আমি খুব সংক্ষেপে একটি কথাই বলব :

প্রথমত : পূর্ববর্তী যুগে শিক্ষার্থীদের হাদিস অধ্যয়ন এবং দীর্ঘসময় মুহাদ্দিসগণের সান্নিধ্যে থেকে তাদের হাদিস গ্রহণ আর বর্তমান যুগের দ্রুত ও দায়সারাভাবে হাদিস পড়ার সংস্কৃতির মাঝে তুলনা করলে হাদিস অধ্যয়নের নামে আজকাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যা ঘটছে, সে বিষয়ে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। পূর্বসূরিদের হাদিসগ্রহণ এবং তাঁদের হাদিস বর্ণনার বিষয়ে আমি তিনটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাচ্ছি। খতিব রহ. এ ঘটনা তিনটি তার বিখ্যাত গ্রন্থ الكفاية -তে উল্লেখ করেছেন।

---

[২৫৫] সুরা মুহাম্মদ : ৩৮

প্রথম ঘটনা

ইবনুল মুবারক রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র, নির্ভরযোগ্য আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব ও প্রাজ্ঞ মনীষী আলি বিন হাসান বিন শাকিক আল-মারূযিকে জিজ্ঞেস করা হলো– আপনি কি আবু হামযা আস-সুক্কারি থেকে 'কিতাবুস সালাত' দরসে বসে শুনেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি সম্পূর্ণ কিতাবই শুনেছি; তবে একদিন দরস চলাকালে গাধা চ্যাঁচিয়ে ওঠার ফলে হাদিসের কিছু অংশ আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। পরবর্তীকালে কোন হাদিসে অস্পষ্টতা ছিল তা ভুলে যাওয়ার কারণে আমি পুরো কিতাবই বর্জন করে ফেলি।

দ্বিতীয় ঘটনা

ইবনে মুঈন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একবার আমরা হাতিম বিন ইসমাইলের কাছে উবাইদুল্লাহ বিন ওমরের বর্ণিত কিছু হাদিস নিয়ে উপস্থিত হই। তিনি আমাদের হাদিস পাঠ করে শোনানোর পর বলতে থাকেন : 'আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি তো উবাইদুল্লাহর ব্যাপারে একটি কিতাব রচনা করেছি। তার হাদিসগুলো নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছি। নাহ.. তার বর্ণিত কোনো হাদিসই আমি বর্ণনা করব না; অল্পও না, অধিকও না!!'

তৃতীয় ঘটনা

ইউসুফ বিন মুসলিম বলেন, আমি হাইসাম বিন জামিল আল-বাগদাদি আল-আন্তাকি রহ.-কে বলতে শুনেছি; শু'বা থেকে আমি সাত শ হাদিস শুনেছি। তবে তার বর্ণিত একটি হাদিসে সন্দেহ হওয়ায় তার সবগুলো হাদিস আমি বর্জন করেছি।[২৫৬]

ইমাম সুমআনি রহ. থেকে বর্ণিত, ইমাম মালেক রহ. থেকে الموطأ -এর বিখ্যাত রাবি ইমাম ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামিমি নিশাপুরি ইমাম মালেক রহ. থেকে মুয়াত্তা শুনে শেষ করার পর বলেন, এ শ্রবণে আমার মন ভরেনি। ইমাম মালেক জিজ্ঞেস করেন, কেন? বলেন, মনে হচ্ছে হাদিসের কোনো অংশ আমার থেকে ছুটে গেছে। এরপর মালেক রহ. হাদিসগুলো আবার তাকে পড়ে শোনান। তিনি আবার বলেন, এবারও আমার মন ভরেনি। মনে হচ্ছে হাদিসের কোনো অংশ আমার ছুটে গেছে। ইমাম মালেক জিজ্ঞেস করেন, কী চাও তুমি? তিনি বলেন, আমি পড়ব আর আপনি শুনবেন। এরপর তিনি পড়েন আর ইমাম

---

[২৫৬] الكفاية : ২৩৪-২৩৪

মালেক তা শোনেন। এভাবে ইমাম মালেক রহ. থেকে তিনি তিন বার মুয়াত্তা শ্রবণ সম্পন্ন করেন।[২৫৭]

ইমাম হাফেজ আবু কুররা আয-যুবাইদি রহ.-এর বৃত্তান্তের শেষের দিকে ইবনে হাজার রহ. বলেন, তিনি একাধিক অধ্যায়ে السنن গ্রন্থ রচনা করেন। আমি কিতাবটি দেখেছি, কিতাবের কোথাও কোনো হাদিসের শুরুতে তিনি حدثنا জাতীয় শব্দ ব্যবহার করেননি। বরং বলেছেন : ذكر فلان । দারা কুতনি রহ.-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তার সবগুলো গ্রন্থে 'ইল্লত' ধরা পড়েছে। তাই তার ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি সংবাদ প্রদান-জাতীয় শব্দ পাশ কাটিয়ে গেছেন।[২৫৮]

যারাকশি রহ. বলেন, শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-জুওয়াইনি–আবু বকর আল-হাইরি থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি আবুল আব্বাস আল-আসাম থেকে বর্ণনা করেছেন। আবুল আব্বাস বলেন, তাঁর কাছে হাদিস পড়া হতো। একপর্যায়ে তিনি বলেন, আমি অর্ধেক বর্ণনা করব আর বাকি অর্ধেক বর্ণনা করব না।' এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি শায়খের কাছে হাদিস পড়ছিলাম। অর্ধেক কিতাব পড়ার পর একটি গাধা চ্যাঁচিয়ে ওঠে। এরপর আমি জানি না শায়খ সেই মুহূর্তে আমার পড়া শুনেছেন কি না! তাই আমি অবশিষ্ট কিতাব বর্ণনা করা বর্জন করেছি। সেকালে মানুষ হাদিস বর্ণনায় এ রকমই সতর্কতা অবলম্বন করত।'[২৫৯]

আবুল আব্বাসের মৃত্যু হয়েছিল ৩৪৬ হিজরিতে। তখনকার সময়ে তার এ উক্তিটি নিয়ে ভাবুন, 'সেকালে মানুষ হাদিস বর্ণনায় এ রকমই সতর্কতা অবলম্বন করত।' কী রকম সতর্কতা অবলম্বন করত, উপরিউক্ত ঘটনাগুলোতেই তা ফুটে উঠেছে।

ইমাম ইবনুল ইমাম মুহাম্মদ বিন ফাজল আল-ফুরাবির বৃত্তান্তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা আবুল কাসেম আল-কুশাইরির কাছে مسند أبي عوانة কিতাবটির দরস শুনতাম। ওই দরসে একজন লাজুক ব্যক্তিও উপস্থিত হতো প্রতিদিন। তিনি এসে শায়খের পাশেই বসতেন আর আমার পিতা পাঠ করতেন। কিতাব শেষ করার পর ঘটনাক্রমে একদিন ওই লাজুক ব্যক্তিটি দরসে উপস্থিত হয়নি। শায়খ যথারীতি মজলিশে এসে উপস্থিত হন। বেশির

---

[২৫৭] أدب الإملاء والاستملاء : ২২

[২৫৮] تهذيب التهذيب : ১০/৩৫০

[২৫৯] النكت على ابن الصلاح : ৩/১০০৮

ভাগ সময় তিনি কালো অমসৃণ জামা পরে আসতেন। মাথায় থাকত ছোটো পাগড়ি। আমি ভাবতাম, আব্বু ওই লাজুক ব্যক্তিটিকে পড়ে শুনাচ্ছেন। শায়খ আসার পর যথারীতি তিনি পড়া শুরু করেন। আমি বললাম, শায়খ তো এখনো আসেনি; আপনি কাকে পড়ে শোনাচ্ছেন? আব্বু বলেন, তুমি কি ওই লাজুক ব্যক্তিটিকে শায়খ ভেবেছ? আমি বলি, হ্যাঁ..! এ কথা শুনে তার মন সংকীর্ণ হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন পড়ে বলেন, আরে বাবা! এই যে বসে আছেন ইনিই তোমার শায়খ!' এ কথা বলে তিনি শায়খের জায়গাটি চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দেন। এরপর আমার জন্যে তিনি আবার প্রথম থেকে পড়া শুরু করেন।'[২৬০]

আমি বলব, এর দ্বারা বুঝা যায়, শিক্ষার্থী প্রথমে তার শায়খকে ভালো করে চিনে নেবে। এটি উলুমুল হাদিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ।

ইমাম ইবনে দাকিক আল-ইদের বৃত্তান্তে হাফেজ কুতুব আল-হালবি রহ.-এর একটি উদ্ধৃতি বর্ণিত হয়েছে : 'হাদিসের অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ ও ইতকান বিষয়ে তিনি (ইবনে দাকিক) ছিলেন এক আদর্শ ব্যক্তি। একবার আমি হাদিসের পাণ্ডুলিপির একটি অংশ তার কাছে নিয়ে আসি। এগুলো তিনি ইবনে রাওয়াজ থেকেও শুনেছিলেন। পাণ্ডুলিপিটি তিনি হাতে নিয়ে বলেন, আমি আগে দেখি তারপর তোমাকে জানাব! কিছুদিন পর আবার তার কাছে গেলে তিনি বলেন, এগুলো আমার লেখা বটে; কিন্তু শ্রবণকালে আমি তা নিরীক্ষণ করিনি। এগুলো তেমন স্মরণে নেই আমার।' এরপর তিনি তা আর আমার কাছে বর্ণনা করেননি।[২৬১]

হাদিস শোনা ও গ্রহণ করা এবং ইলম অন্বেষণের বিষয়ে চরম সতর্কতা অবলম্বন এবং ইলমকে মূল্যায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এসব ঘটনা। কারণ, 'ইসনাদ' হলো দ্বীনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামি জ্ঞানভান্ডারের একটি উজ্জ্বল গৌরবগাঁথা। ইসলামি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সত্যতার একটি বড়ো প্রমাণ হলো সনদ। ইসলামধর্মের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা প্রমাণে তা যেন একটি মাইলফলক।

দ্বিতীয়ত : সবকিছু ঠিক থাকলে হাদিস (দরস) পাঠ ও শ্রবণের সময় আরও দুটি বিষয় যুক্ত হবে। যথা :

১. রেওয়ায়েত ও দরসের মজলিশে অযোগ্য ও ছোট্ট শিশুদেরও উপস্থিত করা।

---

[২৬০] السير : ১৯/৬১৮ وطبقات السبكي ৬/১৬৮:

[২৬১] الدرر الكامنة : ৪/৯৩

২. অনেক ইমাম নির্দিষ্ট কোনো কিতাবের ক্ষেত্রে সনদ বর্ণনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। একাধিক বর্ণনাসূত্র থাকলে তাও শিক্ষার্থীদের সামনে উল্লেখ করতে বলেছেন।

প্রথমটির ব্যাপারে বলব, শিশুদের সাথে নিয়ে গেলে তারা দরস শুনে অনুপ্রাণিত হবে। বড়ো হয়ে ইলম ও হাদিস গ্রহণে মনোনিবেশ করতে অনুপ্রাণিত হবে। এভাবেই হয়তো সে ভবিষ্যতের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলিমে দ্বীন এবং হাফেজুল হাদিস হয়ে উঠবে। তেমনি অযোগ্য লোকেরাও সেখান থেকে উৎসাহ পেয়ে ইলমের প্রতি মনোযোগী হবে। অন্তত কল্যাণ ও বরকত লাভ করবে। একপর্যায়ে হয়তো দ্বীন শেখার পথে এসে আলিমে দ্বীন হয়ে ওঠবে। এ ধরনের ঘটনা মনীষীদের জীবনীগ্রন্থে অনেক পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়টির ব্যাপারে বলা যায়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হাদিস পৌঁছে দেওয়ার সুমহান দায়িত্বপালনকারী বর্ণনাকারীদের নাম স্মরণ থাকলে তাদের সীমাহীন ত্যাগ এবং বিসর্জনের স্মৃতি দৃশ্যমান থাকবে তাদের মস্তিষ্কে। কারণ, তাঁরাই ইলমে হাদিসের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। পূর্ণ আমানতের সাথে তা বিকৃতিসাধন থেকে সুরক্ষিত করেছেন।

তবে যদি হাদিস গ্রহণের বিষয়টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুর্বল পন্থায় হয়। হাদিসগ্রহণ-সংক্রান্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে সে যদি হয় অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, তবে তার এ গ্রহণ এবং শ্রবণের কোনো মূল্য থাকবে না।

হাদিসের পাঠ ও গ্রহণের বিষয়ে এ কালের একটি ঘটনা আমি উল্লেখ করছি। চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে এক ব্যক্তি আমাকে এসে বলত, নিশ্চয় আমি 'উসুলে সিত্তা'র অমুক অমুক গ্রন্থ অমুক অমুক বিখ্যাত শায়খদের কাছে পড়েছি। এর মধ্যে সুনানে তিরমিজি অমুক খ্যাতিমান আলিমের কাছে পড়েছি।' একদিন আমি তাকে বলি, بِلا فوت؟ এ কথা শুনে সে চুপ হয়ে যায়; আমার ভাষা বুঝতে পারে না। এই কি তবে 'সনদ হলো দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত' ইবনুল মুবারকের এ প্রসিদ্ধ উক্তির সারমর্ম?!

আমি বলব, এদের লক্ষ্যহীন কর্মকাণ্ড থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। আর তাই একটু আগে পড়ে আসা আলি বিন হাসান শাকিকের কথাগুলো সব সময় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

মনে হচ্ছে, এ পথের পথিক এবং এ বিষয়ের জ্ঞানীগণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে ভীষণ উদাসীন হয়ে গেছেন।

প্রথম বিষয় : পূর্ববর্তীকালের মনীষীগণ ইলম ও হাদিস গ্রহণ করেছেন পূর্ণ মনোযোগ, পূর্ণ নিরীক্ষণ এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে। এরপর এ পথে আমৃত্যু অবিচল থেকেছেন তারা প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা সহকারে। ফলে তাদের দিয়ে উদাসীনদের প্রমাণ সাব্যস্তকরণের বিষয়টি 'কিয়াসে ফাসেদ' বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় বিষয় : বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ এবং অসচেতন। এ যুগে শত শত ভ্রান্ত মতবাদের লোকেরা সুন্নতে নববির ওপর অপবাদ আরোপ নিয়ে ব্যস্ত। তথাকথিত কুরআনের দল, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, বুদ্ধিজীবী ও মূর্খ শিক্ষার্থীরা হাদিসে রাসুলের ওপর ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যাচ্ছে। তারা দাবি করছে, এ সকল ভিত্তিহীন স্থাপনার ওপর যদি তোমাদের হাদিসশাস্ত্র স্থাপিত হয়ে থাকে, তবে তা সম্পূর্ণ দুর্বল এবং অগ্রাহ্য শাস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিষয়গুলো আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। ঘটনাগুলো আমাদের গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে মাঠে-ময়দানে।

শায়খদের থেকে ইলম অর্জন বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন

ইমাম গাযালি রহ. الإحياء গ্রন্থে আলিম ও শিক্ষার্থীর দশটি দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। পঞ্চম কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন–তালিবুল ইলম উপকারী কোনো ইলমকেই বর্জন করবে না; বরং আবশ্যক ও প্রয়োজন অনুপাতে সকল জ্ঞানই সে রপ্ত করে নেবে। এরপর দীর্ঘায়ু লাভ করলে বা অধিকতর ইলম অন্বেষণের সুযোগ হলে এর মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বোপযোগী এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সে গভীরতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করবে। কারণ, সবগুলো ইলম একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার অনেক সময় মানুষ অজানা ইলমের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, ওই ইলমের কদর সে বুঝতে চায় না। শত্রুতা পোষণ থেকে বাঁচার জন্যে হলেও তাকে ওই জ্ঞান শিখতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾

অর্থ : 'তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন শীঘ্রই বলবে, এ তো এক পুরোনো মিথ্যা।'[২৬২]

---

[২৬২] সুরা আহকাফ : ১১

ষষ্ঠ কর্তব্য সম্পর্কে তিনি লেখেন, কোনো শাস্ত্রের ক্ষেত্রে একবারে বা একসময়ে পাণ্ডিত্য অর্জনে সচেষ্ট না হওয়া; বরং পর্যায়ক্রমে এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া।

সপ্তম কর্তব্য সম্পর্কে তিনি লেখেন, কোনো শাস্ত্র অধ্যয়ন করার আগে এর পূর্বের শাস্ত্রকে রপ্ত করে নেওয়া। কারণ, সকল ইলম একটি অপরটিকে পূর্ণ করে এবং সমন্বয় করে। একটি অপরটি পথ সুগম করে দেয়। যারাই এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে, তারাই লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে।'[২৬৩]

ইবনুল জাওযি রহ. বলেন, ফকিহকে অবশ্যই সকল শাস্ত্রের কিছু-না-কিছু হলেও আয়ত্ত করতে হবে। ইতিহাস, হাদিস, ভাষাতত্ত্বসহ প্রায় সকল ইলমেই যতটুকু না হলেই নয়, তাকে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। কারণ, ফিকহ সকল ইলমের মুখাপেক্ষী। তাই সব বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলো আগে রপ্ত করে নিতে হবে।'[২৬৪]

এ 'খাতেরা'র শেষাংশে তিনি বলেন : আহলে ইলমকে প্রত্যেক অবশিষ্ট ইলম থেকে কিছুটা হলেও শিখে নিতে হবে। কারণ, ইলম একটি অপরটির সম্পূরক।'

এরপর তিনি তার উভয় বক্তব্যের মাঝে অনেক উদাহরণ টেনে আনেন যাতে ইতিহাসগত অনেক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। একটি ছাড়া বাকি সবগুলোতেই তিনি সঠিক তথ্য তুলে ধরেন। উস্তাদ শায়খ আলি তানতাভি রহ. এটি নিরীক্ষণ করেছেন। আমরাও সেটা বুঝতে পেরেছি। অর্থাৎ প্রত্যেক ইলমে অংশগ্রহণের বিষয়টি হবে পূর্ণ নিরীক্ষণ এবং অত্যন্ত গভীরতার সঙ্গে। কোনো লেখক বা রচনাকারীকে শুরুতেই সমালোচনার পাত্র এবং তার গ্রন্থকে তাত্ত্বিক ত্রুটির সম্মুখীন করা যাবে না।

ইবনুল জাওযি রহ.-এর এই উক্তি এবং কিছু ফকিহের ইতিহাসগত ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করার পাশাপাশি ইমাম সাখাভির الإعلان بالتوبيخ গ্রন্থে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা এবং অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। সাফাদির রচিত الوافي بالوفيات গ্রন্থের ভূমিকাতেও এমন কিছুর উল্লেখ আছে। তা ছাড়া আল্লামা কাওসারির রচনাসমগ্রেও بعض أغلاط تاريخية শিরোনামে এগুলো উল্লেখ আছে। ইতিহাস নিরীক্ষণ এবং মনীষীদের স্তর নির্ণয় বিষয়ে আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল-কাতানি রহ.-এর বক্তব্যও এখানে উল্লেখযোগ্য, যা তিনি নিজ রচিত فهرس الفهارس গ্রন্থে বলেছেন।

---

[২৬৩] الإحياء : ১/৫১

[২৬৪] صيد الخاطر : ৩৭৩

নবম পথনির্দেশ

উস্তাদ নির্বাচন

إن هذا العلم دين.

'এই ইলম পূর্ণাঙ্গ একটি দ্বীন'

বাক্যটিই এই অনুচ্ছেদের শিরোনাম, যা বিখ্যাত ইমাম এবং প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ.[২৬৫] বলেছেন :

إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

অর্থ : 'নিশ্চয় এই ইলম পূর্ণাঙ্গ একটি দ্বীন, তাই কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের এ দ্বীন গ্রহণ করছ তা ভালো করে দেখে নাও!'[২৬৬]

এখানে ইলম বলতে শরিয়তের ইলম উদ্দেশ্য; আরবি ভাষাজ্ঞান উদ্দেশ্য। কারণ, আরবি ভাষা হলো ইলমে শরিয়তের এক মহান সেবক; ইমাম মানাভি রহ. এমনটিই উল্লেখ করেছেন।[২৬৭]

খতিবে বাগদাদি রহ. ইবরাহিম নাখঈ রহ. থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবরাহিম নাখঈ রহ. ছিলেন হিজরি প্রথম শতকের মধ্যভাগে জন্ম নেওয়া বিখ্যাত মুসলিম মনীষী। শ্রেষ্ঠ সাহাবিদের সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন। সাহাবিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তারা যখন কারও কাছে ইলম গ্রহণের জন্য আসতেন, তখন সবার আগে তার স্তর ও মর্যাদা যাচাই করে নিতেন। তার অবস্থা ও সম্পর্ক তলিয়ে দেখতেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে তবেই ইলম অন্বেষণের জন্য তার সান্নিধ্য অবলম্বন করতেন।'[২৬৮]

ইমাম রামহুরমুযি রহ. ইবরাহিম নাখঈর সমযুগী; বরং তার চেয়ে উঁচু তাবকার মনীষী আবুল আলিয়া আর-রিয়াহীর একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করে বলেছেন : সাহাবায়ে কেরাম এবং বড়ো বড়ো তাবেঈন ওই সকল শায়খদের থেকেই কেবল ইলম অন্বেষণ করতেন, যারা মুহাম্মদি উত্তরাধিকারের যথাযথ চাহিদা অনুসারে ইলমের পাশাপাশি ইবাদাতেও তাদের জন্য আদর্শ হতেন।[২৬৯]

---

[২৬৫] মৃত্যু : ১১০ হিজরি

[২৬৬] ইমাম মুসলিম রহ. তার হাদিসগ্রন্থের ভূমিকায় এটি উল্লেখ করেছেন : ১/14 ইমাম তিরমিজি রহ. তাঁর শামায়েল গ্রন্থটি এ উক্তি দ্বারা সমাপ্ত করেছেন।

[২৬৭] দেখুন : فيض القدير : ২/৫৪৫

[২৬৮] الجامع : ১৩৬ :الكفاية :১৫৭

[২৬৯] المحدث الفاصل : ৪৩০

তালিবুল ইলমের জন্য শায়খ নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাকে শায়খ নির্বাচন করতে হবে?! আমাদের বর্তমান সাধারণ পাঠ্যক্রম এবং ক্লাসরুটিনের ভেতর দিয়েই তাকে বিশেষভাবে একজনকে শায়খ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সব সময় তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখবে। নিজের সার্বিক অবস্থার কথা তাঁর কাছে বর্ণনা করবে। সকল ক্ষেত্রে তাঁর পথনির্দেশ মেনে চলবে। যদিও তিনি হন তার দরসের উস্তাদ ছাড়া অন্য কেউ।

পূর্ববর্তীকালের আলিমগণ শায়খ নির্বাচনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করে গেছেন। ইমাম বদর বিন জামাআ রহ. বলেন : কার কাছ থেকে ইলম অর্জন করছে তালিবুল ইলমকে তা ভালো করে যাচাই করে নিতে হবে। আল্লাহর কাছে ইস্তেখারা করতে হবে। তবেই তাঁর থেকে সুশিষ্টাচার শিক্ষা লাভ করবে। শায়খ হবেন পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। যার স্বভাবে থাকবে সহানুভূতি ও মনুষ্যত্ব। যার তাকওয়া, আল্লাহভীরুতা ও পরোপকারিতা হবে সর্বজনবিদিত। তিনি হবেন আদর্শ শিক্ষক। বোঝানোর ক্ষমতা থাকবে প্রখর। ইলমের পাশাপাশি তিনি তাদের শেখাবেন আদব, সুশিষ্টাচার, সচ্চরিত্র, একনিষ্ঠতা ও ধর্মভীরুতা।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সকল মনীষীর জীবনী পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে সঠিক শায়খ নির্বাচনের কারণেই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছিলেন। তাদের গড়ার এবং প্রতিপালনের পেছনে শায়খদের হাত ও প্রভাব ছিল প্রবল। শায়খের সদুপদেশ এবং সহানুভূতি ছিল তাদের ওপর সদা প্রতিক্রিয়াশীল।

তালিবুল ইলম এমন শায়খ নির্বাচন করবে যিনি ইলমে শরিয়তের ব্যাপারে হবেন পূর্ণ অভিজ্ঞ। সমকালীন বিখ্যাত আলিম ও ফকিহদের সঙ্গে তার থাকবে অধিক ওঠাবসা। থাকবে বুজুর্গদের দীর্ঘ সংশ্রব। কেবল কিতাবের পাতা থেকে ইলম গ্রহণকারী শায়খ নয়, যে কখনো বিজ্ঞ কোনো শায়খের সুহবত লাভ করেনি।'

আমি বলব, সম্মানিত পাঠককে অবশ্যই শায়খের মধ্যে উপর্যুক্ত গুণাবলি আছে কি না তা এক এক করে যাচাই করে দেখে নিতে হবে। তালিবুল ইলম মাত্রই যেন বিষয়টির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

আর এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের মনীষীদের জীবনচরিতে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে গভীরভাবে। অনুধাবন করতে হবে, এই ইলমের উপকার এবং এর মাধ্যমে শান্তি ও সফলতা লাভ কেবল একজন বস্তুনিষ্ঠ শায়খের হাত ধরেই সম্ভব, যিনি হবেন পূর্ণ ইসলাহ অর্জনকারী। হবেন স্বয়ংসম্পূর্ণ শায়খ; কেবল জামিয়ার শায়খ নয়। আর তখনই তার এ ইসলাহি কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়বে। তাঁর সান্নিধ্যে থাকা প্রতিটি

তালিবুল ইলমই তা লাভ করে ধন্য হবে। মানুষ যার সঙ্গে ওঠাবসা করে, নিশ্চিতভাবেই তার ওপর তার প্রভাব পড়ে—বিষয়টি আমরা সবাই জানি।

পূর্বে আলোচিত হয়েছে, কোনো পশুর সঙ্গে সময় ব্যয় করলে ওই পশুর স্বভাবও মানুষের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এ ক্ষেত্রে যদি সে মানুষ হয়, তবে তো অতিমাত্রায় প্রভাবিত হওয়ার কথা! আবার ওই ব্যক্তির প্রতি যদি তার গভীর শ্রদ্ধাবোধ থাকে; তার উস্তাদ ও মুরব্বি হয়, তবে তো কোনো কথাই নেই। নিশ্চিতভাবেই তা উক্ত ঘটনাবলির মতোই ক্রিয়াশীল হবে। তালিবুল ইলমরা মুতাআসসির হবে পুরোপুরিভাবে।

ইমাম যাহাবি রহ. থেকে এ ব্যাপারে অমূল্য উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন: পূর্ববর্তীকালের মনীষীগণ ইলম অন্বেষণ করতেন এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। এ কারণেই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফল ছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান ইমাম হয়েছিলেন।'

এরপর ভিন্ন পন্থায় ইলম অর্জনকারীদের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : এরপর তাদের পেছনে এসেছে এমন এক সম্প্রদায়, যারা শুধু বাহ্যিকভাবে ইলম পিপাসু হয়েছে; ইলমের গভীর রহস্য এবং পূর্ণ সফলতা কখনো তাদের হস্তগত হয়নি। তারা তাদের অন্বেষিত বিষয়কে 'ইলম' মনে করে বসেছে। এর দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে হবে বিষয়টি তাদের মাথাতেই আসেনি। কারণ, তারা এমন কোনো শায়খ দেখেনি বা তাদের সাহচর্য পায়নি, যাদের 'আদর্শ' ভাবা যায়। এভাবেই তারা দিগ্‌ভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করছে। এ জাতীয় শিক্ষকদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হয় বাজারের দামি কিতাবগুলো কিনে আলমারি সাজানো আর সময়ে সময়ে সেগুলো পাতা উল্টিয়ে দেখা। এভাবেই তারা কিতাবের বিষয়বস্তু বিকৃত করেছে। কেউই তার যথাযথ হক আদায় করেনি। আল্লাহ ক্ষমা করুন! এ মহা মসিবত থেকে আমাদের রেহাই দিন! তাদের একজন বলেছিল : আমি আলিম নই; আজ পর্যন্ত কোনো আলিমও আমি দেখিনি!'[২৭০]

তাদের এ করুণ দশার একমাত্র কারণ, যথাযথ পন্থায় তারা ইলম অন্বেষণ করেনি। ইলম অনুযায়ী আমলে মনোনিবেশ করেনি। কারণ, তারা আল্লাহভীরু ও পরহেজগার কোনো আলিমের সংশ্রব লাভ করে ধন্য হয়নি। কোনো শায়খ চোখে আঙুল দিয়ে তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেয়নি।

---

২৭০ السير : ৭/১৫২-১৫৩

একটি বিষয় আমরা সবাই জানি–একজন তালিবুল ইলমের জন্য উস্তাদই হলেন তার চেতনা, তার জ্ঞানের উৎস; তার আত্মা ও চরিত্রের সংশোধনকারী। এ রকম উস্তাদই তাদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব; বরং তিনিই তার ও আল্লাহ তাআলার মাঝে সম্পর্কের বন্ধন, তার ও সাধারণ মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরির প্রধান উপকরণ। তালিবুল ইলমগণ প্রথমত তাদের শিক্ষক হিসেবে এক রকম দেখে থাকে; দ্বিতীয়ত তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়ে অন্যরকম (বিশেষভাবে) দেখে থাকে।

এ কারণে আলোচনার শুরুতেই আমি 'আদর্শ আলিমের' সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বর্ণনা করতে চাচ্ছি।

ন্যায়নিষ্ঠ আলিমের নিদর্শন

ইমাম আবু ইসহাক শাতেবি রহ. ন্যায়নিষ্ঠ এবং আদর্শ আলিমের নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এনেছেন। এর সামান্য নিচে উল্লেখ করছি–

তিনি বলেন,[২৭১] 'লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ইলম অন্বেষণের সর্বোত্তম পন্থা হলো, ইলমকে এমন-সব লোকদের থেকে গ্রহণ করা যারা ইলমের কদর করেছেন পরিপূর্ণরূপে। ইলমের যথাযথ হক আদায় করেছেন।'

এরপর তিনি বলেন, এ রকম আলিমের কিছু নিদর্শন রয়েছে; উক্ত বিষয়গুলোর সঙ্গে এগুলোও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তবে দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে সামান্য ব্যতিক্রম হতে পারে।

প্রথম : ইলম অনুযায়ী আমল

আলিমের সকল কাজ তার কথার অধীন হবে। ব্যতিক্রম হলে সে আলিম নয়; তার কাছ থেকে ইলম অর্জনও সমীচীন নয়। ইলম অর্জনের পথে তাকে অনুসরণ করাও উচিত নয়। ইজতিহাদের অধ্যায়গুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় : আলিম হবেন দক্ষ ও স্বীকৃত অপর আলিমের হাতে গড়া এমন তালিব, যে শায়খের কাছ থেকে ইলম অর্জনের পাশাপাশি তাঁর সান্নিধ্য গ্রহণ করেছেন দীর্ঘসময়। এভাবে তিনিও হয়ে গেছেন শায়খতুল্য। সালাফে সালেহিনের মাঝে এটিই ছিল স্বীকৃত রীতি। সাহাবিগণ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে ইলমের পাশাপাশি ঈমান ও আমলও শিখেছেন। তাঁর সকল কথা ও কাজ উত্তমরূপে

---

২৭১ الموافقات :১/৬৪

গ্রহণ করেছেন। তাঁর ওপর ভরসা করেছেন সকল বিষয়ে। এভাবে তারা পুরোপুরিভাবে এটিকেই একমাত্র সত্য ও চিরন্তন পথ হিসেবে জেনেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন।

শেষ পর্যন্ত বলেছেন, এই ছিল আলিমদের থেকে ইলম অর্জন, তাঁদের সান্নিধ্য গ্রহণ এবং প্রমাণ সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সংশয়ের স্থানগুলোতে তাদের ধৈর্যধারণের ফসল। পরবর্তী সময়ে এটিই চিরন্তন মূলনীতি হিসেবে ধার্য হয়। এরপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহাবিদের ঘটনা এবং সংশ্রবের মুহূর্তগুলো ধারণ করতে থাকেন তাবেঈগণ। সেখান থেকে শরিয়তের মাসআলা-মাসায়িল উদ্ভাবন করতে থাকেন। এভাবেই তারা ইলমে শরিয়তের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করতে সক্ষম হন। এ কারণেই আপনি যত আলিমের কথা শুনবেন, দেখবেন তাদের সময় তাদের চেয়েও প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত অনেক আলিম ছিলেন; যাদের হাত ধরে এবং যাদের স্পর্শ পেয়ে তারাও বস্তুনিষ্ঠ আলিম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। পক্ষান্তরে যত পথভ্রষ্ট দল-উপদলের কথা শুনবেন, সুন্নাহর বিরুদ্ধাচরণকারী শুনবেন, দেখবেন তারাই উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য ও রীতির বিরোধিতা করেছে। ইবনে হাযম যাহেরি 'মুত্তাহাম' বা অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ কারণেই। তিনি কোনো নির্ভরযোগ্য শায়খের সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করেননি। তাদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করেননি। এর বিপরীতে 'রাসিখ' আলিমদের অসংখ্য উদাহরণ আপনি দেখতে পাবেন। চার মাযহাবপ্রণেতা ইমাম এবং তাদের মতো মনীষীগণের জীবনী অধ্যয়ন করলে সহজেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন।

তৃতীয় : শিক্ষার্থীকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের উস্তাদ ও শায়খকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে হবে। তাকে তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হতে হবে। তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের মধ্যে আনতে হবে। ঠিক যেমন সাহাবিগণ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করেছিলেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাবেঈগণও সাহাবিদের আদর্শ মেনেছিলেন। এভাবেই চলে আসছে প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি স্থানে। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইমাম মালিক রহ. সমকালীন অনেক আলিম থেকে ঊর্ধ্বে ছিলেন। উন্নত আসন লাভ করেছিলেন।'

কথাগুলো খুবই চমৎকার। খুবই মূল্যবান। এ ছাড়াও ইমাম শাতেবি রহ. থেকে বর্ণিত আরও কিছু উৎকৃষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আগ্রহীগণ যথাস্থানে সেগুলো দেখে নিতে পারেন।

স্বীকৃত আলিমের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য

ইমাম বদর বিন জামাআ রহ. বলেন,[২৭২] শায়খের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত এ বারোটি গুণ অবশ্যই থাকতে হবে–

১. প্রকাশ্যে গোপনে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে সকল গুনাহ থেকে তিনি বেঁচে থাকবেন। কথা, কাজ, আন্দোলন ও নীরবতাসহ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করবেন। কারণ, ইলম তো তার কাছে একটি মূল্যবান আমানত।

২. সালাফে সালেহিনের মতো তিনিও ইলমের পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। কখনো তিনি ইলমের মর্যাদা খর্ব করবেন না। কোনো দুনিয়াদারের শরণাপন্ন হয়ে ইলমের মানহানি করবেন না।

৩. দুনিয়াতে আল্লাহভীরুতা এবং অল্পেতুষ্টির গুণে গুণান্বিত হবেন। যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু পেয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। অতিরিক্ত উপার্জনের পেছনে ছুটবেন না।

৪. ইলমকে পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম বানাবেন না।

৫. নিম্নমানের কোনো পেশা তিনি গ্রহণ করবেন না। শরিয়তের কোনো মাকরূহ বিষয় গ্রহণ করা থেকেও তিনি বিরত থাকবেন। অপবাদ ও কুধারণামূলক কথা ও কাজ থেকে তিনি বিরত থাকবেন। মনুষ্যত্বহীনতার কোনো কাজে তিনি জড়াবেন না। এমন কিছু করবেন না যা বাহ্যিকভাবে বৈধ হলেও সামাজিক ও আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে ঘৃণ্য।

৬. ইসলামের সকল বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণরূপে মেনে চলার পাশাপাশি সুন্নাহর প্রচার-প্রসার ও বিদআত বিলুপ্ত করার কাজে তিনি তৎপর হবেন।

৭. মুস্তাহাব কাজগুলো তিনি মেনে চলবেন। নফল আমলগুলো নিয়মিত আদায় করবেন। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত, জিহ্বা ও অন্তর দিয়ে আল্লাহর স্মরণ, নিয়মিত দোয়া-জিকির ইত্যাদি।

৮. মানুষের সঙ্গে উৎকৃষ্ট আচরণ করবেন।

৯. সকল প্রকার বদভ্যাস এবং অসচ্চরিত্র থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবেন। সচ্চরিত্রে নিজেকে সুশোভিত করবেন।’

এরপর তিনি কিছু অসৎ চরিত্রের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন : এ সকল ব্যাধির সুচিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ মাশায়েখদের রচিত বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে চায়, সে যেন ওই কিতাবগুলোর শরণাপন্ন

---

২৭২ التذكرة : ১৫

হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উপকারী মনে হয়েছে শায়খ মুহাসিবীর লিখিত الرعاية গ্রন্থটি। বিস্তারিতভাবে এ বিষয়গুলো তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন।

১০. সব সময় তিনি আত্মোন্নতি এবং আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকবেন। সব সময় ইবাদাত ও ইজতিহাদে মগ্ন থাকবেন। ইলমের সেবায় এবং মানুষের উপকারে ব্যস্ত থাকবেন। দরস-তাদরিস, মুতালাআ, ফিকির, তাহকিক, হিফজ, তাসনিফ, বাহাস ইত্যাদি কাজে মশগুল থাকবেন। অপ্রয়োজনীয় কোনো কাজ বা ইলম-আমলের পরিপন্থী কোনো বিষয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করবেন না। আমাদের পূর্বসূরিগণ ছোটো ছোটো সব প্রয়োজন আর দরদ-ব্যথা ইলমচর্চার মাধ্যমেই নিরাময় করে নিতেন। যথাসম্ভব ইলমপ্রচারের কাজে নিজেকে মশগুল রাখতেন। তাদের ব্যাপারে সত্যই বলা হয় :

إذا مرضْنا تداوينا بذِكركمُ ☆ ونتركُ الذكر أحياناً فننتكسُ

অর্থ : 'অসুস্থ হয়ে গেলে আপনাদের স্মরণ করে আমরা সুস্থ হয়ে উঠি। কখনো যদি আপনাদের আলোচনা পরিত্যাগ করি, তখনই আমরা অধঃপতনের সম্মুখীন হয়ে যাই।'

ইলমের স্তর হলো নবিদের উত্তরাধিকার লাভের স্তর; যা সীমাহীন কষ্ট, অশেষ পরিশ্রম ও সাধনা ছাড়া সম্ভব নয়।

ইমাম রাবি রহ. বলেন, বেশি বেশি তাসনিফের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে ইমাম শাফেঈ রহ.-কে আমি দিনের বেলায় কখনো আহার করতে এবং রাতের বেলায় নিদ্রা যেতে দেখিনি।

১১. শায়খ অজানা কোনো বিষয় বয়সে, মর্যাদা বা বংশের বিচারে তার নিম্নস্তরের কোনো ব্যক্তি থেকে শিখতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

১২. পূর্ণ যোগ্যতা নিয়ে রচনা, সংকলন ও লেখালেখির কাজে তিনি সদা ব্যস্ত থাকবেন। তবে ওই রকম যোগ্যতাসম্পন্ন না হলে এ কাজ থেকে বিরত থাকবেন। কারণ, যে কাজ তিনি উত্তমভাবে করতে পারেন না, তাতে অযথা সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

আমি মনে করি, তালিবুল ইলমের জন্য উস্তাদ আর আদর্শ ব্যক্তি হবেন এক জনই। ইলম ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য এক জনকেই বেছে নিতে হবে। কারণ, সহিহ ইলম ও সহিহ তাসাউফ একটি অপরটির সমন্বয়ক ও সম্পূরক; আলাদা কোনো বিষয় নয়। তাসাউফের শায়খের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম গাযালি রহ. উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে আরও কিছু বিষয় যোগ করেছেন। তিনি বলেন,

'তিনি (শায়খ) হবেন দুনিয়ার মোহ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। পার্থিব মর্যাদা ও প্রতিপত্তি কখনো তিনি আশা করবেন না। এমন একজন দূরদর্শী শায়খের অনুসারী হবেন যার অনুক্রম স্বয়ং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে মিলেছে। আত্মশুদ্ধিতে তিনি অগ্রগামী হবেন। দূরদর্শী কোনো শায়খ থেকে উত্তম চরিত্রগুলো তিনি ধারণ করবেন। সবর, নামাজ, শুকরিয়া, তাওয়াক্কুল, ইয়াকিন, দান, অল্পেতুষ্টি, আত্মস্থিরতা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, সততা, লজ্জাশীলতা, প্রতিশ্রুতিপূরণ, গাম্ভীর্য, নীরবতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তিনি শায়খের কাছ থেকে পুরোপুরি গ্রহণ করবেন। তবেই তার সকল কথা ও কাজ নূরে নবুয়তের আলোয় আলোকিত ও জ্যোতির্ময় হবে। দ্রুতই নেতৃত্বের যোগ্য হয়ে উঠবেন তিনি।'[২৭৩]

এ ক্ষেত্রে নতুন বিষয় হলো : ইমাম গাযালি রহ. এখানে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করার ব্যাপারে ধারাবাহিক রীতি অবলম্বন করার কথা বলেছেন।

একজন আলিমে রাব্বানি থেকেই আরেক জন আলিমে রাব্বানি তৈরি হবে। এক মুরশিদ থেকে অপর মুরশিদ তৈরি হবে। কথার আগে কাজের মাধ্যমেই তার বাস্তবায়ন ঘটে যাবে।

অনেক সময় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের দ্বারা এ ধরনের শায়খ নির্বাচন সম্ভব হয়ে ওঠে না। হয়তো তার জন্য শায়খ নির্বাচন করিয়ে দিতে হবে। না হয় শায়খ নির্বাচনের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত সে বিলম্ব করবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া-প্রার্থনা করবে; আল্লাহ তাআলা যেন তার জন্য দ্রুত উপযুক্ত শায়খের ব্যবস্থা করে দেন, যিনি তাকে আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে সকলকে সে ব্যবস্থা করে দিন। প্রতিটি তালিবুল ইলমকে ইলম ও হিদায়াতের নুরে নুরান্বিত করে দিন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখতে হবে, শায়খ নির্বাচন করতে হবে সান্নিধ্য অর্জন এবং আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে; কেবল একজনের কাছে সীমাবদ্ধ হতে নয়। এ বিষয়ে বরং তালিবুল ইলমকে একাধিক শায়খ নির্বাচন করতে হবে। যেন তার ইলমের পরিধি প্রশস্ত হয়। চিন্তা-চেতনা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটে। সালাফে সালেহিন এ বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। যেখানেই কোনো বিজ্ঞ শায়খের অস্তিত্ব টের পেতেন, জ্ঞানার্জন ও উপকারলাভের আশায় প্রতিযোগিতামূলকভাবে তাঁর কাছে তারা ছুটে যেতেন।

---

[২৭৩] নিজ গ্রন্থ أيها الولد : ১২৯

এর আগে রেওয়ায়েতের শায়খ এবং সুহবত বা 'ইকতেদা'র শায়খের মাঝে যে পার্থক্য আমি নির্ণয় করেছি, তাও এখানে স্মরণ রাখতে হবে।

শুরু থেকেই আদর্শ শায়খের সুহবত এক্তিয়ার

তালিবুল ইলম যদি শিক্ষাজীবনের সূচনাতেই উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের কোনো আদর্শ শায়খ পেয়ে যায় এবং বিরতিহীনভাবে দীর্ঘদিন তাঁর সংশ্রবলাভে ধন্য হয়, তবে সেটি হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য এক পরম সৌভাগ্য। এভাবেই সে দিন-দিন উন্নতস্বভাবী হয়। সংশ্রব যতই দীর্ঘ হয়, ততই শায়খের প্রতি তার ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এক পর্যায়ে শায়খের স্বভাব ও যাবতীয় বৈশিষ্ট্য তার স্বভাবেও প্রবাহিত হতে থাকে। ঠিক যেমন ইসলামের সূচনালগ্নে সংশ্রব ও ভালোবাসার পরিমাণ অনুপাতে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় গুণ ও স্বভাব সাহাবিদের মাঝে প্রবাহিত হয়েছিল।

এ ধরনের প্রবল ও পরম ভালোবাসার কারণেই নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় কথা ও কাজ তারা হিফজ ও সংরক্ষণ করতে পেরেছিলেন। তাদের অন্যতম ছিলেন আবু হুরায়রা রা.। সুন্নতে নববির এত বিশাল ভান্ডার সংরক্ষণের পেছনে ছিল তার একটিই কারণ। দীর্ঘকাল নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য অবলম্বন এবং তা যথাযথভাবে উম্মতের কাছে পৌঁছে দিতে নিজেকে উৎসর্গকরণ।

তালিবুল ইলমের এ সংশ্রব অবলম্বনের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত উপকার অর্জন হবে না যতক্ষণ না তার অন্তর শায়খের সঙ্গে পূর্ণরূপে জুড়ে যায়। আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠে উভয়ের মাঝে। সংশ্রব যতই দীর্ঘ হয়, শায়খের কাছ থেকে ইলম অর্জন ও উপদেশগ্রহণের লিপ্সা ততই তার বেড়ে যায়। ইলম ও আমলের ময়দানে তার অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়।

ইলম, সম্মান, পূর্ণতার কথা বিবেচনা করলে সেক্ষেত্রে সাহাবিগণই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁদের মাঝে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যে যত বেশি আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তত বেশি তারা আত্মিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। দ্বীনের পথে অগ্রগামিতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এমন কঠোর অনুসরণের কারণেই এ রকম অলৌকিক অনুকরণ সম্ভব হয়েছিল। ইবাদাতের পাশাপাশি আদতেও তারা তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের সীমাহীন ভালোবাসার কিছু ঘটনা حجية أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم অধ্যায়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

তার মধ্যে আলি বিন আবি তালিব রা. ইয়েমেন থেকে ফিরে এসে যখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার খবর জানতে পারেন, তখন তিনিও নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজসঙ্গী হতে রওনা হয়ে যান। সাক্ষাতের পর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিকে জিজ্ঞেস করেন– কীভাবে তুমি তালবিয়া পাঠ করেছ? উত্তরে তিনি বলেন, যেভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পাঠ করেছেন।'

তেমনি আবু মুসা আশআরি রা.-এর ঘটনাও এখানে বর্ণনা করা যায়। উভয় ঘটনাই সহিহাইনে বর্ণিত রয়েছে।

আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে কোনো একটি ঘটনার এক পর্যায়ে মুয়ায রা.-এর একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

لا أجد رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على حال أبداً إلا كنت عليها.

অর্থ : রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি যখন যে অবস্থায় দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমিও সে অবস্থা অবলম্বন করেছি।

আনাস রা. যখন থেকে দেখতে পান যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্লেটের চারপাশ থেকে দেখে দেখে কদুর টুকরা আহার করছেন, তিনি বলেন, সেদিন থেকে আমিও কদু পছন্দ করা শুরু করি। প্রতিদিনের খাবার-তালিকায় কদু যোগ করে নিই।'

আবু আইয়ুব আনসারি রহ. যখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রসুন খাওয়া থেকে বিরত থাকতে দেখেন; তিনি নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি যা খেতে অপছন্দ করেন আমিও তা খেতে অপছন্দ করি।

কুররা বিন ইয়ায আল-মুযানি রা. যেদিন নবিজির কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন নবিজির জামার বোতাম ছিল খোলা। এরপর থেকে কুররা রা.-কে আর কখনো বোতাম লাগানো অবস্থায় দেখা যায়নি। মৃত্যুর পর তার পুত্র মুআবিয়াও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। শীত কি উষ্ণ উভয় ঋতুতেই তারা জামার বোতাম খোলা রাখতেন। সহিহাইনে বর্ণিত, আয়েশা রা. বলেন :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطُهوره في شأنه كله.

অর্থাৎ, 'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতো পরিধান করা, চুল আঁচড়ানো, অজু করা এমনকি প্রায় সব কাজই তিনি ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।'

এ হাদিস শোনার পর ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. প্রায় সকল শুভ কাজে ডানপন্থা অবলম্বন করতেন। এমনকি কথা বলার সময় হাত দিয়ে ইশারা করতে হলে সেটিও ডান হাত দিয়ে করতেন। তাঁর ছেলে যেদিন মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন তিনি দেখেন এক ব্যক্তি বাঁ-হাতে ইশারা করে কী যেন বলছে। তিনি ছিলেন তখন কবরস্থানে। সেখানেই তাকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন, ওহে...কথা বলার সময় কখনো বাঁ-হাত দিয়ে ইশারা করবে না; ডান হাত দিয়ে ইশারা করে কথা বলো! তা শুনে লোকটি অবাক হয়ে বলে, কী আশ্চর্য! এই ব্যক্তির সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি আজ মারা গেছে। তারপরও ডান হাত দিয়ে কথা বলার গুরুত্ব তাঁর কাছে একটুও কমেনি।

এ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করাই এখানে যথেষ্ট মনে করি।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো যুক্তি হলো, পরম ভালোবাসা চরম ক্রিয়াশীলতার প্রতিফলন ঘটায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চাইলে বলতে পারেন—পূর্ণ অনুসরণের প্রতিনিধিত্ব করে। আর তালিবুল ইলম এবং উস্তাদের মাঝে এটিই কাম্য। শায়েখদের সাথে আমাদের পূর্ববর্তীকালের আলিমগণের সম্পর্কও ছিল এ রকম। আল্লাহ তাআলা ইসলামের সুমহান আলিমদের প্রতি রহম করুন। সর্বোত্তম হালতে তাদের সঙ্গে আমাদের মিলিত করুন।

* * * *

দশম পথনির্দেশ

উস্তাদের সুহবত

উস্তাদের সঙ্গে তালিবুল ইলমের সম্পর্ক হবে বন্ধুবান্ধব বা অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। উস্তাদের কাছে তার যাবতীয় কথা ও কাজের লাগাম হস্তান্তর করবে। বিশেষত ইলম, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং আচার-প্রকৃতির বিষয়ে। উস্তাদের কাছেই ইলম শিখবে। আমল ও চরিত্র সংশোধনের বিষয়ে তাঁকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে।

এ নিয়মটি সাধারণ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর বিশেষ উস্তাদের সাথে তার সম্পর্ক হবে আরও গভীর। যাঁকে সে ভালোবাসবে মনেপ্রাণে। সবকিছুর ওপর তার মতামতকেই সে প্রাধান্য দেবে। নিজেকে তাঁর আদর্শের অনুসারী ভেবে গর্ববোধ করবে। তবেই তালিবুল ইলমের মধ্যে উস্তাদের গুণগুলো ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকবে। ইলমি ও আমলি বৈশিষ্ট্যগুলো তার মাঝে প্রকাশ হতে থাকবে। কথা, কাজ ও চরিত্রে ভীষণ প্রভাব তৈরি করবে। এটাই হলো প্রকৃত সরল পথের সন্ধান।

এ কথাগুলো আমি أدب الاختلاف গ্রন্থেও উদ্ধৃত করেছি।[২৭৪] সেখান থেকেই তা হুবহু বর্ণনা করছি।

আবু উবাইদ কাসিম বিন সালাম রহ. বর্ণনা করে বলেন, ইবনে মাসউদের সঙ্গীরা সবাই ওমর রা.-এর কাছে যেতেন। ওমর রা.-এর কথা, কাজ, আচার-ব্যবহার এবং উপলব্ধিগুলো লক্ষ করে সেগুলো তারা অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন।[২৭৫]

ইবনুল আসির রহ. বলেন : কথা, কাজ, আচার-ব্যবহার এবং উপলব্ধিগুলোর সঠিক ব্যবহার তখনই সম্ভব, যখন তার ভেতরে থাকবে শান্তশিষ্টতা, ধীরতা, স্থিরতা, শুভবুদ্ধি, সদাচরণ এবং সরল মন-মানসিকতার বিচরণ।[২৭৬]

ইবনে সিরিন রহ. বড়ো বড়ো তাবেঈদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইলম শেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা রীতি-সংস্কৃতিও শিখে নিতেন। চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করতেন। একবার তিনি কাসিম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর কাছে এক লোককে পাঠালেন তাঁর সচ্চরিত্র অবলোকন করতে। কাসিম র.

---

[২৭৪] পৃষ্ঠা : ৭২

[২৭৫] غريب الحديث : ৩/৩৮৩

[২৭৬] النهاية : ২/১৩১ মূলত তা আবু উবাইদের উক্তি।

ছিলেন ঠিক যেন নববি আদর্শের ছায়া। বায়তুন্নবির ধারকবাহক। তিনি তা পেয়েছিলেন দাদা সিদ্দিকে আকবার রা.-এর কাছ থেকে। ফুপি আয়েশা রা.-এর কাছ থেকে। পাঠকের জেনে রাখা দরকার যে, ইবনে সিরিন এবং কাসিম ছিলেন একই 'তাবকা'র মনীষী। কিন্তু উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলির কারণে কাসিম ছিলেন অনন্য। উন্নত আসনপ্রাপ্ত।

আল্লামা যামাখশারির লিখিত ربيع الأبرار গ্রন্থে[২৭৭] বর্ণিত হয়েছে যে, একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-কে ভ্রমণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করা হয়, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে বলেন, বসরায়। জিজ্ঞেস করা হয় : বসরায় কার কাছে? বলেন, ইবনে আউন; তাঁর কাছ থেকে শিষ্টাচার শিখব। তাঁর আচার-আচরণগুলো ধারণ করব।

পাঠককে উদ্‌ঘাটন করা দরকার; ইবনুল মুবারক রহ. কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন! কোন জায়গা থেকে তিনি ইবনে আউনের কাছে ভ্রমণ শুরু করেছিলেন! তা কি তার মাতৃভূমি 'মারওয়া' থেকে! তবে তো মারওয়া থেকে বসরা প্রায় হাজার কিলোমিটারের পথ!!

ইবনে আসাকির রহ. ইবনে আউন রহ.-এর জীবনবৃত্তান্তে[২৭৮] ইবনুল মুবারক রহ. থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেন : 'আমি যত জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি; যাদের সান্নিধ্যে থেকেছি, তাদের মধ্যে কারও ব্যাপারে আমার আফসোস হয় না। কিন্তু ইবনে আউনকে স্মরণ করলে আমার আফসোস হয়; তার সান্নিধ্যে যদি আজীবন থাকতে পারতাম!' এর এক পৃষ্ঠা পর আরও একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে : 'ইলম সবার কাছ থেকেই যথাযথ পেয়েছি। তবে সুশিষ্টাচার শুধু মিসআর এবং ইবনে আউন ছাড়া আর কারও কাছে পাইনি।'

ইমাম যাহাবি রহ. বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ রহ.-এর মজলিশে বসা প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঁচ শ জন শুধু ইলম লিখত। আর বাকি সবাই তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা করত।'

তালিবুল ইলমের শায়খ নির্বাচন, শায়খের যাবতীয় কথা ও কাজের অনুসরণ এবং সব ক্ষেত্রে তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে ইমাম যাহাবি রহ.-এর বলা আরেকটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য, যা তিনি হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান আর-রুআসি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান রুআসি রহ. বলেন : কথা, কাজ, আচার-ব্যবহার ও রীতি-পদ্ধতি অনুসরণে সাহাবিদের মধ্যে নবি

---

[২৭৭] ১/৮১৫

[২৭৮] ৩১/৩৪৬-৩৪৭

করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন ইবনে মাসঊদ রা.। এসব বিষয়ে ইবনে মাসঊদ রা.-এর সঙ্গে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন আলকামা। আলকামার সঙ্গে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন ইবরাহিম নাখঈ। ইবরাহিম নাখঈর সঙ্গে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন মানসুর বিন মু'তামির। মানসুরের সঙ্গে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন সুফিয়ান সাওরি রহ.। সাওরির সঙ্গে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন ওয়াকি। মুহাম্মদ বিন ইউনুসের ভাষ্যমতে ওয়াকি-এর সঙ্গে সবচেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন আহমদ বিন হাম্বল রহ.।

এ বিষয়ের আরও অনেক ঘটনা মনীষীদের জীবনীগ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে।

ইমাম মালেক রহ.-এর ছাত্রদের একজন ছিলেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া আত-তামিমি নিশাপুরি[২৭৯]। তিনি ছিলেন বুখারি ও মুসলিম রহ.-এর শায়খ। ইমাম আবু বকর ইবনে ইসহাক আস-সিবগি রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন : সমগ্র খুরাসানে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমির চেয়ে অধিক জ্ঞানী কেউ ছিল না। এসব উৎকৃষ্ট গুণ, শিষ্টাচার এবং বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার তিনি লাভ করেন মালিক বিন আনাস রা. থেকে। মুয়াত্তা গ্রন্থ শ্রবণের পর তিনি অতিরিক্ত এক বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটান। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি তাঁর আদর্শ গ্রহণ করতে এবং তাঁর শিষ্টাচারগুলো ধারণ করতেই অতিরিক্ত এক বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটাই। কারণ, তাঁর জীবনচরিত ছিল ঠিক সাহাবিদের জীবনচরিতের মতো।'[২৮০]

ইবনে আবদুল বার রহ. ইমাম মালেক রহ.-এর অপর ছাত্র থেকে বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ইবনে কাসির আল-লাইসি আল-আন্দালুসি[২৮১] ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য, জ্ঞানী ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর চরিত্র ছিল ঠিক যেন ইমাম মালেক রহ.-এর চরিত্র।'[২৮২]

ইমাম আবু ইসহাক শাতেবি রহ. ইলমস্বীকৃত আলিমের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'তৃতীয়ত : উস্তাদ ও শায়খকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করা। তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া। তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো আঁকড়ে ধরা। ঠিক যেমন সাহাবিগণ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করেন। সকল ক্ষেত্রে তাঁকে আদর্শ

---

[২৭৯] মৃত্যু : ২২৬ হিজরি।

[২৮০] ترتيب المدارك : ১/৫৪৪

[২৮১] মৃত্যু : ২৩৪ হিজরি।

[২৮২] الانتقاء : ১০৯

হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাবেঈগণও সাহাবিদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। এভাবেই চলে আসছে প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি স্থানে। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই ইমাম মালিক রহ. ছিলেন সমকালীন আলিমদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। ছিলেন উন্নত আসনপ্রাপ্ত।'[২৮৩]

শায়খ নির্বাচনে উস্তাদের দিকনির্দেশনা

তালিবুল ইলমের জন্য বিষয়টি খুবই উপকারী হবে, যখন তার কোনো একজন উস্তাদ তাকে নির্দিষ্ট কোনো শায়খের কথা বলে দেবেন। ওই শায়খের কাছে গিয়ে তাকে আত্মশুদ্ধি করতে বলবেন। ইলম ও আমলের ময়দানে যোগ্যতা ও সুশিষ্টাচার অর্জনের বিষয়ে তাকে পথ দেখাবেন। কারণ, শিক্ষার্থী নিজে শায়খ নির্বাচন করার চেয়ে উস্তাদ কর্তৃক শায়খ নির্বাচনের বিষয়টি বেশি প্রতিক্রিয়াশীল এবং অধিক কার্যকরী হবে। এর উদাহরণ মুয়ায বিন জাবাল রা.-এর মহামারিতে আক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনার মাধ্যমে বোঝা যায়। এখানে তা বর্ণনার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, যখন রোগের ব্যথায় বারবার তিনি অচেতন হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর এক সঙ্গী তাকে দেখে কাঁদতে আরম্ভ করে। মুয়ায রা. তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, আমি যে ইলম আপনার কাছ থেকে শিখতে এসেছিলাম, তার জন্য কাঁদছি।

তিনি বলেন, কেঁদো না! কারণ, ইলম কখনো বিলুপ্ত হবে না। ইবরাহিম খালিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম যে উৎস থেকে ইলম লাভ করেছিলেন, তুমিও সে উৎস থেকে ইলম লাভ করো। আমার মৃত্যু হলে তুমি চার জন ব্যক্তির কাছে গিয়ে ইলম অন্বেষণ করবে– আব্দুল্লাহ বিন সালাম, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, সালমান এবং উওয়াইমির আবু দারদা রা.।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, আমর বিন মাইমুন আল-আওদি মুয়ায বিন জাবাল রা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সান্নিধ্যে থেকে ইলম অর্জন করেন। এরপর মৃত্যুর সময় মুয়ায রা. তাকে ইবনে মাসঊদের কাছে গিয়ে ইলম অর্জনের ওসিয়ত করে যান। ওসিয়ত মোতাবেক মুয়ায রা.-এর মৃত্যুর পর তিনি ইবনে মাসঊদ রা.-এর সান্নিধ্যে এসে ইলম অর্জন করতে থাকেন।'[২৮৪]

তেমনি ইমাম মালেক রহ. তাঁর ছাত্র আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ.-কেও একই ওসিয়ত করেছিলেন।

---

[২৮৩] الموافقات : ১/৬৭

[২৮৪] إعلام الموقعين : ১/২৫

প্রখ্যাত ইমাম কাজি ইয়ায রহ. বলেন, আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. বলেছেন– ইবনুল কাসিমসহ অনেক ব্যক্তি আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন মালেক রহ.-কে বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে প্রশ্ন করতে। তারা বলতেন, এর উত্তর দেওয়ার পর তুমি আবার জিজ্ঞেস করবে, যদি এমন হয়, তবে কী বিধান? ইত্যাদি। একদিন তিনি সামান্য সংকোচ বোধ করে বলেন, এভাবে প্রশ্ন করলে প্রশ্ন বরং বাড়বেই; কমবে না। যদি তুমি ফিকহ বিষয়ে অধিক জ্ঞানার্জনে আগ্রহী হও, তবে ইরাক যেতে পারো। ইমাম মালেক রহ. সম্পূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করার আগে প্রশ্ন করা পছন্দ করতেন না। এরপর আসাদ ইবনুল ফুরাত ইরাকে চলে যান। সেখানে কিছুদিন আবু ইউসুফ রহ.-এর সান্নিধ্যে থাকেন।

এরপর আবু ইউসুফ রহ. তার ছাত্র মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শাইবানির কাছে তাকে হস্তান্তর করে দিয়ে বলেন, একে তোমার সঙ্গে নিয়ে নাও! হয়তো তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তোমাকে দুনিয়া-আখেরাতে উপকৃত করবেন। আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. বলেন, এরপর আমি ইমাম মুহাম্মদের সান্নিধ্য গ্রহণ করি। একপর্যায়ে আমি তার একান্তই নিকটবর্তী সহচরদের অন্যতম হয়ে ওঠি।

ঠিকই ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক একসময় তিনি তৎকালীন ইলমের প্রাণকেন্দ্র হিজায ও ইরাক এলাকার খ্যাতিমান ইমাম এবং বিশিষ্ট ফকিহ হয়ে ওঠেন।

হাম্বলি মাযহাবের বিশিষ্ট আলিমদের অন্যতম হলেন الأحكام السلطانية-এর স্বনামধন্য লেখক আবু ইয়ালা আল-ফাররা আল-হাম্বলি এবং তাঁর পুত্র طبقات الحنابلة -এর রচয়িতা ইবনে আবি ইয়ালা রহ.। পুত্র ইবনে আবি ইয়ালা বলেন, দাদার মৃত্যুর সময় আমার পিতা আবু ইয়ালার বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। প্রসিদ্ধ 'হারবি' ছিলেন আব্বুর অভিভাবক। তিনি বসবাস করতেন 'দারুল কাযে'। প্রতিপালনের সুবিধার্থে তিনি আমার পিতাকে 'বাবুত্তাক' থেকে দারুল কাযে নিয়ে আসেন। দারুল কাযের মসজিদে ছিলেন একজন বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি ইবনে মাকদাহা আল-মুকরি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কারি। তাঁর কাছে যারাই পড়তে আসত, সকলকে তিনি مختصر الخرقي থেকে 'ইবাদাত' অধ্যায়টি পড়তে বলতেন। এরপর তিনি আমার পিতাকেও ওই গ্রন্থের 'ইবাদাত' অধ্যায়টি পড়ান। আমার পিতা আরও বেশি অধ্যয়নের অনুরোধ করলে ইবনে মাকদাহা তাকে বলেন, এইটুকুই আমার ভালো জানা আছে। এর চেয়ে বেশি পড়তে চাইলে তুমি শায়খ আবু আবদুল্লাহ ইবনে হামিদের শরণাপন্ন হতে

পারো। এরপর তিনি ইবনে হামিদের কাছে চলে যান। শায়খের মৃত্যু পর্যন্ত (৪০৩ হিজরি) তিনি সেখানেই অবস্থান করেন এবং ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।'[২৮৫]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ.-এর মাঝেও এই ইলমি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম সাখাভি রহ. নিজ গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন, সেখানে তিনি তার শিষ্যদের সমকালীন প্রসিদ্ধ সব আলিম থেকে ইস্তেফাদা করার, তাদের থেকে ইলম শ্রবণের, সনদের মানোন্নয়ন এবং মুনফারিদ হাদিসগুলোর প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে তাদের কাছে যেতে বলেন।[২৮৬]

একাধিক শায়খ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

তালিবুল ইলমের যোগ্যতা, দক্ষতা ও মননশীলতা বিকাশের একটি মহান উপকরণ হলো ইলম অন্বেষণের জন্য ভ্রমণের সুযোগ লাভ করা। খ্যাতিমান আলিমদের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হওয়া। এভাবে এক নুরের ওপর অপর এক নুরের সংযোগ ঘটবে। এক হিকমার সঙ্গে অপর হিকমার সংযোজন হবে। ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তি হয়ে থাকে একটি মৌমাছির মতো; প্রতিটি ফুল ও কলি থেকে সে শ্রেষ্ঠ নির্যাসটুকু বের করে আনে। এরপর নিজ সাথিদের সে সুমিষ্ট মধু পান করায়। যাতে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'শিফা'। থাকে হেদায়াত প্রার্থীদের জন্য সরল পথের দিশা।

আর যারা ইলম অন্বেষণের জন্য ভ্রমণের সুযোগ না পান, তারা যেন কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবির মূল্যবান উপদেশটুকু গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, দৈহিকভাবে যারা ভ্রমণ করতে অক্ষম, তারা যেন অন্তর দিয়ে আল্লাহর দিকে ভ্রমণ করে। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। কুপ্রবৃত্তির জগৎ থেকে নৈকট্যশীলতার জগতে পাড়ি জমায়। ইন্দ্রিয় বিষয়াদি থেকে অনেন্দ্রিয় বিষয়াদির দিকে পথপরিবর্তন করে। আখেরাতের পাথেয়ের প্রতি মনোনিবেশ করে। এটি খুবই জরুরি। পথপ্রদর্শক খোঁজো! ইলম অন্বেষণে মনোযোগী হও! তা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। সেখানে ভালো কোনো মুয়াল্লিম বা শায়েখ পেয়ে গেলে সেটা হবে অনেক বড়ো কৃপা। যা তোমাকে পথ দেখাতে সহায়তা করবে। বিদআত ও কুসংস্কার থেকে তোমাকে রক্ষা করবে।'[২৮৭]

ইমাম সাখাভি রহ. তার শায়খ ইবনে হাজার রহ.-এর বৃত্তান্তে তাঁর ইলমি উৎকর্ষ ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের কারণ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বলেন :

---

[২৮৫] الطبقات : ৩/৩৬৪

[২৮৬] الجواهر والدرر : ৩/১০২১-১০২৩

[২৮৭] قانون التأويل : ৬৪৫

'তিনি একাধিক জগদ্বিখ্যাত শায়খ থেকে ইলম অর্জন করেন। যাদের কাছে গেলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তাঁর সমকালীন কোনো মনীষীই এতসব বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ শায়খের সংশ্রব লাভ করতে পারেননি। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন সুগভীর জ্ঞানের ধারক-বাহক। নির্দিষ্ট বিষয়ে ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।'

পূর্বসূরিদের এ ইলমি ভ্রমণ থেকে দুটি বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় :

এক. ইলম অন্বেষণে দূরদেশে পাড়ি জমানো।

দুই. বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন।

একাধিক শায়খ নির্বাচনের পেছনে এ দুটি লক্ষ্য অবশ্যই থাকা চাই।

একাধিক শায়খ নির্বাচনের পেছনে অপর হিকমাহ হলো– বয়স, বংশ, দেশ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যভেদে বিভিন্ন স্বভাবের এবং বিভিন্ন স্তরের শায়খদের থেকে জ্ঞানার্জন করে ইলমের বিকাশ ঘটানো। তা ছাড়া লোকমুখে একটি হাদিসও প্রসিদ্ধ আছে–

الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها.

অর্থ : 'হিকমাহ হলো মুমিনের হারানো মানিক। যেখানেই এই মানিক পাবে, সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করে নেওয়ার উপযুক্ত একমাত্র মুমিনই।'[২৮৮]

শিক্ষক ও উস্তাদের সাথে শিক্ষার্থীদের আদবের বিবরণ দিতে গিয়ে ইমাম নববি রহ. বলেন– কোনো শিক্ষার্থীকে বয়সে, বংশ-মর্যাদায়, দেশভেদে, প্রসিদ্ধি বা দ্বীনদারির ক্ষেত্রে নিম্নবর্তী মনে করা অথবা দুর্বল কারও কাছ থেকে ইলম অর্জন করতে হীনম্মন্যতাবোধ করা উচিত নয়; বরং তার কাছে যেটুকু আছে সেটুকুই মূল্যবান মনে করা উচিত!'[২৮৯]

উস্তাদের কাছ থেকেই যদি এ রকম গুণাবলি আশা করা হয়, তবে ছাত্রদের কাছ থেকে তো নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে তা আশা করা হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এত ইলম আপনি কীভাবে অর্জন করলেন? উত্তরে তিনি বলেন,

ما بخلتُ بالإفادة، ولم أستنكف عن الاستفادة .

---

[২৮৮] হাদিসটি যইফ। ইমাম তিরমিজি রহ. তা বর্ণনা করে যইফ বলেছেন : ২৬৮৭। ইবনে মাজা রহ. আবু হুরায়রা রা. থেকে তা কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা করেছেন।

[২৮৯] المجموع-এর ভূমিকা : ১/29

'ইলম বিতরণে কখনো কার্পণ্য করিনি এবং কারও কাছ থেকে উপকৃত হতে কখনো লজ্জাবোধ করিনি।'[২৯০]

العقد الفريد গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : বাদশা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের দরবারে একব্যক্তি প্রবেশ করে। তার কাছে যে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করা হতো, সঙ্গে সঙ্গে তার সঠিক উত্তর এবং সমাধান সে বলে দিত।

বাদশা জিজ্ঞেস করেন : এ জ্ঞান তুমি কোথায় ও কীভাবে অর্জন করেছ? উত্তরে লোকটি বলে : হে আমিরুল মুমিনিন, আমি কখনো কারও কাছে জ্ঞান বিতরণে কৃপণতা করিনি। কারও কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি। কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমি তার কাছ থেকে গ্রহণ করি আবার তাকে প্রদানও করি।'[২৯১]

أدب الدين والدنيا গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : ইমাম আলফারাহিদি নামে খ্যাত খলিল বিন আহমদকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই ইলম আপনি কোত্থেকে অর্জন করলেন? উত্তরে তিনি বলেন :

كنت إذا لقيت عالمًا أخذت منه وأعطيته.

যখনই আমি কোনো আলিমের সাক্ষাতে গিয়েছি, তখন তাকে কিছু দিয়েছি এবং তার থেকে কিছু নিয়েছি। খ্যাতিমান আব্বাসি খলিফা মানসুর–কাজি শুরাইককে লক্ষ্য করে বলেন, এত ইলম আপনি কোথায় পেলেন? উত্তরে তিনি বলেন :

لم أرغبْ عن قليلٍ أستفيده، ولم أبخل بكثير أفيده.

অর্থ : তুচ্ছ কোনো জ্ঞান অর্জনে আমি অবজ্ঞা করিনি এবং বেশি বেশি জ্ঞান প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি।[২৯২]

বিষয়টি ইমাম আবু হাতিম রাযি রহ.-এর প্রতিস্থাপিত ওই মূলনীতির ওপর গঠিত, যা খতিব রহ. বর্ণনা করেছেন :

إذا كتبت فقَمِّشْ، وإذا حدثتَ ففَتِّشْ.

অর্থ : 'যখন লিখতে চাও তখন বিভিন্ন জনের কাছ থেকে সংগ্রহ করে লেখো। আর যখন বলতে চাও তখন যাচাই বাছাই করে বলো!'[২৯৩]

---

[২৯০] সিরাজুদ্দিন আওশির রচিত الفتاوى السراجية : ৬১০ যারনুজি রহ. এ উক্তিকে আবু ইউসুফ রহ. এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন : ৭৪

[২৯১] ইবনে আব্দি রাব্বিহি রচিত : ২/২২১

[২৯২] للماوردي : ১২৪

[২৯৩] الجامع : ১৭২৯ নিজ ইতিহাসগ্রন্থেও তিনি ইবনে মুঈন থেকে উক্তি নকল করেছেন : ১/৩৪৪ ফাতহুল মুগিস গ্রন্থে প্রায় কাছাকাছি অর্থে এটি বর্ণিত হয়েছে : ৩/৩১২।

খতিব রহ. ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ থেকেও একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন :

لا يكون الرجل عالمًا حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو دونه، وعمن هو مثلُه.

অর্থ : 'কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আলিম হবে না যতক্ষণ না সে তার উচ্চস্তরের, তার সমস্তরের এবং তার নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের কাছ থেকে ইলম লিপিবদ্ধ করে।'[২৯৪]

এরপর الجامع গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলোর শেষে কাসিম বিন দাউদ আল-বাগদাদি রহ. সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন : কাসিম বিন দাউদ ছয় হাজার শায়খ থেকে লিখে সংরক্ষণ করেছেন।'[২৯৫]

কাসিম আল-বাগদাদি রহ.-এর জীবনবৃত্তান্ত ميزان الاعتدال গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। হাফিজ ইবনে হাজার রহ. اللسان গ্রন্থেও তার সম্পর্কে বাড়িয়ে কিছু বলেননি।[২৯৬] যার ফলে এ খবরের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

কারণ, এত অধিকসংখ্যক শায়খ থেকে বর্ণনা করার রেকর্ড ইতোমধ্যে অনেক মনীষীর রয়েছে; বরং এর চেয়ে বেশিও রয়েছে কারও কারও।

ইমাম হাফেজ আবু সা'দ আস-সুমআনি রহ.[২৯৭]-এর বৃত্তান্তে ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, তাঁর শায়খের সংখ্যা সাত হাজার! তিনি আরও বলেন, ইবনুন্নাজ্জার বলেছেন : আমি একজনের কাছ থেকে শুনেছি, আবু সা'দের শায়খের সংখ্যা সাত হাজার! এত বেশি পরিমাণ শায়খের সান্নিধ্য অর্জন অন্য কেউ করেছেন বলে বর্ণিত নয়।'[২৯৮]

ইমাম হাফেজ ইবনুন্নাজ্জার রহ.[২৯৯]-এর বৃত্তান্তে ইমাম যাহাবি রহ. বলেন : ইবনে সায়ি বলেছেন, তাঁর মাশায়েখের সংখ্যা তিন হাজারেরও বেশি। আর মহিলা

এরূপ অপর একটি উক্তি عيون الأخبار গ্রন্থের ভূমিকায় ইবনে কুতাইবা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

[২৯৪] الجامع : ১৭১৪ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকেও (১৭২০) হুবহু উক্তি বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া আরও অনেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

[২৯৫] الجامع : ১৭৩৭

[২৯৬] الميزان : ৬৪৩১ اللسان : ৬১১৩

[২৯৭] ৫০৬-৫৬২ হিজরি

[২৯৮] السير : ২০/৪৬২। ইবনে আইবেক আদ্দিময়াতির রচিত المستفاد من ذيل تاريخ بغداد গ্রন্থেও এটি স্থান পেয়েছে। ইমাম সাখাভির রচিত فتح المغيث দ্রষ্টব্য : ৩/৩১০। النكت الوفية : ২/৩৭৫

[২৯৯] ৫৭৮-৬৪৩ হিজরি

শায়খার সংখ্যা চার শ। এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় হলো : ইমাম যাহাবির রচিত السير গ্রন্থে ইবনুল মুবারক রহ. সম্পর্কে তার নিজস্ব উক্তি বর্ণিত হয়েছে: 'আমি চার হাজার শায়খ থেকে ইলম লাভ করেছি। তাদের মধ্যে শুধু এক হাজার শায়খ থেকে আমি বর্ণনা করেছি।'[৩০০]

মজার বিষয় হলো, ইবনুল মুবারক রহ. ইবনুন্নাজ্জার থেকেও আরও আগের (মৃত্যু ১৮১ হিজরি)।

এসব ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো, অধিকসংখ্যক শায়খের সান্নিধ্য লাভ একটি প্রশংসনীয় গুণ। হ্যাঁ, সঙ্গে যদি থাকে সদিচ্ছা ও সৎ নিয়ত; কিন্তু সেটি যদি অহংকারের লোভে হয়, তবে তা হবে নির্ঘাত হারাম।

সদা সতর্কতা অবলম্বন এবং সর্বক্ষণ তালিবুল ইলমের সংশ্রব অর্জন

একাধিক শায়খ গ্রহণকালে তালিবুল ইলমকে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষত শায়খের আচার-আচরণ ও চরিত্রগত দিক বুঝতে। শায়খের ইলমি মানহাজ উপলব্ধি করতে। তালিবুল ইলমকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে কার হাতে সে জীবনের লাগাম সোপর্দ করছে। একটি বিষয় তাকে বুঝতে হবে, স্বভাব স্বভাবকে চুরি করে। প্রতিটি বৈঠক থেকেই স্বভাব প্রভাবিত হয়। তালিবুল ইলম যেন হয় মৌমাছিসদৃশ; প্রতিটি ফুল থেকে সে উত্তম বস্তু বেছে নেয়। অনুত্তমকে ছুড়ে ফেলে দেয়।

ঠিক তেমনই যেন হয় তালিবুল ইলমের শিক্ষাজীবন। প্রতিটি মানুষ থেকে সে জ্ঞান ও চেতনার দিকটিকেই বেছে নেবে। প্রতিটি কিতাব থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু নির্বাচন করবে। মিডিয়া বা গণমাধ্যমে শোনা প্রবক্তাদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ দিকটিকেই গ্রহণ করবে।

কারণ, বর্তমান যুগে এটি ব্যাপক মহামারির আকার ধারণ করেছে। পাপিষ্ঠ ও স্বল্পজ্ঞানীরা সবাই মিডিয়াতে জেঁকে বসেছে। ভালো ও উৎকৃষ্ট বিষয় অপেক্ষা মন্দ ও অনিষ্টকর বিষয়ই তাতে বেশি অনুপ্রবেশ করছে।

এ রকম সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি তার মূল টার্গেট থাকবে 'কিতাবুল্লাহ' এবং সুন্নাতে রাসুলের পূর্ণাঙ্গ অনুকরণ। সালাফে সালেহিন এবং তাদের আদর্শের অনুগামী গ্রহণযোগ্য আলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণ। কারণ, নতুন হলেই ছুড়ে ফেলে দিতে হবে এমনটি কাম্য নয়। আবার সব পুরোনো বিষয় সর্বকালের জন্য উপযুক্তও নয়।

* * * *

---

[৩০০] ৮/৩৯৭

একাদশ পথনির্দেশ

তালিবুল ইলমের আদব-আখলাক

আরবি 'আদব' শব্দটি সেসব বিরল ও ব্যাপক অর্থসংবলিত শব্দ, যার দ্বারা পুরো ইসলামকেও বোঝানো সম্ভব। শব্দটি আরবি الأمانة শব্দের মতো; যার একটি অর্থ হলো– আমানতের মাল তার আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু তার ব্যাপক অর্থ হলো– (আল্লাহই বেশি জানেন) যা সুরাতুল আহযাবের শেষের দিকে বর্ণিত হয়েছে–

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾

অর্থ : 'আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম...' অর্থাৎ পুরো ইসলামধর্মকে।

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন : জুমহুর আলেমের মতে, এখানে 'আমানত' বলতে দ্বীনের সকল কাজ উদ্দেশ্য।[৩০১]

তেমনি العدل শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো : শুধু বিচার ও সালিশের ক্ষেত্রে ন্যায়পন্থা অবলম্বন করা। এটি ব্যবহৃত হয় জুলুমের বিপরীতে। তবে ব্যাপক অর্থে শব্দটি পূর্ণ ইসলামকে বোঝায়। ইবনুল আরাবি সুরা নাহলের ৯০নং আয়াতের তাফসিরে এ মত ব্যক্ত করেছেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾

অর্থ : 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের আদেশ দেন..।'[৩০২]

তার মতো الأدب শব্দটিও ব্যাপক অর্থবোধক। যা সম্পূর্ণ ইসলামধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আদব, তাঁর সৃষ্টিকুলের সঙ্গে আদব, নবিদের সঙ্গে আদব, ফেরেশতাদের সঙ্গে আদব, অন্যসব প্রাণীর সঙ্গে আদব, নিজের সঙ্গে আদব, পিতা-মাতা ও নিকটবর্তীদের সঙ্গে আদব, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আদব ইত্যাদি...।

অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রতিপালকের অবতীর্ণ সকল বিষয়ের পূর্ণ সত্যায়ন এবং তার ওপর আমল করে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃত আদবই প্রকৃত 'আদব'।

---

[৩০১] তাফসিরে কুরতুবি : ১৪/২৫৩

[৩০২] أحكام القرآن : ৩/১৫৩-১৫৪

এ ব্যাপক অর্থের প্রমাণ পাওয়া যায় ইমাম আবুল কাসিম আল-কুশাইরির নিজ গ্রন্থ الرسالة-তে সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ. থেকে বর্ণিত উক্তিতে। তিনি বলেন, ব্যক্তিসত্তায় প্রতিপালকের অধিকারগুলো যে ব্যক্তি বোঝে না, তাঁর আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা করে না, তার উচিত হলো প্রতিপালকের রাজত্ব থেকে বের হয়ে যাওয়া।'[৩০৩]

আদবের এই ব্যাপক অর্থের মধ্যে তালিবুল ইলমের জন্য তার উস্তাদের সঙ্গে কৃত আদবের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত তার মুরুব্বি, পথনির্দেশক, তাকে অপরাধ ও পাপ-পঙ্কিলতার বেড়াজাল থেকে উদ্ধারকারী, ইলমে নববির দিকে পরিচালনাকারী, আমালে সালেহের দিকে উদ্বুদ্ধকারী শায়খের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে, তা উল্লেখ করা জরুরি। অবশ্যই তাদের কিছু অধিকার রয়েছে। রয়েছে সর্বোচ্চ হক্কুল ইবাদ। কারণ, তাঁরাই আল্লাহর হকসমূহ সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছেন। নবি, ফেরেশতা, পিতা-মাতা এমনকি সকল মাখলুকের অধিকার সম্পর্কে তাকে জ্ঞান দিয়েছেন।

যতই তাঁদের সম্মানিত করা হোক, যত উঁচু আসনেই সমাসীন করা হোক, তাঁরা যে মহান ও সর্বোচ্চ জ্ঞানের দিশা তাদের দিয়েছেন, সেগুলোর সামনে তা খুবই সামান্য। এই যদি হয় দুনিয়ায় তাদের মর্যাদা, তবে আখেরাতে তাদের মর্যাদা কীরূপ হতে পারে!?

এখানে শায়খ ও মুরুব্বির সঙ্গে তালিবুল ইলমের আদবের পাশাপাশি স্বয়ং ইলমের সঙ্গে তার আদবের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হবে; যে ইলমের দিকনির্দেশনার ওপর তাঁরা তাকে পরিচালিত করছেন। এ বিষয়ে বলতে গেলে বিস্তারিতই বলতে হবে। অনুসঙ্গসহ বর্ণনা করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আলোচনা করতেই হয়। তাই নিম্নে আমি এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি; কারণ, এ বিষয়ে আলোচনা অনেক দীর্ঘ ও সুবিস্তৃত।

১. শায়খের সঙ্গে আদব

উস্তাদের প্রতি তালিবুল ইলমের আদব অবলম্বন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; যার দ্বারা তার চরিত্র সংশোধিত হবে। সব সময় লক্ষ রাখতে হবে এ দিকটিতে; প্রতিটি কাজে; শায়খের উপস্থিতিতে, অনুপস্থিতিতে। এটিই তালিবুল ইলমের সফলতা ও লক্ষ্যার্জনের মূল চাবিকাঠি। সর্বোত্তম শিক্ষা। সালাফে সালেহিনের জীবনীগুলোতে আদবের বিষয়টি প্রচুর পরিমাণে লক্ষ করা গেছে। কিছু ঘটনা

---

[৩০৩] أول باب الأدب : ১৫/৪

আমি أدب الاختلاف গ্রন্থে[৩০৪] উল্লেখ করেছি। সেগুলোর মধ্যে ইবনে আব্বাস এবং মালেক রহ.-এর ছাত্র ইবনুল কাসিমের ঘটনাও বর্ণনা করেছি।[৩০৫]

ইমাম আহমদ রহ.-এর পুত্র আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, একবার শুনি আব্বুকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি ইবরাহিম বিন সা'দ থেকে বেশি পরিমাণে কেন ইলম অর্জন করছেন না; অথচ তিনি দারুল উমারাতে আপনার বাড়ির পাশেই অবস্থান করছেন?! উত্তরে তিনি বলেন, একবার আমরা তাঁর মজলিশে উপস্থিত হলে তিনি আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় মজলিশের সময় হলে কয়েকজন যুবককে দেখতে পান যে তারা শায়খদের থেকে অগ্রসর হয়ে গেছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলতে থাকেন, আল্লাহর শপথ! আগামী এক বছর আমি তোমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করব না! এরপর এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন।'[৩০৬]

এ ঘটনার দ্বারা আমার আরও কিছু ঘটনা স্মরণ হয়ে যায়। ইবনে সা'দ রহ. তার الطبقات গ্রন্থে এবং খতিব রহ. তার الجامع গ্রন্থে[৩০৭] মালেক বিন মিগওয়াল রা. থেকে বর্ণনা করেন : 'একবার আমি তালহা বিন মুসাররিফের সঙ্গে চলছিলাম। পথিমধ্যে গিরিপথ এলে তিনি আমাকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, যদি জানতাম আপনি আমার চেয়ে অন্তত এক দিনের বড়ো তবে আজ আপনাকে এগিয়ে দিতাম না!' (অর্থাৎ আয়ুতে বড়ো হওয়ার কারণে সম্মান করছি না; ইলমের কারণে করছি) অপর আরেকটি ঘটনা যা ইমাম দাওরি রহ. তার ইতিহাসগ্রন্থে এবং খতিব রহ. الجامع গ্রন্থে উল্লেখ করেন : আলি বিন সালেহ বিন হাই এবং হাসান বিন সালেহ বিন হাই ছিলেন পরস্পর জমজ ভাই। কিন্তু আলি জন্মেছিলেন হাসানের কিছুক্ষণ আগে। এ কারণে হাসান তাকে শ্রদ্ধা করতেন। সরাসরি তার নাম না নিয়ে উপনাম ধরে সম্বোধন করে বলতেন : 'আবু মুহাম্মদ বলেছেন...আবু মুহাম্মদ বলেছেন'। আলি বিন সালেহ কোথাও বসলে হাসান তার পাশে না বসে পেছনে বসতেন। সামান্য পূর্বে জন্মেছিলেন বলেই তিনি তাকে এত সম্মান করতেন![৩০৮]

---

[৩০৪] ১৯০-১৯৬

[৩০৫] পৃষ্ঠা : ২১৭

[৩০৬] السير : ১১/৩১৭

[৩০৭] ইবনে সা'দ : ৬/৩০৮ জামে : ২৫২

[৩০৮] الدوري : ২/৪১৮ খতিব : ২৫৫ তিনি ঘটনার দ্বিতীয় অংশকে সেখানে সংক্ষেপিত করেছেন এবং এ জাতীয় আরও আশ্চর্য ও বিরল ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা মুনাভি রহ. বলেন : আল-বুরহান আল-বিকাঈ রহ. বলেন, এক অনারব তাকে কিছু বিষয় পড়ে শোনানোর আবেদন করলে তিনি তাকে অনুমতি দেন। এরপর সে চারজানু হয়ে বসে পড়া শোনানোর জন্য তৈরি হলে তিনি তাকে পড়তে বারণ করেন। বলেন, যে ইলম অন্বেষণের জন্য তুমি এসেছ, এরচেয়ে বরং আদব শেখা তোমার বেশি দরকার।'[৩০৯]

শামস আল-জাওজারি হতে বর্ণিত, শিক্ষাজীবনের শুরুলগ্নে তিনি তার নগরীর প্রায় সকল আলিমের শরণাপন্ন হয়েছেন। তবে কারোর মাধ্যমেই তার মন ভরেনি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও অতি সতর্কবান ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত শায়খুল ইসলাম ইয়াহইয়া আল-মানাভি রহ.-এর কাছে এসে তাঁর সামনে বসে পড়েন। কেউ একটু সামনে এগিয়ে গেলে তাকে পেছনে টান দিয়ে কাছে নিয়ে আসতেন। এ দৃশ্য দেখে শায়খ তাকে ধমক দিয়ে তিরস্কারের সুরে বলেন, তোমার আদব-লেহায দেখছি খুবই কম। তোমার মতো ব্যক্তিদের দিয়ে ইলম তলব হয় না। হাত সামলে রাখো! আদবের লেহায করো! শায়খের ধমক শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি নীরব হয়ে যান। অহংকার ও অন্যদের ছোটো মনে করার যে সামান্য অভ্যাস তার মধ্যে ছিল, তাও দূর হয়ে যায়। এরপর তিনি শায়খ মানাভির সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইলমের কর্ণধার এবং জ্ঞানের ধারক-বাহক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

তালিবুল ইলমের মধ্যে যদি এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তবে দেখবেন এগুলোর চেয়েও উন্নত ও উৎকৃষ্ট অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার মাঝে এমনিতেই চলে আসছে।

ওপরে বর্ণিত শায়খ হাম্মাদের সঙ্গে ইমাম হানিফা রহ.-এর আদব অবলম্বন, মালেক রহ.-এর সঙ্গে ইমাম শাফেঈর আদব অবলম্বন এবং ইমাম শাফেঈর সঙ্গে রাবি বিন সুলাইমানের আদব অবলম্বনের ঘটনাও এখানে যোগ করে নিন।[৩১০]

---

[৩০৯] فيض القدير : ১/২২৫

[৩১০] ঘটনার সারমর্ম হলো– ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, আমার উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমানের সম্মানার্থে আমি ত্াঁর ঘরের দিকে কখনো পা প্রসারিত করিনি। অথচ তার ও শায়খ হাম্মাদের ঘরের মাঝে ছিল সাত গলির ব্যবধান। ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, শায়খের সামনে পাতা উল্টানোর সময় আমি ধীরে ধীরে পাতা উল্টাতাম যেন শায়খ তা না শুনতে পান। রাবি বিন সুলাইমান বলেন, আল্লাহর শপথ, ইমাম শাফেঈ রহ. আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আর আমি পানি পান করছি এরকমর দুঃসাহস আমার কখনো হয়নি!!

উস্তাদ অনেক সময় সরাসরি আদব শিক্ষা দেন। আবার অনেক সময় বলা ও সতর্ক করা ছাড়া এমনিতেই শিক্ষার্থীর মাঝে অনেক আদব ও উন্নত চরিত্রের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে।

কোনো পথ দিয়ে উস্তাদ ও ছাত্র একসঙ্গে চলার সময় পাশে ছায়াদার পথ থাকলে উস্তাদের জন্য তা ছেড়ে দিয়ে নিজে রোদের মধ্যে দিয়ে চলবে। পাশাপাশি উস্তাদের ছায়ায় কখনো পা ফেলবে না; বরং অপর পাশ দিয়ে চলবে।

এখানে সম্প্রতি আমি আমার নিজ চোখে দেখা একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। একবার আমি শায়খুল মাশায়েখ বিখ্যাত ফকিহ আলেপ্পোর শাফেঈ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় মুফতি আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আসআদ আবাজির[৩১১] সান্নিধ্যে ছিলাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ ও মুরুব্বি শায়খ আবদুল্লাহ সিরাজুদ্দীন রহ.। মাদরাসাতুস শা'বানিয়ার অপর এক উস্তাদও ছিলেন সেখানে। মজলিশটি ছিল মাদরাসা চত্বরে। দিনটি ছিল বসন্তের শুরুর দিনগুলোর একটি। রোদ ছিল হালকা। হঠাৎ আমার উস্তাদ খুবই নীরবতা ও সতর্কতার সঙ্গে মাদরাসার অপর উস্তাদের দিকে তার তাসবিহযুক্ত আঙুল দিয়ে তাকে একটু পেছনে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। লক্ষ করলাম, তার পা ছিল ওই মহান শায়খের ছায়ার ওপর।

আরেকটি ঘটনা স্মরণ হয়ে যায়। একবার মাদরাসায়ে শা'বানিয়ায় অধ্যয়নকালে গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় আমি আমার প্রিয় সৎ উৎকৃষ্ট ও প্রাণাধিক প্রিয় এক বন্ধু এবং শায়খ আব্দুল মাজিদ কাত্তান রহ.-এর সঙ্গে ছিলাম। দোয়া করি মাদরাসায়ে শা'বানিয়াকে আল্লাহ দীর্ঘজীবী করুন এবং ইলম ও আমলের দ্বারা তাকে সুশোভিত করে রাখুন। সহসা মাদরাসার ফটকে শায়খ আল্লামা মুহাম্মদ আসআদ আবাজির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গে আমার উস্তাদ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.ও ছিলেন। আমার ওই বন্ধু প্রথমে আমাদের শায়খ আব্দুল ফাত্তাহকে সালাম দিলে তিনি সালামের উত্তর না দিয়ে বলেন, উস্তাদকে আগে দাও.. উস্তাদকে আগে দাও..!! এরপর তিনি প্রথমে উস্তাদকে সালাম দেন। আমিও তার মতো শায়খ আব্দুল ফাত্তাহকে আগে সালাম দিতে গেলে তিনি সালামের উত্তর না নিয়ে আরও কঠিন এবং ধমকের সুরে বলেন, উস্তাদকে আগে দাও.. উস্তাদকে আগে দাও..!!

ওই ঘটনার সাক্ষী তারা হয়েছিল, যারা তখন উপস্থিত ছিল, অবশ্যই তারা এ আদবের সম্মান ও মর্যাদা ভালো করে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। আল্লাহ

---

[৩১১] ১৩০৫-১৩৯৩ হিজরি

আমাদের সকল শায়খ ও উস্তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন! তাদের উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন! আমাদেরও তাদের আদর্শ অনুসরণের তাওফিক দান করুন!

জিজ্ঞেস করুন তো–যারা বিভিন্ন অধিবেশনে তাদের উস্তাদ ও শায়খদের সাথে একসঙ্গে এক চেয়ারে বসে বলতে থাকে, আমরা সবাই এক সমান! এসব ব্যক্তিদের সাথে সেইসব মাশায়েখ ও উস্তাদদের কি কোনো তুলনা হতে পারে?!!

অনেক সময় এ রকম উন্নত ও অভাবনীয় আদব-লেহায দেখে মানুষ অবাক হয়–মানুষ কীভাবে আরেকজন মানুষের সঙ্গে এত উন্নত আদব অবলম্বন করতে পারে?! উত্তর হলো, এসব আদব ও শিষ্টাচারের প্রেক্ষাপট এক দিনে বা এক মুহূর্তে তৈরি হয়নি; বরং তা অর্জনের পেছনে রয়েছে শায়খের বিশাল ভূমিকা, সুদীর্ঘ পরিশ্রম আর অক্লান্ত শ্রম-সাধনা।

তুমি লক্ষ করে থাকবে, কোনো মানুষ মফস্বল থেকে উঠে যখন উন্নত শহরে উপনীত হয়, তখন স্বভাবতই গগণচুম্বী সুবিশাল সব ইমারত আর অট্টালিকা দেখে যারপরনাই সে বিস্মিত হয়ে যায়। মনে মনে বলতে থাকে, এত বিশাল বিশাল বিল্ডিং আর প্রাসাদ কীভাবে গড়ে ওঠল?! এরপর যখন তাকে বোঝানো হয়–এত সব প্রাসাদ নির্মাণের পেছনে রয়েছে বিশাল অর্থায়ন, অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম এবং বহুদিনের সাধনা ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ; আর ধীর পদক্ষেপে তার বাস্তবায়ন; তখন ঠিকই তার সব জল্পনা-কল্পনা দূর হয়ে যায়। বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় সে।

তেমনি আমাদের মনীষী ও বিজ্ঞ উস্তাদদের এত সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তির পেছনেও রয়েছে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা আর সীমাহীন পরিশ্রম।

অনেক সময় মনে এ ধারণার উদয় হতে পারে যে, বড়োদের সম্মান আর শ্রদ্ধার বিষয়টি তো জীবজন্তুর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, তাই এতে অবাক হওয়ার কী আছে! আমি বলব : থামো! তুমি কি মহান প্রতিপালকের বাণী পড়োনি?

﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ، حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

অর্থ : 'সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হয়। জিন-মানুষ ও পাখীদের; এরপর তাদের বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হয়। যখন তারা পিপীলিকা-অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছায়, তখন এক পিপীলিকা বলে,

হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো। না হয় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজান্তেই তোমাদের পিষে ফেলবে।'[৩১২]

এখানে ছোট্ট জীব পিপীলিকার সেই সম্বোধনটি খেয়াল করুন :

﴿لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

অর্থ : 'না হয় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজান্তেই তোমাদের পিষে ফেলবে।'

এখানে তারা সুলাইমান আ.-এর বাহিনীর সঙ্গে শিষ্টাচার অবলম্বন করেছে। কারণ, তারা হলো বিশালকায় এবং নবির অনুসারী বাহিনী। সতর্ক করে দিচ্ছে, তাদের পক্ষ থেকে কোনো পীড়নের সম্মুখীন হলে তাদের কোনো দোষ থাকবে না। তারা উপলব্ধিও করতে পারবে না। এই ছিল বড়োদের প্রতি ক্ষুদ্র একটি প্রাণীদলের শিষ্টাচার অবলম্বন।

সুলাইমান আ.-এর সঙ্গী ও তাঁর সেনাবাহিনীর প্রতি যদি তারা এরূপ আচরণ অবলম্বন করতে পারে, তবে মহানবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী সম্মানিত সাহাবিদের প্রতি আমাদের কীরূপ আদব অবলম্বন করা উচিত! দ্বীনের তরে অক্লান্ত পরিশ্রমকারী মহান মনীষী, আলিম এবং ইমামদের প্রতি কীরূপ শিষ্টাচার অবলম্বন করা উচিত!! হে আল্লাহ, তাদের যথাযথ কদর করার তাওফিক আমাদের নসিব করুন!

শায়খের সঙ্গে তালিবুল ইলমের আদব অবলম্বনের ব্যাপারে আল-কুরআনের নির্দেশনা

আদব-শিষ্টাচার সংক্রান্ত কথাগুলো বলে যাব, অথচ তার মধ্যে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ.-এর নিজ তাফসিরগ্রন্থে উদ্ধৃত উক্তিটি এখানে উল্লেখ করব না—তা হয় না। সেই গ্রন্থে খাযির আ.-এর সঙ্গে মুসা আ.-এর শিষ্টাচার অবলম্বনের ঘটনায় তিনি সুন্দর ব্যাখ্যা ও বিবরণ উল্লেখ করেছেন :

﴿قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾

অর্থ : 'মুসা তাঁকে বললেন, আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?!' [সুরা কাহাফ (১৯) : ৬৬][৩১৩]

---

[৩১২] সুরা নামল : ১৭-১৮

[৩১৩] এখানে কেবল প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আলোচনা করব। আর পুরো ঘটনার বিবরণ আল্লামা তাহের ইবনে আশুরা রহ. নিজ তাফসিরগ্রন্থ التحرير والتنوير -এর

ইমাম রাযি রহ. বলেন : জেনে রেখো, এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে খাযির আ. -এর কাছ থেকে ইলম অন্বেষণের ইচ্ছা পোষণ করার সময় একাধিক আদব ও শিষ্টাচার অবলম্বন করেছেন মুসা আ.। যথা :

১. মুসা আ. নিজেকে খাযির আ.-এর সম্পূর্ণ অনুসারী ও অনুরাগী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি?'

২. এই অনুসরণ চলমান রাখতে তিনি খাযির আ.-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। ঠিক যেন তিনি এভাবে বলছেন : 'আমি নিজেকে আপনার পূর্ণ আনুগত্যশীল ও অনুসরণকারী করতে চাই, আপনি কি আমাকে সে অনুমতি দেবেন?' এখানেও শিষ্টাচারে আতিশয্য লক্ষ করা যায়।

৩. তিনি বলেছেন 'এ শর্তে যে আপনি আমাকে শেখাবেন'। এখানে مِن অব্যয়টি تبعيض -এর অর্থে। নবি হওয়া সত্ত্বেও এখানে নিজের অজ্ঞতার বিষয়টি তিনি অকপটে স্বীকার করে নিয়ে তার সামনে উঁচুমানের আদব অবলম্বন করেছেন মুসা আ.।

৪. বলেছেন 'যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে'। এখানেও مِن অব্যয়টি تبعيض-এর অর্থে। অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান থেকে সামান্য কিছু শেখানোর জন্য তিনি তার কাছে আবেদন করছেন। ঠিক যেন বলছেন, 'আমি আপনার পুরো জ্ঞানের সমাধিকারী হতে চাই না; বরং আপনার জ্ঞানের কিছু অংশ আমাকে শিক্ষা দিন!' ঠিক যেমন একজন দরিদ্র ব্যক্তি বিত্তশালীর কাছে তার অর্থের সামান্য অংশ প্রার্থনা করে থাকে।

৫. 'যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে'। স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তাঁকে এ মহা জ্ঞানের অধিকারী করেছেন।

৬. আয়াতে رشدا শব্দটির দ্বারাও খাযির আ.-এর কাছে সরল পথপ্রাপ্তি এবং সঠিক দিকনির্দেশনার আবেদন করছেন। إرشاد হলো, এমন মূল্যবান বিষয় যা না পেলে পথভ্রষ্টতা আর বিচ্যুতি অনিবার্য।

৭. 'যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন!' অর্থাৎ মুসা আ. খাযির আ.-এর কাছ থেকে ওই অনুগ্রহ প্রার্থনা করছেন, যা স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছেন। আল্লাহ যেমন আপনাকে এসব সুউচ্চ ও

ভূমিকায় (১/৪২) কাজি ইবনুল আরাবি রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর বলেছেন : মুসা আর খাযির আ.-এর ঘটনা থেকে তিনি আট শ মাসআলা উদ্ভাবন করে বর্ণনা করেছেন।

অনন্যসাধারণ জ্ঞান শেখাতে কুণ্ঠাবোধ করেননি; আপনিও আমাকে তা শেখাতে কোনোরূপ কার্পণ্যবোধ করবেন না!
এ কারণেই বলা হয় :

أنا عبد من تعلمت منه حرفا.

অর্থ : 'যে আমাকে একটি হরফ শেখায় আমি তাঁর ক্রীতদাস হয়ে যাই।'

৮. অনুসরণ হলো কোনো কাজ অন্যের মতো করে করা। অন্যের চরিত্রের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বনের চেষ্টা করা। এখন যদি আমরা বলি : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; ইহুদিরাও এর আগে এ কালেমা বলেছে; কিন্তু আমাদের এ বাণী উচ্চারণের দ্বারা ইহুদি সম্প্রদায়ের অনুকরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এ কালেমা উচ্চারণের আবশ্যিকতা প্রমাণ করা। আমরা যখন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করা। কারণ, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পালন করেছেন এবং উম্মতকে পালনের আদেশ করেছেন।

মুসা আ.-এর উপর্যুক্ত উক্তি هل أتبعك (আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?)—এর দ্বারা বোঝা গেল, তিনি খাযির আ.-কে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণের আবেদন করেছিলেন। সব ক্ষেত্রে তাঁকে অনুকরণের আশা ব্যক্ত করেছিলেন। বোঝা গেল, সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা ভুলে গিয়ে তালিবুল ইলমকে সর্বপ্রথম শিক্ষক ও উস্তাদের সামনে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে।

৯. هل أتبعك (আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?) বোঝা গেল, সব কথা, সব কাজ এবং সকল ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় এবং নিঃসংকোচে উস্তাদের অনুকরণ করতে হবে।

১০. বর্ণিত আছে, মুসা আ.-এর তাওরাতের অধিকারী হওয়ার এবং বনি ইসরাইলের নবি হওয়ার বিষয়টি খাযির আ. আগেই জেনে নেন। আরও জানেন যে, এই মুসাই সে ব্যক্তি যার সঙ্গে তূর পর্বতে খোদ আল্লাহ কথা বলেছেন কোনো মাধ্যম ছাড়া। তাঁকে একাধিক অলৌকিকত্ব ও মুজিযা দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এতসব সম্মান আর মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও মুসা আ.-এর এ রকম নম্রতাপূর্ণ আচরণ এবং আবেদন দেখে বোঝা যায়, সত্যিই তিনি পূর্ণ আনুগত্যশীল হয়ে নিষ্ঠার সাথে ইলম তলবে এসেছিলেন। আর এটিই কাম্য। কারণ, মানুষ যতই জ্ঞানী হবে, যতই তার বিদ্যার পরিধি বাড়বে, ততই সে

আনন্দ ও সুখ অনুভব করবে। পাশাপাশি জ্ঞানী, বিদ্বান ও উলামা-মাশায়েখকে বেশি বেশি শ্রদ্ধা করবে। তাদের অধিক মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে।

১১. 'আমি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন!' বোঝা গেল, আগে অনুসরণ করতে হবে। তারপর ইলম অর্জনের আবেদন করতে হবে। আর অনুসরণের সূচনা হবে খিদমাতের মাধ্যমে। এ স্তর পার হয়ে তবেই সে জ্ঞানসাধনার আবেদন জানাতে পারবে।

১২. তিনি বলেছেন, 'আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন!' এখানে তিনি ইলম অর্জনের পর অন্য কিছু প্রার্থনা করেননি। তাঁর কথার ভাষ্য যেন এ রকম : আপনাকে অনুসরণের মাধ্যমে মর্যাদা বা সম্মান লাভ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধুই ইলম তলব।'

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি রহ.-এর উক্তি এখানেই শেষ হলো। সেই সাথে أدب الاختلاف গ্রন্থে বর্ণিত আমার রচনাও সমাপ্ত হলো।

উস্তাদের সঙ্গে ছাত্রের আদবের কিছু নমুনা

এটি একটি দীর্ঘ অধ্যায়; যা শেষ হবার নয়। আগের ঘটনা ও বর্ণনাগুলোর সাথে আপনি নিচেরগুলোও যোগ করতে পারেন।

খতিব রহ. هيبة الطالب للمحدث শিরোনামে মুগিরা বিন মিকসাম আদ-দাবি থেকে বর্ণনা করেন : আমরা ইবরাহিম নাখঈকে রাজা-বাদশাদের মতো ভয় করতাম (শ্রদ্ধা করতাম)[৩১৪]।

আইয়ুব আস-সাখতিয়ানি রহ. বলেন : এমনও লোক ছিল যে হাসান বসরি রহ.-এর কাছে দীর্ঘ তিন বছর অবস্থান করেছে; কিন্তু ভয়ে তাঁর কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি।'

আবদুর রহমান বিন হারমালা আল-আসলামি রহ. থেকে বর্ণিত : সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের কাছে অনুমতি ছাড়া কেউ কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেত না। রাজা-বাদশাদের প্রশ্ন করার পূর্বে যেমন তাদের কাছে অনুমতি নিতে হয়, তার কাছে জিজ্ঞেস করার আগেও অনুমতি নিতে হতো।

ইবনে শিহাব যুহরি রহ. বলেন, আমি সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের সান্নিধ্যে ছিলাম বহু বছর। দীর্ঘ সংশ্রবের ফলে আমার এক হাঁটু অপর হাঁটুর সঙ্গে মিশে যাওয়ার

---

[৩১৪] الجامع : ২৯৭-৩০৩

উপক্রম হয়েছিল। এরপরও আমি তাঁর সামনে কোনো কথা বলার সাহস পাইনি। শুধু এতটুকুই, 'তারা আজ এই বলেছে'..'তারা আজ এই বলেছে'... এরপর তিনি কথা বলতেন।

উস্তাদের প্রতি তালিবুল ইলমের শ্রদ্ধা এবং মর্যাদা প্রদর্শনের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে যারনুজি রহ. বলেন, 'উস্তাদের সন্তান এবং উস্তাদের আত্মীয়দের সম্মান করাও উস্তাদকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের উস্তাদ শায়খ বুরহানুদ্দীন মুরগিনানি রহ. (আল-হিদায়া গ্রন্থকার) বর্ণনা করেন : বুখারার একজন বড়ো ইমাম ছাত্রদের সামনে নিয়মিত দরস দিতেন। একদিন দরস চলাকালে তিনি প্রায়ই বসা থেকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন। দরস শেষে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, আমার উস্তাদের ছেলে পাশেই অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করছিল। কোনো কোনো সময় সে মসজিদের দরজা পর্যন্ত এসে যাচ্ছিল। যখনই তার ওপর আমার দৃষ্টি পড়ত উস্তাদের সম্মানার্থে আমি তার জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম।'[৩১৫]

ইসহাক বিন ইবরাহিম বিন হাবিব ইবনুশ শাহিদ রহ. বলেন, আমি ইয়াহইয়া আল-কাত্তানকে দেখেছি তিনি আসরের নামাজ আদায় করে মসজিদের মিনারার গোড়ায় বসে যেতেন। এরপর ইবনুল মাদিনি, শাযুকানি, আমর আল-ফাল্লাস, আহমদ, ইবনে মুঈন প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে হাদিস জিজ্ঞেস করত। মাগরিবের আজান পর্যন্ত তারা এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের কাউকে তিনি বলতেন না, বসে পড়ো! আর তারাও ভয়ে এবং তাঁর সম্মানার্থে বসার সাহস পেতেন না।

এরচেয়েও বিস্ময়কর আরেকটি ঘটনা ইয়াকুত রহ. শরিফ আযিযুদ্দীন ইসমাইল বিন হুসাইন আল-আলভি আল-হুসাইনি আল-মারুযি আন-নাসসাবার[৩১৬] বৃত্তান্তে বর্ণনা করেছেন।[৩১৭] তিনি বলেন, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. যখন মারওয়াতে আগমন করেন। তিনি ছিলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং বহুল-আলোচিত ব্যক্তি। তাঁর সামনে দাঁড়ানো ছিল চরম দুঃসাহসিকতা। তাঁর কথা পুনরুচ্চারিত হতো না। বলা হয়, কেউ তাঁর সামনে সজোরে শ্বাস গ্রহণ করার হিম্মত করত না। আমি তাঁর মজলিশে প্রবেশ করে তাঁর কাছে হাদিস পাঠ করতে হীনম্মন্যতায় ভুগছিলাম। একদিন তিনি আমাকে বলেন, আমি চাই তুমি আমার জন্য ছাত্রদের

---

[৩১৫] تعليم المتعلم : ৪৮
[৩১৬] ৫৭২ খুব সম্ভবত ৬৩২ হি.
[৩১৭] معجم الأدباء : ২/৬৫৪

বংশ-ধারাবাহিকতার বিষয়ে ছোট্ট একটি গ্রন্থ রচনা করবে। আমি তা পড়ে আয়ত্ত করব। কারণ, তাদের সম্পর্কে অজ্ঞতায় থাকা আমার পছন্দ নয়। আমি বলি, শাজারাভিত্তিক লেখব না রচনাভিত্তিক? বলেন, শাজারাভিত্তিক লিখলে মনে রাখতে কষ্ট হয়; আর আমি চাচ্ছি মুখস্থ করতে। যেন সর্বদা মনে থাকে। আমি বলি, জি আচ্ছা! যেমন বলেছেন তেমনিই করব।

এরপর আমি গিয়ে ফখরুদ্দীন রাযির চাহিদা ও বিবরণমতো একটি গ্রন্থ রচনা করে নিয়ে আসি। বইটি হাতে পেয়ে তিনি আসন থেকে নেমে চাটাইয়ে বসে যান। আর আমাকে বলেন, তুমি ওই আসনে গিয়ে বসো! তা শুনে ভয়ের আতিশয্যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম। আমাকে দ্বিধান্বিত দেখে তিনি প্রচণ্ড ধমক দেন। পুনরায় তাগিদ করে জোর দিয়ে বলেন, যেখানে তোমাকে বসতে বলেছি, সেখানে বসো! সে সময় আমার ভেতরে কী রকম ভয় ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার হয়, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। শেষ পর্যন্ত তার আদেশমতো সেখানে উঠে বসি। এরপর আমার ওই গ্রন্থটি তিনি আমাকে পড়ে শোনাতে থাকেন। যেখানে সমস্যা হচ্ছিল আমাকে জিজ্ঞেস করে বুঝে নিতে থাকেন। পাঠ শেষ করে বলেন, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা বসো! কারণ, এটি একটি জ্ঞান; এ ব্যাপারে তুমিই আমার উস্তাদ। আমি তোমার কাছ থেকে উপকৃত হয়েছি; তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি। আর উস্তাদের সামনে বসাটা শিষ্যের বেয়াদবি নয়।

এরপর আমি আসন ছেড়ে নেমে যাই। আবার তিনি সেখানে উঠে বসেন। এরপর যথারীতি আমি আমার নির্ধারিত জায়গায় বসে তার সামনে দরস পাঠ করতে থাকি।'

কোনো সন্দেহ নেই, এটি ছিল সর্বোত্তম শিষ্টাচার। বিশেষত এ রকম সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে এ রকম প্রকাশ পাওয়াটা অবশ্যই বিরাট শিক্ষণীয় ব্যাপার।'

আল্লাহ তাআলা ইসলামের সুমহান মনীষীদের ওপর রহম করুন। আহলে আদবের শ্রমসাধনা কবুল করুন।[৩১৮]

---

[৩১৮] পূর্ববর্তীকালের মনীষীগণ আদব ও শিষ্টাচারের ব্যাপারে কতটুকু মনোযোগী ছিলেন, তা এ ঘটনা দ্বারা সামান্য অনুমান করা যায়। এ ঘটনায় দুটি বিষয় লক্ষণীয় : ১. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ.-এর হিম্মত, আত্মত্যাগ এবং ইলমের প্রতি তাঁর সীমাহীন আগ্রহ। কারণ, তিনি চাচ্ছিলেন না, কোনো একটি ইলমের বিষয়ে অজ্ঞ থেকে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। ২. শরিফ আন-নাসসাবা জন্মেছিলেন ৫৭২ হিজরিতে। আর

সংশ্রব অবলম্বনকালে তালিবুল ইলমকে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে

তালিবুল ইলমের উচিত, শায়খের সান্নিধ্যে অবস্থানকালে অধিক পরিমাণে ইস্তেফাদা ও ফয়েয-বারাকাত হাসিলে মনোনিবেশ করা। বিষয়টি তাকে সব সময় স্মরণ রাখা যে, সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে; কিছুদিন পর তার আর এ সুযোগ থাকবে না; তখন বলবে, হায় আমি যদি শায়খকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম; হায়, কী মূল্যবান সময়টাই-না নষ্ট করলাম! হায়, যদি তাঁর কাছ থেকে ইস্তেফাদা করতাম। শত আফসোস করেও তখন আর কোনো লাভ হবে না।

এ ক্ষেত্রে তালিবুল ইলমকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে : শায়খকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করতে হবে। শায়খকে অনন্য অসাধারণ মনে করতে হবে। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে শায়খের প্রতি তার আদব ও সম্মান। শায়খের তৎপরতা ও মনমানসিকতা বুঝে শায়খের সঙ্গে আচরণ করবে। লক্ষ করবে, বারবার তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, তাঁকে জিজ্ঞেস করা বা মুজাকারা করা অধিক সমীচীন না চুপ করে নীরবতার সাথে তাঁর কাছ থেকে ফায়দা ও নসিহত গ্রহণ করা বেশি সমীচীন! উভয় পদ্ধতিতেই রয়েছে কল্যাণ। এ বিষয়গুলো লক্ষ রাখার মাধ্যমে তালিবুল ইলমের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে। সবর ও তাহাম্মুলের মাদ্দা তৈরি হবে তার ভেতরে। কোনো তালিবুল ইলম শায়খ থেকে উপকৃত হতে পারবে না এবং কোনো শায়খও তালিবুল ইলমের জ্ঞান বিকশিত করতে পারবে না যদি তাদের মাঝে না থাকে পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাব। সেই সাথে দিন দিন বাড়তে থাকবে তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি। বিদগ্ধ ও সর্ববিজ্ঞ মনীষী ইমামুল মুফাসসিরীন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা এবং রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ফখরুদ্দীন রাযি রহ. ইন্তেকাল করেছিলেন ৬০৬ হিজরিতে ৬২ বছর বয়সে। বুঝা গেল, ফখরুদ্দীন রাযি রহ.-এর এন্তেকালের সময় শরিফ নাসসাবার বয়স ছিল ৩৪। টগবগে যুবক। স্বভাবতই বুঝা যায়, ওই গ্রন্থ রচনার সময় তার বয়স ছিল আরও কম। এরকম নওজোয়ান ও পুত্রবয়সের তালিবুল ইলমের সামনে নিজেকে শীষ্য হিসেবে পেশ করা নিঃসন্দেহে ফখরুদ্দীন রাযি রহ.-এর উন্নত আদব, সুউচ্চ মর্তবা, অনন্য শিষ্টাচার এবং সীমাহীন নম্রতাপূর্ণ চরিত্রের প্রমাণ।

এরপর ডক্টর আবদুল হাকিম উনাইসকেও দেখেছি তিনি তাঁর গ্রন্থ أدب المتعلم تجاه المعلم–এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সালাফে সালেহিনের অনেকগুলো ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহ. এর আলোচ্য ঘটনাটিও সেখানে স্থান পেয়েছে।

সাথে অপূর্ব আদব ও অনন্য শিষ্টাচার অবলম্বনের কারণে তিনি কী রকম জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার বিবরণও সামনে আলোচিত হবে।

বায়হাকি রহ. ইমাম, সত্যনিষ্ঠ হাফেজ, হুজ্জাতুল আদব ওয়ালিসানুল আরব আল্লামা আসমাঈ রহ.-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন :

من لم يتحمل ذلَّ التعلّم ساعة، بقي في ذلّ الجهل أبداً.

অর্থ : 'তলব ও শিক্ষাক্ষেত্রে সামান্য কষ্ট ও দুর্ভোগ যে সহ্য করতে পারবে না, চিরকাল সে অজ্ঞতার লাঞ্ছনায় নিমজ্জিত থাকবে।'[৩১৯]

এর অব্যবহিত পরই তিনি সালাফের দৈনন্দিন জীবনাচার থেকে বাস্তব নমুনা হিসেবে ইমাম মালেক রহ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন : উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা ইবনে মাসউদ রা. ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলিম। ইবনে শিহাব তাঁর খেদমত করতেন। সবকিছু তার জন্য প্রস্তুত করে দিতেন। তিনি বলেন, ইবনে শিহাব উবায়দুল্লাহর সংশ্রব অবলম্বন করেন। এমনকি তাঁর জন্য তিনি পানির ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি আরও বলেন, উবায়দুল্লাহ রহ. যখন নামাজে দাঁড়াতেন, তখন মানুষ তাঁর অপেক্ষায় থাকত। আর তিনি নামাজ শেষ না করে তাদের দিকে মনোনিবেশ করতেন না। নামাজকে বিলম্ব করতেন। একাকী আদায়ের সময় যেমন নামাজকে বিলম্ব করতেন, এ সময়েও ঠিক তেমনই বিলম্ব করতেন। একটুও সংক্ষেপ করতেন না।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, আলি ইবনুল হুসাইন (যায়নুল আবেদিন) রা. ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তি। তিনিও এই উবায়দুল্লাহ রহ.-এর কাছে এসে বসতেন। তারপরও তিনি নামাজকে একটুও সংক্ষিপ্ত করতেন না। তাঁর দিকে দৃষ্টি দিতেন না। বলা হতো : আলি ইবনুল হুসাইন এসেছেন!! জানেনই তো সে কার পুত্র, কার বংশধর!! উত্তরে তিনি বলতেন, যারা এই জ্ঞান অন্বেষণে আসবে, অবশ্যই তাদের কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে।

এরপর ইমাম বায়হাকি রহ. তিন জন নির্ভরযোগ্য মনীষী থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেন :

من رق وجهه رق علمه.

অর্থ : 'যার চেহারা কোমল হবে (ধৈর্য ধরবে), তার ইলমও সূক্ষ্ম হবে।'

---

[৩১৯] المدخل إلى السنن الكبرى : ৪০৩

উক্তিটি তিনি প্রথমে ইমাম সাওরি থেকে, এরপর ইবনে ওমর থেকে, এরপর ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। মূলত উক্তিটি ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর। পরবর্তীকালে সবাই তাঁর উদ্ধৃতিতেই বর্ণনা করেছেন।

খতিব রহ. সাইয়েদ জালিল আস-সাররি আস-সাকাতি রহ. থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন :

من علم ما طلب، هان عليه ما بذل.

অর্থ : 'যে ব্যক্তি অন্বেষিত বিষয় চিনতে পারবে, সে জন্যে ব্যয়কৃত সকল অর্থ ও যাপিত সকল কষ্ট তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে।'[৩২০]

শায়খের প্রতি সম্প্রীতি ও নম্রতা অবলম্বন এবং শায়খকে মর্যাদা দান ও তাঁর জন্য সবর এক্তিয়ার করার বিষয়ে অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। ইবনে আবদুল বার তার الجامع গ্রন্থে ইমাম ইবনে জুরাইজ রহ. থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেন, 'আতা ইবনে আবি রাবাহ থেকে যতটুকু জ্ঞান আমি অর্জন করেছি, তা একমাত্র তাঁর প্রতি আমার প্রবল সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।'[৩২১]

স্বীকার করতেই হবে, ইলমে দ্বীন অন্বেষণে সালাফ ও খালাফের অধিকাংশ তালিবুল ইলমের অবস্থাই ছিল এরূপ। আবার সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার ভিন্ন প্রেক্ষাপটও পরিলক্ষিত হয়েছে কিছু কিছু মনীষীর ক্ষেত্রে। মূলত তারা পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বুঝে সে-মতে সিদ্ধান্ত নিতেন। হিকমাহ অবলম্বন করতেন।

খতিব রহ. ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রহ. সম্পর্কে বলেন, তিনি দুপুরবেলায় মানুষের বিশ্রামের সময় উটে আরোহণ করে ভিস্তিওয়ালা সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করতেন। বলতেন, এ সম্প্রদায়ের লোকেরা জীবিকা উপার্জনে ব্যস্ত থাকায় আমার কাছে এসে হাদিস শুনতে পারে না।' এভাবে তিনি তাদের প্রতি নম্রতাপূর্ণ আচরণ অবলম্বন করতেন।[৩২২]

এরপর তিনি প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ওয়ালিদ বিন উতবা আল-আশজাই দামেস্কি সম্পর্কে বলেন, দামেস্কের 'বাবুল জাবিয়া'র মসজিদে তিনি ওয়ালিদ বিন মুসলিমের লেখা গ্রন্থগুলো পড়তেন। একজন লোক দেরি করে আসলে

---

[৩২০] الجامع ৭৮ : جامع بن عبد البر : ৮৯৩

[৩২১] (৬২৫) বায়হাকি রহ. مناقب الشافعي গ্রন্থেও এটি বর্ণনা করেছেন : ২/১৫১। তবে তার বর্ণনাসূত্রে 'মাতবাঈ'র নাম বিলুপ্ত ছিল, যা ইবনে আবদুল বার-এর বর্ণনা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

[৩২২] الجامع : ৩৬৩

দরসের কিছু অংশ তার ছুটে যায়। ওয়ালিদ তার জন্য সেটি পুনরায় পাঠ করেন। প্রতিদিনই সে দেরি করে আসত। কয়েকদিন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে ওয়ালিদ তাকে বলেন, এই...প্রতিদিন দেরি হয় কেন তোমার? সবার সঙ্গে এসে গেলে তো আমার দ্বিতীয় বার আর পড়তে হয় না। উত্তরে লোকটি বলে, পুরো একটি পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওপর। বেতলিহবাতে[৩২৩] একটি দোকান আছে আমার। প্রতিদিন সকালে যদি দোকানের জন্য মাল না কিনতে পারি, তবে ওইদিন আমার পক্ষে মাল বিক্রি করে উপার্জন করা আর সম্ভব হয় না।' একথা শুনে ওয়ালিদ বলেন, তোমাকে আর এ মজলিশে আসতে হবে না।' এরপর থেকে ওয়ালিদ বিন উতবা নিজে কষ্ট করে বেতলিহবে তার দোকানে গিয়ে সম্পূর্ণ দরস তাকে পড়ে দিয়ে আসতেন।

আল্লাহ তাআলা এসব উন্নত চরিত্রবান মহামনীষীর কষ্ট-পরিশ্রমগুলো কবুল করুন। পরকালে তাদের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ প্রতিদানে ভূষিত করুন।

শায়খের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে গভীর পর্যবেক্ষণ

শায়খের সান্নিধ্যে দীর্ঘ সংশ্রব অবলম্বনের প্রাথমিক পর্যায়ে তালিবুল ইলমের কিছু কষ্ট ও ক্লান্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সামান্য ধৈর্যের মাধ্যমে এই কষ্টই তার জন্য সুমধুর ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে উঠবে। হৃদয়কে স্বস্তি দেবে।

তালিবুল ইলমের ৩-নং দায়িত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে ইমাম গাযালি রহ. বলেন :

'শিক্ষার্থী প্রথমেই তার সব কাজের লাগাম শায়খের কাছে সোপর্দ করবে পুরোপুরিভাবে। মূর্খ রোগী যেমন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে তার কথা ও নির্দেশনাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকে, তালিবুল ইলমকেও তেমনি শায়খের পথনির্দেশগুলো অকপটে মেনে নিতে হবে। শায়খের কাছে বিনম্র হতে হবে। শিক্ষকের সামনে নিজেকে অনুর্বর ও মৃত ভূমির মতো উপস্থাপন করতে হবে; মৃত ভূমি বৃষ্টিবর্ষণের সাথে সাথেই তা পুরিপুরিভাবে গ্রহণ করে নেয়। জমির পুরো অস্তিত্বে তা প্রবাহিত হয়ে থাকে, তালিবুল ইলমকেও হতে হবে ওই মৃত ভূমির মতো। যখনই শায়খ তাকে কোনো কিছুর আদেশ করবেন, নিজের মতকে বিসর্জন দিয়ে নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে সে তা গ্রহণ করে নেবে। কারণ, শায়খের ভুল মতও তার জন্য নিজের মতের চেয়ে বেশি উপকারী।'[৩২৪]

এ ব্যাপারে ইমাম গাযালি রহ. আরও বলেন, বিজ্ঞ ও দূরদর্শী মুরুব্বির কাছে শিক্ষার্থী নিজের সকল দোষ-ত্রুটি খুলে বলবে, নিজের দুর্বলতা ও ব্যাধিগুলো

---

[৩২৩] দামেস্কের আল-গুতা'র একটি গ্রাম।

[৩২৪] الإحياء : ১/৫০

পেশ করবে। এরপর শায়খের আদেশ ও নির্দেশনাগুলো সে পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলবে। ইলমি গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশগুলো সানন্দে বাস্তবায়ন করে যাবে। এটিই পীরের সাথে মুরিদের আসল তাআল্লুক এবং শিক্ষকের সাথে ছাত্রের প্রকৃত সম্পর্ক।'[৩২৫]

এ ব্যাপারে ইমাম মাওয়ারদি রহ. থেকেও অনেক উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, সৎ স্বভাব ও উন্নত চরিত্রে শায়খ হবেন তালিবুল ইলমের আদর্শ। সকল কাজ ও সকল অভ্যাসে শায়খকে অনুসরণ করবে সে। শায়খ তা দেখে যেন আনন্দিত হন। শিক্ষার্থীদের প্রতি বিনম্র হন। তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহ দেখে খুশি হন। বেশি করে তাদের মাঝে ইলম বিতরণে মনোযোগী হন। শিক্ষার্থীরাও যেন সব ধরনের কুঅভ্যাস এবং অসৎ স্বভাব বর্জন করে শায়খের প্রতি মনোযোগী হয়।'[৩২৬] কারণ, মানুষ প্রিয়জনকেই অনুসরণ করে। হাদিসেও আছে :

من تشبه بقوم فهو منهم.

'মানুষ যাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখবে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।'

২. ইলমের প্রতি আদব

খতিব রহ. আলি বিন আবি তালিব রা. থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন :

> إذا تعلمت العلم فاكظِمواعليه أي: حافظوا عليه، ولا تخلِطوه بضحكٍ وباطل، فتمجَّه القلوب.
>
> অর্থ : 'যখন তোমরা ইলমে শেখা শুরু করো, তখন সে ইলমকে তোমরা ভালোভাবে আঁকড়ে ধরো! হাশি-তামাশা এবং গল্পগুজব দিয়ে ইলমকে কলুষিত করো না! তা না হলে তোমাদের অন্তরগুলো ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'[৩২৭]

হিশাম আদ-দাসতাওয়াঈ এক ব্যক্তিকে হাদিসের মজলিশে হাসতে দেখে বলেন, হাদিস পড়তে এসেও তুমি হাসছ?!

সুফিয়ান সাওরি অথবা ইবনে উয়াইনা রহ. বনি শাইবার এক লোককে কাবা শরিফের নিকটে কৌতূক করতে এবং হাসতে দেখে তাকে লক্ষ্য করে বলেন, এ

---

[৩২৫] الإحياء : ৩/৬৪
[৩২৬] أدب الدين والدنيا : ১১৩
[৩২৭] الجامع : ২১৩-২১৭

স্থলে এসেও তুমি হাসছ?! হায়, একসময় মানুষ একটি হাদিস শুনলে তিন দিন পর্যন্ত তাদের মাঝে ওই হাদিসের প্রভাব ও নিদর্শন দেখা যেত!'

ইবনে মুফলিহ রহ.-এর রচিত الآداب الشرعية গ্রন্থে ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ রহ.-এর অন্যতম শায়খ আবু জা'ফর আহমদ বিন বুদাইল আল-ইয়ামি রহ.[৩২৮] থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, হাদিস লেখার সময় তখন কলম ও কালির শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যেত না।'[৩২৯]

আবদুল আ'লা আত-তাইমি রহ. থেকে ইবনুল মুবারক রহ. বর্ণনা করেন : 'যে ইলম শিক্ষার্থীকে কাঁদায়নি, মনে হয় না সে ইলম শিক্ষার্থীর জন্যে কোনো উপকার বয়ে আনবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা নিজে আলিমদের সিফাত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾.

অর্থ : 'যারা এর আগে ইলম লাভ করেছে, যখন তাদের কাছে এর তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নতশিরে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে, আমাদের পালনকর্তা পবিত্র, মহান! নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমস্তকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং আরও বৃদ্ধি পায় তাদের বিনয়ভাব।'[৩৩০]

একজন শিক্ষার্থীর ওপর ইলমের প্রতি তার প্রধান কর্তব্য ও আদব হবে ইলম অনুযায়ী আমল করা। ইলম ও আহলে ইলমের চরিত্রকে আঁকড়ে ধরা।

খতিব রহ. ইমাম ইবরাহিম আল-হারবি থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন :

ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به.

---

[৩২৮] মৃত্যু : ২৫৮ হি.

[৩২৯] ১/১৬২

[৩৩০] সুরা আল-ইসরা : ১০৭-১০৯

অর্থ : 'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কোনো আদব ও শিষ্টাচার শোনার সাথে সাথে তালিবুল ইলমের দায়িত্ব হলো নিঃসংকোচে তা আঁকড়ে ধরা।'[৩৩১]

হাসান বাসরি রহ. থেকেও একটি উক্তি বর্ণিত আছে–

كان الرجل يطلب العلم، فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه، وهديه، ولسانه، وبصره، ويده.

অর্থ : 'সে সময় মানুষ ইলম তলব করলে ইলমের ছাপ এবং নিদর্শন তার নম্রতায়, তার স্বভাবে, তার চোখে-মুখে, তার দৃষ্টিতে এবং তার হাতে পরিলক্ষিত হতো।'[৩৩২]

এরপর আবু ঈসমা আল-বায়হাকি রহ. থেকে খতিব রহ. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর কাছে রাত্রিযাপন করি। তিনি অজুর পানি এনে রেখে দেন। পরদিন ভোরে পানি অব্যবহৃত দেখে তিনি বলতে থাকেন, সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য, ইলম তলব করতে এসেও রাতের ইবাদাত করছে না, তা কী করে হয়?!

উকবা রহ. আবু আমর মুহাম্মদ বিন আবু জাফর আহমদ বিন হামদান থেকে, আর তিনি তার পিতা আবু জাফর[৩৩৩] থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : একবার আমি আবু আবদুল্লাহ আল-মারওয়াযির মজলিশে ছিলাম[৩৩৪]। তখন জহরের নামাজের সময় হলে আবু আবদুল্লাহ আজান দেন। আজান শুনে আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাই। তা দেখে তিনি বলেন, কোথায় যাচ্ছ আবু জাফর? উত্তর দিই, নামাজের জন্য অজু করতে! তা শুনে তিনি বলেন, আমি তো তোমার ব্যাপারে অন্যরকম ধারণা করতাম–নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেল আর তুমি অজুবিহীন অবস্থায় আছ!!

সমকালীন স্বনামধন্য মুরুব্বিদের থেকেও এ রকম অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত আলিম ও মুরুব্বি শায়খ আবদুল করিম রিফাঈ রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র শায়খ ও দাঈ ডক্টর মুহাম্মদ ইওয়ায আমার কাছে বর্ণনা করেন, একবার

---

৩৩১ الزهد : ১২৫। ফাজায়েলুল কুরআন গ্রন্থে কাসিম বিন সাল্লামও এটি বর্ণনা করেছেন : ৬৬। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৬৫০৮।

৩৩২ الجامع : ১৭৬, ১৭৮, ১৮১, ১৮২

৩৩৩ খুব সম্ভবত ২৪০-৩১১ হি.

৩৩৪ [খুব সম্ভবত তিনি ইমাম মুহাম্মদ বিন নাসর আল-মারওয়াযি রহ. (২০২-২৯৪ হি.)]

মসজিদে চাশতের নামাজের সালাম ফেরানোর সাথে সাথে তিনি উঠে যান। শায়খ পেছন থেকে হা করে তাকিয়ে থেকে তাকে লক্ষ করতে থাকেন। একপর্যায়ে তাকে ডেকে বলেন, হে মুহাম্মদ, মনে হচ্ছে তুমি তোমার প্রতিপালক থেকে বিমুখ হয়ে গেছ?! এরপর ছাত্র ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় বলতে থাকে, কেন হে সম্মানিত শায়খ?! তখন শায়খ বলেন, নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা (দোয়া) না করেই তুমি উঠে যাও!!

যারা শায়খের সংশ্রব অবলম্বন করেনি তারা এ রকম সুউচ্চ এবং উন্নত চরিত্রের শিক্ষা কোথায় পাবে?! বিশেষত যারা নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন না করে বড়ো বড়ো কলেজ-ভার্সিটি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা অনলাইন ইউনিভার্সিটি থেকে নামমাত্র সার্টিফিকেটের আশায় পড়াশোনা করে, কেমন করে তারা এ রকম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অর্জন করবে?!

এসবের উত্তর প্রশ্নকারীকে নয়, প্রশ্নকৃতকে জিজ্ঞেস করুন!

৩. কিতাবের সাথে আদব

ইলমের সাথে আদব ও শিষ্টাচার অবলম্বনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, ইলমচর্চার সময় তালিবুল ইলম এমনকি শায়খও তাহারাত বা অজু অবস্থায় থাকবেন। দরসে উপস্থিত হওয়ার সময় বা কিতাব মুতালাআর মুহূর্তে পবিত্রতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। এ বিষয়ে পূর্বসূরিদের থেকে অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যথা :

১. আবু যর আল-হিরাভির বৃত্তান্তে ইমাম ইবনে রুশাইদ বর্ণনা করেছেন। আবু যর আল-হিরাভি হলেন ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ রহ. থেকে বুখারি শরিফের অন্যতম রাবি। তিনি বলেন, আবু ইসমাইল আল-হিরাভি আবু যর আল-হিরাভি রহ.-এর কাছে হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজের বর্ণনা সংবলিত দীর্ঘ হাদিসের একাংশ পাঠ করেন। আবু ইসমাইল বলেন, তিনি তা ধরার জন্য উক্ত অংশের লিখিত গ্রন্থটির দিকে ইঙ্গিত করেন। আমাকে বলেন, রেখে দাও! কারণ, এ মুহূর্তে আমার অজু নেই। এরপর তিনি তা স্পর্শ করেননি।[৩৩৫]

২. ইমাম আবু ওসমান আস-সাবুনি রহ.-এর বৃত্তান্তে হাফেজ ইবনে আসাকির রহ. তার একটি উক্তি নকল করেছেন : 'অজু ছাড়া কখনো আমি পাঠাগারে প্রবেশ করিনি। অজু ছাড়া কখনো কোনো হাদিস বর্ণনা করিনি;

---

[৩৩৫] إفادة النصيح : ৪১

অজু ছাড়া কোনো মজলিশ আহ্বান করিনি; দরসদানের উদ্দেশ্যে অজু ছাড়া কখনো বসিনি।'[৩৩৬]

বুরহান আয-যারনুজি রহ. বলেন, ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি মাধ্যম হলো, কিতাবকে তাযিম করা। তালিবুল ইলমের উচিত হলো অজু ছাড়া কখনো কোনো কিতাব হাতে না নেওয়া। শায়খ ইমাম শামসুল আইম্মা আল-হালওয়ানি রহ. থেকে একটি উক্তি প্রসিদ্ধ আছে। তিনি বলেন, একমাত্র তাযিমের কল্যাণেই আমি এই ইলম অর্জন করতে পেরেছি। অজু ছাড়া কখনো কোনো কাগজ আমি স্পর্শ করিনি।'

শায়খ ইমাম শামসুল আইম্মা আস-সারাখসি রহ. একবার ডায়রিয়া-জাতীয় রোগে আক্রান্ত হলে রাতের বেলায় তাকে সতেরো বার বাথরুমে যেতে হয়। সেই রাতে তিনি সতেরো বার অজু করেন। যতবার বাথরুমে যান, ততবার অজু করে ফিরেন। কারণ, ইলম হলো একটি নুর। অজুও একটি নুর। অজুর মাধ্যমে ইলমের নুর আরও বেড়ে যায়।

ইলমের তাযিমের ইস্যুতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কিতাবের দিকে পা প্রসারিত না করা। তাফসিরের কিতাবগুলো অন্য বিষয়ের কিতাবের ওপরে রাখা। কিতাবের ওপর কালি, কলম ইত্যাদি কোনো বস্তু না রাখা।

ঘটনায় ঘটনা স্মরণ হয়। আবুল কাসিম আর-রাফেঈর التدوين في أخبار قزوين গ্রন্থে ইমাম আবুল হাসান আলি ইবনে ইবরাহিম আল-কাত্তান[৩৩৭] এর বৃত্তান্তে বর্ণিত আছে, একবার এই আবুল হাসান রহ.-এর পেট খারাপ হয়ে গেলে একদিনে তিনি নব্বইয়ের অধিক বার অজু করেন। তিনি বলতেন, অজু অবস্থায়ই মালাকুল মাওতের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটবে। তেত্রিশটিরও বেশি মজলিশে তিনি বসেন এ রোগের ওষুধ খেয়ে। প্রতিবারই তিনি নামাজের অজুর মতো অজু করে মজলিশে বসতেন।[৩৩৮]

ইবনে আবদুল বার রহ. তার الجامع গ্রন্থে باب ذكر بعض من كان لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء নামে পৃথক একটি অধ্যায় রচনা করে এর অধীনে অনেকগুলো আছার উল্লেখ করেন।[৩৩৯] তেমনি

---

৩৩৬ تاريخ ابن عساكر : ৯/৯

৩৩৭ তিনি সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে ইমাম ইবনে মাজা রহ. থেকে বর্ণনাকারী অন্যতম রাবি (২৫৪-৩৪৫ হি.)।

৩৩৮ ৩/৩২১

৩৩৯ ২৩৯০-২৩৯৭

খতিব রহ.-ও তাঁর الجامع গ্রন্থে[৩৪০] يستحب للقارئ أن يقرأ من أصل المحدث وأن لا يمسه إلا على طهارة নামে একটি পৃথক অধ্যায় তৈরি করে তাতে প্রখ্যাত তাবেঈ কাতাদাহ রহ. এবং ফাযল বিন মুসা আস-সিনানি রহ. (তাবে তাবেঈ)-এর আসার উল্লেখ করেন। ইবনে আবদুল বার এর বর্ণনায়ও এরূপ উল্লেখ আছে। মোটকথা কাতাদাহ রহ.-এর আসারে তার উক্তিটি এভাবে এসেছে–'মুস্তাহাব হলো অজু ছাড়া নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কোনো হাদিস পাঠ না করা।

ইমাম সুমআনি রহ. সিনানি রহ.-এর বর্ণিত আসারের পাশাপাশি ইমাম মালেক রহ.-এর ঘটনাও উল্লেখ করেছেন।[৩৪১]

ঘটনার প্রথমাংশ উল্লেখ করাটা আমি সমীচীন মনে করছি। তবে দ্বিতীয় অংশটি যদিও সমীচীন নয়; তারপরও শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং অপর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে তা বর্ণনা করছি; আশা করি সেটি ফায়দাহীন হবে না ইনশাআল্লাহ।

আমি আমার শিক্ষাজীবনে–এখনো শিক্ষাজীবনেই আছি আলহামদুলিল্লাহ– একবার মাদরাসায়ে শা'বানিয়ার চত্বরে ছিলাম। আল্লাহ ওই মাদরাসাকে কবুল করুন; তার ফয়েয ও বারাকাত স্থায়ী করুন। পাশাপাশি আলেপ্পো নগরীকেও দুশমনদের সকল অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন। আমার হাতে ছিল আমার কিতাব। বাম হাতে তা বহন করছিলাম আমি। এমন সময় আমার প্রাণপ্রিয় শায়খ বিদগ্ধ আলিমে দ্বীন, রুচিশীল এবং বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব, শতায়ু, শাফেঈ মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ ও নাহুবিদ এবং মদিনায় ইন্তেকালকারী উস্তাদ আহমদ কাল্লাশ রহ.[৩৪২] এসে আমার বাঁ-হাত থেকে কিতাবটি নিয়ে আমার ডান হাতে দিয়ে বলেন : হে আল্লাহ, আমাকে আমার আমলনামা ডান হাতে দিয়ো!

এর কিছুকাল পর আমি দামেস্কের শরিয়া কলেজে ভর্তি হই। সময়টি ছিল প্রথম শিক্ষাবর্ষের শেষ দিকের। ফিকহ বিষয়ের মৌখিক পরীক্ষার অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত কিতাব ছিল ইমাম সমরকান্দি রহ.-এর রচিত 'তুহফাতুল ফুকাহা'। একজন একজন করে ডাকা হচ্ছিল পরীক্ষার জন্য। এক ছাত্র দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত হয়ে যায়। হলঘরের একটি সিঁড়িতে বসতে গিয়ে দেখে সেটি ময়লাযুক্ত। ধুলোবালিতে ভরপুর। আর তার গায়ে ছিল কালো

---

[৩৪০] ১/৪৬৬

[৩৪১] أدب الإملاء গ্রন্থে।

[৩৪২] ১৩২৮-১৪২৮ হি.

রঙের প্যান্ট। স্বভাবতই সেখানে বসলে তার কালো প্যান্টে ময়লা বেশি দেখাবে। তা সইতে না পেরে হাতে থাকা তুহফাতুল ফুকাহা গ্রন্থটি মাটিতে রেখে তার ওপরে বসে পড়ে!!

ঘটনাটি লিখতেও আমার খারাপ লাগছিল। কিন্তু এর দ্বারা আমি অন্য একটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছা করেছি। যেন পাঠকমাত্রই সুন্নাতে নববির আলোকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী সত্যনিষ্ঠ আলিমদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং শিক্ষা-দিক্ষার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করেন। ইলমের প্রতি কী রকম দরদি হলে বাঁ-হাতের কিতাবটি টেনে নিয়ে ডান হাতে তুলে দিতে পারেন! আর কী রকম শিক্ষা-দীক্ষায় বেড়ে উঠলে একজন ছাত্র কিতাবকে নিতম্বের নিচে রেখে তার ওপর বসে পড়তে পারে!! হ্যাঁ..বোবা ও বধিরতুল্য সেসব কাগুজে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করলে শিক্ষার্থীদের থেকে এমনটি ঘটাই স্বাভাবিক।

অপর দিকে যেসব শিক্ষক, উস্তাদ ও শায়খদের সম্পর্ক রয়েছে সত্যনিষ্ঠ মসজিদমুখী আলিমদের সাথে, তাদের পক্ষেও আজকাল ছাত্রদের নববি তারবিয়াতে গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠেছে। হয়তো ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কারণে। অথবা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপরিবেশ প্রতিকূলে থাকার কারণে। তবে আশঙ্কা হয়, অবশিষ্ট এ ধরনের সৎ শিক্ষকদের অবর্তমানে এই ইলমি নুর একেবারেই বিলীন হয়ে যাবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!!

আগের কথায় ফিরে আসছি। আলোচনা চলছিল তালিবুল ইলমের সফলতা ও কামিয়াবির পেছনে আদবের গুরুত্ব ও ভূমিকা নিয়ে।

আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরি সত্যনিষ্ঠ আলিমদের মুখে একটি বাক্য সব সময় উচ্চারিত হতো :

ما فاز من فاز إلا بالأدب وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب.

অর্থ : 'যারা সফল হয়েছে তারা এই আদব অবলম্বনের দ্বারাই হয়েছে। আর যারা বঞ্চিত হয়েছে তারা বেয়াদবির কারণেই বঞ্চিত হয়েছে।'[৩৪৩]

এ কথাটিই শায়খ বুরহান আয-যারনুজি রহ. তাঁর উক্তির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন :

ما وصل من وصل إلا بالحرمة وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة.

---

[৩৪৩] এর পক্ষে দলিল সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

অর্থ : 'যারা কামিয়াব হয়েছে, তারা শায়খকে মর্যাদাদানের মাধ্যমেই হয়েছে। আর যারা বঞ্চিত হয়েছে, শায়খকে অমর্যাদাদানের কারণেই হয়েছে।'[৩৪৪]

ওই অধ্যায়ে তিনি আরও অনেক চমকপ্রদ ঘটনা ও বিষয় উল্লেখ করেছেন। অধিক উপকারের জন্য ইমাম ইবনে জামাআর রচিত تذكرة السامع والمتكلم এবং খতিবে বাগদাদি রহ.-এর রচিত الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع গ্রন্থ দুটি দ্রষ্টব্য। তা ছাড়া তালিব ও মুহাদ্দিসের আদব সংক্রান্ত যতগুলো অধ্যায় উলুমুল হাদিসের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোও দেখা যেতে পারে। আল্লাহ সকলকে তাওফিক দান করুন!

দ্বিতীয় বিষয়ের সর্বোত্তম প্রমাণ হলো ইবলিস শয়তানের বঞ্চিত, বিতাড়িত, অপমানিত এবং অভিশপ্ত হওয়ার ঘটনাটি, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারিমের একাধিক স্থানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তার অধঃপতনের একমাত্র কারণ ছিল বেয়াদবি এবং আল্লাহর আদেশের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন।

আর **প্রথম বিষয়ের** দলিল হলো আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ঘটনা সংবলিত হাদিস, যা বুখারি শরিফে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে।[৩৪৫] ইবনে আব্বাস রা. নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : উম্মুল মুমিনীন হজরত মায়মুনা রা.-এর ঘরে অবস্থানকালে একবার নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বায়তুল খালা'য় প্রবেশ করেন। এ সময় আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অজুর পানি এনে রেখে দিই। বায়তুল খালা থেকে বের হয়ে অজুর পানি দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে রেখেছে পানি? মায়মুনা রা. বলেন, ইবনে আব্বাস! এরপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে আমার জন্য দোয়া করেন,

اللّٰهم فقهه في الدين.

'হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের বিষয়ে ফিকহের জ্ঞান দান করুন!'

অন্য শব্দে :

اللّٰهم علمه الحكمة.

'হে আল্লাহ, তাকে হিকমাহ শিক্ষা দিন!'

---

৩৪৪ تعليم المتعلم : ৪৬

৩৪৫ সহিহুল বুখারি : ৭৫, ১৪৩, ৩৭৫৬, ৭২৭০

অপর বর্ণনায় :

اللّٰهم علمه الكتاب.

'হে আল্লাহ, তাকে কিতাব শিক্ষা দিন!'

ইবনে আবি শাইবার বর্ণনায় এসেছে :[৩৪৬]

اللّٰهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل.

অর্থ : 'হে আল্লাহ, তাকে দ্বীনের বিষয়ে ফিকহের জ্ঞান দান করুন এবং তাকে তাবিলের ইলম দান করুন!'

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবায় সংক্ষিপ্তভাবে এবং মুসনাদে আহমদে দীর্ঘ কলেবরে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে[৩৪৭] :

রাতের শেষভাগে আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর পেছনে নামাজে দাঁড়িয়ে যাই। তিনি হাতে ধরে আমাকে তাঁর বরাবর দাঁড় করিয়ে দেন। নামাজ শুরু করার পর আমি পেছনে চলে আসি। সালাম ফেরানোর পর জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার, আমি তোমাকে আমার সাথে দাঁড় করাই আর তুমি পেছনে চলে যাও?! আমি বলি, আপনি হলেন আল্লাহর রাসুল, আপনাকে আল্লাহ রিসালাতের জন্য মনোনিত করেছেন; কোনো মানুষের পক্ষে কি আপনার বরাবর দাঁড়ানো সম্ভব? উত্তরটি শুনে তিনি খুশি হন এবং আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ যেন আমার জ্ঞান এবং দ্বীনের ব্যাপারে আমার বুঝশক্তি বাড়িয়ে দেন।'

এখানে ইবনে আব্বাস রা.-এর দুটি ঘটনা আমি উল্লেখ করলাম। একটি হলো, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তার অজুর পানি ব্যবস্থা করে দেওয়ার ঘটনা। দ্বিতীয়টি হলো, তাহাজ্জুদের নামাজে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাবর দাঁড়াতে অনীহা প্রকাশের ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়মুনা রা.-এর ঘরে অবস্থানকালে নয়। ওই রাতে তিনি শুধু নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাহাজ্জুদের নামাজে শরিক হন। বাঁ-দিকে দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করেন।

তিরমিজি ও নাসাঈ শরিফে বর্ণিত হয়েছে[৩৪৮], ইবনে আব্বাস রা. বলেন : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু-দুবার

---

[৩৪৬] ৩২৮৮৭

[৩৪৭] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩২৮৮৫ এবং মুসনাহে আহমদ : ৩৩০

[৩৪৮] তিরমিজি : ৩৮২৩ এবং নাসাঈ : ৮১৭৮

হিকমাহ প্রদানের দোয়া করেন। এ দুটোই হলো, সে দুটো। আর এই ঘটনা হলো, সে দুটোর কারণ।

ঘটনা দুটো দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, খেদমতের কারণেই প্রথম বার নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্যে দোয়া করেছিলেন। আর দ্বিতীয় বার করেছিলেন মাকামে নবুয়তের প্রতি তার সীমাহীন শ্রদ্ধাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে। আর তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, খেদমতও আদবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার ফলেই ইবনে আব্বাস রা. মর্তবায় অন্যসব সাহাবি থেকে ছিলেন অনন্য উচ্চতায়। এমনকি ইবনে মাসউদ রা. তাঁর সম্পর্কে বলেন, ইবনে আব্বাস যদি আমাদের মতো বয়স পেত, তবে আমাদের কেউ তাঁর ইলমের দশ ভাগের এক ভাগ পর্যন্তও পৌঁছতে পারতাম না।'

তিনি আরও বলেন : আল-কুরআনের কতই-না শ্রেষ্ঠ তারজুমান ইবনে আব্বাস!' ইবনে আব্বাস রা.-এর জানাযার দিন ইবনুল হানাফিয়্যা রহ. বলেন, ইলমের এক মহা অধিপতির মৃত্যু হলো আজ।'[৩৪৯]

তাঁর সম্পর্কে ইবনে উমর রা. বলেন, আল্লাহর পক্ষ হতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কিতাবের বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্ববিজ্ঞ ও সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।' তাঁর উপাধি ছিল হিবরুল উম্মাহ বা উম্মতের সর্ববিজ্ঞ আলিম এবং তারজুমানুল কুরআন।

এটাই সেই উক্তির সারমর্ম :

ما فاز من فاز إلا بالأدب وما سقط من سقط إلا بسوء الأدب.

অর্থ : 'যারা সফল হয়েছে তারা এই আদব অবলম্বনের দ্বারাই হয়েছে। আর যারা বঞ্চিত হয়েছে তারা বেয়াদবির কারণেই বঞ্চিত হয়েছে।'

আল্লাহ আমাদের আমলের তাওফিক দিন!!

* * * *

---

[৩৪৯] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩২৮৮২-৩২৮৮৪

দ্বাদশ পথনির্দেশ

ধৈর্য ও বিরতিহীনতা

আল্লাহর সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত ইলম তলবে শিক্ষার্থীর ধৈর্যধারণ

তালিবুল ইলমকে প্রচণ্ড ধৈর্যধারণ করতে হবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তার জন্যে ইলমের পথ সহজ করে দেন। এটাই তালিবুল ইলমের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান উপদেশ। নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিটি সকল তালিবুল ইলমকে স্মরণ রাখতে হবে সব সময় :

أَخْلِقْ بذي الصبر أن يَحْظى بحاجته ☆ ومُدْمِنُ القَرْعِ للأبواب أن يَلِجا

অর্থ : 'ধৈর্যশীলদের চরিত্র কতই-না সুমহান; তাদের দাবি সব সময় পূর্ণতা লাভ করে। ঠিক যেমন বিরামহীন দরজায় নককারীর জন্য শেষ পর্যন্ত দরজা খুলেই দেওয়া হয়।'[৩৫০]

হাফেজুসসুন্নাহ বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব, সা'লাব উপাধিতে ভূষিত কুফাবাসীর মধ্যে আরবি ভাষাবিষয়ক ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন ইয়াহইয়া আশ-শাইবানি[৩৫১] থেকে খতিবে বাগদাদি রহ. এটি বর্ণনা করেছেন। আর আবুল আব্বাস বর্ণনা করেছেন তার শায়খ ফজল বিন সাইদ বিন সালেম থেকে। তিনি বলেন, সে যুগে একব্যক্তি এলো ইলম তলব করার জন্য। অনেক চেষ্টা করেও সে ইলম অর্জনে সক্ষম হয়ে উঠল না। অবশেষে সে ইলম অন্বেষণ ত্যাগ করার ইচ্ছা করল। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন একটি পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে অতিক্রমকালে সে দেখল, পাহাড়ের ওপর থেকে বিরতিহীনভাবে পানি পড়তে পড়তে পাথরে কিছুটা গর্ত হয়ে গেছে। কোমল পানি সেই বলিষ্ঠ পাথরকে পর্যন্ত প্রভাবিত করে ছেড়েছে। এ দৃশ্য দেখে সে বলে উঠল, আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি ইলম অন্বেষণ করতে থাকব। এরপর সে ইলম তলবে অধিকতর মনোযোগী হয় এবং ব্যুৎপত্তি অর্জন করে।[৩৫২]

الجامع গ্রন্থে খতিব রহ. এ ঘটনা উল্লেখ করার আগে এবং পরে আবুল কাসিম জুনাইদ রহ.-এর দুটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তার একটি হলো,

---

[৩৫০] ছাফাদি নিজ গ্রন্থ الوافي بالوفيات-এ তা উল্লেখ করেছেন : ২/২৫১

[৩৫১] ২০০-২৯১ হি.

[৩৫২] الجامع : ১৫৯৫

ما طلب أحد شيئًا بجدّ وصدق إلا ناله ، فإن لم ينله كلّه نال بعضه

অর্থ : ‘কেউ যদি বাস্তবিক অর্থে এবং সততার সাথে কোনো কিছু অন্বেষণ করে, তবে নিশ্চিতভাবে সে তা লাভ করবে। পুরোটা না পেলে কিছুটা হলেও পেয়ে যাবে।’

দ্বিতীয় উক্তিটি হলো :

"بابُ كل علمٍ نفيسٍ جليلٍ : مفتاحُه بذل المجهود"

অর্থ : ‘প্রত্যেক উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ ইলমের জন্য রয়েছে দরজা; যার চাবি হলো চেষ্টা-সাধনা এবং বিরামহীন অধ্যবসায়।’

এরপর খতিব রহ. প্রাজ্ঞ ইমাম বিখ্যাত মুসনাদ প্রণেতা আবু ইয়ালা আল-মুসিলি রহ.-এর উদ্ধৃত চারটি কবিতা উল্লেখ করেন। যার শেষাংশ হলো :

إني رأيت وفي الأيام تَجرِبةٌ ☆ للصبر عا قبةً محمودةَ الأثرِ

وقلَّ مَن جدَّ في أمر يُطالبه ☆ واستصحبَ الصبرَ إلا فاز بالظَّفَرَ

অর্থ : ‘আমি সবরের প্রতিদানে সুমিষ্ট ও প্রশংসনীয় প্রভাব উপলব্ধি করেছি; বাস্তব অভিজ্ঞতাই যার প্রধান সাক্ষী। কেউ যদি কোনো বিষয় অর্জনে মনোনিবেশ করে এবং ধৈর্যের পথ বেছে নেয়, তবে শেষ পর্যন্ত সাফল্য তার পদচুম্বন করবেই।’

আমি আমার শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাশায়েখদের কাছ থেকেও এ রকম কিছু মুখস্থ করেছিলাম :

اُطلبِ العلم ولا تضجَرنْ ☆ فآفةُ الطالب أن يضجَرا

ألـم ترَ الحبلَ بتكراره ☆ في الصخرة الصماء قد أثّرا

অর্থ : ‘ইলম অন্বেষণ করো; তবে বিব্রত বোধ করো না। কারণ, রুষ্টতা তালিবুল ইলমের জন্য মহাবিপদ। তুমি কি দেখোনি, বারবার রশি দিয়ে টানার কারণে শক্ত পাথরেও দাগ পড়ে যায়!!’

অখণ্ড অভিনিবেশ

তালিবুল ইলমকে আত্মপ্রত্যয়ী এবং উচ্চাভিলাষী হয়ে ইলম অন্বেষণ চালিয়ে যেতে হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। এটি তালিবুল ইলমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, অনেক সময় বিচ্ছিন্নতা কেবল পিছিয়েই দেয় না; ইলমের ময়দান থেকেই ছিটকে দেয় তালিবুল ইলমকে।

আমি আমার তালিবুল ইলম ভাইদের ইমাম বুখারি রহ.-এর একটি মূল্যবাদ উপদেশ উপহার দিচ্ছি; যা তিনি ওয়াররাকার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন :

لا أعلم شيئًا أنفع للحفظ من نَهْمة الرجل ، ومداومة النظر.

অর্থ : 'কোনো কিছু হিফজ বা মুখস্থ রাখার জন্য ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছা এবং অখণ্ড অভিনিবেশ ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ আমার জানা নেই।'

ইমাম যারনুজি রহ. বলেন[৩৫৩] : তালিবুল ইলমের অধ্যয়ন জীবনে কোনো বিরতি থাকতে পারবে না। কারণ, বিরতি হলো মহাবিপদ! আমাদের প্রাণপ্রিয় উস্তাদ ইমাম বুরহানুদ্দিন মুরগিনানি রহ. (আল-হিদায়া গ্রন্থকার) বলতেন, আমি আমার সহপাঠীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছি কেবল ইলম তলবে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের কারণে। কোনো বিরতি দিইনি ইলম অর্জনে।

বিরতি গ্রহণ বেশির ভাগ সময় পূর্ণ বিচ্ছেদ ডেকে আনে। গ্রীষ্মকালীন ছুটিজাতীয় দীর্ঘ বিরতির দিনগুলোতে দুনিয়াবি ব্যস্ততা অনেক সময় শিক্ষার্থীকে ইলমের পথ থেকে সম্পূর্ণ ছিটকে দেয়। আর তাই তালিবুল ইলম এবং আহলে ইলমকে এ ধরনের উপলক্ষ বা বিরতিগুলো পাশ কাটিয়ে চলতে হবে।

তালিবুল ইলমকে বিচ্যুতকারী বিষয়গুলো বর্ণনা করার পাশাপাশি আমি সেসব ব্যক্তির বিপথগামিতার কথাও আলোচনার সুযোগ খুঁজছি, যারা ইলম অর্জন শেষে যখন শিক্ষাদান বা তালিমের মারহালায় উপনীত হয়েছে, তখন বিভিন্ন কোম্পানি বা অফিসের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ব্যস্ততায় পড়ে নিজের অর্জিত ও বহু কষ্টে অন্বেষিত ইলম হারাতে বসেছে। ইফাদা ও ইস্তিফাদা থেকে হাত ধুয়ে বসেছে। একজন দুজন নয়; সংখ্যায় তারা অনেক। আর তাই অভিজ্ঞতার আলোকে পরিস্থিতি বুঝে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে।

দেখা যাবে ইলমের অঙ্গন থেকে ছিটকে পড়েছে এমন তালিবুল ইলমের সংখ্যাই বেশি। বাস্তবতাই এর পেছনে বড়ো সাক্ষী। বিপথগামী ব্যক্তিদের ঘটনা বর্ণনা করার দ্বারা এখানে তাদের থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উদ্দেশ্য; তাদের দোষ বর্ণনা করা নয়।

ইমাম বুখারির শায়খ ইলমুল হাদিসের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব শুয়াইব বিন হারব রহ. বলেন, হাদিসের দরসে আমরা ছিলাম সংখ্যায় চার হাজার। আমাদের মধ্যে কেবল চার জনই মুহাদ্দিস হতে পেরেছে।'[৩৫৪]

---

[৩৫৩] تعليم المتعلم : ৮০

[৩৫৪] الجامع للخطيب : ৯৩

এরপর তিনি ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরের আঙিনায় হাদিসগ্রহণে আসা তালিবুল ইলমদের ভিড় দেখতে পান। তারপর তার সাথি ইমাম আবু দাউদ আত-তায়ালিসিকে[৩৫৫] লক্ষ্য করে তিনি বলেন, হে সুলায়মান, আপনি কী মনে করেন—এই শিক্ষার্থীরা সবাই কি মুহাদ্দিস হতে পারবে? আমি বলি, না। তিনি বলেন, আপনি সত্য বলেছেন! তবে কি পাঁচ জনও না? বলি, পাঁচ জন হয়তো পারবে! বলেন, হ্যাঁ... শৈশবে তো সবাই হাদিস লেখে, কিন্তু বড়ো হয়ে অনেকে হাদিস লেখা এবং ইলম অর্জন করা পরিত্যাগ করে। আবার কেউ ছোটোকালে লেখে, কিন্তু বড়ো হয়ে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। আবু দাউদ রহ. বলেন, এভাবে তিনি একের পর এক বলতে থাকেন। আবু দাউদ রহ. আরও বলেন, এরপর আমি দেখি, তাদের মধ্যে পাঁচ জনও মুহাদ্দিস হয়ে উঠতে পারেনি।

الجامع لابن عبد البر গ্রন্থে বিনা ইসনাদে উল্লেখ আছে যে, একবার আ'মাশকে বলা হলো : আপনি তো বেশি পরিমাণ শিক্ষার্থী দিয়ে ইলমকে পুনর্জীবিত করে তুললেন! উত্তরে তিনি বললেন, অবাক হবেন না; কারণ তাদের এক-তৃতীয়াংশ হয়তো মুহাদ্দিস হওয়ার আগেই ইন্তেকাল করবে। অপর তৃতীয়াংশ দরবারি আলেম হয়ে যাবে; তারা তো মৃতদের চেয়েও বেশি অনিষ্টকর। শেষ তৃতীয়াংশের মধ্যে হয়তো কয়েকজন সফল হতে পারবে।

এগুলো হলো কিতাবে উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা মাত্র। এ ছাড়া আরও কত অসংখ্য ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। তালিবুল ইলম কখনো ইলমের চিরন্তন পথ থেকে ছিটকে পড়া ভণ্ডদের অজুহাত ও কথাবার্তায় কান দেবে না; বরং সে নিজ থেকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে। তাদের জীবন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে। সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে সামনে এগোতে চেষ্টা করবে। পিতা-মাতা এবং অভিভাবকরাও বেশি করে তাদের সন্তানদের ইলম তলবে পাঠাবেন, সবাই তো পেরে উঠবে না; অল্পসংখ্যক হলেও যেন এদের মধ্য সত্যনিষ্ঠ আলিম হিসেবে উঠে আসে। দ্বীনের কর্ণধার ও কান্ডারি হয়ে মুসলিমসমাজকে সত্যের পথে পরিচালিত করে।

ইলম তলবে অবিচ্ছিন্নতা ও অখণ্ডতার বিষয়ে আকাবির ও পূর্বসূরিদের থেকেও অনেক ঘটনা রচিত আছে। এর মধ্যে :

---

[৩৫৫] বিখ্যাত মুসনাদের গ্রন্থকার।

প্রখ্যাত হানাফি ইমাম আবুল হাসান আল-কারখি রহ.[৩৫৬] সম্পর্কে আবু হিলাল আল-আসকারি রহ. বর্ণনা করেন যে, তিনি তার শায়খ বিশিষ্ট বিচারক আবু খাযিম আবদুল হামিদ বিন আবদুল আজিজ রহ.[৩৫৭]-এর দরসে প্রতিদিন উপস্থিত হতেন। এমনকি জুমার দিনেও। ইমাম কারখি রহ. শায়খের দরসস্থলে শুক্রবার দিনও এসে বসে থাকতেন। অথচ সেদিন শায়খ উপস্থিত হতেন না। এ সম্পর্কে ইমাম কারখি রহ. বলেন, আমি শুক্রবার শায়খ আবু খাযিমের দরসে সকাল সকাল চলে আসতাম। অথচ সেদিন দরস অনুষ্ঠিত হতো না। যেন দৈনন্দিন উপস্থিত হওয়ার অভ্যাসটা চালু থাকে আমার।[৩৫৮]

আলেপ্পো ও দামেশকের কিছু আলেমকেও আমি এ সুন্নাত চালু রাখতে দেখেছি। আলেপ্পোর আলেমদের মধ্যে আমার প্রাণপ্রিয় আলেম ও আরেফ শায়খ আবদুল জাওয়াদ বাওয়াদিকজি তার শায়খ আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ নজিব সিরাজুদ্দীন রহ.-এর সাথে এবং দামেশকের আলেমদের মধ্যে আল্লামা ফকিহ শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব দাবসওয়াযাইত তাঁর শায়খ আল্লামা ফকিহ আতাউল্লাহ আল-কাসমের সাথে এ রকম ঘটনা ঘটতে দেখেছি।

আল্লাহ সকলকে তাঁর রহমতের চাদরে ঢেকে দিন! তাঁরা সকলেই দরসের সময় হলে নিজ নিজ শায়খের কাছে চলে আসতেন। এমনকি মঙ্গলবারেও; এদিন সাপ্তাহিক ছুটি ছিল তখন। শায়খের বাড়ি এসে দরজার একাংশ স্পর্শ করতেন। দরজা বন্ধ থাকত। এরপর তারা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যেতেন। গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুতেই তারা এমনটি করতেন। যেন বুধবার দিন শায়খের দরসে উপস্থিত হতে কোনোরূপ অলসতার ভাব সৃষ্টি না হয় তাদের মনে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের পূর্বসূরি উলামা-মাশায়েখের চেষ্টা-মুজাহাদা কবুল করুন। তারা সব সময় আত্মিক ব্যাধিগুলো নিরাময়ের চেষ্টা করতেন। সব সময় কীভাবে সেগুলো দমন করে রাখা যায়, সে চিন্তায় ব্যস্ত থাকতেন। ইলম অন্বেষণের পথে বিরতিগ্রহণ থেকে প্রবল সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

* * * *

---

[৩৫৬] (২৬০-৩৪০ হি.)

[৩৫৭] (মৃত্যু : ২৯২ হি.)

[৩৫৮] الحث على طلب العلم : ৭৮

ত্রয়োদশ পথনির্দেশ

তাকরার ও মুতালাআর গুরুত্ব

ছাত্র-উস্তাদ উভয়ের ওপর সমানভাবে আবশ্যক হলো, ওই দিনের দরসের জন্য দরস শুরু হওয়ার আগে যথেষ্ট পরিমাণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেখে আসা। পূর্বসূরিগণ এটাকে বলতেন : السبق

শায়খের জন্য আবশ্যক হলো : দরসে উপস্থিতির আগে ভালো করে দরসের বিষয়বস্তু বুঝে নেওয়া। এরপর ছাত্রদের সামনে তা পাঠ করা। ফিকহে হানাফি দরসের প্রথম বছরের একটি ঘটনা আমি এখানে উল্লেখ করছি। তখন আমাদের উস্তাদ ও শায়খ ছিলেন বিখ্যাত ফকিহ শায়খ মুস্তাফা মুযারিব রহ.। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

একদিন শায়খ লক্ষ করলেন, শিক্ষার্থীরা দরসে উপস্থিত হওয়ার আগে মুতালাআ করে আসছে না। তা দেখে যথারীতি তিনি দয়া ও ভদ্রতার সাথে আমাদের বলতে লাগলেন, হে আমার সন্তানরা, আমাদের সম্মানিত শায়খ ইবরাহিম আত-তুরমানিনি রহ.[৩৫৯] আমাদের বলতেন, হে আমার সন্তানরা, আল-আযহার ইউনিভার্সিটিতে আমি অনেক ইলম নিয়ে পড়াশোনা করেছি; এর মধ্যে ছাব্বিশটি ইলমের ব্যাপারে আমাকে কোনো সময় প্রশ্ন করা হয়নি। এরপরও আমি সে বিষয়ে দরসে বসার আগে যথেষ্ট মুতালাআ করে দরসে উপস্থিত হতাম!

আর তালিবুল ইলমের ওপর আবশ্যক হলো, দরস শুরু হওয়ার আগে নিজ থেকে দরসের বিষয়বস্তু দেখে আসা। এরপর শায়খের সামনে তা পাঠ করা। এটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়ে আকাবির ও পূর্বসূরিদের থেকে অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে।

তাদের উক্তির মধ্যে রয়েছে, ইমাম যারনুজি রহ. বলেন, سبق হবে এক হরফ পরিমাণ আর তাকরার হবে এক হাজার হরফ পরিমাণ।'

অর্থাৎ মুতালাআ তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হবে আর সবকে বসার আগে তার তাকরার হবে অনেক বার..এক হাজার বার...![৩৬০]

---

[৩৫৯] (১৩০৫-১৩৭৪ হি.)

[৩৬০] تعليم المتعلم : ৬৯

এরপর তালিবুল ইলমের মস্তিষ্কে তা ভালো করে বসে যাওয়ার গুরুত্ব স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'তালিবুল ইলমের উচিত হলো উত্তমরূপে প্রস্তুতি নেওয়া এবং তাকরার বা পুনঃপাঠের ক্ষেত্রে নিজেই অনুমান করে সংখ্যা ঠিক করে নেওয়া। যেন পরিপূর্ণভাবে মস্তিষ্কে না বসা পর্যন্ত সে তা পড়তেই থাকে।'[৩৬১]

এ বিষয়ে বিস্ময়কর সব ঘটনার মধ্যে রয়েছে—

ইমাম আবু ইসহাক আশ-শিরাযি রহ.-এর বৃত্তান্তে বর্ণিত হয়েছে, 'বলা হতো, একবার বড়ো শিমের ঝোলমিশ্রিত মণ্ডবিশেষ আহারের মন চায় তার। তিনি বলেন, কিন্তু দরস আর পড়ার পালা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় তা খাওয়ার আর সুযোগ হয়নি আমার।[৩৬২]

তিনি আরও বলেন, আমি প্রতিটি দরস পড়তাম এবং তাকরার করতাম এক হাজার বার। এক হাজার বার পড়া শেষ করে তবেই অন্য সবকে মনোযোগ দিতাম। এভাবেই চলত আমার জ্ঞান-সাধনা। সবকের মাঝে উদাহরণস্বরূপ কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তি আসলে তা মুখস্থ করে নিতাম।'

আমার মন্তব্য হলো, ইমাম সুবকি থেকেও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি নিজে বলেছেন, আমি এক হাজার বার দরস তাকরার করতাম। তাঁর শায়খ ইমাম যাহাবির গ্রন্থেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে।[৩৬৩]

লক্ষ করুন, কেমন ছিল বিদগ্ধ ও জগদ্বিখ্যাত এ মহাপুরুষের জ্ঞান-সাধনা ও ইলমি সংস্কৃতি! কেমন ছিল কাব্যচর্চার প্রতি তাদের আসক্তি!

একাধিকবার দরস এবং মুতালাআর বিষয়ে এর আগে বর্ণিত ইমাম কাফফাল আশ-শাশির শিক্ষাজীবনের শুরুলগ্নের ঘটনাও এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

ইমাম সুবকি রহ.-এর طبقات গ্রন্থে হারামাইন শরিফাইনের ইমামের কাছে দরস গ্রহণের বিষয়ে ইমাম গাযালি রহ.-এর সতীর্থ ইমাম আবুল হাসান ইলকিয়া আল-হাররাসি রহ.[৩৬৪]-এর বৃত্তান্তে এসেছে যে, তিনি বলেন—নিশাপুরের সারহানক মাদরাসায় একটি খাল ছিল। সেখানে অবতরণের জন্য ছিল সত্তর

---

[৩৬১] تعليم المتعلم : ৭৯

[৩৬২] طبقات الشافعية الكبرى : ৪/২১৮

[৩৬৩] السير : ৮/৪৫৮

[৩৬৪] (৪৫০-৫০৪ হি.)

স্তরের একটি সিঁড়ি। যখনই কোনো দরস মুখস্থ করতাম, তখনই ওই খালে নেমে যেতাম। আর প্রতিটি সিঁড়িতে নামার সময় এবং ওঠার সময় আমি একবার করে দরস পুনঃপাঠ করতাম। তিনি বলেন, প্রতিটি দরস মুখস্থ করার সময়ই আমি এমনটি করতাম।[৩৬৫]

অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত, নিশাপুরের নিযামিয়া মাদরাসার সিঁড়ির স্তরে উঠার সময় আমি সাত বার করে দরস তাকরার করতাম। আর প্রতিটি সিঁড়িতে সত্তরটি করে স্তর ছিল। তাহলে সর্বমোট স্তর হিসাব করলে তাকরারের পরিমাণ হয় ৪৯০ বার![৩৬৬]

ইমাম সারাখসি রহ.-এর অন্যতম শাগরিদ হানাফি মাযহাবের খ্যাতিমান ইমাম আবুল ফজল বাকর বিন মুহাম্মদ আয-যারানজারি রহ.[৩৬৭]-এর বৃত্তান্তে ইবনুল জাওযি রহ. এটি বর্ণনা করেছেন।[৩৬৮] তা ছাড়া ইমাম সুমআনি রহ.-ও নিজ শায়খদের বৃত্তান্তের মাঝে তাঁর জীবনী উল্লেখ করেছেন।[৩৬৯] তবে ইবনুল জাওযি তাঁর সম্পর্কে একটি ঘটনা বেশি বলেছেন।

তিনি বলেন, একবার তাঁকে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এই মাসআলাটি আমি বুখারার একটি দুর্গের প্রাসাদের ওপর দাঁড়িয়ে একরাতে চার শ বার পড়েছি।'

আর তাই ইবনুল জাওযি এবং সুমআনি উভয়েই স্বীকার করেছেন– আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব হিফজ করার বিষয়ে আবুল ফজলের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হতো। তাঁর কাছে যখনই কোনো শিক্ষার্থী কিছু জিজ্ঞেস করত, যেখান থেকে জিজ্ঞেস করত, তিনি মুতালাআ এবং কিতাব দেখা ছাড়াই অনায়াসে তা বলে দিতেন।

মালেকি মাযহাবের তৎকালীন প্রাজ্ঞ আলেম ইমাম আবু বকর আল-আবহারি রহ.[৩৭০]-এর বৃত্তান্তে কাজি ইয়ায রহ. এমনই কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[৩৭১] তিনি লিখেছেন : তিনি ইবনে আবদুল হাকামের রচিত المختصر গ্রন্থটি পাঁচ শ

---

[৩৬৫] পৃষ্ঠা : ১১১

[৩৬৬] ৭/২৩২

[৩৬৭] (মৃত্যু : ৫১২ হি.)

[৩৬৮] المنتظم গ্রন্থে : ১৭/১২২

[৩৬৯] التحبير : ১/১৩৫

[৩৭০] (মৃত্যু : ৩৭৫ হি.)

[৩৭১] ترتيب المدارك : ১/১৩৫

বার, الأسدية গ্রন্থটি পঁচাত্তর বার, الموطأ পঁয়তাল্লিশ বার, المختصر للبرقي গ্রন্থটি সত্তর বার এবং المبسوط গ্রন্থটি ত্রিশ বার পাঠ করেন।

কাজি ইয়ায রহ. তার শায়খ ইমাম হাফিজ গালিব বিন আবদুর রহমান ইবনে আতিয়্যা আল-গারনাতি রহ.[৩৭২]-এর বৃত্তান্ত বলেন, তিনি সহিহুল বুখারি সাত শ বার পাঠ করেন। তাঁর আয়ু ছিল ৭৭ বছর। এ হিসেবে তিনি ষাট বছরে প্রায় প্রতিমাসে এক বার করে সহিহ বুখারি পাঠ সম্পন্ন করতেন।[৩৭৩]

আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলি বিন আলভি খারদ আত-তারিমি[৩৭৪]-এর রচিত غرر البهاء الضوي গ্রন্থে বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ আলেম ফজল বিন আবদুল্লাহ ইবনে আবি ফজল আল-আলভি আত-তারিমির[৩৭৫] ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক হাজার বার সহিহুল বুখারি পাঠ করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, এ ধরনের দুর্লভ তথ্য অন্য কারও ব্যাপারে আমার জানা নেই–আল্লাহই অধিক জানেন।

এ তথ্যটি আমাকে জানিয়েছেন শাফেঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ফকিহ সালেহ আল-মুবারক শরিফ আলে সুমাইত হাফিযাহুল্লাহ।

ইমাম সুয়ুতি রহ.-এর রচিত المنهاج السوي গ্রন্থে ইমাম নববি রহ.-এর বৃত্তান্তে বর্ণিত হয়েছে[৩৭৬] : (যার সারমর্ম হলো) ইমাম নববি তার কিছু গ্রন্থে ইমাম গাযালি রহ. এর রচিত الوسيط গ্রন্থ থেকে কিছু বিষয় বর্ণনা করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক কিছু আলেম তার সমালোচনা করেন। তার ওপর ভুল ব্যাখ্যার অপবাদ আরোপ করলে তাদের উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা আমার সমালোচনা করছ, আমার সাথে মতবিরোধ করছ...অথচ ওই গ্রন্থটি আমি চার শ বার পাঠ করেছি!!

এখান থেকে আমাদের একটি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত; আর তা হলো, পূর্ববর্তীকালের আলেমগণ দরস মুতালাআ ও তাকরার করতেন একাধিক বার। এভাবে তারা পুরো কিতাব মুখস্থ করে নিতেন। আর শায়খদের নিকট তারা শুধু নির্ভরযোগ্য মৌলিক কিতাবগুলোই পড়তেন। আর সেগুলো মুখস্থ করার ফলে

---

[৩৭২] (৪৪১-৫১৮ হি.)

[৩৭৩] الغنية : ১৯০। التنويه والإرشاد : ৬০

[৩৭৪] (মৃত্যু : ৯৬০ হি.)

[৩৭৫] নবম শতকের প্রথম দিকের বিশিষ্ট আলেম।

[৩৭৬] পৃষ্ঠা : ৪৩

পরবর্তী সময়ে রচনা ও তাসনিফাতের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত তাদের জন্য। দ্বিতীয়বার কিতাব খুলে তা দেখার আর প্রয়োজন হতো না।

আমাদের প্রাণপ্রিয় উস্তাদ ও শায়খ আমাদের দুটি বিষয়ের তাগিদ দিতেন খুব জোরালোভাবে। শায়খের সামনে দরসে বসার আগে সবক মুতালাআ করে আসা এবং দরস শেষে সবকের মুরাজাআ করা। মুতালাআর সময় তালিবুল ইলম শায়খ যা বর্ণনা করবেন তা ভালো করে শুনতে ও আত্মস্থ করতে যথাযথ প্রস্তুতি নেবে। আর মুরাজাআর সময় শায়খের আলোচিত বিষয়গুলো আলোচনা-পর্যালোচনা করবে। যেন মস্তিষ্কে সেটা ভালো করে গেঁথে যায়। দরসের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু স্পষ্ট হয়ে যায়।

যারনুজি রহ. দরস তাকরারের বিষয়ে দুটি কাজের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন, উচিত হলো আজকের সবক পাঁচ বার পড়া। গতকালের সবক চার বার পড়া। পরশু দিনের সবক তিন বার পড়া। এর আগের দিনের সবক দুই বার পড়া এবং এর আগের দিনের সবক এক বার পড়া। এ নিয়ম মেনে চললে আশা করা যায় সবক হিফজ ও আত্মস্থ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে তালিবুল ইলমদের জন্য।'[৩৭৭]

তাকরারে অলসতা ও কালক্ষেপণ পরিহার করা উচিত। দরস এবং তাকরার হওয়া উচিত পূর্ণ তৎপরতা ও উদ্যমের সাথে। তবে বুক ফাটিয়ে নয়। নাহলে দরসের মূল উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ন হবে। এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাটাই বাঞ্ছনীয়।

আবু হিলাল আল-আসকারি রহ. এখানে দ্বিতীয় বিষয়টির দিকে তালিবুল ইলমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন,[৩৭৮] শিক্ষার্থীদের উচিত হলো দরস পড়ার সময় উঁচু আওয়াজে পড়া। কমপক্ষে নিজের কানে যেন তা শুনতে পায়। কারণ, যা কানে বাজবে, তা অন্তরে বদ্ধমূল হবে।

একজন বিশিষ্ট শায়খ আমাকে বলেছেন যে, নাবতের এক গ্রামে আমি এক যুবককে দেখলাম সে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ আরবি এবং উত্তম বর্ণনাভঙ্গিতে কথা বলছে। তোমার সমগোত্রীয় অন্য লোকেরা অশুদ্ধ ও অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলে, আর তুমি শুদ্ধ ও স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছ জিজ্ঞেস করা হলে সে উত্তরে বলে, আমি প্রতিদিন ইমাম জাহিয রহ.-এর কিতাবসমূহ থেকে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা পাঠ করতাম উচ্চ আওয়াজে। এভাবে কিছুকাল পড়ার পর আমার এ রকম যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়।

---

[৩৭৭] পৃষ্ঠা : ৮০

[৩৭৮] الحث على طلب العلم : ৭২

শাফেঈ মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম আবু হামিদ আল-ইসফারায়িনি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর সাথিদের বলতেন, দরস পড়ার সময় তোমরা উচ্চ আওয়াজে পড়বে, কারণ তা হিফজের জন্য বেশি সহায়ক। তা ছাড়া তন্দ্রাকেও দূর করে দেয় তা।

আমিও তালিবুল ইলমের উদ্দেশে জোর দিয়েই বলছি বিষয়টিকে। তবে বেশি জোর দিচ্ছি দৈনন্দিন কুরআনুল কারিম পড়ার সময় উঁচু আওয়াজ বজায় রাখার ব্যাপারে। পাশাপাশি সহিহ বুখারি অথবা রিয়াযুস সালেহিন ইত্যাদি হাদিসের গ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ উঁচু আওয়াজে পাঠ করতে। এভাবে সুন্নতে নববির সাথে তার সখ্যতা ও পরিচিতও বাড়বে এবং সঠিক উচ্চারণ ও বর্ণনাভঙ্গির পর্যাপ্ত অনুশীলনও তার হয়ে যাবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, সুন্দর ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ যেন বজায় থাকে।

এভাবে কিছুদিন পড়ার পর যখন বিশুদ্ধ উচ্চারণ আত্মস্থ হয়ে যাবে, তখন আল্লামা ইউসুফ কান্ধলভি রহ.-এর রচিত حياة الصحابة গ্রন্থটি পড়া যেতে পারে একপৃষ্ঠা দুপৃষ্ঠা করে। পাশাপাশি তালিবুল ইলমদের আমি প্রখ্যাত আরবি সাহিত্যিক উস্তাদ শায়খ আলি তানতাভি রহ.-এর দুটি বই رجال من التاريخ এবং قصص من التاريخ পড়ার জন্য ওসিয়ত করছি; এ দুটি কিতাবের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি থেকে তারা উপকৃত হবে। কারণ, তা খুবই সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত।

সর্বশেষ ওসিয়ত এবং একটি ঘটনা

ওসিয়তটি হলো, তালিবুল ইলম নিজের চেষ্টা ও আগ্রহ দ্বারা তার ইলমের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটাবে। তালিবুল ইলমের শ্রম-সাধনা দ্বারা উস্তাদও অনুপ্রাণিত হবে। তা এভাবে যে, শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে উন্নত স্তরের কিতাব ও ভালো মানের শরাহ দেখে মুতালাআ করে আসবে। যেন তার ইলমের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। শায়খের দৃষ্টি আকর্ষণে সে সক্ষম হয়। এভাবে সহজেই সে শায়খদের দোয়া ও নেকদৃষ্টি লাভ করতে পারবে। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ওসিয়তটি আমলে নিতে পারলে তালিবুল ইলমের জন্য হাতছানি দেবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

আর ঘটনাটি হলো, একবার আমার প্রাণপ্রিয় মুরব্বি বিশিষ্ট হানাফি ফকিহ আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব শায়খ মুহাম্মদ আস-সালকিনি রহ.-এর কোথাও সফরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে আলেপ্পোর মাদরাসায়ে খুসরুবিয়্যার শরয়ি বিভাগে তার হয়ে দরস প্রদানের জন্য তারই ছাত্র আমার শায়খ উস্তাদ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-কে দায়িত্ব দিয়ে যান। আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর দরসে

ছাত্ররা যারপরনাই মুগ্ধ হয়। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন তিনি। এরপর শায়খ মুহাম্মদ আস-সালকিনি সফর থেকে ফিরে এসে দরসে উপস্থিত হলে ছাত্ররা জিজ্ঞেস করে, হে উস্তাদ, শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা কি আপনার ছাত্র? এ কথা শুনে তিনি যথারীতি নম্রতা ও তাওয়াজু অবলম্বন করে বলেন, হ্যাঁ.. তবে এখন আমি নিজেই তার ছাত্র। আমি ইলমে নাহুর দরসে তার জন্য الآجرومية -এর মতন পড়ে আসতাম। আর সে দরসের জন্য مغنى اللبيب মুতালাআ করে আসত।'

এ গুণের কারণেই আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. আরবি ভাষা ও ব্যাকরণবিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পাশাপাশি শরিয়াবিষয়েও ব্যুৎপত্তি ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হন। আল্লাহ তাআলা সকল শায়খকে তাঁর রহমতের আঁচলে ঢেকে নিন!

* * * *

চতুর্দশ পথনির্দেশ

মুজাকারা বা ইলমচর্চার তাৎপর্য

তালিবুল ইলমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, ইলমের মুজাকারা করবে সে নিজের সাথে, তার সহপাঠীদের সাথে, তার শায়খদের সাথে অথবা অন্য কারও সাথে।

মুজাকারার উদ্দেশ্য হলো, ইলম নিয়ে পরস্পর আলোচনা করা। একে অন্যকে জিজ্ঞেস করা। পর্যালোচনা করা। বিতর্ক করা; তা যে কোনো পন্থায় হোক, যে কোনো ভঙ্গিতে হোক। তবে সেই বিতর্ক যেন কোনোরূপ ঝগড়া বা গোঁড়ামিতে রূপ না নেয়। নির্দিষ্ট কথা বা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষাবলম্বন-জাতীয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কারণ, ইলমচর্চা অনেক সময় একাকী হয়, যেমন অধ্যয়ন বা লেখালেখি। তবে মুজাকারার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একজন লাগবে অবশ্যই; যার সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হবে এবং বিষয়বস্তু শেয়ার করা যাবে। এভাবে একাধিক ব্যক্তি মিলে আলোচনা করলে সেখান থেকে নতুন নতুন মত ও ভিন্ন ভিন্ন বুঝ তৈরি হবে। মাসআলার নানান উত্তর ও সম্ভাবনার দিক উন্মোচন হবে।

আমাদের মাশায়েখদের মুখে মুখে একটি কথা প্রায়ই উচ্চারিত হতো : ইলমকে দুজনের মাঝে জবাই করা উচিত। অর্থাৎ দুজন মিলে পরস্পর আলোচনা করে তাতে উদীয়মান প্রশ্নগুলো নিরসন করা উচিত।

মুজাকারার সবচেয়ে বড়ো ফায়দা হলো, তা হিফজের জন্য সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় বড়ো ফায়দা হলো, হিফজকৃত বিষয়গুলো মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হতে সাহায্য করে। তৃতীয় বড়ো ফায়দা হলো : শিক্ষার্থীর ইলমের মধ্যে অন্যের ইলম এসে যুক্ত হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থীর ইলম ও বুঝ গিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির ইলমের সাথে সংযুক্ত হয়। এটি কোনো অংশে কম গুরুত্বের নয়। অবহেলা করার বিষয় নয়।

মুজাকারার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়ে বড়ো বড়ো সাহাবির উক্তি এবং তাদের আমলও এখানে উল্লেখযোগ্য। এ ব্যাপারে আলি বিন আবু তালিব, ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, আবু সাইদ খুদরি; বড়ো বড়ো তাবেঈন যেমন আলকামা, নাখঈ, ইবনে শিহাব, আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা প্রমুখ মনীষীর জীবনী অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

আর তাদের এসব কীর্তি উল্লেখ করেছেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাদের রচিত গ্রন্থগুলোতে। যেমন : ইবনে আবি শাইবা তার মুসান্নাফে (২৬৬৫৭-

২৬৬৬৪), দারেমি নিজ 'সুনান' গ্রন্থে (৫৯৫-৬২৭), এরপর কাজি রামহুরমুযি রহ. المحدث الفاصل গ্রন্থে (৭২১-৭৩২), এরপর হাকিম রহ. معرفة علوم الحديث গ্রন্থের তেত্রিশ নং অধ্যায়ে, এরপর খতিব রহ. آداب الفقيه গ্রন্থে (৯৫৩-৯৫৭) ও الجامع গ্রন্থে (১৮৭৫-১৯১২), এরপর ইবনে আবদুল বার তার الجامع গ্রন্থে (৯৪, ৬২৩, ৬৫১), এরপর ইমাম বায়হাকি রহ. তার المدخلগ্রন্থে (৪১৮-৪৫১)। তারা সকলেই প্রায় সবগুলো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কেউ কেউ আবার অতিরিক্তও বলেছেন। সবগুলো আলোচনাই কল্যাণ ও হিকমায় ভরপুর।

মুজাকারার বিষয়ে মনীষীদের কিছু ঘটনা

ইয়াকুব বিন সুফিয়ান রহ. المعرفة والتاريخ গ্রন্থে ফুযাইল বিন গাযওয়ান থেকে বর্ণনা করেন যে–ইবনে শুবরুমা, মুগিরা ইবনে মিকসাম আদ-দাবঈ, আল-হারিস আল-উকলি, কাকা বিন ইয়াযিদ প্রমুখ আলেম রাতভর ফিকহ নিয়ে আলোচনা করতেন। কখনো কখনো ফজরের আজান দিতে পর্যন্ত ভুলে যেতেন তারা।'[৩৭৯]

ইরাকের তৎকালীন এ সকল বিখ্যাত ইমাম সারা রাত তাহাজ্জুদ ও ইবাদাত করার ওপর ইলমি মজলিশ তৈরি এবং ইলম নিয়ে পরস্পর মুজাকারাকে প্রাধান্য দিতেন। তা ছাড়া এর আগে ইবনে ওমর এবং ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কেও আমরা জেনেছি যে, তারা পরস্পর ইলমি মুজাকারাকে নফল নামাজের মতো মনে করতেন।

ইলম নিয়ে মুজাকারা ও বিতর্ক করার গুরুত্ব আরেকটি ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়। ইমাম বুঅজুলি রহ. বর্ণনা করেন, আবুল হাসান আল-কাবিসি আল-কায়রাওয়ানি রহ.-কে একবার মুখস্থ পাণ্ডুলিপির (শায়খের তাকরির-লিপির) ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় হলো তা থেকে কি ফতোয়া দেওয়া যাবে? উত্তরে তিনি বলেন, যদি এগুলো নিয়ে সে শায়খের সাথে মুজাকারা করে থাকে এবং ভালো করে তা বুঝে থাকে, তবে সে ফতোয়া দিতে পারবে। আর যদি মুজাকারা না করে থাকে, তবে তা থেকে ফতোয়া দেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না।[৩৮০]

শায়খের সাথে তালিবুল ইলমের মুজাকারার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এখান থেকেই অনুমান করা যায়।

---

[৩৭৯] ২/৬১৪

[৩৮০] فتاوى الإمام البرزلي : ১/৬৩

আরেকটি বিষয় বোঝা দরকার, মুজাকারা হলো শায়খদের থেকে ফায়দা অর্জনের একটি সুন্দর মাধ্যম। তাহলে যারা কখনো শায়খদের থেকে গ্রহণ করেনি তাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে; আর যারা ইলমের বিষয়ে শায়খদেরই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের গ্রহণযোগ্যতা কোন পর্যায়ে হতে পারে?! যারা শায়খদের সংশ্রবে গিয়ে ইলম অর্জন করেনি, কোনো সন্দেহ নেই—তারা ইলম ও ইলমের সঠিক বুঝ থেকে অনেক দূরে রয়ে গেছে।

মুজাকারার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়ে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি এর আগেও উল্লেখ হয়েছে—আবু যুরআ রহ. যখন বাগদাদ এসে ইমাম আহমদ রহ.-এর বাড়িতে মেহমান হন, তখন তিনি আবু যুরআকে নিয়ে ইলম চর্চা করতেন। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, আমি তখন ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নামাজ পড়তাম না। আবু যুরআর সাথে ইলমি মুজাকারায় সময় দেওয়াকে আমি আমার নফল নামাজের ওপর প্রাধান্য দিই। আর তিনি প্রতিদিন তিন শ রাকাত নফল আদায় করতেন। পরে বার্ধক্যের কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ায় তিনি দেড় শ রাকাত নফল আদায় করতেন।[৩৮১]

খতিব রহ.-ও এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা উল্লেখ করেছেন,[৩৮২] কিন্তু প্রবক্তার নাম উল্লেখ করেননি। সেখান থেকে সামান্য অংশ আমি এখানে বর্ণনা করছি :

তিনি বলেন, ইলম হলো মেশকের মতো; যদি দীর্ঘদিন তা বোতলে ফেলে রাখা হয়; ব্যবহার না করা হয়, তবে তার সুঘ্রাণ চলে যাবে। অথবা ইলম ওই পরিষ্কার পানির মতো, যা দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকার কারণে ধুলোবালি পড়ে তার রং ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। অথবা ওই কূপের মতো, যা খনন করলে নিয়মিত পানি আসে এবং পানি বৃদ্ধি পায়। এমনকি বেশি খনন করার কারণে যদি কোনোভাবে নদীর প্রবাহপথ পেয়ে যায়, তবে নদীর সাথে মিশে গিয়ে তা আরও উৎকৃষ্ট হয়ে যায়, অমরত্ব লাভ করে। পুরো সমাজ তা থেকে স্থায়ীভাবে উপকৃত হতে থাকে। আর যদি তা নিয়মিত খনন না করা হয়, তবে আবদ্ধ থাকার কারণে একসময় তার পানি গাছের পাতা আর ধুলোবালি পড়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তেমনি ইলম যদি চর্চা না করা হয়, মুজাকারা বা তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা না করা হয়, তবে একসময় ইলমও নষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যাবে। আর যখন মুজাকারার মাধ্যমে ইলম জীবন্ত করে তোলা

---

৩৮১ أبو نعيم في الحلية : ৯/১৮১

৩৮২ آداب الفقيه و المتفقه : ২/১০

হয়, আর তা প্রচার-প্রসার করা হয়, তখন সেটি ওই প্রবহমান নদীর মতো হয়ে যায়, যেখান থেকে মানুষ নিয়মিত উপকৃত হতে থাকে। যদি এক দিক দিয়ে প্রতিবন্ধকতা আসে, তখন অন্য দিকে নদী তার প্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে নেয়। এক দিকে ময়লাযুক্ত হয়ে গেলে অন্য দিকে পরিষ্কার হতে থাকে। আর নদীর ময়লাযুক্ত পানিও জমিতে ও খেতে সিঞ্চন করা যায়। পশুপাখি তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

মুজাকারার ব্যাপারে ইমাম যারনুজি রহ. দিয়েছেন আরও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ। 'তালিবুল ইলমের উচিত হলো, মুজাকারা করা, বিতর্ক করা এবং তা নিয়ে পরস্পর প্রশ্ন ছুড়াছুড়ি করা। এ ক্ষেত্রে সব সময় সতর্কতা, ন্যায়সংগতা এবং নম্রতাপূর্ণ আচরণের দিকে খেয়াল রাখা। ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, মুজাকারা আর মুনাযারা হলো মাশওয়ারার মতো। আর মাশওয়ারা করা হয় সত্য ও সঠিক মতটি খুঁজে বের করার জন্যে। আর তাই ইলমি মুজাকারার ক্ষেত্রেও বিষয়টি ভালো করে স্মরণ রাখা উচিত। সেখানে যদি একপক্ষের উদ্দেশ্য থাকে মতবিরোধ তৈরি করা, পারস্পরিক ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা, তবে কোনো সময় ওই বিতর্ক বৈধ হবে না। ইলমি বিষয়ে সত্য উদ্‌ঘাটন করার লক্ষ্যে হলে তবেই তা বৈধতা পাবে।

শুধু একাকী পড়ার চেয়ে বিতর্ক বা প্রশ্ন ছুড়াছুড়ি করা অধিক উপকারী। কারণ, সেখানে পড়ার পাশাপাশি ভিন্ন উপকারও অর্জিত হয়। বলা হয়, এক মুহূর্ত প্রশ্ন ছুড়াছুড়ি করা এক মাস একাকী অধ্যয়ন করা থেকে উত্তম। তবে অসরল স্বভাবের কারও সাথে মুজাকারা করা যাবে না। কারণ, স্বভাবের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়। একজনের চরিত্র আরেকজনের চরিত্রকে আকর্ষণ করে। সংশ্রব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

মুজাকারার পদ্ধতিগুলো হলো, প্রথমে শিক্ষার্থী নিজের মন ও মস্তিষ্কের সাথে মুজাকারা করবে পাঠ ও মুতালাআর মাধ্যমে। এরপর তার চেয়ে উন্নত মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে। এরপর তার সমযোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে।

খতিব বাগদাদি রহ. এ সকল নিয়ম ও পদ্ধতি হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু হুরায়রা রা.-এর উক্তির মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সূচনা করেছেন।[৩৮৩] আবু হুরায়রা রা. বলেন,

جزّأتُ الليل ثلاثة أجزاء : ثلثًا أصلي و ثلثًا أنام و ثلثًا أذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

---

[৩৮৩] الجامع : ১৮৬৯ এবং এর পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো দেখুন।

অর্থ : আমি রাতকে তিনটি ভাগে ভাগ করতাম। এক ভাগে নামাজ পড়তাম। আরেক ভাগে নিদ্রায় যেতাম। অপর ভাগ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলো স্মরণ করতাম।

এরপর খতিব রহ. আমর বিন দিনার থেকেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। তা ছাড়া ইমাম সাওরি রহ. থেকেও তিনি তা নকল করেছেন।

মুজাকারা ও তার প্রভাব সম্পর্কে অচিরেই ইমাম আবু হানিফা এবং খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির ঘটনা আমি উল্লেখ করব। কীভাবে তারা ইলমের এত উন্নত ও অভাবনীয় উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন তার রহস্য আমি উদ্‌ঘাটন করব।

ইবনে আবি হাতিম রাযি রহ.-এর বৃত্তান্তে বর্ণিত হয়েছে, ইলম এবং রিওয়ায়াতের পুণ্যভূমিতে জন্ম হওয়াটা ছিল ইবনে আবি হাতিমের ওপর আল্লাহপ্রদত্ত এক মহান কৃপা। তিনি তার পিতা এবং আবু যুরআর সাথে সব সময় শুধু ইলমি মুজাকারা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আর তারা উভয়ে তাকে ইফাদা করতেন, ঠিক যেমন পাখি তার ছোট্ট বাচ্চাকে মুখে তুলে আহার করিয়ে দেয়। তাকে সহযোগিতা করে।'[৩৮৪]

তা ছাড়া ইমাম ইবনে শিহাব যুহরি রহ.-এর মতো আলেমের বেদুইনদের সাথে ও বাঁদির সাথে ইলমি মুজাকারা এবং ইসমাইল বিন রাজা আয-যুবাইদির মতো বিদগ্ধ আলেমের শিশুদের সঙ্গে মুজাকারার ঘটনা তাদের অন্তরে ইলমের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধাবোধ এবং তা ভুলে যাওয়ার ব্যাপারে প্রবল শঙ্কারই বহিঃপ্রকাশ। এ রকম করার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল; একটি শব্দ এমনকি একটি হরফও যেন মন থেকে হারিয়ে না যায়। আল্লাহ তাআলা এসব আত্মত্যাগী মহাপুরুষদের কষ্ট-পরিশ্রমগুলো কবুল করুন। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের কবরে সাদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব প্রেরণ করুন। ইলম সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা কতটুকু মনোযোগী ছিলেন!! দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণে তারা আত্মসত্তাকে কী পরিমাণ বিলীন করেছিলেন!!

মুজাকারার বিষয়ে ইমাম নববি রহ. থেকেও অনেক গুরুত্ববহ উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। খতিব রহ. সেগুলো উল্লেখ করে সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সে কারণেই আমি তা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

তিনি ইলমুল হাদিস অর্জনের পথ ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এই ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাহকিকের বিষয়ে খুব গুরুত্বের সাথে আমল করা।

---

৩৮৪ تاريخ ابن عساكر : ৩৫/৩৬০

পাশাপাশি মতন ও সনদের সূক্ষ্ম অর্থগুলো খুঁজে খুঁজে বের করা। এরপর লিখিত বিষয়গুলো গভীর মনোযোগের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে মুতালাআ করা। এরপর মুখস্থ বিষয়গুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মুজাকারা করা। ওই ব্যক্তি বয়সে বা মর্যাদায় তার সমপর্যায়ের হোক, তার চেয়ে উঁচু স্তরের বা নিচু স্তরের হোক। কারণ, মুজাকারার দ্বারা মুখস্থ বিষয় মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়, তার সম্পাদনা হয়, তা স্বনির্ভর হয়ে ওঠে, তা স্থির হয় এবং সর্বোপরি জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। কোনো নির্দিষ্ট শাস্ত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে সে বিষয়ে এক মুহূর্ত মুজাকারা করা একাধিক মুহূর্ত বরং দিনভর মুতালাআ এবং হিফজ করা থেকে বেশি উপকারী। আর মুজাকারা হতে হবে ন্যায়সংগত ও স্বাভাবিক পন্থায়। ইফাদা এবং ইস্তাফাদার উদ্দেশ্যে। কখনো কেউ কাউকে খাটো করে দেখবে না। আত্মমর্যাদা দেখানো যাবে না। সব সময় সম্বোধন করতে হবে নম্র ও উৎকৃষ্ট ভাষায়। এভাবেই তাদের ইলমের সমৃদ্ধি ঘটবে। মুখস্থ বিষয়গুলো স্বচ্ছ ও অধিকতর বদ্ধমূল হবে।'[৩৮৫]

ইমাম নববি রহ.-এর উক্তির সার্থকতার প্রতি তাগিদ করে আমি বলব, কোনো বিষয়ে বিজ্ঞ লোকের সাথে ওই বিষয়ে মুজাকারা যদি কয়েক দিন বা কয়েক মাস একাকী অধ্যয়ন থেকে বেশি উপকারী সাব্যস্ত হয়, তবে যদি তালিবুল ইলম নিজে দক্ষ ও অভিজ্ঞ উস্তাদের সংশ্রবে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জন করে, দীর্ঘদিন তাঁর কাছে অবস্থান করে, তবে তা কী পরিমাণ উপকারী সাব্যস্ত হবে...?!! যারা বিজ্ঞ কোনো আলেমের সংশ্রবে থেকে ইলম অর্জন করেনি তাদের কাছে ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে ইমাম ইবনে জামাআ রহ.-এর সতর্কবাণীও সামনে আসছে।

যে সকল ব্যক্তি মিডিয়া বা পত্র-পত্রিকায় 'শায়খ' রূপে উপস্থিত হয়েছে বা মিডিয়া তাদের শায়খ বানিয়েছে, তারা ওই রকম তাহকিকপূর্ণ ইলম থেকে কী পরিমাণ দূরত্বে আছে?! বিশেষত এর সাথে যখন যুক্ত হয় নিজের ব্যাপারে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ অথবা নিজেকে সে ইলমের অনুপযুক্ত মনে করার বিষয়টি..!!

আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন! সকল অনিষ্ট হতে এ দ্বীনের হেফাজত করুন! আমাদের সঠিক পথের দিশা দিন!

* * * *

---

[৩৮৫] صحيح مسلم এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ভূমিকায় : ১/৪৭-৪৮

পঞ্চদশ পথনির্দেশ

অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা

তালিবুল ইলমের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, অজানা বা দুর্বোধ্য বিষয়ে বেশি বেশি জিজ্ঞেস করবে। এ কাজকে তার মজ্জাগত অভ্যাস বানিয়ে নেবে। সাইয়িদুল মুফাসসিরীন হজরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উত্তরটিও এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ আছে। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, এত ইলম আপনি কীভাবে অর্জন করলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন–

بلسان سئول، وقلب عقول.

অর্থ : 'অধিক প্রশ্নকারী মুখ এবং অধিক বোধগম্যকারী অন্তর দিয়ে।'[৩৮৬]

জাহিলি এবং ইসলামি উভয় যুগপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি দাগফাল বিন হানজালা আশ-শাইবানির উত্তরটাও এ রকম ছিল, যখন মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা. তাকে ডেকে নিয়ে ভাষাজ্ঞান, বংশপরম্পরা জ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি প্রায় সকল জ্ঞান থেকে জিজ্ঞেস করার পর সব বিষয়ে জ্ঞানী পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে দাগফাল, এত জ্ঞান তুমি কোথায় অর্জন করেছ? উত্তরে দাগফাল বলেছিল, তা অর্জন করেছি অধিক ধীশক্তিসম্পন্ন অন্তর এবং অধিক প্রশ্নকারী মুখ দিয়ে; আর ইলমের মহাবিপদ হলো বিস্মৃতি।'[৩৮৭] কারণ,

العلم خزائن ومفاتيحها السؤال.

অর্থ : 'ইলম হলো অনেক রত্নভান্ডার, যার চাবি হলো প্রশ্ন করা।'[৩৮৮]

---

[৩৮৬] ইবনে আব্বাস রা. থেকে ইমাম বায়হাকি রহ. নিজগ্রন্থ المدخل -এ জারিরের রেওয়ায়েতে মুগিরা হতে তা বর্ণনা করেছেন : ৪২৭। রাফেঈ রহ التدوين -এও জারিরের রেওয়ায়েতে মুগিরা হতে বর্ণনা করেছেন। আর মুগিরা বর্ণনা করেছেন ইবরাহিম নাখঈ থেকে। আর ইবরাহিম সরাসরি ইবনে আব্বাসের সাক্ষাৎ লাভ করেননি। কিন্তু তবুও তার মারাসিলগুলো সহিহ।

[৩৮৭] ইবনে আবদুল বার তার جامع গ্রন্থে তা বর্ণনা করেন : ৫৩১। الاستيعاب : ২/৪৬২, المدخل للبيهقي : ৪২৮

[৩৮৮] এটি একটি যইফ হাদিসের অংশ, যা আবু নুআইম الحلية গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ৩/১৯২। ইমাম সাখাভি রহ.-ও المقاصد গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে তা বর্ণনা করেছেন,

شفاء العي السؤال.

অর্থ : 'অজ্ঞতার সুচিকিৎসা হলো জিজ্ঞেস করা।'[৩৮৯]

তবে ওই চাবিকাঠি এবং ওষুধের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হতে হবে তালিবুল ইলমকে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ, সুলাইমান বিন ইয়াসার এবং মাইমুন বিন মিহরান রহ. বলেছেন :

حسن المسألة نصف العلم.

অর্থ : 'সুন্দর জিজ্ঞাসা ইলমের অর্ধেক।'[৩৯০]

এ বিষয়ে ইমাম যারনুজি একটি ঐতিহাসিক ও বিরল তথ্য উপস্থাপন করেছেন। আর সেটি হলো, আগেকার যুগে তালিবুল ইলমকে মানুষ ما تقول -এর মতো অদ্ভুত শব্দ দিয়ে সম্বোধন করত। কারণ, তাদের অভ্যাস ছিল ما تقولون في هذه المسألة؟ (এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?) এ-জাতীয় প্রশ্ন করা।[৩৯১]

পরস্পর প্রশ্ন করা তালিবুল ইলমের অবিচ্ছেদ্য স্বভাব ও অনন্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। তার পোশাক ও প্রতীকে রূপ নেবে। এটিই মুজাকারার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এ বিষয়ে সামনে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। পূর্ববর্তীকালের মনীষীগণ অর্থাৎ সাহাবা, তাবেইন এবং তাদের পরবর্তী সময়ের প্রায় সকল ইমাম এর ওপর গুরুত্বের সাথে আমল করতেন। এটি বাস্তবায়নে জোর তাগিদ দিতেন।

ইমাম ইবনে শিহাব যুহরি রহ.-এর জ্ঞান অনুসন্ধিৎসা বর্ণনা করতে গিয়ে রামহুরমুযি রহ. নিজগ্রন্থে উল্লেখ করেন : শিক্ষাজীবনে দরসের মজলিশের সহপাঠীদের মধ্যে সকল যুবককে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সকল বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করতেন, সকল তরুণকে জিজ্ঞেস করতেন। আনসারিদের এলাকায় এসে সেখানকার সকল যুবককে জিজ্ঞেস করতেন, সকল বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করতেন, সকল তরুণকে জিজ্ঞেস করতেন, সকল বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করতেন, সকল

৭০৪। যারকানি রহ. তার مختصر গ্রন্থে তাকে যইফ হিসেবে অভিহিত করেছেন, ৬৫৪

[৩৮৯] ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত শক্তিশালী মারফু হাদিসের একাংশ, যা আবু দাউদ রহ. নিজগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : ৩৩৭। ইবনে মাজা রহ.-ও তার সুনানে এটি উল্লেখ করেছেন : ৫৭২

[৩৯০] جامع ابن عبد البر : ৫৪৪। آداب الفقيه والمتفقه : ৭০০। তাখরিজ দেখুন : المقاصد الحسنة : ১৪০। أدب الدنيا والدين : ১১৭

[৩৯১] تعليم المتعلم : ৭৪-৭৫

বয়োবৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করতেন; এমনকি নববধূদেরও জিজ্ঞেস করতে চাইতেন (কিন্তু লজ্জার কারণে করতেন না)।

ইবনে শিহাব যুহরি রহ.-এর এ সাধনা ও অনুসন্ধিৎসা দ্বারা আমরা মুজাকারা ও মুসাআলার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। কারণ, এ ঘটনায় মুসাআলা তথা পরস্পর জিজ্ঞেস করার কথাই বলা হয়েছে। আর এটাই হলো মুজাকারা বা পর্যালোচনার প্রকৃত অর্থ (আল্লাহই ভালো জানেন)।

আর স্বাভাবিকভাবেই তালিবুল ইলমের প্রশ্নগুলো হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অজানা কিছু সম্পর্কে। ঠিক মূর্খ ব্যক্তির সাবলীল প্রশ্ন করার মতো। অথবা প্রশ্ন হবে শরয়ি কোনো বিষয়ে অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য। অথবা কোনো দুর্বোধ্য বাক্য বোঝার জন্য। এগুলোই হলো যুক্তিসংগত এবং প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুর প্রশ্ন।

তবে কিছু কিছু প্রশ্ন আছে, যা শিক্ষার্থী নিজের বা অন্যের মনে সৃষ্টি হওয়া সন্দেহ নিরসন করার জন্যে করে থাকে। এসব সন্দেহ মনের ভেতরে রাখলে বরং শিক্ষার্থীদেরই ক্ষতি হবে। এর জন্য দ্রুত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শায়খের শরণাপন্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে নেবে। মনের এ জল্পনা দূর করতে সচেষ্ট হবে। কোনো ইলমি দলিলভিত্তিক সমাধান বা সুচিকিৎসা গ্রহণ ছাড়া এমনিতেই পাশ কেটে যাওয়া তালিবুল ইলমের জন্য কোনোভাবেই বৈধ নয়।

আর কোনো দলিলের উদ্দেশ্য যদি অস্পষ্ট থাকে, সেটাকেই 'সন্দেহ' হিসেবে অভিহিত করা হবে। কারণ, সেখানে হকের সঙ্গে বাতিলের সংমিশ্রণ হয়ে গেছে। আর তা নিরসন করতে দরকার শক্তিশালী বর্ণনা এবং দলিলভিত্তিক উপস্থাপন।

এ ক্ষেত্রে শিক্ষক ও মুরুব্বিকে অবশ্যই তার কিশোর ছাত্রদের সঙ্গে আচরণের বিষয়ে এবং তাদের মাসআলা বোঝানোর বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যেন তাদের প্রশ্নের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে অবগত হয়ে এর যথাযথ উত্তর বের করা তার জন্যে সহজ হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ.-ও সন্দেহ-সংশয়, তার প্রভাব, ক্ষতি এবং তা নিরসনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এর মধ্যে নিম্নোক্তটি আমার কাছে খুবই মূল্যবান উপদেশ মনে হয়েছে (তবে সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ); তিনি বলেন–

'আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-কে একের পর এক প্রশ্ন করতাম। মনে যা আসত, তা-ই তাকে বলে দিতাম। জিজ্ঞেস করতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, সকল কুমন্ত্রণা আর সংশয় গ্রহণের ব্যাপারে

অন্তরকে স্পঞ্জ বানিয়ো না; যা-ই তাকে স্পর্শ করে তা-ই সে গ্রহণ করে নেয়, এরপর চিপ দিলে সে তাই বের করে দেয়। বরং হৃদয়কে করে শক্ত ও সুকঠিন কাচের মতো, তার ওপর দিয়ে সব সন্দেহ-সংশয় অতিক্রম করে যাবে, কখনো ভেতরে ঢুকতে পারবে না। ফলে তা সব সময় স্বচ্ছ ও নির্মল দেখা যাবে। আর সব সময় সন্দেহের পেছনে পড়ে থাকলে একপর্যায়ে তোমার হৃদয় হয়ে যাবে সন্দেহের আস্তানা।

তিনি বলেন, সন্দেহ-সংশয় দূর করার ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিলাম তার এ উপদেশটি দ্বারাই। আর আল্লাহ তাআলাই সঠিক পথের দিশা দানকারী।'[৩৯২]

* * * *

তৃতীয় অধ্যায়

একজন আদর্শ উস্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রথম পথনির্দেশ

উস্তাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ

দ্বিতীয় পথনির্দেশ

ইলমি উপকারী বিষয়গুলো মুখস্থ করার প্রতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান

তৃতীয় পথনির্দেশ

শিক্ষাপ্রদানে ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন

চতুর্থ পথনির্দেশ

ভাষাকে বিশুদ্ধ ও আকর্ষণীয় করতে জোর পদক্ষেপ গ্রহণ

পঞ্চম পথনির্দেশ

শব্দের আভিধানিক অর্থ নিয়ে সূক্ষ্ম গবেষণার গুরুত্ব

ষষ্ঠ পথনির্দেশ

'জানি না' কথাটির ওপর শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করানো

সপ্তম পথনির্দেশ

শিক্ষার্থীদের ওপর গভীর পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দান

অষ্টম পথনির্দেশ

যে কোনো গবেষণায় ন্যায়পন্থা অবলম্বনের তাগিদ

নবম পথনির্দেশ

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের গৃহীত মতের অনুসরণ এবং দুর্লভ ও ব্যতিক্রমধর্মী জ্ঞান বর্জন

দশম পথনির্দেশ

প্রত্যেক দেশের স্থানীয় আলেমদের ইলম ও আমলের স্বীকৃতি দান

একাদশ পথনির্দেশ

স্বতঃসিদ্ধ আহকাম ও আখবার অন্বেষণের গুরুত্ব

দ্বাদশ পথনির্দেশ

প্রতিটি বর্ণনার উৎস ও যোগসূত্র যাচাইয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করানো

ত্রয়োদশ পথনির্দেশ

ফতোয়ার জন্য বিজ্ঞ প্রজন্ম তৈরি এবং দক্ষ উস্তাদের মাধ্যমে তাদের তত্ত্বাবধান

চতুর্দশ পথনির্দেশ

সমসাময়িক রীতি-সংস্কৃতিকে গুরুত্বদান

পঞ্চদশ পথনির্দেশ

তালিবুল ইলমের মধ্যে সাহিত্যসমালোচনার যোগ্যতা তৈরি

তৃতীয় অধ্যায়

আদর্শ উস্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উস্তাদ ও মুরুব্বির দায়িত্ব

আল্লাহভীরু আলেম ও মুরুব্বিগণ বলে থাকেন, 'ফাসেক হলো আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীদের হারানো মানিক।' একই কথা প্রযোজ্য আলেম শিক্ষকের ব্যাপারেও। 'জাহেল ব্যক্তি হলো প্রতিটি আলেম শিক্ষকের হারানো মানিক।' জাহেলদের সে খুঁজে বের করবে। আর যদি ওই জাহেল ব্যক্তিটি হয় তার ছাত্র। তার সান্নিধ্যে হকের সন্ধানে আসা তালিবুল ইলম, তবে আবশ্যক হলো সাদর সম্ভাষণ, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য দিয়ে এবং সুস্বাগতম জানিয়ে তাকে বরণ করে নেওয়া। তাকে তার মূল্যবান সময় ও ইলম দিয়ে ভরপুর করে তোলা। ইমাম আবু হানিফা রহ. তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আবু ইউসুফকে দেওয়া দীর্ঘ উপদেশের মধ্যে বলেন, 'শিক্ষার্থীদের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সাথে বরণ করে নাও। তাদের তোমার স্নেহাস্পদ সন্তানের মতো আপন করে নাও। যেন তারা সেই আদর-সোহাগে অনুপ্রাণিত হয়ে ইলমের অনুরাগী হয়।'[৩৯৩]

প্রতিটি আলেমের উচিত তালিবুল ইলমদের ব্যাপারে এ কথা চিন্তা করা যে, তারা তো আল্লাহর কৃপা ও তাঁর দান। এ জমানায় ইলমে দ্বীন শেখার জন্য তাদের আল্লাহ মনোনীত করেছেন; অথচ প্রায় সব মানুষ বর্তমানে ইলমে দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। নবুয়তের উত্তরাধিকার প্রদানের জন্যে এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তা পূর্ণ আমানতের সাথে তুলে দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তাদের নির্বাচিত করেছেন।

আল-মাগরিবুল আরাবির বিশিষ্ট ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন : 'যতদিন পর্যন্ত এমন একজন বাকি থাকবে যার থেকে আরেকজন শিক্ষাগ্রহণ করে, ততদিন পর্যন্ত মানুষের মাঝে কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে।'[৩৯৪]

যতই মানুষ হীনম্মন্যতায় পড়ুক, যতই তাদের ইচ্ছা ও অভিলাষ দুর্বল হয়ে পড়ুক যতই ইলম প্রতিকূল অবস্থায় পড়ুক–এ দ্বীনি ইলমের সিলসিলা কেয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

---

[৩৯৩] مناقب الموفق المكي তে সেটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে : ৩৭৩

[৩৯৪] নিজগ্রন্থ جامع بيان العلم -এর ভূমিকার শেষের দিকে : ১/২১

ইমাম বদর বিন জামাআ রহ. বলেন, জেনে রাখা উচিত, একজন সত্যান্বেষী তালিবুল ইলম উস্তাদের জন্য দুনিয়া-আখেরাতের অমূল্য সম্পদ। তার সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান বস্তু। তার সবচেয়ে নিকটের আত্মীয়। এ কারণেই পূর্বসূরি উলামায়ে কেরাম কষ্ট ও পরিশ্রম করে সব সময় এমন তালিবুল ইলমের সন্ধানে থাকতেন, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে ইহকালে এবং পরকালে। কোনো আলেমের জন্য যদি কেবল একজন তালিবুল ইলম থাকে, যার ইলম, আমল, নির্দেশনা ও পথপ্রদর্শন দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়; তবে এমন একজনই আল্লাহর দরবারে তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, তার শেখানো জ্ঞান শুনে যত মানুষ উপকৃত হবে, আমল করবে; এর পূর্ণ সাওয়াব ও প্রতিদান তার নেকির ভান্ডারেও যোগ হবে।'[৩৯৫]

এরপর আল্লাহ তাআলা যখন কোনো আলিমের কাছে এ রকম ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ তালিবুল ইলম প্রেরণ করে তার ওপর কৃপা করেন, তখন তার জন্য ওয়াজিব হলো তালিবুল ইলমের সাথে এমন আচরণ করা যা ইমাম গাযালি রহ. কাজি ইবনুল আরাবি রহ.-কে পেয়ে করেছিলেন। কাজি ইবনুল আরাবি তার বিবরণ দিতে গিয়ে দীর্ঘ আলোচনা উল্লেখ করেছেন। এর সামান্য আমি এখানে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন–

'মনে হচ্ছিল তিনি (ইমাম গাযালি) আমার জন্যে সবকিছু ছেড়ে একেবারে ফারেগ হয়ে গেছেন। আমাকে আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পূর্ণ সচেষ্ট হন। আমাকে তাঁর ঘরে ঢোকার অনুমতি দিয়ে দেন। ফলে আমি সকাল-সন্ধ্যা বা রাতের যে কোনো সময়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতাম। তিনি তাঁর স্বাভাবিক পোশাকেই থাকতেন।' অর্থাৎ পুরোনো কাপড় নিয়েই দরস দিতেন। এ ঘটনার দ্বারা ইমাম গাযালি রহ.-এর মুক্তমন ও প্রশস্ত হৃদয়ী হওয়ার ইঙ্গিত মেলে।

মূলত এ ব্যাপারে যতগুলো ঘটনা তাদের এবং তাদের মতো অন্যদের জীবনে ঘটেছে, তা শুধু দুটি কারণেই সম্ভব হয়েছে–

প্রথম কারণ : তারা অনুধাবন করতেন যে, এই তালিবুল ইলমগণ হচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতিনিধি।

দ্বিতীয় কারণ : তারা মনে করতেন এবং শিক্ষার্থীদেরও অনুভূতি দিতেন যে, তিনি হচ্ছেন তাদের জন্য দয়াশীল পিতার মতো, যিনি সব সময় তাদের উপদেশ দেবেন। প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও এবং দেখাশোনার ক্ষেত্রেও; সংশোধনের ক্ষেত্রেও এবং তাকে উন্নত চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও।

---

[৩৯৫] التذكرة : ٦٣

তবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যতগুলো আদেশ-নিষেধ জারি হবে, নিশ্চিতভাবেই তা শিক্ষক নিজের মধ্যে আগে বাস্তবায়ন করবেন এবং নিজে এ চরিত্রে চরিত্রবান হবেন।

উস্তাদ ও মুরুব্বির প্রভাব

উস্তাদ হলেন চারিত্রিক সৌন্দর্যের প্রতীক। উম্মতের প্রতিটি সদস্যের আত্মার সংশোধনকারী। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক। বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষসাধক। আর তালিবুল ইলমগণ হচ্ছেন তাঁর অনুসারী এবং তাঁর বাহিনী। উস্তাদ হলেন তাদের মন ও মস্তিষ্কে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী। আর তা হবে ঠিক সেই সময়, যখন উস্তাদ নিজ জিম্মাদারি ও দায়িত্ব সম্পর্কে হবেন পূর্ণ সচেতন। কর্তব্য আদায়ে হবেন পূর্ণ নিষ্ঠাবান।

বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক ও সুলেখক, আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব আমাদের শায়খ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. প্রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আগে 'কীভাবে মুসলিমবিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া যায়' শিরোনামে একটি বক্তব্য দিয়েছিলেন। যা সৌদি আরবের 'দারুল ইফতা' প্রকাশনীর তত্ত্বাবধানে বই আকারে ছেপে আসছে। ওই বক্তৃতার শেষের দিকে আদর্শ শিক্ষকের প্রভাব এবং উক্ত পদে যোগ্য লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তিনি খুব সুন্দর করে তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ কোনো আহামরি বিষয় নয়; যেমনটি অনেকেই ভেবে থাকেন। এ নিয়োগের ভিত্তি কেবল ইলম ও শিক্ষাগত যোগ্যতাই নয়; বরং শিক্ষকের মধ্যে ইলমের পাশাপাশি থাকতে হবে উৎকৃষ্ট ও উন্নত চরিত্র। থাকতে হবে লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলার দুরন্ত বাসনা। তাকে হতে হবে ঈমান-আকিদার বলে বলীয়ান। থাকতে হবে তার মাঝে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের যোগ্যতা। তার এই ঈমান ও আকিদা ছড়িয়ে পড়বে নিজ দেহসত্তায়। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। গোষ্ঠীগত বা সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা থেকে বেরিয়ে তাকে হতে হবে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তাকে হতে হবে এমন দায়ী, যে কখনো বিরক্ত হয় না; বিব্রত বোধ করে না; থেমে যায় না। এমন মুমিন যে কখনো সংশয়ে পতিত হয় না। এমনই হতে হবে একজন দ্বীনি ইলমের শিক্ষক। এমন লোকদের মাধ্যমেই পুলকিত হবে দ্বীনি শিক্ষাঙ্গন। সহজ ও সফলভাবে পৌঁছতে পারবে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।'

'উম্মতের ওপর ইলম ও মারিফাত থেকে বড়ো আমানত আমার জানা নেই। তাতে অবহেলার কারণেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে আমাদের। উম্মতে মুসলিমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-জীবনে ইলমের চেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টিকারী অন্য

কিছু আমার চোখে ভাসছে না। দ্বীনি ইলমের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের কারণে মুসলিম জাতির আজ অবক্ষয়, অধঃপতন; চারিত্রিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং তাদের নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংসের সম্মুখীন। যার ফলে দিন দিন বাড়ছে নাস্তিকতা ও ধর্মবিদ্রোহীদের অপতৎপরতা। অপরদিকে এই ইলমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং যথাযথভাবে তার প্রচার-প্রসারের দ্বারাই মানবাত্মাকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া এবং চিরন্তন সুখের দিকে তাদের পথপ্রদর্শন করা সম্ভব; উম্মতে মুসলিমাকে নতুন করে জাগিয়ে তাকে বিশ্বনেতৃত্বের যোগ্য করে তোলা সম্ভব। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করে আবারও বিশ্ববাসীর ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।'

'সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা কোনোভাবেই বীরত্ব ও মর্যাদার প্রতীক হতে পারে না। বরং মর্যাদা, বীরত্ব এবং উচ্চাভিলাষ তো হলো উম্মতকে এ অন্ধকার গর্ত থেকে উদ্ধার করা। মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণে অংশীদারত্বের স্বাক্ষর রাখা। এমন মজবুত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা, যার ওপর উন্নত ও সুন্দর একটি ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।'

এ দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে বিচারক ও প্রশাসকদের সাথে আলেমগণও অন্তর্ভুক্ত :

﴿وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

অর্থ : '(হে মুমিনগণ, তোমরা নির্দেশ মান্য করো...) তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের'। (সুরা নিসা : ৫৯)

কারণ, আলেমগণ তাদের মুখের দ্বারা এবং শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতার দ্বারা সকল প্রকার অনিষ্টকে প্রতিহত করবে। উভয় দায়িত্বই গুরুত্বপূর্ণ।

আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা অনেক দীর্ঘ, অনেক বিস্তর। তাদের অবহিত করতে এবং দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে পরের 'পথনির্দেশে' সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করতে চাচ্ছি।

* * * *

প্রথম পথনির্দেশ

উস্তাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ

সেসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে :

১. শিক্ষা ও উপদেশদানে তিনি হবেন মুখলিস বা ন্যায়নিষ্ঠ।

২. শিক্ষা দেওয়া বিষয়গুলো তাদের মাঝে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ এবং সেমতে তাদের গড়ে তুলবেন।

নিম্নোক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে রজব রহ. এ দুটো বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন,

إن العلماء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا ، إنما ورَّثوا العلم.

অর্থ : 'নিশ্চয় আলেমগণ উত্তরাধিকার হিসেবে কোনো দিনার-দিরহাম (টাকা-পয়সা) রেখে যান না; তারা তো রেখে যান ইলম।'

হাদিসের প্রথম অংশ হলো :

من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا.

অর্থ : 'যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষেণের লক্ষ্যে পথ পাড়ি দেয়..।'

হাফেজ ইবনে রজব রহ. বলেন : এখানে দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত এসেছে,

প্রথম বিষয় : আলেমগণই একমাত্র রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। একজন আলেম যেহেতু শ্রেষ্ঠ নবির উত্তরাধিকার লাভ করেছেন, তাই তার উচিত হবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পদটুকু যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তিনিও তা সেভাবে ব্যবহার করবেন। অন্যদের তিনি ইলমের উত্তরাধিকারীরূপে গড়ে তুলবেন। আর এই উত্তরাধিকারীরূপে গড়ে তোলা এবং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে এই সুমহান ও চিরপবিত্র আমানত তুলে দেওয়ার বিষয়টি শুধু তালিম-তাআল্লুম এবং শিক্ষা-দীক্ষার পথ ধরেই সম্ভব। সহিহ হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত–

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

অর্থ : 'মানুষ মারা গেলে তিনটি আমল ছাড়া তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় : ১. সাদকায়ে জারিয়া, ২. মানুষ উপকৃত হয় এমন ইলম, ৩. অথবা নেক সন্তান, যে তার জন্যে দোয়া করতে থাকে।'[৩৯৬]

---

[৩৯৬] মুসলিম : ৩/১২৫৫

আর তাই একজন আলেম যখন অপরকে এ ইলম শেখায়, তখন উপকারী ইলমের পাশাপাশি সাদকায়ে জারিয়াও সে রেখে যায়। কারণ, ইলম শিক্ষাদান হলো সর্বোত্তম সাদকা। আর তালিবুল ইলম তো সন্তানতুল্য; যারা মৃত্যুর পরও উস্তাদের জন্যে দোয়া করে থাকে। এভাবে একজন আলিম ইলম শিক্ষাদানের মাধ্যমে হাদিসে উল্লিখিত তিনটি ফায়দাই লুফে নেয়।

দ্বিতীয় বিষয় : নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পার্থিব কোনো বস্তু বা অর্থ-সম্পদ উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি। তাই একজন আলিমেরও দুনিয়াবি কোনো বস্তু অথবা প্রাচুর্যের পেছনে নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও সময় ব্যয় না করা উচিত। এভাবেই নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণের পাশাপাশি অল্পেতুষ্টি ও তপশ্চর্যার সুমহান সুন্নাতের ওপরও আমল হয়ে যাবে তার।'

এরপর হাফেজ ইবনে রজব রহ. এ পরিপ্রেক্ষিতে যথারীতি পূর্বসূরিদের কিছু ঘটনা উল্লেখ করেন,

৩. এ অনুভূতির পাশাপাশি আলিমকে হতে হবে আদর্শ, সদা সঙ্গী হবে যার একনিষ্ঠতা। নিজের কথা ও কাজকে সে ইখলাস ও ন্যায়নিষ্ঠার আলোকে সব সময় পর্যবেক্ষণ করবে। সর্বজ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে। এখানে আলোচিত সেনাপতি মাসলামা বিন আবদুল মালিকের নেতৃত্বে কোনো একযুদ্ধের ময়দানে সেই ফটক উন্মোচনকারীর ঘটনাও স্মরণ করা যেতে পারে।

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবায় মাইমুন ইবনে আবি শাবিব রহ. (৮৩ হি.) থেকে বর্ণিত।[৩৯৭] তিনি বলেন, একবার আমি একটি কিতাব লিখতে বসি। এরপর এমন একটি বিষয় আমার স্মরণ হয়, যা উল্লেখ করলে কিতাবের সৌন্দর্য বেড়ে যাবে; তবে আমি তখন মিথ্যাবাদী হব। আর না লিখলে কিতাবে কিছু অসংগতি থেকে যাবে, তবে আমি সত্যবাদী থেকে যাব। একবার ভাবছিলাম লিখেই ফেলি। আবার ভাবলাম, না থাক দরকার নেই। সবশেষে তা না লেখার মনস্থ করি। তিনি বলেন : এরপর ঘরের দিক থেকে (খুব সম্ভবত তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন বায়তুল্লাহর দিক থেকে) একটি আওয়াজ আসে :

﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

অর্থ : 'আল্লাহ তাআলা মুমিনদের মজবুত বাক্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।' (সুরা ইবরাহিম : ২৭)

---

[৩৯৭] ৫৪৪৫

বিশিষ্ট ইমাম আল-বাবারতি রহ. তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ العناية على الهداية -এর ভূমিকায় এবং ইমাম আইনি রহ. البناية في شرح الهداية-এর ভূমিকায় বলেন[৩৯৮] : বর্ণিত আছে যে, গ্রন্থকার আল-হিদায়া গ্রন্থটি লিখতে সময় নেন দীর্ঘ তেরো বছর। ওই তেরোটি বছর তিনি একাধারে রোজা পালন করেন। চেষ্টা করেন, তার এ তপস্যার কথা যেন কেউ না জানে। খাদেম খানা নিয়ে এলে বলতেন, তা রেখে যাও! চলে গেলে তা তালিবুল ইলম বা অন্য কাউকে দিয়ে দিতেন। এ সীমাহীন পরিশ্রম এবং তাকওয়া অবলম্বনের ফলেই তাঁর কিতাবটি আলেমদের মধ্যে বিপুল গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। দরস ও তালিমের মজলিশে বসা অবস্থায় উস্তাদ ও মুরুব্বিকে ঠিক সে রকম ধারণা করতে হবে, যে রকম ইমাম মালেক রহ.-এর বিশিষ্ট ছাত্র এবং খলিফা ইমাম আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম আল-উতাকি রহ. করতেন।

ترتيب المدارك গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : যতক্ষণ তিনি ছাত্রদের থেকে শুনতেন, ততক্ষণ তিনি তাঁর আঙুল ওপরের দিকে উঠিয়ে রেখে আল্লাহর কাছে তাওফিক ও সালামাত কামনা করতেন।'

এখানে তাওফিক বলতে শিক্ষাদান ও পাঠপর্যালোচনার বিষয়ে সামর্থ্য অর্জন এবং সালামাত বলতে দরসের কোনো বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা থেকে নিরাপত্তা ও নিষ্কৃতি লাভ উদ্দেশ্য। কারণ, দরসের সময় তিনি হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতিনিধি। আলিম তার শিক্ষাদান কাজকে কস্মিনকালেও অন্যসব পেশার মতো মনে করবে না!! বরং এ তো হলো মহান ইবাদাত।

ইমাম নববি রহ. বলেন, জেনে রাখা উচিত, তালিমই হলো দ্বীনের মূল ভিত্তি। এর দ্বারাই ইলম বিকৃতিসাধন থেকে রক্ষা পাবে। তালিম হলো দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ। সুমহান ইবাদাত। সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ফরজে কিফায়া।'

তার বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বিষয় তিনি কুরআন-হাদিস দিয়ে প্রমাণ করে ছাড়েন।

৪. তালিমের তীব্র অনুভূতির পাশাপাশি আলিমকে মনে মনে এ ধারণা করতে হবে যে, তিনি হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ হতে প্রতিনিধিত্বের আসনে সমাসীন। সব সময় তিনি আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়তকে প্রচার করে যাবেন। নবির সুন্নাতকে জিন্দা করতে থাকবেন। কারণ, ফতোয়া প্রদানের সময় তিনি তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই ফতোয়া দিয়ে থাকেন। প্রথম অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

---

[৩৯৮] বাবারতি : ১/৮ এবং আইনি : ১/৫১

৫. এ অনুভূতির পাশাপাশি তার অন্তরে বদ্ধমূল হতে হবে যে, তিনি হলেন তালিবুল ইলমের আদর্শস্থল। প্রতিটি মুহূর্তে তার প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপ এ কথা জানান দেবে যে, এটি ঠিক, সেটি বেঠিক; এটি বৈধ, সেটি অবৈধ। কথা, কাজ এবং শিক্ষাদানকালে গভীর আত্মপর্যবেক্ষণের দ্বারাই শুধু এটি সম্ভব।

সব সময় তাকে উসামা বিন যাইদ রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি স্মরণ রাখতে হবে। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তার পাকস্থলি ও নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে পৃথক হয়ে যাবে। আর সে তার নাড়িভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে ঠিক যেমন গাধা চাকাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামবাসী তার কাছে একত্র হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, আরে কী হলো তোমার–তুমি না সৎ কাজের আদেশ করতে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে?! সে বলবে, হ্যাঁ করতাম; তবে অন্যদের সৎকাজের আদেশ করে নিজে তা পালন করতাম না। আর অন্যদের অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে নিজে তাতে লিপ্ত হতাম।'[৩৯৯]

৬. ব্যাপকভাবে মানুষের কাছে দ্বীন পৌঁছানো এবং বিশেষভাবে তালিবুল ইলমদের উপকৃত করার বিষয়ে সব সময় আবু যর গিফারি রা.-কে ইমাম ও আদর্শ হিসেবে মনে করতে হবে। আবু যর গিফারি রা. বলেন, তোমরা যদি আমার গলায় ধারালো ছুরি রাখো। আর তখনো যদি আমার মনে হয় যে, আমাকে হত্যা করার আগে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শোনা একটি কথা আমি প্রচার (বাস্তবায়ন) করার ক্ষমতা রাখি; তবে অবশ্যই আমি তা বাস্তবায়ন করব।'[৪০০]

ইবনে আবিল আওয়াম রহ. ইমাম কাজি আবু ইউসুফ রহ. থেকে তাঁর কিছু ছাত্রদের উদ্দেশে বলা একটি উক্তি বর্ণনা করেন : আমি যদি আমার অন্তরে যা আছে তা ঢেলে কোনো কিছু অবশিষ্ট না রেখে তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতে পারতাম, তবে আমি তা-ই করতাম।'[৪০১]

ইমাম সুবকি রহ. তার 'তাবাকাত' গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ রহ. থেকে তার ছাত্র রাবি বিন সুলাইমান আল-মুরাদির উদ্দেশে বলা একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন, 'যদি পারতাম তোমাকে পুরো ইলম খাইয়ে দিতে, তবে আমি তোমাকে তা খাইয়ে দিতাম।'[৪০২]

---

[৩৯৯] বুখারি : ৩২৬৭ মুসলিম : ৪/২২৯০ (৫১)

[৪০০] تعليق البخاري : ১/১৬০

[৪০১] مناقب الإمام أبي يوسف : ৩১২

[৪০২] طبقات السبكي : ২/১৩৪

আসাদ ইবনুল ফুরাত রহ. বলেন, যখনই আমি কোনো সফরের জন্য ইবনুল কাসিম রহ. এর কাছে বিদায় নিতে যেতাম, তখনই তিনি আমাকে বলতেন, 'আমি তোমাকে ওসিয়ত করছি, আল্লাহকে ভয় করো, কুরআনকে আঁকড়ে ধরো এবং ইলমের প্রচার করো!'[৪০৩]

৭. তালিবুল ইলমদের শিক্ষাদান এবং ইলম হতে মানুষের ধারণক্ষমতা ও চাহিদামতো দ্বীন প্রচারে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাবেন। কারণ, তাদের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতার বাইরে কোনোকিছু সরবরাহ করলে তখন হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অপরদিকে তাদের ইলম থেকে উপকৃত করার বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শনও বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং সতর্কতার সাথে কাজ করা উচিত।

৮. শিক্ষকতার ক্ষেত্রে দিন দিন উন্নতি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা। কারণ, যে উস্তাদ একই বিষয় একাধিক বছর সফলতার সাথে পাঠদান করেছেন, নিশ্চয় ওই বিষয়ে তিনি নতুন নতুন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। যার ফলে শিক্ষার্থীদের তিনি বিষয়টি সহজেই বোঝাতে পারবেন, যা নতুন শিক্ষকের বেলায় সম্ভব নয়।

ইমাম আবু হানিফা রহ. উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁর শায়খ ইমাম হাম্মাদ বিন আবু সুলায়মান রহ.-এর সঙ্গে তার প্রথমবার সাক্ষাতের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমি হাম্মাদ বিন আবু সুলায়মানের কাছে আসি। তিনি ছিলেন মর্যাদাপূর্ণ ও সহিষ্ণু আলিম। তিনি নিজেও ভালো বুঝতেন এবং শিক্ষার্থীদেরও ভালো করে বোঝাতেন। আমি তার সান্নিধ্য গ্রহণ করি। সব ধরনের ইলম আমি তার কাছে পেয়ে যাই। এমনকি একদিন তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি আমাকে চুষে ফেলবে হে আবু হানিফা?!'[৪০৪]

৯. উস্তাদের কর্তব্য হলো তার এবং তালিবুল ইলমের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং শ্রদ্ধা ও স্নেহের বন্ধন গড়ে তোলা। যেন আশানুরূপ ফায়দা অর্জিত হয়। উস্তাদের জন্য অর্জিত হবে পুণ্য, প্রতিদান, সাদকায়ে জারিয়া এবং সুখকর স্মৃতি আর ছাত্রদের অর্জিত হবে সীমাহীন ফায়দা ও ইলমি নৈপুণ্য।

১০. সেই শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্কের নির্দশন হলো, কখনো কঠোরতা অবলম্বন না করা। শিক্ষার্থীদের মনোবল ভেঙে না দেওয়া। বরং কথা ও কাজের দ্বারা এবং উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দ্বারা দিন দিন তাদের মনোবল দৃঢ় ও শক্তিশালী করা।

---

[৪০৩] ترتيب المدارك : ১/৬০৯

[৪০৪] مناقب أبي حنيفة : ৫৮

সুসংবাদ দেওয়া যে, তোমরাই উম্মাহর ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের মুসলিম জাতির কান্ডারি। পথপ্রদর্শনকারী বিদগ্ধ আলিমে দ্বীন ইত্যাদি ইত্যাদি..।

ইবনে আবিল আওয়াম হাসান বিন যিয়াদ আল-লুলুঈ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ফিকহের বিষয়ে আমি ইমাম যুফার এবং আবু ইউসুফ উভয়ের কাছে যেতাম। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ছিলেন ইমাম যুফারের চেয়ে বেশি মুক্তমনের অধিকারী। বোঝানোর জ্ঞান ছিল তার প্রখর। প্রথম প্রথম আমি ইমাম যুফারের কাছে গিয়ে তাঁকে দুর্বোধ্য মাসআলাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বলে দিতেন। কিন্তু আমি বুঝতাম না। কয়েকবার বোঝানোর পরও যখন বুঝতে পারতাম না—তখন তিনি বলতেন, ধিক তোমার, তোমাকে দিয়ে কাজ হবে না। কোনো লাভ হবে না। আমার মনে হয় তুমি ফিকহটা আত্মস্থ করতে পারবে না।

তিনি বলেন, এরপর আমি ইমাম আবু ইউসুফের কাছে চলে আসি। তিনিও আমাকে বোঝাতেন। না বুঝলে বলতেন, ধৈর্য ধরো, বুঝে যাবে! তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আগে যেমন ছিল তেমনই? একটুও বোঝোনি? আমি বলতাম, না একটু বুঝেছি! কিছুটা উপলব্ধি হচ্ছে! পুরোপুরি না বুঝতে পারলে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, যত জটিল বিষয় হোক, যতই দুর্বোধ্য হোক, খুব দ্রুতই তা বুঝে আসবে। ধৈর্য ধরো, বুঝতে পারবে!

হাসান বিন যিয়াদ বলেন : আমি ইমাম আবু ইউসুফের ধৈর্য দেখে যারপরনাই অবাক হয়ে যেতাম।'[৪০৫]

হাফেজ আবু তাহের আস-সিলাফি নিজ সনদে ইমাম কুদুরির প্রতি সম্বন্ধ করে বলেন, ইমাম আবু জাফর তাহাবি রহ. শুরুতে মুযানি রহ.-এর কাছে পড়তেন। একদিন মুযানি রহ. তাকে বলেন, আল্লাহর শপথ তুমি কামিয়াব হতে পারবে না! এ কথা শুনে তিনি মন খারাপ করেন। অভিমান করে তার কাছ থেকে চলে এসে আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব অধ্যয়ন করে তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর বিশিষ্ট ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে দরসে বসে যখন দুর্বোধ্য কোনো মাসআলা সমাধান করতেন, তখন বলতেন : আল্লাহ তাআলা শায়খ আবু ইবরাহিম আলমুযানির ওপর রহম করুন; আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন আর আমাকে এই অবস্থায় দেখতেন তবে অবশ্যই তিনি তার শপথের কাফফারা আদায় করতেন।'[৪০৬]

---

[৪০৫] مناقب الإمام أبي حنيفة : ৬৭৩

[৪০৬] معجم السفر : ৫

১১. তালিবুল ইলমদের অন্তরে মহব্বত বা সম্প্রীতি তৈরির অন্যতম উপকরণ হলো, অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ নেওয়া। তার সম্পর্কে অন্যদের জিজ্ঞেস করা। অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া। তাদের প্রতি সৌহার্দ্যের ভাব প্রকাশ করা। অসচ্ছল হলে তাকে আর্থিক সহযোগিতার চেষ্টা করা ইত্যাদি। আর ব্যাপকভাবে একজন পিতা তার সন্তানকে যেভাবে দেখাশোনা করে থাকে, ভাই অপর ভাইকে দেখাশোনা করে থাকে, উস্তাদও ঠিক সেভাবেই তার দেখাশোনা করবেন।

আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরিগণ মেধাবী এবং সম্ভাবনাময় তালিবুল ইলমদের কী রকম গুরুত্ব দিতেন এবং তাদের দেখাশুনা করতেন, তার কিছু নমুনা আমি এখানে তুলে ধরছি :

কাজি মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন হুসাইন বিন মুহাম্মদ বিন আবি ইয়া'লা আল-ফাররা আল-হাম্বালি রহ. বলেন, আমার দাদা হুসাইন বিন মুহাম্মদ বিশিষ্ট ফকিহ আবু বকর আর-রাযির কাছে আবু হানিফার মাযহাব নিয়ে পড়াশোনা করতেন। তিনি আবু বকর আর-রাযিকে ভয় করতেন না। আর প্রশাসক মুতিলিল্লাহ এবং মুয়িযযুদ্দাওলা তাকে বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব করলেও তিনি তা এড়িয়ে যান। আবু বকর আর-রাযির সাথে তার এতটাই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যে, একবার তিনি দীর্ঘ এক শ দিন পর্যন্ত অসুস্থতায় ভোগেন। এর মধ্যে পঞ্চাশ দিনই আবু বকর রাযি তাকে দেখতে আসেন। 'আবদা'র পথ ধরে কারখ এলাকার পশ্চিমাঞ্চল হয়ে পূর্ব দিকের বাবুত্তাক পর্যন্ত আসতেন। এরপর তিনি সুস্থ হয়ে যখন তাঁর দরসের মজলিশে গিয়ে উপস্থিত হন, তখন তাকে দেখে আবু বকর রাযি বলে ওঠেন : 'হে আবু আবদুল্লাহ, তুমি অসুস্থ ছিলে এক শ দিন, এর মধ্যে পঞ্চাশ দিন আমি তোমাকে দেখতে গিয়েছি। আর সেটা আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য কমই বলা চলে।'[৪০৭]

এ সকল পবিত্র আত্মাকে আল্লাহ জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করুন, যাদের অন্তরগুলো আল্লাহ ইসলাম এবং সুন্নাতে রাসুলের ইত্তেবায়ের জন্য পূত-পবিত্র করে দিয়েছিলেন।

কখনো কখনো তালিবুল ইলমের খোঁজ নেওয়ার মধ্যে উস্তাদ ও তালিব উভয়ের জন্যেই সূক্ষ্ম উপকার নিহিত থাকে। ইবরাহিম নাখঈর শাগরিদ মুগিরা বিন মিকসাম আদ-দাবঈর দিকে সম্বন্ধ করে খতিব রহ. বলেন, একদিন মুগিরা ইবরাহিম নাখঈর দরসে বিলম্ব করে এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে মুগিরা, আজ

---

[৪০৭] في طبقاته : ৩/৩৬৪

তোমার দেরি হলো যে? বলেন, আমাদের কাছে আজ একজন শায়খ এসেছিলেন। তিনি হাদিসের বর্ণনাকারী। তার কাছ থেকে আজ আমরা অনেক হাদিস লিপিবদ্ধ করেছি। তা শুনে ইবরাহিম নাখঈ বলেন, আমাদের অধ্যয়নজীবনে আমরা কেবল ওই সব লোকদের থেকেই হাদিস সংগ্রহ করতাম, যারা হাদিসের হালাল-হারামগুলো ভালো করে পার্থক্য করতে পারত। আর আজ তুমি অনায়াসে হাতের কাছে কোথাকার এমন অজ্ঞাত শায়খ পেয়ে গেলে যে হালাল-হারামের পার্থক্য বোঝে না এবং তা উপলব্ধিও করতে পারে না।

শায়খের এ কথাগুলো তার মনে তীব্র রেখাপাত করে। পরবর্তীকালে তার এ কথাগুলোকে হাদিস গ্রহণের বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে তিনি গ্রহণ করে নেন এবং আজীবন এর ওপর আমলে সচেষ্ট থাকেন।

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া তো নবিজির সুন্নাত। এ ছাড়া আবু ইউসুফ রহ.-এর সাথে শায়খ আবু হানিফার আচরণ এবং তাকে আর্থিক সহায়তা দানের বিষয়টিও এখানে উল্লেখযোগ্য।

ইমাম সাইমারি রহ. নিজ সনদে আবু ইউসুফ রহ.-এর দিকে সম্বন্ধ করে, তিনি বলেন : আমি তখন হাদিস ও ফিকহের ছাত্র ছিলাম। আর্থিকভাবে ছিলাম অসচ্ছল। একদিন আমি আমার শায়খ আবু হানিফা রহ.-এর কাছে বসা ছিলাম; এমনসময় আমার আব্বু আমার কাছে এলে আমি তার সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসি। আব্বু বললেন, শোনো, আবু হানিফার দরসের দিকে আর কখনো পা বাড়াবে না! কারণ, আবু হানিফার রুটি হলো ভাজা (উন্নত)। আর তোমার নেই কোনো খাদ্য, নেই কোনো জীবিকা। আব্বুর মুখে এ কথা শুনে ইলম তলবে আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। পুরোপুরি ইলম অন্বেষণ ত্যাগ করে আব্বুর পরামর্শমতো চলতে থাকি। এদিকে আবু হানিফা রহ. আমার খোঁজ নেন। আমার ব্যাপারে সাথিদের জিজ্ঞেস করেন। আমি ছিলাম তাঁর মজলিশের নিয়মিত ছাত্র। তাঁর এ খোঁজ নেওয়ার সংবাদ শুনে আমি পুনরায় মজলিশে আসার সংকল্প করি। প্রথম দিন দরসে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কিসে তোমাকে ব্যস্ত করে দিয়েছে? আমি বলি, জীবিকা উপার্জন আর পিতার আনুগত্য। এরপর আমি দরসে বসে পড়ি। দরস শেষে সবাই যখন উঠে যায়, তখন তিনি আমার দিকে একটি থলে এগিয়ে দিয়ে বলেন, এগুলো নিয়ে খরচ করতে থাকো। থলেটি খুলে দেখি তাতে এক শ দিরহাম। তিনি আমাকে বলেন, দরস বর্জন করো না! এগুলো শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানাবে। এরপর নিয়মিত আমি দরসে উপস্থিত হতে থাকি। কিছুদিন পর তিনি আমাকে আরও এক শ দিরহাম দেন। আবারও প্রতিশ্রুতি নেন, শেষ হয়ে গেলে জানাবে। আর আমি লজ্জায় তাকে এ

ব্যাপারে কিছু বলতাম না। অর্থ শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে অবহিত করতাম না। কীভাবে তিনি যেন তা বুঝে ফেলতেন। শেষ পর্যন্ত একদিন আমি সচ্ছল হয়ে মোটামুটি অর্থবিত্তের মালিক হয়ে যাই।[৪০৮]

বিশিষ্ট ইমাম আসাদ বিন ফুরাত রহ.-এর ইরাক সফর এবং ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ-শাইবানির সাথে তাঁর সাক্ষাতের ঘটনাটিও শিক্ষণীয়। তিনি বলেন, 'একদিন ইমাম মুহাম্মদ দেখেন পথিক মুসাফিরদের জন্য বরাদ্দকৃত পানি পান করছি আমি। তিনি বলেন, এই পানি তুমি পান করছ? আমি বলি, আমি তো মুসাফিরই! এদিন রাতেই তিনি আমার কাছে এক শ দিরহাম পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, এখন থেকে তোমাকে যেন আর মুসাফিরের মতো না দেখি। এরপর যখন তিনি আফ্রিকার দিকে ভ্রমণের ইচ্ছা করেন, তখন তার সঙ্গে অর্থকড়ি বলতে কিছুই ছিল না। বিষয়টি তিনি তার শায়খ মুহাম্মদ বিন হাসান রহ.-কে অবহিত করলে তিনি বলেন, অচিরেই তোমার বিষয়টি নিয়ে আমি প্রশাসকের সঙ্গে বসব। এরপর তিনি গিয়ে প্রশাসককে তার বিষয়ে অবহিত করলে আসাদ বিন ফুরাতের জন্য তিনি দশ হাজার দিরহাম অনুদান মঞ্জুর করেন।[৪০৯]

তালিবুল ইলমদের দেখাশোনা ও খোঁজ নেওয়ার বিষয়ে ছাত্র কাসির বিন ইবনুল মুত্তালিব ইবনুল ওয়াদাআর সাথে বিখ্যাত তাবেঈ সাইদ বিন মুসাইয়াব রহ.-এর প্রসিদ্ধ ঘটনাটিও উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাসির ইবনুল মুত্তালিব বলেন, আমি সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের দরসের নিয়মিত ছাত্র ছিলাম। একবার আমাকে তিনি কয়েক দিন দরসে অনুপস্থিত দেখেন। পুনরায় আমি দরসে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোথায় ছিলে তুমি? আমি বলি, আমার স্ত্রীর ইন্তেকাল হওয়ায় কিছুদিন বিলম্ব হয়ে গেছে আমার। তিনি বলেন, তুমি আমাদের জানাওনি কেন? তবে তো আমরাও তার জানাযায় শরিক হতাম। দরস শেষে আমি উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে ডেকে বলেন, তুমি কি নতুন কোনো স্ত্রীর সন্ধান করেছ? আমি বলি, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন—কে বিয়ে দেবে তার মেয়েকে আমার কাছে; আমি তো দু-দিরহাম বা তিন দিরহামেরও মালিক নই! সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন, আমি দেব!! আমি বলি, আপনি কি সত্যিই বিয়ে দেবেন?! বলেন, হ্যাঁ..! এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা পাঠ এবং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ

---

[৪০৮] أخبار أبي حنيفة : ৯২ খতিব রহ.-ও নিজ ইতিহাসগ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন : ১৬/৩৬

[৪০৯] ترتيب المدارك : ১/৬১০

করেন। তারপর ওই দুই কি তিন দিরহাম মহর ধার্য করেই তিনি তাঁর মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দেন।

তিনি বর্ণনা করেন : এরপর আমি তার কাছ থেকে উঠে আসি। আনন্দের আতিশয্যে কী যে করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ঘরে গিয়ে কার কাছে টাকা ধার করব, কী কী অনুষ্ঠান করব এসব নিয়ে চিন্তা করতে থাকি। মাগরিবের নামাজ শেষে ঘরে ফিরে বিশ্রাম করতে থাকি। সেদিন রোজা রাখার ফলে আমার সামনে ইফতার নিয়ে আসা হয়। ইফতারের আইটেম ছিল রুটি আর তেল। এমন সময় দরজায় কে যেন নক করতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করি, কে? উত্তর আসে, সাইদ! এরপর আমি সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব ছাড়া এ নামে যতজনকে চিনি, সবার ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকি–কে আসতে পারে এ অসময়ে?! কারণ, চল্লিশ বছর পর্যন্ত সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবকে আমি ঘর ও মসজিদের বাইরে কোথাও দেখিনি। গিয়ে দরজা খুলে দেখি, সত্যিই সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব দাঁড়ানো। আমি ভাবি, হয়তো অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আমাকে তা জানাতে এসেছেন। আমি বলি, হে আবু মুহাম্মদ, সংবাদ পাঠালেই তো আমি নিজে আপনার কাছে চলে আসতাম! তিনি বলেন, তোমার কাছে আসাটাই আমার বেশি দরকার ছিল।

আমি বলি, কী করতে পারি বলুন! সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেন, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে তুমি একাকী ছিলে। আজ নতুন করে বিয়ে করেছ। বিবাহিত স্বামী ঘরে একা রাত যাপন করবে, কিছুতেই তা আমার পছন্দ হয়নি। তাই, এই নাও তোমার স্ত্রী।' তাঁর কন্যা ছিল তাঁর পেছনেই দাঁড়ানো। লম্বা আর সুডৌল দেহ তার। হাত ধরে তাকে আমার ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি চলে যান। নববধূ একাকী নিদারুণ লজ্জা পেয়ে তার মস্তক অবনত করে রাখে। দরজা আটকে দিয়ে আমি তাকে ওই শুকনো রুটি আর তেলযুক্ত প্লেটের দিকে নিয়ে আসি। ওই খাবারটুকু আমি বাতির ছায়ায় সরিয়ে দিই, যেন সে তা দেখতে না পায়। এরপর ঘরের ছাদে উঠে প্রতিবেশীদের ডাকতে থাকি। তারা আমার কাছে এসে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে তোমার? বলি, আরে তোমরা তো জানো না–সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব তার মেয়েকে আজ আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। এইমাত্র তিনি তার মেয়েকে আমার কাছে দিয়ে গেছেন। তারা অবাক হয়ে বলতে থাকে, কী.. সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব তার কন্যাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন!! আমি বলি, হ্যাঁ। এই তো তাঁর কন্যা এখন আমার ঘরেই আছে। এরপর মহিলারা নববধূকে দেখতে আমার ঘরে ভিড় করতে থাকে। মা সংবাদ শুনে আমার

কাছে ছুটে এসে বলতে থাকেন, আগামী তিন দিন তুমি তোমার স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। এই তিন দিন আমি তাকে তৈরি করে দিচ্ছি। এরপর তিন দিন অতিবাহিত হলে আমি তার সঙ্গে মিলিত হই। দেখি, সে অত্যধিক সুন্দরী, মহীয়সী নারী। কুরআনুল কারিমের শ্রেষ্ঠ হাফেজা। হাদিসে রাসুল সম্পর্কে সর্বাধিক বিদুষী। স্বামীর অধিকার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন।'[৪১০]

এ-জাতীয় ঘটনা মনীষীদের জীবনে অনেক অনেক। সেগুলোতে রয়েছে আমাদের জন্য প্রচুর শিক্ষা। তারাই ছিলেন ইসলামের জীবন্ত প্রতীক। আমলে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। হক ও সিরাতুল মুস্তাকিমের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

পূর্বসূরিদের নির্দেশিত উস্তাদের অন্যান্য দায়িত্ব

ইমাম গাযালি রহ. তালিবুল ইলমের উদ্দেশে আলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে আটটি বিষয় উল্লেখ করেছেন।[৪১১] ইমাম বদর বিন জামাআ সেগুলো চৌদ্দটিতে উন্নীত করেছেন।[৪১২] অধিকাংশ বিষয়ে উভয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। আবার উভয়ে নিজ নিজ বক্তব্যে কিছু অনুষঙ্গও যোগ করেছেন। আর ইমাম নববি রহ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।[৪১৩]

ইমাম গাযালি রহ.-এর বর্ণিত বিষয়গুলোর শিরোনামসমূহ এখানে আমি উল্লেখ করছি। তিনি বলেন :

প্রথম দায়িত্ব

শিক্ষার্থীদের ওপর সহানুভূতিশীল হওয়া। তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। তাদের সন্তানের মতো মনে করা। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إنما أنا لكم بمنزلة الوالد.

অর্থ : 'তোমাদের জন্য আমি হলাম পিতাসদৃশ।'[৪১৪]

---

[৪১০] حلية الأولياء : ২/১৬৭-১৬৮

[৪১১] الإحياء : ১/৫৫-৫৮

[৪১২] تذكرة السامع والمتكلم : ৪৭-৬৬

[৪১৩] المجموع : ১/২৮-৩৫। ৩০-নং পৃষ্ঠা থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়েছে। খুব মনোযোগ দিয়ে তা পড়া উচিত।

[৪১৪] আবু দাউদ : ৮। নাসাঈ সুনানে ছুগরা : ৪০। ইবনে মাজা : ৩১৩। ইবনে হিব্বান : ১৫২৩। মুসনাদে আহমদ : ২/২৪৭। সহিহ মুসলিম : ১/২২৩

দ্বিতীয় দায়িত্ব

সব সময় মহানবি সাইয়িদুল মুরসালীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। ইলম প্রচারের পরিবর্তে কোনো বিনিময় দাবি না করা। প্রতিদান বা পার্থিব কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ না করা; বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনকল্পে শিক্ষাদান চালিয়ে যাওয়া।

তৃতীয় দায়িত্ব

তালিবুল ইলমদের উপদেশ দানে কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করা। যথাযথ যোগ্যতা অর্জনের আগে নির্দিষ্ট পদ দাবি করা থেকে তাদের নিষেধ করা। সর্বোন্নত ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান শেখা শেষ না করে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে মনোনিবেশ করা থেকে তাদের বারণ করা। সব সময় তাদের সতর্ক করা যে, এই ইলম অর্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে দুনিয়া-আখেরাতে চিরশান্তি ও চিরমুক্তি লাভ।

চতুর্থ দায়িত্ব

কুঅভ্যাস, দুরাচার, অনৈতিক স্বভাব থেকে সুকৌশলে তাদের বারণ করা। স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে সেগুলো প্রকাশ না করা। এ ক্ষেত্রে কঠোরতা না করে সদয় পন্থা অবলম্বন করা। এর ক্ষতিকর দিকগুলো তাদের সামনে তুলে ধরা।

পঞ্চম দায়িত্ব

তালিবুল ইলমদের সামনে এক শাস্ত্রের উস্তাদ কর্তৃক অন্য শাস্ত্রকে খাটো না করা। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ না বলা। যেমন অনেক সময় ভাষাবিষয়ক শিক্ষক ফিকহের মন্দাচার করে থাকেন। আবার কখনো ফিকহের শিক্ষক হাদিস ও তাফসিরকে কম গুরুত্বপূর্ণ ভেবে থাকেন।

ষষ্ঠ দায়িত্ব

দরস প্রদানকালে সব সময় ছাত্রদের বুঝশক্তির দিকে খেয়াল রাখা। তাদের মস্তিষ্ক বুঝে কুলিয়ে উঠতে পারে না এমন কোনো বিষয় তাদের সামনে না বলা। তা না হলে তারা হীনম্মন্যতায় ভুগবে। ইলমের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। সব বিষয় ঢালাওভাবে সবার কাছে উপস্থাপন না করা উচিত।

সপ্তম দায়িত্ব

অবুঝ শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের মেধা ও বোধক্ষমতা অনুসারে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই শুধু তুলে ধরা।

অষ্টম দায়িত্ব

শিক্ষক সব সময় তার ইলম অনুযায়ী আমল করবেন। কখনো তার কথা ও কাজে যেন অসামঞ্জস্য না ঘটে। এ রকমটি হলে কখনো উদ্দেশ্য সাধন হবে না। কেউ যদি কিছু পান করে আর মানুষকে বলে, তোমরা এটা পান করো না; এটা হলো বিষ।' তবে মানুষ তাকে বিদ্রুপ করবে। অপবাদ দেবে। নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে তারা আরও আগ্রহী হয়ে পড়বে। বলবে, এটি যদি বিষযুক্ত এবং বিস্বাদ হতো, তবে তো প্রথমে সে নিজেই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতো।'

ইমাম গাযালি রহ. তার অষ্টম দায়িত্বের আলোচনাটি আলি বিন আবি তালিব রা.-এর একটি উক্তি দ্বারা সমাপ্ত করেছেন :

قصم ظهري رجلان : عالم متهتك وجاهل متنسّك.

অর্থ : 'দু-ধরনের ব্যক্তি আমার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে : নির্লজ্জ আলিম এবং মূর্খ দরবেশ।'

কারণ, মূর্খ ব্যক্তি অপাত্রে সাধনা ও তপস্যা দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে আর আলেম নিজের পথভ্রষ্টতা দ্বারা মানুষকে বিপথগামী করে।'

উপরিউক্ত ইমাম গাযালির আলোচনার মধ্যে আদর্শ শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে।

ইমাম বদর ইবনে জামাআর বক্তব্যে তালিবুল ইলমদের জন্য রয়েছে অনেক তথ্যবহুল বিষয়, যা তাদের উদাসীনতা থেকে জাগিয়ে তোলে। সত্যনিষ্ঠ আল্লাহভীরু আলেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকনির্দেশনা দেয়। সকল তালিবুল ইলম ভাইকে আমি সেগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ার এবং তার ওপর আমল করার ওসিয়ত করছি।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম মাওয়ারদি রহ. থেকেও উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমি তার বর্ণিত কয়েকটি বাক্য বর্ণনা করছি। তার কিছু অংশ উক্ত কথাগুলো সমর্থন করে। তিনি বলেন,

'আলেমদের কর্তব্য হলো, জানা বিষয়গুলো মানুষকে শিক্ষাদানে কোনোরূপ কৃপণতা না করা। অন্যকে উপকৃত করা থেকে বিরত না থাকা। কারণ, কার্পণ্য একটি নিন্দনীয় স্বভাব। আর বিরত থাকা বা বঞ্চিত করা একটি হিংসাত্মক অপরাধ। যে জ্ঞান তারা কোনোরূপ কৃপণতা এবং বিনিময় ছাড়াই শিক্ষালাভ করেছে, তা বিতরণ করতে কীভাবে তারা কৃপণতা বা হিংসাবোধ করতে পারে?! পূর্বসূরিগণ যদি ইলম বিতরণে কৃপণতা করতেন, তবে এই ইলম ও জ্ঞান আজ

আমাদের পর্যন্ত পৌঁছত না। বহু আগেই তা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেত। আলি বিন আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

ما أخذ الله العهد على أهل الجهل أن يتعلّموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلّموا.

অর্থ : 'আল্লাহ তাআলা জাহেলদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার কোনো প্রতিশ্রুতি নেননি; তবে আলেমদের থেকে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তিনি ঠিকই নিয়েছেন।'[৪১৫]

এরপর তিনি বলেন, সব সময় আলেমকে চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে, যেন শিক্ষার্থীরা তার সামর্থ্য সম্পর্কে অবগত হয়। যথাযথ কদর করতে সক্ষম হয়। যেন সফলতার সাথে তিনি ছাত্রদের শেখাতে পারেন। বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের জন্য সবকিছু সহজভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। কারণ আলেমের সঠিক পরিচয় এবং তালিবুল ইলমের সফলতার মূল চাবিকাঠি এটিই।'

এরপর বলেন, আলিমদের পালনীয় আদব হলো, শিক্ষার্থীদের সব সময় নসিহত করা। তাদের সাথে সদয় আচরণ করা। সরল পন্থা অবলম্বন করা। তাদের জ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাওয়া। কারণ, এভাবেই সে পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। তার সুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে। তার ইলম ছড়িয়ে পড়বে। অন্তরে তার প্রচারকৃত জ্ঞান বদ্ধমূল হবে।

উস্তাদের পালনীয় অন্যতম আদব হলো, কোনো শিক্ষার্থীর সাথে কঠোরতা অবলম্বন না করা। অন্যদের সামনে কাউকে তুচ্ছ বা নীচ সাব্যস্ত না করা। কারণ, নম্রতা অবলম্বনই ছাত্রদের কোমল হৃদয়ের দাবি এবং তাদের ওপর সদয় হওয়ার সবচেয়ে সহজ পন্থা।

উস্তাদের জন্য পালনীয় অন্যতম কর্তব্য হলো : কোনো তালিবুল ইলমকে বঞ্চিত না করা। তাদের ঘৃণার চোখে না দেখা। হতাশ না করা। কারণ, এগুলোর দ্বারা তাদের আগ্রহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মন ভেঙে যাবে। সর্বোপরি ইলম পড়ে যাবে চরম অবক্ষয় ও অস্বাভাবিক বিলুপ্তির মুখে।

* * * *

দ্বিতীয় পথনির্দেশ

ইলমি উপকারী বিষয়গুলো মুখস্থ করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান

আদর্শ তালিবুল ইলম গঠন করতে হলে এবং সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় তাদের গড়ে তুলতে হলে শায়খ ও উস্তাদের অন্যতম দায়িত্ব হবে, কুরআনুল কারিম, হাদিসে রাসুল, ইলমি রচনা থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ মুখস্থ করতে তালিবুল ইলমের উদ্বুদ্ধ করা; যেন ভবিষ্যৎজীবনে তারা সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। প্রতিটি শাস্ত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আত্মস্থ করে রাখা। তেমনি সাহিত্যের কিতাবগুলো থেকে সুন্দর ও অর্থপূর্ণ কবিতাগুলো মুখস্থ করা। এর আগে ইমাম আবু ইসহাক আশ-শিরাযি রহ.-এর উক্তি আমরা পড়ে এসেছি—'কোনো মাসআলায় যখন উদাহরণস্বরূপ কবিতা আসত, তখন সেগুলো আমি মুখস্থ করে নিতাম।'

আমাদের বর্তমান ইলমি সমাজে আলহামদুলিল্লাহ খুব গুরুত্বের সঙ্গে কুরআনুল কারিম হিফজ করানো হয়। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, হাদিসে রাসুল মুখস্থ করার প্রতি কারও তেমন আগ্রহ নেই। এমনকি রিয়াজুস সালেহিনের মতো গ্রন্থটি মুখস্থ করাতেও কোনো উদ্যোগ নেই কারও। এটি একটি মহা দুর্যোগ। এ ক্ষেত্রে আমি মাদরাসা ও জামিয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, তারা যেন নিজ নিজ বোর্ডের অধীনে বিষয়টি সিলেবাসভুক্ত করেন। যথেষ্ট পরিমাণ হাদিস মুখস্থ করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেন। আর সেজন্য সেমিনার, মাহফিল, প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান আয়োজন করে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। বন্ধের দিনগুলোতে এ বিষয়ে নানান কোর্সের আয়োজন করে ছাত্রদের উৎসাহিত করেন।

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন এবং হাফেজুল হাদিস আবদুল্লাহ সিরাজুদ্দিন রহ.-এর মৃত্যু ইলমি অঙ্গনে বিরাট শূন্যতা তৈরি করেছে। কারণ, হাদিসে রাসুলের হিফজের বিষয়ে তিনি কোনো প্রতিনিধি রেখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তিনি (আল্লাহ তাঁকে রহম করুন, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন) যখনই কোনো হাদিস পড়তেন, সাথে সাথে তা মুখস্থ করে নিতেন। এভাবে একসময় এমন হলো যে, কোনো হাদিস সামনে এলে তা তিনি অকপটে বলে দিতেন। সব ধরনের উপকারী বাক্য ও শব্দ তিনি মুখস্থ করে নিতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, প্রতিটি

হাদিস বর্ণিত শব্দে (অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত থাকলে সেটাও), রাবির নাম এবং তাখরিজকারী মুহাদ্দিসগণের নামসহ মুখস্থ করতেন।

খতিব রহ. বলেন, তালিবুল ইলমের উচিত শিক্ষাজীবনের শুরুলগ্নে কিতাবুল্লাহ মুখস্থ করে নেওয়া। কারণ, কুরআনের ইলম হলো সর্বোত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বমহান ইলম।'[৪১৬]

ইমাম আওযাঈ এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান রহ.-এর বক্তব্যেও এর সমর্থন মেলে।

এরপর তিনি বলেন, কুরআনুল কারিমের পরই আসবে হাদিসে রাসুলের স্থান। তালিবুল ইলমের উচিত হলো হাদিস নিয়ে গবেষণা শুরু করা। কারণ, হাদিসে রাসুলই হলো শরিয়তের গোড়া ও মূল ভিত্তি।'[৪১৭]

এরপর বলেন–

'অধ্যায় : হাদিস মুখস্থ করা এবং তা নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ প্রসঙ্গ তালিবুল ইলম যখন ঘরে স্থির হয়ে যায়। সফর ও দূরদেশে পাড়ি জমানোর পথ তার জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন সে নিজে নিজে তার রচিত ও লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে। গবেষণা করে নিত্যনতুন তথ্য আবিষ্কার করবে।'[৪১৮]

এরপর তিনি ইমাম আবদুর রাযযাক আস-সানআনি ও ইমাম আসমাইর দিকে সম্বন্ধ করে দুটি উক্তি বর্ণনা করেন–

كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمّام، فلا تَعدَّه علمًا.

অর্থ : 'ইলম যদি আলিমের সঙ্গে বাথরুমে প্রবেশ না করে, তবে তা ইলম হিসেবে গণ্য হবে না।'[৪১৯]

অর্থাৎ সে যদি তা মুখস্থ না করে, ইলম যদি সব সময় সঙ্গে না থাকে, তবে তা ইলম নয়।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ.-ও এ বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা তুলে ধরেন। ইলমি জীবনে অনুসরণ করে চলার উদ্দেশ্যে তালিবুল ইলমের জন্য একটি সঠিক ও উপকারী পন্থা বর্ণনা করেন। তিনি নিম্নোক্ত শিরোনামে একটি পৃথক অধ্যায় তৈরি করেন।

---

[৪১৬] الجامع : ৭৯
[৪১৭] ৮৯
[৪১৮] ১৮১৩
[৪১৯] ১৮১৮-১৮১৯

باب رتب الطلب وكشف المذهب.

অর্থ : 'ইলম অন্বেষণের পথ ও পদ্ধতি প্রসঙ্গ'

এর শুরুতেই তিনি বলেন :

لا ينبغي تعدِّيها ومن تعدّاها جملةً فقد تعدّى سبيل السلف رحمهم الله ، ومن تعدى سبيلهم عامدًا ضلّ، ومن تعداها مجتهدًا زلّ.

অর্থ : 'এ সীমা কখনো লঙ্ঘন করা যাবে না। সামগ্রিকভাবে যে তা লঙ্ঘন করবে, সে পূর্বসূরিদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। ইচ্ছাপূর্বক লঙ্ঘন করলে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত হবে। মুজতাহিদ হিসেবে লঙ্ঘন করলে তার পদস্খলন ঘটবে।'[৪২০]

আমি বলব, ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ.-এর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। তার এই একটি বক্তব্যই তালিবুল ইলমের জীবনের পথ ও পদ্ধতি রচনা করতে সক্ষম। সব সময় তালিবুল ইলমকে কথাগুলো স্মরণ রাখতে হবে। এ সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না কখনো।

এরপর আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে আধ-পৃষ্ঠার মধ্যেই তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। তালিবুল ইলমমাত্রই তা পড়া ও অনুধাবন করা উচিত। সে অনুযায়ী আমলে মনোনিবেশ করা উচিত।

ইমাম বদর বিন জামাআ রহ.ও গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ও দিকনির্দেশনা বর্ণনা করেন; অবশ্যই প্রতিটি তালিবুল ইলমকে তা পড়তে হবে, অনুধাবন করতে হবে এবং তা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এর সামান্য অংশ এখানে আমি উল্লেখ করছি :[৪২১]

'তালিবুল ইলম প্রথমে আল্লাহর কালাম পড়ে তা আত্মস্থ করে নেবে। কখনো যেন ভুলে না যায় সে দিকে ভীষণ সতর্ক থাকবে। এরপর হাদিস, উলুমুল হাদিস, তাওহিদ, উসুলে ফিকহ এবং নাহু-সরফ ইত্যাদি প্রতিটি ফন ও বিষয়বস্তুর মৌলিক কথাগুলো সে মুখস্থ করে নেবে। অনন্তর সেগুলো শায়খদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বুঝে নেবে।'

'এ ক্ষেত্রে শুধু নির্দিষ্ট কোনো কিতাবের ওপর নির্ভরশীল হওয়া থেকে সে বিরত থাকবে। বরং প্রতিটি ইলমসংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞজনদের কাছ থেকে তাহকিক-

---

[৪২০] الجامع : ২/১১২৯-১১৩৯

[৪২১] تذكرة السامع : ১১২-১২০

তাদকিকসহ বুঝে নেবে। আর শিক্ষক অবশ্যই হবেন দ্বীনদার ও মুসলিহ। তিনি ওই কিতাব বা ফনের আগাগোড়া সবকিছু সুন্দর করে তাকে বুঝিয়ে দেবেন।'

'পাশাপাশি কোনো কারণ ছাড়া এক কিতাব ছেড়ে অন্য কিতাবে মনোযোগী হওয়া থেকেও বিরত থাকবে। শুরুতেই পরামর্শসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শ্রেষ্ঠ ও অধিক উপকারী কিতাবটিই সে বেছে নেবে। উচিত হলো, ইলমে শরিয়তের কোনো জ্ঞানকেই তুচ্ছ মনে না করা। সবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো পড়ে সে সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। আর আমলের মাঝে কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন না করা; কারণ আমলই সকল ইলমের একক ও অভিন্ন লক্ষ্য।'

ছাত্রদের নসিহতের পাশাপাশি ইমাম বদর বিন জামাআ রহ. নিজেও প্রায় সকল ইলম ও সকল ফনে অভিজ্ঞ ছিলেন। যেমনটি তার দীর্ঘ প্রশংসা বর্ণনাশেষে ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, 'তিনি ছিলেন সকল ইলমের ঝরনাধারা, প্রতিটি শাস্ত্র থেকেই তিনি যথেষ্ট পরিমাণ সংগ্রহ করেছিলেন।'[৪২২]

এরপর ইবনে জামাআ রহ. আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের দিকে তালিবুল ইলমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : উচিত হলো, কোনো বিষয় মুখস্থ করার আগে তার উচ্চারণ ও পাঠ শুদ্ধ করে নেওয়া। হয়তো কোনো শায়খের কাছ থেকে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী কোনো সহপাঠীর কাছ থেকে। এরপর উত্তমরূপে তা মুখস্থ করা। মুখস্থ করার পর তা কোনো বিজ্ঞজনকে শোনানো। শুদ্ধ না করে কোনোক্রমেই যেন মুখস্থ না করা হয়। কারণ তখন তাতে বিকৃতি বা অশুদ্ধতার সংমিশ্রণ ঘটার সমূহ আশঙ্কা থাকবে।'[৪২৩]

এর আগে বলা হয়েছে যে, নির্বাচিত শায়খ যেন কিতাবনির্ভরশীল শায়খ না হন; যিনি কোনো বিদগ্ধ শায়খের কাছ থেকে ইলম শেখেননি; কেবলই কিতাব দেখে দেখে আলেম হওয়ার অপচেষ্টা করেছেন।

জেনে রাখা উচিত, ইলম কখনো কিতাবের পাতা থেকে অর্জিত হয় না। তা না হলে তো সেটি সবচেয়ে বড়ো ফ্যাসাদের কারণ হবে। প্রতিটি ফন ও বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য অংশ মুখস্থ করার বিষয়ে ইমাম বদর বিন জামাআ রহ.-এর উপদেশের দিকে ফিরে আসছি। তার মতামতকে আমি দুটি দিক থেকে সমর্থন করছি। এক. দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে। দুই. বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে।

---

[৪২২] ذيل تاريخ الإسلام : ৩৬৭

[৪২৩] التذكرة : ১২১

প্রথম দিক : ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. তার সন্তানকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বলেন, তোমার ওপর আবশ্যক হলো ইলম মুখস্থ করা। কারণ, তা হলো মূলধন আর তার প্রচার হলো মুনাফা।'[৪২৪]

মাশায়েখ ও তালাবার হাতে এখনো এমন ভলিয়ম আছে যা مجموع مهمات المتون নামে প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন প্রকাশনী তা ছেপেছে। একেকটিতে একেক রকম ইলমের সমষ্টি একত্র করা হয়েছে। এতে প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য অংশ (মতন) সংকলন করা হয়েছে। সর্বশেষে সংস্করণে প্রায় ষাটটির মতো মতন রাখা হয়েছে। যা প্রায় সকল শরয়ি বিভাগের ছাত্রদের–বিশেষত আল-আযহারের শরয়ি বিভাগের শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করতে উদ্বুদ্ধ করা হতো। ভলিয়মটি جيل المتون বলে নামকরণ করেছেন উস্তাদ ডক্টর মাহমুদ আত-তানাহি রহ.। বাস্তবেও সেটি ওই নামের যোগ্য।[৪২৫]

শুনেছি, ইমাম মুহাম্মদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. রচনাভিত্তিক সংকলন বাদে শুধু ইলমি কাব্যসংকলন-ই মুখস্থ করেছিলেন পঁচিশ হাজার।

আমাদের শাফেয়ি মাযহাবের অনেক শায়খ এবং তাদের অনেক ছাত্রের মুখস্থ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ছিল : البهجة الوردية যা ছন্দবদ্ধ করেছিলেন বিশিষ্ট শাফেয়ি ফকিহ ইমাম ইবনুল ওয়ারদি রহ. (মৃত্যু : ৭৩৯), ইবনে ইউনুসের রচিত الحاوي الصغير যার কবিতাসংখ্যা ৫২৮৬টি। আরও ছিল সিরাতে নববির প্রসিদ্ধ কিতাব ألفية العراقي , উলুমুল হাদিসের বিষয়ে ألفية السيوطي , ইলমে নাহুর বিষয়ে ألفية ابن مالك এবং ইলমে তাওহিদের বিষয়ে جوهرة التوحيد অথবা بدء الأمالي ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরপর আধুনিক শিক্ষাবিদদের ছত্রছায়ায় কীভাবে যেন শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে এ কথা বদ্ধমূল হলো এবং তা ছড়িয়ে পড়ল যে, মুখস্থ করা ইলমের জন্য অনেক ক্ষতিকর (নতুন শিক্ষানীতি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে)। ফলে হিফজের বিলুপ্তির সাথে সাথে ইলমি ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং বোধগম্যতাও চিরতরে হারিয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিক : পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালের সকল আহলে ইলমের কাছে ইমাম গাযালি রহ.-এর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ, যা ইমাম সুবকি রহ. ইমাম গাযালি রহ.-এর বৃত্তান্তের সূচনাতেই উল্লেখ করেছেন।

---

[৪২৪] لفتة الكبد : ২০

[৪২৫] في مقالاته : ১/১৪০

তিনি বলেন, ইমাম আসআদ আল-মিহানি বলেছেন যে, আমি ইমাম গাযালি রহ. কে বলতে শুনেছি—একবার চলার পথে কিছু ডাকাত আমার সব আসবাবপত্র ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেতে থাকে। আমিও তাদের পেছনে পেছনে চলতে থাকি। তাদের সামনের দিকের কিছু লোক পেছনে তাকিয়ে আমাকে দেখে বলতে থাকে, ধিক তোমার, আমাদের পিছু পিছু আসছ কেন? যাও, ফিরে যাও, না হয় পরিণতি খারাপ হবে তোমার! আমি তাদের বলি, ওই সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যার কাছে তোমরা নিরাপত্তা চাও– দয়া করে শুধু আমার রচনাগুলো তোমরা ফিরিয়ে দাও! এগুলো দিয়ে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। তারা বলে, কী তোমার রচনা? বলি, ওই ব্যাগের মধ্যে কিছু কিতাব আছে; যেগুলো শোনার জন্য, লেখার জন্য এবং তা থেকে ইলম অর্জন করার জন্যই আমি দূরদেশে পাড়ি দিই। এ কথা শুনে সে হেসে দিয়ে বলে, কোন মুখে এগুলোকে তোমার ইলম দাবি করছ; অথচ তা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ামাত্রই তুমি ইলমশূন্য হয়ে গেলে?! এরপর সাথিদের সে কিতাবগুলো ফিরিয়ে দিতে বললে তারা ওই ব্যাগটি আমাকে ফিরিয়ে দেয়।[৪২৬]

ইমাম গাযালি রহ. বলেন– আমি বলব, কথাটি সে নিজে বলেনি; আমাকে উপদেশ করার জন্য আল্লাহ তাকে দিয়ে বলিয়েছেন। এরপর তুস নগরীতে এসে আরও তিন বছর ইলম নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত থাকি। শেষ পর্যন্ত আমি আমার সকল রচনা মুখস্থ করে নিই। নিশ্চিত হই যে ডাকাতদল আমার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নিলেও আমি আর ইলমশূন্য হব না।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সকল প্রসিদ্ধ আলেমের মুখে মুখে একটি কথা প্রায়ই উচ্চারিত হতো :

من حفظ المتون، نال الفنون.

অর্থ : 'যে মতন হিফজ করে, সে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে।'

আরও উচ্চারিত হতো :

حفظُ حرفين، خير من سماع وِقْرين، وفهم حرفين خير من حفظ وِقرين، وحرفٌ في قلبك، خير من ألفٍ في كتبك- أي : دون حفظ لها.

অর্থ : 'দুটি হরফ মুখস্থ করা দুটি ব্যাগভর্তি কিতাব শ্রবণ করা থেকে উত্তম। আর দুটি হরফ বোঝা দুটি ব্যাগভর্তি কিতাব মুখস্থ করা থেকে উত্তম।

---

[৪২৬] في طبقاته : ৬/১৯৫

অন্তরে একটি হরফ সংরক্ষিত থাকা—(আলমারিতে রাখা) হাজার কিতাবের চেয়ে উত্তম।'

আরও উচ্চারিত হতো :

لا خير في علم لا يَعْبُر معك الوادي، ولا يَعْمُر بك النادي.

অর্থ : 'এমন ইলমের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যা তোমার সাথে ভ্রমণ করে না এবং তোমার মাধ্যমে মজলিশ জীবন্ত করে তোলে না।'[৪২৭]

তারা আরও একটি কথা বলতেন :

ما كُتِب قَرَّ، وما حفظ فَرّ.

অর্থ : 'যা লিপিবদ্ধ করা হয় তা-ই অন্তরে স্থায়ী হয়, আর যা মুখস্থ করা হয় তা পালিয়ে যায়।'

এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুখস্থ করা বিষয়গুলো তো সময় অতিক্রম হওয়া বা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার দ্বারা বিস্মৃত হয়ে যায়। তাই লিখে রাখাই বেশি নিরাপদ। এ কথা বলে হিফজকে তুচ্ছ বা গুরুত্বহীন করা তাদের উদ্দেশ্য না।

এর সারমর্ম হলো, হিফজের সাথে সাথে বোধগম্য করাই ইলমের ভিত্তি এবং আলিমের পাথেয়। তবে ইলমকে উম্মাহর মাঝে অমর ও স্থায়ী করার একক মাধ্যম হলো লেখনী ও সংকলন।

ইলমি মতনসমূহ সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের শায়খদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রদানের বিষয়ে আলেপ্পোর মুফতি প্রাজ্ঞ আলেমে দ্বীন ডক্টর শায়খ ইবরাহিম আস-সালকিনি রহ.[৪২৮]-এর বলা ঘটনাটি আমি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। তাঁর দাদা পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব শায়খ ইবরাহিম আস-সালকিনি[৪২৯] তাকে ইলমে নাহুর কাব্যগ্রন্থ 'আলফিয়া ইবনে মালেক' মুখস্থ করাতেন। তখন দাদার ছিল নব্বই আর নাতির ছিল দশ বছর বয়স।

আলেপ্পোর অন্যতম আলিম ও মুফতি আল্লামা ফকিহ আহমদ আল-হাজ্জি আল-কুরদি রহ.[৪৩০]-এর কাছে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে গেলে দেখতেন যে আলফিয়া বিন মালেক জাতীয় কাব্যগ্রন্থের সেই মুখস্থ করা বিষয়গুলো তিনি একাকী পুনঃপাঠ করছেন।

---

[৪২৭] الماوردي : ৪৫৩ والزرنوجي : ৭০

[৪২৮] (১৩৫৩-১৪৩২ হি.)

[৪২৯] (১২৭০-১৩৬৭ হি.)

[৪৩০] (১২৯৯-১৩৭৩) হি.)

মক্কা মুকাররামায় একজন শায়খের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট আলেম, ফকিহ এবং তরুণ প্রজন্মের ইলমি মুরুব্বি শায়খ মাহমুদ আবদুদ-দায়িম[৪৩১]। তিনি উচ্চতর গবেষণা বিভাগে ছাত্রদের দরস প্রদানকালে তাদের দিয়েই কিতাবের ইবারাত পড়াতেন। কেউ ইবারাতে ভুল করলে সাথে সাথে তা সংশোধন করে দিতেন। এরাব ঠিক করে দিতেন। আর তখন প্রমাণস্বরূপ আলফিয়া বিন মালেক গ্রন্থ থেকে ইলমে নাহুর কবিতাও পাঠ করতেন।

ইমাম ইবনে মালেক রহ.-এর প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন। তিনি তার এ 'আলফিয়া' রচনায় কতটুকু একনিষ্ঠ ছিলেন! যে কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এখনো তা থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছে!!

ইমাম বদর ইবনে জামাআর সংক্ষেপিত উদ্ধৃতিতে তিনি যেসব ফন পড়তে ও মুখস্থ করতে জোর তাগিদ দেন, শুরুতে আমি চাচ্ছিলাম প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সামনে প্রত্যেকটি ফনের নির্দিষ্ট কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করতে। কিন্তু পরে সেখানে শহর ও নগরীর ইখতেলাফ দেখতে পেয়েছি। এক নগরীর আলেমদের ব্যাখ্যাদানের সাথে অন্য নগরীর আলেমদের ব্যাখ্যাদানের গরমিল থাকায় সেগুলো আর উল্লেখ করিনি।

তবে একটি বিষয় আমি জোর দিয়েই ওসিয়ত করছি, তালিবুল ইলমদের শিক্ষাজীবনের একদম গোড়ার দিকে ইমাম তিরমিজি রহ.-এর রচিত الشمائل المحمدية গ্রন্থটি পড়ানো উচিত।

কারণ, তা নববি চরিত্রের আলোকে তালিবুল ইলমদের চরিত্র গঠনে খুবই উপকারী সাব্যস্ত হয়েছে।

কারণ, এ বয়সে তার স্বভাব ও মনমানসিকতা যে কোনো বিষয়কেই সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। নির্দেশিত পথে চলতে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে।

তবে স্বীকৃত একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত না করলেই নয় যে, প্রতিটি ফনই সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত এর বিচারে পরস্পর তারতম্যপূর্ণ। আবার গ্রহণযোগ্যতা ও বোধগম্যতার দিক দিয়েও পার্থক্যবিশিষ্ট।

---

[৪৩১] (১৩১৪-১৪১২ হি.)

সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতের বিচার

প্রতিটি ইলমেই এটি বিদ্যমান। ফিকহে শাফেঈর বিষয়ে ইমাম গাযালি রহ.-এর রচিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থও আছে। আধা-বিস্তারিত গ্রন্থও আছে। আবার পুরো বিস্তারিত গ্রন্থও আছে। ইবনুল আকফানি রহ.[৪৩২] তার إرشاد المقاصد গ্রন্থে শরয়ি ইলম, আরবি ভাষাবিষয়ক জ্ঞান, প্রকৃতিবিদ্যা, গণিতবিদ্যা ও দর্শনবিদ্যাসহ সর্বমোট তেষট্টিটি বিদ্যা আবিষ্কার করেন। সবগুলো বিদ্যার প্রসিদ্ধ সব গ্রন্থের নাম সংক্ষিপ্ত, আধা-বিস্তারিত এবং পুরো বিস্তারিতের ক্রমানুসারে তিনি সেখানে বর্ণনা করেন।

গ্রহণযোগ্যতা ও বোধগম্যতার বিচার

কারণ, প্রসিদ্ধ কোনো মনীষী কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থকারকে দুর্বল আখ্যাদান বা তাকে প্রত্যাখ্যানের কারণে তার গ্রন্থটি অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়। আবার সুবিন্যস্ত আলোচনা, সাবলীল প্রকাশ, প্রকার বর্ণনা বা দুর্বোধ্য বিষয়গুলোর সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখের কারণেও কোনো কোনো গ্রন্থ অধিক গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হয়। আল্লাহই প্রকৃত সংস্কারক। তিনিই সামর্থ্যদানকারী।

* * * *

---

[৪৩২] মৃত্যু : ৭৪৯ হি.

তৃতীয় পথনির্দেশ

শিক্ষা প্রদানে ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন

তালিবুল ইলমদের শিক্ষাদানকালে ধীরতা অবলম্বনের বিষয়টি তিনটি স্তরবিশিষ্ট; যেগুলোর আলোচনা না করলেই নয়।

প্রথম স্তর : তালিবুল ইলমদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ ইলমগুলো আগে শিক্ষা দেওয়া। এরপর তাৎপর্যের দিক থেকে বেশি গুরুত্ববহ ইলমগুলো পর্যায়ক্রমে তাদের শিক্ষা দেওয়া।

দ্বিতীয় স্তর : একেক বছর একেক ইলম অথবা এক ইলম শেষ করার পর অন্য ইলম—এভাবে শিক্ষাদানপদ্ধতি বিন্যস্ত করা।

তৃতীয় স্তর : ছোটো এবং সহজ বিষয়গুলো আগে শিক্ষা দেওয়া। এরপর বড়ো এবং জটিল মাসআলাগুলো।

উপরিউক্ত তিনটি স্তরবিশিষ্ট আলোচনা শুরুর আগে এখানে একটি কথা আগেভাগে বলে নিচ্ছি, শিক্ষাদানে ধীরতা অবলম্বনের বিষয়টি আল-কুরআন অবতীর্ণকালে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গৃহীত পদ্ধতি, যার মাধ্যমে তিনি মুমিনদের সংশোধিত ও সুসংগঠিত করেছেন। প্রথমে মক্কি জীবনে ইসলামি আকিদা এবং তাওহিদজাতীয় বিষয়গুলোর শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর ধীরে ধীরে সময় ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের অন্যসব রুকন ও শরয়ি বিষয় প্রতিপাদিত করেছেন। যেমন : নামাজের সকল বিধান তিনি এক দফায় অবতীর্ণ করেননি, তেমনি জাকাতের বিধানও জারি করেননি। জিহাদের বিধানটিও তিনি ধীরে ধীরে শরিয়তসিদ্ধ করেছেন। এ সবগুলো শরিয়াকরণে তিনটি স্তর অবলম্বন করেছেন। পারিবারিক বিধান ও আচার-আচরণগত বিধানাবলির ক্ষেত্রেও একই কথা।

একই রীতি গৃহীত হয়েছে নববি শিক্ষাদানক্ষেত্রেও। এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো মুয়াজ বিন জাবাল রা.-কে ইয়েমেন অভিমুখে প্রেরণের ঘটনা সংবলিত ইবনে আব্বাস রা.-এর হাদিস; যা বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে:

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি এখন আহলে কিতাবের একটি সম্প্রদায়ের দিকে প্রেরিত হচ্ছ। আর তাই শুরুতেই গিয়ে তাদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল'-এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি আহ্বান করবে। তারা যদি অনুগত হয়ে যায় তবে তাদের বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচ

ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। তা যদি পালনে সচেষ্ট হয়, তবে তাদের বলবে : আল্লাহ তোমাদের ওপর জাকাত ফরজ করেছেন; যা তোমাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’[৪৩৩]

এ নীতির ওপর একজন শিক্ষার্থীকে গড়ে তুললে বছর কয়েকের ভেতরেই তার মধ্যে ইলমের প্রভাব দেখা যাবে; যদি থাকে তার মাঝে এখলাস ও মেহনতের মাদ্দা। তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে এমন প্রক্রিয়া উদিত হবে, যা ইবনে নুহাস আল-হালবি আল-মাসরি[৪৩৪] ছন্দাকারে ব্যক্ত করেছেন :

اليومَ شيءٌ وغداً مثلُه ☆ من نُخَبِ العلم التي تُلْتَقطْ

يُحصِّلِ المرءُ بها حكمةً ☆ وإنما السَّيلُ اجتماعُ النُّقَطْ

অর্থ : ‘কিছু আজ, কিছু কাল, এভাবেই কিছু কিছু করে হয় ইলম অর্জন। এভাবেই ধীরে ধীরে মানুষ হয় প্রজ্ঞাবান। ফোঁটা ফোঁটা একত্র হয়েই তো সৃষ্টি হয় সয়লাব।’[৪৩৫]

এ নীতি অবলম্বন করে যারা সফলতা অর্জন করেছেন, খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আবু হানিফা রহ.। তাঁর শায়খ হাম্মাদ বিন আবি সুলায়মান তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, প্রতিদিন মাত্র তিনটি করে মাসআলা শিখবে; এর বেশি নয়। অন্যথায় তোমার জ্ঞানের ঝুলি ছিঁড়ে যাবে।’ এরপর তিনি সেভাবেই ইলম অর্জন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত ফকিহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। মানুষেরা আঙুল দিয়ে তার দিকে ইশারা করত। তাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে চিহ্নিত করত।

(ক) প্রথম স্তর সংক্রান্ত আলোচনা আমি ইমাম মাওয়ারদি রহ.-এর উক্তি দিয়ে শুরু করছি :

‘প্রতিটি ইলমই মর্যাদাপূর্ণ। প্রতিটি জ্ঞানেই কিছু-না-কিছু উন্নত দিক থাকে; আর সকল বিদ্যার সকল দিক আত্মস্থ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। যেহেতু সকল ইলম অর্জন করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তাই সকল ইলমের গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে বেছে নিয়ে তাকেই বরং আত্মস্থ করার দিকে মন দিতে হবে। অধিক প্রয়োজনীয় ও বেশি গুরুত্বর্পূণ বিষয়কেই আগে বেছে নিতে হবে। এর মধ্যে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ইলম হলো ইলমে দ্বীন। কারণ, তা

---

[৪৩৩] বুখারি : ১৩৯৫ মুসলিম : ১/৫০

[৪৩৪] ৬২৭-৬৯৮ হি.

[৪৩৫] بغية الوعاة গ্রন্থের শুরুতে এ কবির জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখ হয়েছে : ১/১৩ পৃ.

জানার মধ্য দিয়ে মানুষ সঠিক পথ ও চিরমুক্তির দিশা পাবে। অন্যথায় বিপথগামী হয়ে চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[৪৩৬]

এরপর তিনি বলেন :

'জেনে রাখা উচিত, প্রতিটি ইলমেরই রয়েছে সূচনা ও সমাপ্তি। রয়েছে ভূমিকা যা শিক্ষার্থীকে নিয়ে যায় ইলমের গভীরে। আর তাই শিক্ষার্থীকে সূচনা থেকেই অন্বেষণ শুরু করতে হবে, যেন সমাপ্তি পর্যন্ত যাওয়া তার পক্ষে সহজ হয়। ভূমিকা থেকে আরম্ভ করতে হবে, যেন ইলমের গভীরে বিচরণ করা যায়। সূচনার পূর্বে সমাপ্তি অন্বেষণ করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় ভূমিকার আগে তার গভীরতা অনুসন্ধানও। অন্যথায় সমাপ্তি পর্যন্ত যাওয়াও সম্ভব হবে না এবং ইলমের গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছারও সুযোগ হবে না। কারণ, ভিত্তি ছাড়া কোনো ভবনই স্থাপিত হয় না এবং বীজ ছাড়া কোনো বৃক্ষই ফলদায়ক হয় না।'[৪৩৭]

তালিবুল ইলমের উল্লিখিত শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে এখানে দুটি আলোচনা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি।

১. পর্যায়ক্রমিক ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে জনৈক ইমাম এবং তার শিষ্যের মাঝে সংঘটিত একটি সূক্ষ্ম ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। রামহুরমুযি রহ. বর্ণনা করেন : একব্যক্তি ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে জিজ্ঞেস করে, ইমাম যুহরি থেকে আপনি কী পরিমাণ হাদিস শুনেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, জনসমাবেশে শুনেছি অনেক, তবে একাকী শুনেছি কেবল একটি হাদিস। জিজ্ঞেস করি, সেটি কোনটি? বলেন, একবার আমি বনি শাইবা দরজা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে দেখি, ইমাম যুহরি রহ. মসজিদের এক খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে বসা। মনে মনে পুলকিত হই। শায়খ আবু বকর (ইমাম যুহরির উপনাম) এখানে বসে আছেন; এরচেয়ে বড়ো সুযোগ আমার জীবনে আর আসবে না ভেবে আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে বসে পড়ি। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করি, হে আবু বকর, একটি বা দুটি হাদিস আমার কাছে বর্ণনা করুন! তিনি বলেন, যা মনে চায় জিজ্ঞেস করতে পারো! আমি বলি, আমার কাছে ওই মাখযুমিয়্যা নারীর ঘটনাসংবলিত হাদিসটি বর্ণনা করুন, যার হাত কেটে দিয়েছিলেন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' এ কথা শুনে তিনি আমার চেহারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে বলেন, ধিক তোমার, তুমি তো দেখছি আমার অপছন্দনীয় কিছু শুনতে চাচ্ছ!

---

[৪৩৬] أدب الدنيا والدين : ৬৬-৬৭

[৪৩৭] أدب الدين والدنيا : ৮৪

তিনি বলেন : এরপর আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তার কাছ থেকে উঠে যাই। এরপর তার সন্নিকটেই আবার বসে পড়ি। কিছুক্ষণ পর মসজিদে তাঁর সামনে দিয়ে এক লোক অতিক্রম করে। কী প্রয়োজনে তিনি তাকে ডাকতে চান। সে উদ্দেশ্যে প্রথমে সশব্দে তাসবিহ পাঠ করেন। কিন্তু লোকটি শুনতে পায় না। এরপর তিনি তার দিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কঙ্করও তার পর্যন্ত পৌঁছায় না। এরপর আমাকে ডেকে বলেন, যাও, তাকে ডেকে নিয়ে এসো! এরপর আমি গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসি। এরপর তিনি তার সাথে তার প্রয়োজন শেষ করেন। আমি আবার আমার স্থানে ফিরে আসি। এরপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং আবু সালাম বিন আবদুর রহমান উভয়ে আবু হুরায়রা রা. থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

> العجماء جُبَار ، والبئر جُبَار ، والمعدِن جبار ، وفي الرِّكاز الخُمُس.
>
> 'পশুর ক্ষতিকর আচরণে কোনো জরিমানা নেই। কূপে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। খনিজ পদার্থে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, তবে জমিনে প্রোথিত কোনো মূল্যবান বস্তু লাভ করলে তার এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে দান করতে হবে।'[৪৩৮] এর আগে তুমি যে হাদিস জিজ্ঞেস করেছ এর চেয়ে বরং এটিই তোমার জন্য বেশি উত্তম।'[৪৩৯]

আমাদের পূর্বসূরি সত্যনিষ্ঠ সব ইমামের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হোন। ইলমের পাশাপাশি তালিবুল ইলমদের তারা শিক্ষা দিতেন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা।

---

[৪৩৮] বুখারি : ১৪৯৯। মুসলিম : ৩/১৩৩৪

العجماء বলতে মানুষ ছাড়া সকল প্রাণী উদ্দেশ্য। جبار অর্থ : নিষ্ফল। হাদিসের ভাবার্থ হলো : কোনো পশু যদি দিনের বেলায় অথবা মালিকের ইচ্ছা ও বাড়াবাড়ি ছাড়া রাতের বেলায় কারও সম্পদ নষ্ট করে, তবে মালিকের ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না। তেমনি কেউ যদি তার আয়ত্তাধীন ভূমিতে কূপ খনন করে, এরপর কোনো মানুষ তাতে পড়ে মারা যায়, তবে কূপমালিকের ওপর কোনোপ্রকার ক্ষতিপূরণ ধার্য হবে না। আবার কেউ যদি খনি আবিষ্কার করতে মাটি খুঁড়ে, এরপর মাটি আছড়ে পড়ে খননকারী কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হয়, তবে এর দায়ভার কূপখনন-পরিচালকের ওপর বর্তাবে না। তবে কেউ যদি ভূগর্ভস্থ প্রোথিত কোনো খনিজ সম্পদ লাভ করে, তবে তার এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে (ইসলামি সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ে) দিয়ে বাকিটা সে নিয়ে যাবে।

[৪৩৯] المحدث الفاصل : ৭২

২. ইমাম মাওয়ারদি রহ. 'এবং বীজ ছাড়া কোনো বৃক্ষই ফলদায়ক হয় না' উক্তির মাধ্যমে তিনি প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল বিশেষত বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে চিন্তা-গবেষণাকারীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি উপমা তুলে ধরেছেন। কত অসংখ্য শিক্ষার্থী আজ অন্বেষণ ছাড়াই ইলম অর্জন করে নিচ্ছে। এভাবেই তারা আত্মতৃপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা যেন সিঁড়ি ছাড়াই ভবনের ছাদে উঠতে মনস্থ করেছে। সে তো ওই দরিদ্র ব্যবসায়ীর মতো, যে কোনো পুঁজি ছাড়া খালি হাতে মার্কেটে গিয়ে অধিক মুনাফা লাভের আশায় বসে থাকে। সে এভাবেই বেড়ে উঠেছে যে, আল্লাহর এই শাশ্বত ধর্মে হাদিস, ফিকহ বা উসুলের কোনো বিষয়বস্তুতে ইজতেহাদের দাবি ছাড়াই সে বিখ্যাত চার ইমামকে কাটাছেঁড়া করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের মতামতকে একবার ভুল আরেকবার সঠিক প্রমাণ করতে শুরু করেছে; বরং আরেকটু বাড়িয়ে বললে নিজের করা তাহকিকগ্রন্থে মূল গ্রন্থকারের আকিদা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চরম সীমালঙ্ঘনকারীর পরিচয় দিয়েছে। অথচ তার অবস্থান ওই ইমাম বা মনীষীর রচিত গ্রন্থের পাতার ওপরেই সীমাবদ্ধ। এরপরও সে তাঁকে বিদআতি বা পথভ্রষ্ট বলে চিহ্নিত করছে। করবেই তো, কারণ সে পড়াশোনা করেছে এমন সব শিক্ষাঙ্গনে, যেগুলোতে না আছে ইলম অন্বেষণের কোনো মূলনীতি, না আছে নববি তরবিয়াত। তাদের ইলম অঙ্কুরিত হয়েছে কোনো বীজ ছাড়া। তারা নিজেদের এক শ ভাগ শিক্ষিত বা চূড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী বলে পরিচয় দিচ্ছে; কিন্তু ইলমের প্রথম বা দ্বিতীয় সিঁড়িতেই এখনো পদার্পণ করেনি তারা। এ ধরনের ভণ্ড ও নামধারী শিক্ষিতদের দিয়ে আর যা-ই হোক, কস্মিনকালেও ইলম ও দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষণ হবে না।

এরপর রামহুরমুযি রহ. বলেন :

> 'তালিবুল ইলমের উচিত হলো ইলমের প্রাথমিক দিকগুলো আগে আত্মস্থ করা। যথারীতি ইলমের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা। আর ইলমের বিকাশ ঘটে না এমন কোনোকিছুর পেছনে সময় নষ্ট না করা। তা না হলে যে জ্ঞান সে বুঝতে শুরু করেছিল, তাও বোঝা কঠিন হয়ে যাবে তার পক্ষে। কারণ, প্রতিটি ইলমের রয়েছে কিছু অতিরিক্ত ও নিষ্ফল বিষয়; তালিবুল ইলম যদি সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করে তবে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ইলমের সংখ্যা গুনে শেষ করার মতো নয়; তা থেকে সর্বোত্তমগুলোই তুমি গ্রহণ করো।'[৪৪০]

---

[৪৪০] أدب الدنيا والدين : ৮৮

তালিবুল ইলমকে সর্বপ্রথম দুটি বিষয় অর্জনে মনোনিবেশ করতে হবে

১. আরবি ভাষা অর্থাৎ নাহু, সরফ, ভাষাতত্ত্ব, বালাগাত, বাচনিক প্রয়োগ ও ব্যবহারপদ্ধতি।

২. ফিকহ অর্থাৎ বিধি-বিধান এবং মাসআলাসংক্রান্ত জ্ঞান।

আর তা হবে ধীরস্থিরে ও পর্যায়ক্রমে মৌলিক গ্রন্থসমূহের 'মতন' ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের সহায়তা নিয়ে। পাশাপাশি তার ব্যবহারিক প্রক্রিয়া এবং নিয়মকানুনও যথাযথভাবে মুখস্থ করতে হবে।

আরবি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

খতিবে বাগদাদি রহ.-এর উল্লেখ করা ঘটনাগুলো দেখা যেতে পারে।[৪৪১] এর মধ্যে একটি হলো–

হাম্মাদ বিন সালামা একবার একব্যক্তিকে বলেন, যদি হাদিস পড়তে ভুল করো, তবে আমার ওপর মিথ্যারোপকারী সাব্যস্ত হবে তুমি। কারণ, বর্ণনার সময় আমি তো ভুল বর্ণনা করিনি!'

এ ঘটনার মাধ্যমে হাদিসের ইবারাতে ভুল পাঠকারী ব্যক্তির ব্যাপারে হাম্মাদ বিন সালামার বিশিষ্ট ছাত্র আল-আসমাইর বর্ণিত উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন : এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা যে, তাদের ওপর নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী প্রযোজ্য হবে–

من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

> অর্থ: 'ইচ্ছাপূর্বক আমার ওপর যে মিথ্যারোপ করে, সে জাহান্নামে নিজের স্থান ঠিক করে নেয়।'

এখান থেকেই উচ্চারণ এবং পাঠ বিশুদ্ধ করার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। এখানে অপর বিখ্যাত মনীষী ও স্বনামধন্য ইমামের বলা উক্তিটিও স্মরণ করা যেতে পারে। হাদিসে রাসুলকে তারা কী রকম মর্যাদা দিতেন! সুন্নাতে নববির বিশুদ্ধ প্রচারণায় নিজেরা কী রকম ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন! পঞ্চম শতকের শেষের দিকে ইন্তেকালকারী আবু বাকার আল-মালেকির রচিত رياض النفوس গ্রন্থে ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, কোনো পাঠক যদি (হাদিসের ইবারাত পড়তে গিয়ে) ভুল পাঠ করে, তবে তা শুনে আমার পানাহার ও ঘুম হারাম হয়ে যায়।'

---

[৪৪১] في الجامع : ১০৭৩, ১০৯৭

আমরা আমাদের শায়খদের আরবি ভাষার বিষয়ে অভিজ্ঞ ও আদর্শরূপে পেয়েছি। কিন্তু এখনকার আলেমরা আরবি ভাষা থেকে উদাসীন হয়ে গেছে। ফলে তাদের পায়ের তলার মাটিও সরে গেছে!

আর ফিকহ হলো ইসলামের মূল ভিত্তি। ফিকহই দ্বীন। একজন আলিমের দুই শাহাদাত পাঠ এবং প্রয়োজনীয় আকিদা জানার পর সর্বপ্রথম প্রয়োজন হয় ফিকহের। কারণ, সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে তারা ফিকহি বিষয়েই জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়।

খতিবে বাগদাদি রহ. ইমাম আহমদ রহ.-এর অন্যতম ছাত্র ইমাম ইবরাহিম আল-হারবি থেকে তার একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন :

من تكلم في الفقه بغير لغة ، تكلم بلسان قصير.

> অর্থ : 'ভাষাজ্ঞান ছাড়া যে ব্যক্তি ফিকহি বিষয়ে কোনো কথা বলে, সে যেন অযোগ্য মুখ দিয়ে কথা বলে।[৪৪২]

হাম্বলি মাযহাবের বিশিষ্ট ফকিহ ইমাম ইবনে মুফলিহ রহ. তার চমৎকার ও অনবদ্য الآداب الشرعية গ্রন্থে[৪৪৩] فصل في فضل الجمع بين الحديث وفقهه শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করে তাতে অত্যন্ত উপকারী কিছু বিষয় উল্লেখ করেন। তাতে المحيط গ্রন্থকারের একটি উদ্ধৃতিও প্রকাশ করেন : দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান এবং একত্ববাদের জ্ঞানের পর সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান হলো ইলমুল ফিকহ বা হালাল-হারামের যাবতীয় বিধান বর্ণনাকারী ইলম।'

ইলমুল ফিকহের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়ে আবুল ফারাজ আল-জাওযি রহ.-এর উক্তিটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি صيد الخواطر গ্রন্থের[৪৪৪] ৩৩১ নং 'খাতেরা'র শিরোনাম করেন 'তালিবুল ইলমদের যা শেখা আবশ্যক' বাক্যটি দিয়ে। এর অধীনে তিনি বলেন : যে উচ্চাভিলাষী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়, নিজের জন্য ভালোকিছুর আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন প্রতিটি ইলমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্বেষণে মনোনিবেশ করে। তার সাধনার অধিকাংশটা জুড়ে যেন থাকে ইলমুল ফিকহ। কারণ, তা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ইলম।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে উপরিউক্ত দুটি ইলমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, তালিবুল ইলমদের জন্য আবশ্যক হলো ইলমে নাহু শিক্ষা করে ভাষাগত

---

[৪৪২] آداب الفقيه والمتفقه : ৬৬৩

[৪৪৩] ১২১/২

[৪৪৪] পৃষ্ঠা : ৩৬৬

ত্রুটি সংশোধন করা। যথেষ্ট পরিমাণ শব্দভান্ডারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। আর ফিকহ হলো সকল জ্ঞানের মূল।'[৪৪৫]

المجموع গ্রন্থের ভূমিকায় ইমাম নববি রহ. বলেন, তালিবুল ইলম তার ইলমি অধ্যবসায় সূচনা করবে কুরআনুল কারিম হিফজ করার মধ্য দিয়ে। আল্লাহর কালাম মুখস্থ করার পর প্রতিটি শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো সংক্ষিপ্তভাবে সে মুখস্থ করে নেবে। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ববহ ফনগুলোকে সে অগ্রাধিকার দেবে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শাস্ত্র হলো ফিকহ ও নাহু। এরপর হাদিস ও তার মলূনীতি। এরপর সাধ্যানুযায়ী অন্যসব।'[৪৪৬]

বর্তমানে এ নিয়মেই শরয়ি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে এ দুটো। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যসব। যারা শরয়ি প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা লাভ করেনি বা যারা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে কোন কোন শাস্ত্র পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ চাইছেন, তাদের উদ্দেশেই আমি কথাগুলো বলছি।

ওই শরিয়া ভার্সিটিগুলোতে পর্যায়ক্রমে ইলমে শরিয়ত অধ্যয়নের দ্বারা একজন তালিবুল ইলমের শরয়ি জ্ঞান বিকশিত হবে। এভাবে একসময় সে নিজেই বুঝতে পারবে, কোন ইলমে তার বিশেষজ্ঞতা (তাখাসসুস) অর্জন করা দরকার। পাশাপাশি তার জন্য অন্যসব ইলম অধ্যয়নেরও পূর্ণ সুযোগ থাকবে ভবিষ্যৎ ইলমি জীবনে যদি দরকার হয়।

কোনো গবেষণার প্রয়োজন পড়লে সে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থগুলো দেখে নেবে। এভাবে একসময় প্রতিটি শাস্ত্রে অংশগ্রহণ করার এবং পূর্ণ দাপটের সাথে সেগুলোতে বিচরণ করার পূর্ণ যোগ্যতা তার মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। কারণ, শরয়ি ইলমগুলো একটি অপরটির সম্পূরক। একটি অন্যটির মুখাপেক্ষী। এ কারণেই সব ইলমে দক্ষতা অর্জন করতে হবে সমানভাবে। যেন যাবতীয় বিধান ও রচনাসংক্রান্ত কাজে সে পূর্ণ দক্ষ হয়ে ওঠে।

পাঠ্যক্রমের গুরুত্ব

শরয়ি বিদ্যালয় ও দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে নির্ধারিত পাঠ্যসূচি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো, যুগ যুগ ধরে ইসলাম ধর্মকে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত রাখতে আমাদের সম্মানিত উস্তাদ ও আলেমগণ অত্যন্ত সফলতার সাথে এগুলো পাঠদান করে আসছেন। এই শিক্ষাক্রমই তালিবুল ইলমের মস্তিষ্কে ইলমে শরিয়তের ভিত্তি

---

[৪৪৫] لفتة الكبد : ১০

[৪৪৬] ১/৩৮

তৈরি করবে। এ কারণে আমার তালিবুল ইলম ভাইদের আমি আন্তরিকভাবে ওসিয়ত করছি, পাঠ্যক্রমের নিয়মানুযায়ী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে। সেমতে তাদের দ্বীনি ইলম ও মাআরেফের ভিত্তিস্থাপন করতে। কারণ, এগুলোই বর্তমান ও ভবিষ্যৎজীবনে তাদের মূল্যবান পাথেয়। কিছুতেই তা অবেহলা করা যাবে না। তা রেখে 'আউট বই'য়ের দিকে মনোনিবেশ করা যাবে না। না হলে তাদের ইলমি ভবিষ্যৎ দুর্বল ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

(খ) দ্বিতীয় বিষয় : মালেকি মাযহাবের বিখ্যাত ফকিহ কাজি ইবনুল আরাবি রহ. বলেন[৪৪৭] : মানুষের মস্তিষ্ক যদিও সকল প্রকার জ্ঞান সংগ্রহের জন্যই প্রস্তুত থাকে, বাস্তবতা উপলব্ধিতে সচেষ্ট থাকে, তারপরও তার জন্য সকল প্রকার জ্ঞান আত্মস্থ করা সম্ভব নয়। কারণ, আত্মস্থ ও সংরক্ষণের বিষয়টি কেবল বিশাল সমুদ্রের পক্ষেই সম্ভব; মানুষের পক্ষে নয়। কারণ, প্রাচীনকালে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেও তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি; তাহলে আমাদের মতো স্বল্পায়ু শ্রেণির জন্য কী করে তা সম্ভব হবে?! তবে হ্যাঁ, সকল ইলমের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়গুলো আত্মস্থ করা সম্ভব, সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেগুলোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব।[৪৪৮]

আবু হিলাল আল-আসকারি রহ.-এর রচিত الحث على طلب العلم গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে (খুব সম্ভবত এটি নিযাম রহ.-এর উক্তি) : যে ব্যক্তি সকল ইলমকে আত্মস্থ করতে চায়, তার পরিবারের উচিত তার সুচিকিৎসা করা। তাকে নিয়ে কোনো মনোবিদ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া। কারণ, নিশ্চয় সে কোনো অস্বাভাবিক বিষয়ে প্রভাবিত হয়ে এ রকম অসম্ভব কল্পনা করছে।'

ঠিক এর এক পৃষ্ঠা পরই তিনি বলেন : ইমাম যুহরি বলেছেন, একজন ব্যক্তি যখন ইলম অন্বেষণের সূচনা করে, তখন তার অন্তর থাকে ছোটো ও সংকীর্ণ; কিন্তু কিছুদিন পরই তা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পরিণত হয়; তাতে যা-ই দেওয়া হয়, তাই সে তখন গ্রহণ করে নেয়।'

এর ব্যাখ্যায় আবু হিলাল আল-আসকারি রহ. বলেন : আমার বক্তব্য হলো, তিনি তার উক্তির মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রথমবার হিফজ করার সময় কিছুটা কষ্ট অনুভূত হয় মানুষের। এরপর অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা সহজ হয়ে যায়।

---

[৪৪৭] قانون التأويل : ৫০৪-৫০৬

[৪৪৮] আর এটাই বাস্তব। আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসি রহ. আরেকটু আগে বেড়ে বলেছেন : জ্ঞানীগণ বলে থাকেন, বিভিন্ন জ্ঞানের সমাবেশ বুদ্ধি-বিবেচনাকে বিপথগামী করে তোলে।' দেখুন, الآداب الشرعية : ২/১২৫

এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ : শায়খ আবু আহমদ আল-আসকারি-আস-সুলি থেকে, তিনি হারেস বিন আবি উসামা থেকে বর্ণনা করেছেন : পূর্ববর্তী আলেমগণ বলতেন—দুনিয়াতে যত রকম পাত্র আছে, তাতে যতই তুমি কিছু রাখতে থাকবে, সে ততই সঙ্কীর্ণ হতে থাকবে; তবে এর ব্যতিক্রম হলো অন্তর, তাতে তুমি যতই সংরক্ষণ করবে, ততই সে প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত হতে থাকবে।'

ইমাম ইবনে শিহাবের তার ছাত্র ইউনুস বিন ইয়াযিদ আল-আইলিকে দেওয়া ওসিয়তের সারমর্মও প্রায় এ রকম—

> 'হে ইউনুস, কখনো ইলমের আগে যেতে চেয়ো না; কারণ ইলম হচ্ছে একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকা, যতই তা থেকে তুমি গ্রহণ করবে ততই তোমাকে নিয়ে সে ভ্রমণ করতে থাকবে; বরং ইলম তুমি দিন-রাতের বিবর্তনের সাথে পর্যায়ক্রমে অর্জন করো। কখনো একদফায় সম্পূর্ণ ইলম আত্মস্থ করার চেষ্টা করো না। যদি একদফায় অর্জন করো, তবে তা এক মুহূর্তেই চলে যাবে (দ্রুত ভুলে যাবে)। ধীরপদক্ষেপে সময় ও দিনরাতের পরিভ্রমণের সাথে সাথে তা অর্জন করো!'

(গ) তৃতীয় বিষয় : উস্তাদ প্রথম ও দ্বিতীয় মারাহালায় তালিবুল ইলমদের কেবল ছোটো ছোটো মাসআলা ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেখাবেন। একজন মা যেমন তার ছোট্ট শিশুকে ধীরে ধীরে সবকিছু শিক্ষা দেয়, তার বেড়ে ওঠা, খাদ্যগ্রহণ ও চঞ্চলতা বুঝে পর্যায়ক্রমে যেভাবে তিনি সন্তানকে শেখাতে থাকেন, তেমনি শিক্ষকও তার ছাত্রদের ধীরে ধীরে ও পর্যায়ক্রমে শেখাবেন। একজন মায়ের জন্য যেমন তার ছেলেকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিভরা খাদ্য খাইয়ে এক দিনে এক বছর বড়ো করে তোলার চেষ্টা করা অন্যায়; তেমনি শিক্ষকের জন্যও তার প্রাথমিক স্তরের ছাত্রদের ইখতেলাফ, দলিলসহ এবং বড়োদের জন্য প্রযোজ্য সম্পূর্ণ বা সবগুলো মাসআলা একবারে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করাও অন্যায়।

আলিমে রাব্বানির ব্যাখ্যাটা তাদের কাছে এরূপ

ইমাম বুখারি রহ. كتاب العلم -এর দশম অধ্যায়ে বলেছেন, রাব্বানি হলো যারা বড়ো ইলম শিক্ষাদানের পূর্বে ছোটো ইলম শিক্ষা দিয়ে মানুষদের গড়ে তোলে।'

মাজদ ইবনুল আসির রহ. বলেন, রাব্বানি শব্দটি 'রাব' থেকে এসেছে। যার অর্থ গড়ে তোলা, প্রতিপালন করা। আগেকার রাব্বানিগণ বড়ো জ্ঞান শিক্ষাদানের আগে শিক্ষার্থীদের ছোটো জ্ঞান শিক্ষা দিতেন।[৪৪৯]

---

[৪৪৯] النهاية : ২/১৮১

ইমাম বায়যাভি রহ. তার প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থের শুরুতে বলেন, রাব শব্দটি তারবিয়াত থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো, কোনো বস্তুকে ধীরে ধীরে এবং পর্যায়ক্রমে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া। উস্তাদ তার ছাত্রদের জন্য 'মুরব্বি'। তাই উস্তাদ ধীর পদক্ষেপে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে শিক্ষার্থীদের ইলমি উচ্চতার দিকে নিয়ে যাবেন।[৪৫০]

ইমাম শাতেবি রহ. থেকে বর্ণিত উক্তিটিও এ কথার সমর্থন করে, 'জ্ঞানমাত্রই তা প্রচার করে দেওয়া অনুচিত।' তিনি আরও বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কাছে এমন ইলম প্রকাশ করা যাবে না, যা পরিণত শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়; তাদের বরং ছোটো ছোটো ইলম থেকে পড়ানো শুরু করতে হবে।'

প্রতিষ্ঠিত আলিমের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এই স্তরের লোকদের 'রাব্বানি' তথা আল্লাহভীরু, প্রজ্ঞাবান, বিদগ্ধ প্রশিক্ষক, ফকিহ, বুদ্ধিমান হিসেবে অভিহিত করা হয়। কারণ, তারা ছোটো ছোটো ইলম থেকে পড়ানো শুরু করেন। শিক্ষার্থীদের মন, মস্তিষ্ক ও যোগ্যতা বুঝে তাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।'[৪৫১]

এ চিন্তা থেকেই 'ইলমি মুখতাসারাত' সংকলনের ফিকির উদিত হয়েছে তাদের। এগুলো তারা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারণ করতেন। এগুলো আত্মস্থ করে ফেললে এরপর বড়ো ও প্রশস্ত জ্ঞান দান করতেন।

আমাদের পূর্বসূরিগণ কিতাবকে দলিলমুক্ত করে মানুষকে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে দূরে সরানোর উদ্দেশ্যে এসব ইলমি মতন ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেননি।

উপরিউক্ত লক্ষের ফলে ইলমি মতনগুলো খুললে সেখানে শুধু মাসআলার সূচনা ও মূল বিষয়গুলোই আপনার চোখে পড়বে। সেখানে শাখাগত বিস্তারিত আলোচনার কোনো অস্তিত্ব নেই। দেখবেন, কেবল এক মাযহাবের বিধান এবং তাদের ইমামদের মতামত সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে। দলিল বা বিতর্কের দিকটি সেখানে বর্জন করা হয়েছে। খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

তালিবুল ইলমগণ সেগুলো আয়ত্ত করে ফেললে এরপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শরাহ-শরুহাতের দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। সেখানে তাদের জন্য মাযহাবের বিভিন্ন মতামত, ইমামদের কথা, দলিল এবং বিধান মেনে নেওয়ার কারণগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৪৫০] آداب الفقيه والمتفقه : ১/১৮৪

[৪৫১] ৪/২৩২

শিক্ষাজীবনের শুরুতে একসময় আমরা ভাবতাম যে, ব্যাখ্যা তো করা হয় মাসআলা বোঝার জন্য, তো ব্যাখ্যাছাড়া কেবল কঠিন ইবারাতগুলো দেখে তখন আমরা ভয় পেয়ে যেতাম। পরে বুঝে আসে যে, এখানে উদ্দেশ্য কেবল ফায়দা অর্জন করা এবং দলিল হিসেবে গ্রহণ করা। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান গ্রহণের জন্য যোগ্য করা তোলা।

ইলম ও তালিমের বিষয়ে ধীরপদক্ষেপের উপকারিতা

শিক্ষার্থীদের উক্ত নিয়মে শিক্ষাদান করার মাধ্যমেই তাদের ইলমের ভিত্তি মজবুত হবে। ধীরে ধীরে তাদের ইলম পরিপক্বতা লাভ করবে। দূরদর্শিতা তৈরি হবে তাদের মাঝে। আর ইলম অর্জনের জন্য এটিই সবচেয়ে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য পন্থা। তালিবুল ইলমদের যদি আল্লাহ তাআলা অধিক সাধনা ও অধ্যবসায়ের সুযোগ তৈরি করে দেন, তবে সে ইলমি জীবনে সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকবে। আর যদি সে এ ভিত্তির ওপর গড়ে না ওঠে, তবে তার সুনাম ও সুখ্যাতি যতই ছড়িয়ে পড়ুক; সন্দেহ নেই, তার জ্ঞান-সাধনা চরম হুমকির মুখে পড়ে যাবে।

বর্তমানে ইলম যে অপ্রত্যাশিত বিলুপ্তির মুখে পড়েছে, তার জন্য দায়ী সেসব নামধারী আলিম যারা এ দুটো নিয়মে ইলম অর্জন করেনি। ধীরপদক্ষেপে এবং শায়েখদের নির্দেশিত পন্থায় তারা জ্ঞান আহরণ করেনি।

কারণ, আপনি দেখবেন একজন আধুনিকমনা ধার্মিক যুবক প্রথমেই سبل السلام গ্রন্থ অধ্যয়ন করছে। এর দ্বিতীয় দিনই সে نيل الأوطار এর মতো বিশাল ও বৃহৎ কিতাব হাতে নিয়েছে। তৃতীয় দিন সে المحلى অধ্যয়ন শুরু করেছে। তো তার জন্য ইলম ও মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে আর কী বাকি রইল?! তবে কি এই তিনদিনেই সে বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ আলেমে দ্বীন হয়ে গেছে?! বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে কীভাবে আদব অবলম্বন করতে হয়, সে জ্ঞান তার কোত্থেকে আসবে?! المحلى গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় কুরআন-সুন্নাহর বাহ্যিক ও স্পষ্ট বিধানের ওপর আমলের ধোঁয়া তুলে ইমামদের কঠোর সমালোচনা ও তাদের গালমন্দ করা হয়েছে। نيل الأوطار গ্রন্থে বর্ণিত ইজমা ও ইজমার দাবিদারদের নিন্দা ও সমালোচনা পড়ার পর আর কীভাবে সে ইমামদের মাযহাব অনুসরণ করবে?!

তারজুমানুল কুরআন, বিদগ্ধ আলেম ও মুফাসসির এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে, যা তখনকার খলিফা আমিরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-ও সে ব্যাপারে তার সঙ্গে একমত হন।

আবদুর রাযযাক তার মুসান্নাফ গ্রন্থে الخصومة في القرآن অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার খলিফা ওমর রা.-এর কাছে একলোক এলে তিনি তাকে মানুষের কুরআন-শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে সে বলে, হে আমিরুল মুমিনীন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এত এত পড়ে ফেলেছে! তা শুনে ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর শপথ, অল্প কয়েক দিনে কুরআনুল কারিম শেখার ব্যাপারে তাদের এ অভাবনীয় অগ্রগতি আমার কাছে ইতিবাচক মনে হচ্ছে না। এ কথা শুনে খলিফা ওমর আমাকে থামিয়ে দেন। ইবনে আব্বাস বলেন, এরপর আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে আসি। মনে মনে বলি, ওই লোকের কারণে আজ আমি নীচু হয়েছি। তার কাছে আমি গুরুত্বহীন হয়ে গেছি। তিনি বলেন : ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি আমি। বাড়ির মহিলারা এসে আমার খোঁজ নেয়। কোনো ক্ষুধা ছিল না আমার পেটে। কিছুক্ষণ পরই খলিফা ওমর নিজে আমার বাড়ি চলে আসেন।

তিনি বলেন : আমি পেরেশান হৃদয়ে ঘরে বিছানায় শুয়ে ছিলাম এমন সময় এক লোক এসে বলে, আমিরুল মুমিনীন আপনাকে ডাকছেন! দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি, তিনি আমার ঘরের দরজায় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে বলেন, একটু আগে লোকটি যে কথাগুলো বলেছে, তা তোমার অপছন্দ হলো কেন? আমি বলি, হে আমিরুল মুমিনীন, আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি, তবে আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার ও তাওবা করছি। আপনি চাইলে আমি আমার কথা প্রত্যাহার করে নেব। তিনি বলেন, লোকটির কথা থেকে নেতিবাচক কী মনে হয়েছে তোমার? বলি, হে আমিরুল মুমিনীন, তারা যতই দ্রুত ও তড়িঘড়ি করে কুরআন শিখবে, ততই নিজের মতকে তারা প্রাধান্য দিতে শিখবে। যতই তারা নিজের মতকে হক মনে করবে, ততই তাদের মাঝে বিবাদ ছড়িয়ে পড়বে। যতই তাদের মাঝে বিবাদ ছড়াবে, ততই তারা মতবিরোধে লিপ্ত হবে। যতই তারা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত হবে, ততই তারা আপসে মারামারি ও সংঘাতে লিপ্ত হবে। এ কথা শুনে ওমর রা. বলেন, তোমার পিতার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন–এ কথাটিই দীর্ঘদিন ধরে আমি আমার মনে গোপন রেখেছিলাম; শেষ পর্যন্ত তোমার মাধ্যমেই আল্লাহ তা প্রকাশ করালেন।[৪৫২]

---

[৪৫২] مصنف عبد الرزاق : ২০৩৬৮ المعرفة والتاريخ : ১/৫১৬-৫১৭ মুস্তাদরাক : ৩/৫৪০-৫৪১

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরুব্বি শায়খ আবদুল করিম রিফাই[৪৫৩] বলেন : 'পরিণত বয়সিদের খাদ্য অপরিণতদের জন্য বিষ।'

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ সাইদ আল-বানি দামেস্কি[৪৫৪] عمدة التحقيق গ্রন্থে বলেন: উসুলে ফিকহ পড়ার সময় একবার আমি আমার শায়খ আবদুল হাকিম আল-আফগানি রহ.-কে এই ইলমের ফায়দা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তরে বলেন, উসুলে ফিকহের ফায়দা হলো ইজতেহাদের যোগ্যতা তৈরি হওয়া। আমি বলি, অনেকে তো বলেন ইজতেহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে! তিনি অবাক হয়ে বলেন, কে বন্ধ করল ইজতেহাদের দরজা? আল্লাহ তোমাকে সংশোধন করুন! কিন্তু তোমাদের দেশের অনেকেই ইজতেহাদের দাবি করে অথচ সে এখনো 'নুরুল ইযাহ' গ্রন্থটিও পড়েনি।

আমি বলব, আল্লাহ তাআলা শায়খ আবদুল করিম রিফাইর প্রতি রহম করুন। তিনি যদি আমাদের এ জমানা পেতেন, যেখানে মূর্খ ও নীচু লোকের ইজতেহাদের দাবি তুলে পূর্ববর্তীকালের মুজতাহিদীনের চেষ্টা-পরিশ্রমকে খাটো করে দেখছে। তথাকথিত ইত্তেবায়ে সুন্নাত ও সালাফের অনুসরণের নামে ইমামদের ওপর ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করছে।

মাসআলা বোঝার ক্ষেত্রে অবসন্নতা পরিহার

একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী এটি। শায়খের উচিত হলো প্রতিটি মাসআলা বোঝানোর ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া :

১. বিভিন্ন দিক থেকে সবক আত্মস্থ ও মুখস্থ করানো। আভিধানিক শব্দ হলে শাব্দিকভাবে তা আত্মস্থ করানো। পারিভাষিক হলে ফিকহি বা উসুলগতভাবে মূল সূত্র থেকে তা মুখস্থ করানো। শিক্ষার্থীরা তা উস্তাদকে জিজ্ঞেস করেও বের করতে পারে বা নিজে অনুসন্ধান করেও বের করতে পারে।

২. ইলমি কোনো মাসআলাকেই তুচ্ছ ভেবে এ কথা না বলা যে, এটি পরবর্তী মারহালাতে গিয়ে বুঝবে, এখানে দরকার নেই। এখানে জিজ্ঞেস করা অযৌক্তিক। অথবা এর ব্যবহার বিরল; এ-জাতীয় কোনো বাহানার আশ্রয় না নেওয়া।

বরং প্রতিটি বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে তুলে ধরা। তার মস্তিষ্কে উত্তমরূপে সেটি বসিয়ে দেওয়া, যেন এ ব্যাপারে তার মনে কোনো

---

[৪৫৩] (মৃত্যু : ১৩৯৩ হি. দামেস্কে)
[৪৫৪] (মৃত্যু : ১৩৫১ হি.)

সন্দেহ-সংশয় না থাকে। এভাবে একজন ছাত্রের ভবিষ্যৎ আলোকিত হয়ে ওঠে। ইলমের প্রতিটি বিষয়ে সে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে। সুষ্ঠুভাবে তা পরিমাপ করে যথাস্থানে তার প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়। ইলমি আলোচনা-পর্যালোচনাগুলোতে ওই বিষয়ে সে মুক্ত অংশগ্রহণে সমর্থ্য হয়।

ইমাম শাফেঈ রহ. এ দুটো বিষয়কে সংক্ষিপ্ত কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো বিদ্যা শেখে, সে যেন সূক্ষ্মভাবে তা নিরীক্ষণ করে, যেন ইলমের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও তার হাতছাড়া না হয়।'[৪৫৫]

এই সতর্কবার্তার প্রকৃত উৎস হলো ইবনে মুঈনের সাথে ঘটিত ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি ঘটনা। খতিবে বাগদাদি রহ. বর্ণনা করেন যে, একবার ইমাম আহমদ রহ. ইবনে মুঈনকে দেখেন এক কোণে বসে বিখ্যাত রাবি মা'মারের বর্ণনাগুলো 'আবান' থেকে, আর তিনি আনাস রা. থেকে এ সূত্র ধরে একটি গ্রন্থ রচনা করছেন। যখনই কেউ তা দেখতে যায়, তিনি লুকিয়ে ফেলেন। তা দেখে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, আপনি জানেন যে, এটি একটি জাল-বানোয়াট গ্রন্থ, তারপরও আপনি তা লিখছেন?! উত্তরে ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন বলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন হে আবু আবদুল্লাহ, আমি এ গ্রন্থটি রচনা করছি তা মুখস্থ করার জন্য। আর আমি জানি এটি জাল; যেন কেউ এসে আমাকে বর্ণনাকারী 'আবান'-এর স্থলে 'সাবিত' বসিয়ে عن معمر عن ثابت عن أنس না বলতে পারে। কেউ এরূপ করলে তখন আমি বলে দেব–তুমি মিথ্যে বলছ, অবশ্যই এটি عن معمر عن أبان عن أنس হবে।[৪৫৬]

এর পর পরই খতিব রহ. উক্ত মনীষীদের সমকালীন ব্যক্তিত্ব ইসহাক বিন রাহওয়াই থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি এক লক্ষ হাদিসের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে অবগত আছি। আমি যেন সেগুলো নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছি। এর মধ্যে সত্তর হাজার হাদিস আমি সহিহরূপে অন্তরে মুখস্থ রেখেছি। আর চার হাজার জাল হাদিসও আমি আত্মস্থ করেছি। জাল হাদিস মুখস্থ করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : আমার মুখস্থ সত্তর হাজার হাদিসের মধ্যে যেন কোনো জাল ঢুকে না যায়, তা সহজে ধরার জন্যেই জাল হাদিসগুলো মুখস্থ করেছি।[৪৫৭]

---

[৪৫৫] ইমাম বায়হাকি রহ. তার مناقب -এ ইমাম শাফেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন : ২/১৪২

[৪৫৬] الجامع : ১৬৩৮

[৪৫৭] ১৮৩৪

এ কারণেই তালিবুল ইলমের উচিত, ইলমের সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও আত্মস্থ করা। যেন অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো দুর্ঘটনা বা দুর্ভাবনায় না পড়তে হয়।

তালিবুল ইলমদের উপকারী সব কিতাবের সন্ধান দেবেন উস্তাদ

দ্বিতীয় পথনির্দেশ শেষ করার আগে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছা করেছি। আর সেটি হলো, ধীরে ধীরে উপকারী সব বিষয়ের গ্রন্থসংবলিত সমৃদ্ধ একটি পাঠাগার গড়ে তোলা। কিতাব হলো ছাত্রদের বিচরণক্ষেত্র। তার আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের প্রধান উৎস। ভবিষ্যৎ ইলমি জীবন গঠনের মূল ভিত্তি। তাই তালিবুল ইলমকে অবশ্যই উপকারী মাকতাবা বা গ্রন্থাগারে যাতায়াত করার অভ্যাস করতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে সেখানে। কিন্তু শিক্ষাজীবনের শুরুতে অতিরিক্ত বা 'আউট' বই কেনা ও তাতে মনোযোগ দেওয়া থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সে সময় শিক্ষাসূচির বইগুলোই সে যথানিয়মে বিজ্ঞ উস্তাদের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করতে থাকবে। যদি পড়তেই হয়, তবে বিজ্ঞ কোনো শায়খ বা উস্তাদের নির্দেশনামতে পড়বে। কিতাব ও ইলমি উৎসের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত পরামর্শছাড়া নিজ থেকে কোনো কিতাব ক্রয় ও তাতে মনোনিবেশ করা থেকে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রযুক্তি ও গণমাধ্যম থেকে সতর্কতা অবলম্বন

বর্তমান যুগের তালিবুল ইলমদের সমকালীন সব ধরনের নব্য প্রযুক্তি থেকে ইলম অর্জন এবং তাতে মনোযোগ প্রদান থেকে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমান যুগের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ঢালাওভাবে এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গেছে। তথাকথিত সংস্কৃতিচর্চার নামে তারা যে অবাধ ফেতনার দিকে ঝুঁকছে, তা চরমভাবে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এগুলো দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকার ও ক্ষতিই বেশি হচ্ছে। তালিবুল ইলমকে এগুলোতে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পাশাপাশি উস্তাদ তাদের ছাত্রদের এবং অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের এ মরণব্যাধি থেকে নিয়মিত বারণ করবেন। বরং সব সময় তাদের প্রতি খেয়াল রাখবেন। তাদের দৃষ্টির ভেতরে রাখবেন। বিভিন্ন রকম প্রশ্ন ও সংশয় ছুড়ে দিয়ে প্রযুক্তিনেশার ব্যাপারে তাদের পরীক্ষা করবেন এবং সেমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শিক্ষক যদি কোনো ছাত্রের মধ্যে কিতাব ক্রয় ও সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করেন, তবে তাকে তার স্তর, মেধা ও ক্লাস বুঝে উপযুক্ত কিতাবের সন্ধান দেবেন। ধীরে ধীরে তারা যেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। উস্তাদ তালিবুল ইলমদের তাদের দেশ ও জাতিগত অবস্থা বিবেচনা করেও তাদের

পথনির্দেশ করতে পারেন। যেন সেভাবেই সে প্রস্তুত হয়। নিজ অঞ্চলে গিয়ে সেমতে মানুষের মাঝে ইসলাহ ও তালিমের কাজ করে যেতে পারে।

যে তালিবুল ইলম নিজের তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক পাথেয় অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করে না, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজের মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটায় না, তার মাঝে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না। যেটি আমরা বর্তমান অনেক শিক্ষার্থীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারি। তারা এমন অবস্থায় পড়ালেখা শেষ করে যে, পাঠ্যসূচির বইগুলো পর্যন্ত তাদের সংগ্রহে থাকে না!!

ইলমের মৌলিক গ্রন্থগুলো যদি তার কাছে না থাকে, তবে কী করে সে সেগুলো পাঠ করবে এবং যথাযথভাবে তা অধ্যয়ন করে কাজে লাগাবে?! কীভাবে তার জ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন হবে?!

এখানে বিশেষভাবে আমার উদ্দেশ্য হলো ইসলামি গ্রন্থমালা। যেমন মুতালাআর সময় কোনো শব্দের 'তাহকিক' অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে, সূক্ষ্ম কোনো অর্থ খোঁজার দরকার হলে বা ফিকহি কোনো পরিভাষা জানার প্রয়োজন হলে المصباح المنير এবং القاموس المحيط -এর শরণাপন্ন হবে।

প্রতিটি বিষয়ের মৌলিক গ্রন্থমালা সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, তালিবুল ইলমের সামনে যদি এমন কোনো ফিকহি মাসআলা আসে, যার ইবারাতে থাকে দুর্বোধ্যতা বা জটিলতা; অথবা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে তাতে, তবে তার কাছে যদি ওই বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ বা সহায়ক কোনো গ্রন্থ না থাকে, তবে কী করে সে মাসআলার সমাধান বের করবে..!!

তালিবুল ইলমের জন্য কিতাব সঞ্চয় ও অধ্যয়নের গুরুত্ব, এর তাৎপর্য এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে তা একত্র করাও দুরূহ। আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস। তাঁর কাছেই তাওফিক প্রার্থনা করছি।

* * * *

চতুর্থ পথনির্দেশ

ভাষাকে বিশুদ্ধ ও আকর্ষণীয় করতে জোর পদক্ষেপ গ্রহণ

যাদের আল্লাহ তাআলা তালিম-তারবিয়াতের নেয়ামতে ভূষিত করেছেন, তাদের অনেকগুলো দায়িত্বের অন্যতম হলো তালিবুল ইলমদের মুখের শব্দোচ্চারণ বিশুদ্ধ করা এবং গুছিয়ে বলার ওপর তাদের অভ্যস্ত করানো। এখানে দুটি বিষয় উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে :

ইবারাতের প্রসিদ্ধ সব ভুলগুলো শুধরে দেওয়া। এগুলো থেকে তাদের সতর্ক করা। এমন ভুল প্রায়ই পাওয়া যায়। কিছু কিছু তো পূর্ববর্তীকালের অনেক আলেমের কলম থেকেই বেরিয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের আলেমগণ আবার তা সংশোধনের প্রয়াস চালিয়েছেন। শুধু ভুলগুলো শুদ্ধ করতেই তারা রচনা করেছেন বহু গ্রন্থ। এক্ষেত্রে أدب الكاتب-এর গ্রন্থকার ইমাম ইবনে কুতাইবা রহ.-কে অগ্রবর্তী বলা যায়। তাঁর সমকালীন অনেক মনীষীও এ ব্যাপারে কলম ধরেছেন। ইমাম নববি রহ.-ও তার গ্রন্থগুলোতে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনকি تهذيب اللغات নামে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন এ ব্যাপারে।

শব্দোচ্চারণ বিশুদ্ধ করার বিষয়ে দুটি দায়িত্ব এসে বর্তায় :

১. কিছু পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীকালের আলেমদের মুখে উচ্চারিত আরবদের ব্যবহারের সঙ্গে অমিল হাতেগোনা ভুল শব্দগুলো শুদ্ধ করা।

২. অনারবি শব্দগুলোর সঠিক ইরাব নির্ধারণ করা।

শব্দোচ্চারণ সংশোধনের ব্যাপারে প্রথম দায়িত্ব : মুখে মুখে প্রসিদ্ধ সব ভুলের সংশোধন করা। যেমন, فلان عالم نَحَوِي এটি ভুল। শুদ্ধ উচ্চারণ হবে حاء - এর ওপর সাকিন দিয়ে। কারণ, এখানে ইলমে নাহুর প্রতি 'নিসবত' করা হয়েছে। অনেকে বলেন, فعلت كذا لأجل كذا এটি ভুল। সঠিক হলো من أجل كذا । অনেকে আবার أجب على الأسئلة التالية বলে থাকেন। অথচ শুদ্ধ উচ্চারণটি হবে عن الأسئلة التالية। অনেক সময় লেখা দেখা যায় : المتوفِّي অথচ এটি ভুল। শুদ্ধ উচ্চারণ হলো المتوفَّى (فاء-এর ওপর ফাতহা)[৪৫৮]।

---

[৪৫৮] এভাবেই তা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। ইমাম সাখাভি রহ. الإعلان بالتوبيخ গ্রন্থের আর-রিসালা প্রকাশনীর ছাপায় علم التاريخ عند المسلمين অধ্যায়ের অধীনে ৪৫৩ নং

অনেক মুহাক্কিকীন তাদের তাহকিকের ভূমিকায় লিখে থাকেন قابلت الكتاب على مخطوطتين এটি ভুল। সঠিক হলো قابلته بمخطوطتين। অনেক সময় লেখা থাকে سقْط এটি ভুল। সঠিক হলো سقَطَ। অনেকেই লেখেন بل ولا بد من كذا এটি চরম ভুল। সঠিক হলো মাঝখান থেকে واو বিলুপ্ত করা। কারণ, এক হরফে-আতফের ওপর অন্য হরফে-আতফ প্রবেশ করা ব্যাকরণসিদ্ধ নয়। অনেক সময় বলতে শোনা যায় الشؤون القُروية والمؤتمرات الدُولية এটি ভুল। সঠিক হলো الشؤون القَروية والمؤتمرات الدَّولية, কারণ এগুলো যথাক্রমে একবচন قرية এবং دولة এর দিকে 'নিসবত' হয়েছে।

শব্দোচ্চারণ শুদ্ধ করার বিষয়ে উস্তাদের দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো : উস্তাদ নিজেও এগুলো শুদ্ধ করবেন এবং তালিবুল ইলমদেরও শুদ্ধ করিয়ে দেবেন। কোনো অনারবি বা বিদেশি শব্দকে আরবি ভাষায় প্রবেশ করানো যাবে না। কারণ, ভাষা একজন ব্যক্তির জাতিগত ও ভাষাগত মূল্যবোধ চেনার সর্বোত্তম উপাদান। তা-ই যদি হয়, তবে পুরো উম্মাহর জাতিগত ও ভাষাগত মূল্যায়ন করা কতটুকু দরকার হবে?! ভাষাকে অবহেলা করা পুরো একটি জাতির অধঃপতনের জন্য যথেষ্ট। তাই অনারবি শব্দকে এড়িয়ে চলতে হবে। নিজ ভাষায় বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ রুখতে হবে। মাতৃভাষা নিয়ে সকলকে গর্ববোধ করতে হবে। যেমন, ছাত্রদের সামনে 'বুক' না বলে আমি 'কিতাব' বলব। 'টেলিফোন' না বলে هاتف বলব। ফ্যাক্স না বলে فقس বলব। মোবাইল না বলে جوال বা نقال বলব। কিডনি বা كيدون না বলে مقود বলব। শোফার না বলে سائق বলব ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের মুখ থেকে কখনো এ রকম বেরিয়ে গেলে সাথে সাথে তাদের সতর্ক করে দিতে হবে। পুনরুচ্চারণের তাগিদ করতে হবে।

পৃষ্ঠায় এবং দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা-এর ছাপায় ৮৫ নং পৃষ্ঠায় বলেন, 'দ্বিতীয় ফায়দা এই– অনেকে বলে থাকেন فلان المتوفِّي (ফা-য়ের নিচে কাসরা দিয়ে)। এখানে 'ফাতহা' দিয়েও পড়া যায় আবার কাসরা দিয়েও। কাসরা দিয়ে পড়লে উদ্দেশ্য হবে المستوفي لمدة حياته। এ ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে তিনি আল-কুরআনের বাণী والذين يُتوفون منكم .. الآية টি উপস্থাপন করেন, যেখানে আলি রা. থেকে বর্ণিত একটি ক্বিরাআতে ياء -তে ফাতহা দিয়ে পড়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে يستفون آجالهم (তারা তাদের জীবনের নির্ধারিত আয়ু পূর্ণ করে ফেলেছে)। বিস্তারিত জানার জন্য উল্লিখিত গ্রন্থদুটো দ্রষ্টব্য। তাছাড়া روح المعاني للعلامة آلوسي : ৩/৩২৩ এবং البحر المحيط : ২/২২২ দেখা যেতে পারে।

এ পথনির্দেশের দ্বিতীয় বিষয় হলো : কথাবার্তায় মার্জিত শব্দ ব্যবহার। উস্তাদ নিজে ছাত্রদের সম্বোধনকালে, তাদের শায়েখদের নাম স্মরণকালে এবং পূর্ববর্তী আলেমদের নাম এবং তাঁদের কীর্তি উল্লেখকালে তাদের সামনে কোমল ও মার্জিত ভাষা ব্যবহার করবে।

এ বিষয়ে আমি বিশিষ্ট ফকিহ মুযানি রহ.-এর সাথে তার শায়খ ইমাম শাফেঈ রহ.-এর ঘটনাটি উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। মুযানি রহ. বলেন : একবার এক লোকের ব্যাপারে আমি মন্তব্য করি যে, সে মিথ্যাবাদী। এ কথা শুনে ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, হে আবু ইবরাহিম, ভাষা নরম করো। মার্জিত ভাষায় বলো! 'অমুক মিথ্যাবাদী' না বলে বরং বলো : 'তার কথার কোনো ভিত্তি নেই!'[৪৫৯]

তালিবুল ইলমদের কানে ইমাম আহমদ রহ.-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি পৌঁছে দেওয়া উচিত, যা ইসহাক বিন ইসমাইল আত-তালকানিকে লক্ষ করে তিনি বলেছিলেন। ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদির ব্যাপারে সে সমালোচনা উচ্চারণ করেছে শুনতে পেরে ইমাম আহমদ রহ. তাঁকে বলেছিলেন : কী হলো তোমার, ইমামদের এভাবে স্মরণ করতে নেই!

কাজি ইয়ায তার শায়খ ইমাম আবু আলি আস-সাদাফি রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজ শায়খ ইমাম আবু মুহাম্মদ রিযকুল্লাহ বিন আবদুল ওয়াহহাব আত-তামিমি আল-হাম্বালিকে[৪৬০] বলতে শুনেছেন : ধিক তোমাদের, আমাদের থেকে ইলম শিখে আমাদেরই সমালোচনা করো তোমরা? একটুও সহানুভূতি উদয় হয় না আমাদের প্রতি?!!'[৪৬১] এ-জাতীয় ঘটনা বর্ণনা করে তালিবুল ইলমদের অনুপ্রাণিত করা উচিত। আদব শিক্ষা দেওয়া উচিত তাদের।

ইমাম নববি রহ.-এর স্মরণীয় উক্তিটিও এর আগে গত হয়েছে যে, সরাসরি উস্তাদ ও শায়খ এবং তাদের পূর্বসূরি আলেমগণ হলেন তালিবুল ইলমদের ইলমি পিতা বা পিতামহতুল্য। তা-ই যদি হয়, তবে একজন মুসলমান কী করে তার পিতা ও পিতামহদের ওপর ক্ষিপ্ত হতে পারে?! তাদের তিরস্কার করতে পারে?!

আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরিফে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : 'কেউ তোমার প্রতি দয়া করলে তাকে তার প্রতিফল দিয়ে দিয়ো! প্রতিফল দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তার জন্য

---

[৪৫৯] فتح المغيث : ২/২৯২
[৪৬০] (৪০০-৪৮০ হি.)
[৪৬১] الإلماع : ২২৬-২২৭

বেশি করে দোয়া করো। এমনভাবে দোয়া করবে, যেন মনে হয় তার প্রতিদান আদায় হয়ে গেছে।' হাদিসের একাংশ এটি, যার সনদ সহিহ।[৪৬২]

একজন লোক যদি তোমার পার্থিব কোনো উপকার করে, তবে তার প্রতিফল প্রদান (এমনকি দোয়া দিয়ে হলেও) যদি ইসলামের শাশ্বত শিষ্টাচার হয়ে থাকে, তবে যে উস্তাদ তোমাকে তোমার ধর্ম, তোমার পরিণাম, আখেরাত এবং সকল শিষ্টাচারের শিক্ষা দিচ্ছেন, তার প্রতি কীরূপ প্রতিফল ও আচরণ অবলম্বন করা উচিত তোমার?!!

যদি কেবল শায়খদেরই এ প্রাপ্য থাকে, তবে যারা শায়খদের ওপরের স্তরে আছেন, যারা তাদেরও ওপরের স্তরে আছেন; যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর মহান দ্বীনকে কেয়ামত পর্যন্তের জন্য স্থায়িত্ব দিয়েছেন, তাদের প্রতি কীরূপ আচরণ অবলম্বন করা উচিত? ইসলামের সূচনালগ্নে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ সারা বিশ্বজুড়ে দ্বীনের ঝান্ডা উঁচু করেছেন, শরিয়তকে আমাদের পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, তাদের প্রতি আমাদের কীরূপ শিষ্টাচার অবলম্বন করা উচিত?! তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন! এরপর কী রকম শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত মানবতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, তাদের মুক্তির দূত মহানবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি?! সীমাহীন মর্যাদার পাত্র তিনি। শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী তিনি। উম্মতের পক্ষ হতে একজন নবিকে যতটুকু মর্যাদা দেওয়া উচিত, আল্লাহ তাঁকে এর চেয়েও বেশি মর্যাদা দান করুন!!

* * * *

---

[৪৬২] আবু দাউদ : ১৬৬৯ নাসাঈ : ২৩৪৮

পঞ্চম পথনির্দেশ

শব্দের আভিধানিক অর্থে সূক্ষ্ম গবেষণার গুরুত্ব

আদর্শ উস্তাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো, ছাত্রদের তিনি সূক্ষ্মভাবে ইলমি বাহাস অনুসন্ধানের ওপর অভ্যস্ত করবেন। এর প্রধান মাধ্যম হলো, আরবি শব্দের আভিধানিক অর্থ ও বিশ্লেষণগুলো খুঁজে বের করতে ছাত্রদের তিনি উৎসাহিত করবেন। চাই সেটি কুরআনের কোনো শব্দ হোক, হাদিসের কোনো শব্দ হোক; শিক্ষার্থী কোনোভাবেই যেন শব্দের বাহ্যিক অর্থের ওপর সন্তুষ্ট না থাকে। কারণ, এটি তার জন্য আয়াত, হাদিস বা কোনো কবিতার মূল অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়ক হবে।

আরবি ভাষায় প্রকৃত সমার্থবোধক শব্দের অস্তিত্ব আছে কি? নাকি সেগুলোতেও পরস্পর কিছু-না-কিছু বৃহৎ, ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম কোনো পার্থক্য রয়েছে—এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে বিপুল মতবিরোধ লক্ষ করা গেছে। ছাত্রদের জন্য অতি উপকারী একটি কাজ হলো, সমার্থবোধক সবগুলো শব্দের পারস্পরিক সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করা।

সমার্থবোধক বলতে কিছু নেই

উদাহরণস্বরূপ : اللب শব্দের সূক্ষ্ম আভিধানিক অর্থ হলো– ওই বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে বহিরাগত সকল প্রতিক্রিয়া এবং মনুষ্য প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ অর্থ জানার পরই আমাদের বুঝে আসে কেন আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের একাধিক স্থানে أولي العقول ছেড়ে أولي الألباب -এর প্রশংসা গেয়েছেন। তেমনি الريب শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে যে কাউকে জিজ্ঞেস করুন, নির্দ্বিধায় সে বলবে 'সন্দেহ-সংশয়'। দলিল পেশ করবে ذلك الكتاب لا ريب فيه। আর তখনই আপনার মনে সন্দেহের উদয় হবে যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের ছয়টি স্থানে এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো, وإنهم لفي شك منه مريب । তাহলে উপর্যুক্ত অর্থ নিলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– নিশ্চয় তারা সে ব্যাপারে সন্দেহে সন্দিহান।' অর্থাৎ এক সন্দেহের কারণে তৈরি হয়েছে আরেক সন্দেহ। অথচ প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা যামাখশারি রহ. ريب -এর অর্থ বলেছেন[৪৬৩] : মনের অস্থিরতা ও সংশয়ভাব।

---

[৪৬৩] সুরায়ে বাকারার তাফসিরের শুরুর দিকে : ১/১৯

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী :

آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح.

অর্থ : 'কেয়ামতের দিন আমি জান্নাতের ফটকে এসে তা উন্মোচন করতে বলব'।

আর আমরা জানি যে, أتى ফেয়েলটি جاء ফেয়েলের অর্থে নয়; বরং إتيان হলো ধীরস্থিরে ও শান্তশিষ্টভাবে আসা। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন জান্নাতের ফটকে আসবেন রাজা-বাদশাদের মতো ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে।

কোনো আয়াতে বা হাদিসের কোনো ইবারাতে আমরা صنع كذا বাক্যটি শোনার সাথে সাথে বলে দিই যে, এর অর্থ হলো– فعل كذا । অথচ صنع এর প্রকৃত অর্থ হলো, কোনো কাজ নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করা। আল্লাহর নবি নূহ আ.-এর উক্তি কুরআনে বর্ণিত হয়েছে[৪৬৪] : ويصنع الفلك যার অর্থ হলো, (আল্লাহই অধিক জানেন) তিনি শৈল্পিক মানে এবং সুসংহত করে ওই জাহাজটি তৈরি করেছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, এই জাহাজই হবে মানবতার মুক্তির একমাত্র তরী, বিরামহীন বৃষ্টি আর বিশাল বিশাল বানের ঢেউ উপেক্ষা করে সমুদ্রের বুক চিরে চলতে হবে তাকে।'

শব্দের সূক্ষ্ম অর্থ অনুসন্ধানের বিষয়ে এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করা যায়।

অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর এই বাণী أقيموا الصلاة দ্বারা أدوا الصلاة অর্থ বুঝে থাকে। আর তখনই তার মনে প্রশ্ন উদয় হয়, কেন আল্লাহ তাআলা أدوا الصلاة না বলে বলেছেন :

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾

অর্থ : 'এবং নামাজ কায়েম করুন; নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সুরা আল-আনকাবূত (২৯) : ৪৫)

অথচ আমাদের সমাজে আমরা এমন অনেক মানুষ দেখি, যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করার পরও অশ্লীল ও গর্হিত কাজে লিপ্ত!!

এর উত্তর হলো, এখানে الإقامة শব্দের আভিধানিক অর্থ বুঝতে আমরা ভুল করেছি; অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখার বিষয়টি বুঝতে ভুল করিনি। কারণ, الإقامة হলো নামাজকে পরিপূর্ণ হক আদায় করে পড়া। নামাজের

---

[৪৬৪] সুরা হূদ : ৩৮

যাবতীয় শর্ত, রুকন, ফরজ, ওয়াজিব, মুস্তাহাব বজায় রেখে খুশু-খুজুর সঙ্গে আদায় করা। ইমামের মুখ থেকে কুরআনের পঠিত আয়াত নিয়ে 'তাদাব্বুর' করা, চিন্তা-গবেষণা করা। আর তাদাব্বুরের প্রকৃত অর্থ হলো, চিন্তা-ভাবনার পাশাপাশি নামাজের বাইরে দৈনন্দিন জীবনেও তা বাস্তবায়ন করা। ঘরে-বাইরে সব জায়গায় তা পালনে মনোযোগী হওয়া। যদি এভাবে সে নামাজ আদায় করে, তবে অচিরেই তার নামাজ তাকে সকল প্রকার অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখবেই।'[৪৬৫]

এ-জাতীয় সূক্ষ্ম অর্থ অনুসন্ধানের ব্যাপারে আল্লামা রাগেব আল-আসফাহানি রহ.-এর রচিত مفردات এবং ইবনুল আসির রহ.-এর রচিত النهاية গ্রন্থদুটি তালিবুল ইলমের অনুসন্ধিৎসা কিছুটা হলেও মেটাতে সক্ষম হবে। কিতাবদুটি সব সময় সাথে রাখার পরামর্শ রইল আহলে ইলমের প্রতি।

তাৎক্ষণিক শুদ্ধি ও সংশোধনের গুরুত্ব

এ বিষয়ে তালিবুল ইলমদের অপর দায়িত্ব হলো, তাৎক্ষণিকভাবে শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ ও বস্তুর নাম আয়ত্ত করে ফেলা। অচিরেই করব–এ ধরনের বাহানার আশ্রয় না নেওয়া। কালক্ষেপণ পরিহার করা। কোনো শব্দ পাওয়ামাত্রই যদি বিশুদ্ধ উচ্চারণে তা আত্মস্থ করে ফেলা হয়, তবে এ শব্দের ব্যাপারে সারা জীবনের জন্য তার জবান বিশুদ্ধ হয়ে গেল। এটি নিয়ে তার আর কখনো ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে না।

'নির্ভরযোগ্য' রাবির ওপরের স্তর নির্ণয় করতে গিয়ে ইমাম ও মুহাদ্দিসীন বলে থাকেন فلان ثَبْت। 'আল-মিসবাহুল মুনীর' গ্রন্থে এর অর্থ এসেছে–কোনো ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ়। কাজের ধরন ও অন্তরিচ্ছাভেদে মানুষের কাজ ও দায়িত্বের মূল্যায়ন হয়ে থাকে। একজন আলিম সব সময় নিজ ইলমে নির্ভর ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিটি তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ মুখস্থ করবে। এরপর চর্চা করবে এবং লিখে রাখবে। মুখস্থ করার সময় বিশুদ্ধ উচ্চারণের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে নেবে। আভিধানিক অর্থ আয়ত্ত করবে। প্রধান প্রধান ইলমি বিধানকে হৃদয়ঙ্গম করবে। এ ক্ষেত্রে বিষয়টি ফিকহি হোক, উসুলি হোক বা হাদিসভিত্তিক..।

এরপরও তালিবুল ইলম বা আলেমের মনে এর শাখাগত কোনো বিষয়ে সন্দেহের উদয় হলে তৎক্ষণাৎ সে কিতাবের শরণাপন্ন হবে। কারণ, মাসআলা 'হল' করার জন্য কিতাব হলো নীরব শায়খ। প্রশ্ন বা সন্দেহ উদয়কালে যদি

---

[৪৬৫] এ ব্যাপারে رسالة المسترشدين গ্রন্থে আমাদের শায়খ রহ.-এর তালিকা দেখা যেতে পারে : পৃষ্ঠা - ১৯৬

'দেখব দেখব' করে কালক্ষেপণ করা হয়। তবে কস্মিনকালেও এ সন্দেহ তার অন্তর থেকে দূর হবে না।

তা ছাড়া পঠিত বিষয়ে তালিবুল ইলমের স্বচ্ছ ধারণা লাভ করাই হলো মুখস্থ করা বা বোধগম্য করার মূল কারণ। এরপর আসবে তালিম, তালকিন, তালিফ বা ফতোয়ার প্রশ্ন। কোনো মাসআলায় স্বচ্ছ ধারণা লাভ না করলে তাতে বিকৃতিসাধন অথবা তাকে ভিন্নার্থে প্রকাশের প্রবল সম্ভাবনা দেখেন আমাদের প্রবীণ উলামায়ে কেরাম। এ ব্যাপারে তাদের থেকে অনেক সূক্ষ্ম ঘটনাও বর্ণিত রয়েছে। এর মধ্যে : সুনানে আরবাআর গ্রন্থকারগণ, ইবনে আবি শাইবা এবং ইবনে খুযাইমা নিজ নিজ গ্রন্থে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ، وفي رواية ابن خزيمة الأولى : نهى عن الحِلَقِ يوم الجمعة قبل الصلاة.

অর্থ : 'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন নামাজের পূর্বে উপদেশমূলক কোনো বৈঠক গঠন থেকে নিষেধ করেছেন।'[৪৬৬]

ইমাম খাত্তাবি রহ. বলেন : আমাদের জনৈক শায়খ উক্ত حِلَق শব্দটিকে حَلْق বলে (মাথা মুণ্ডন করা অর্থে) বর্ণনা করেন। এ হাদিস শোনার পর থেকে দীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি জুমার দিন নামাজের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেননি!! এরপর আমি তাকে বলি, এটি তো حِلَق যা حَلْقَة এর বহুবচন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, তুমি আমার মনের সংশয় দূর করেছ। এরপর আমাকে 'জাযাকাল্লাহ খাইর' বলে দোয়া দিলেন। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও পুণ্যবান (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)।[৪৬৭]

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরাও আমাদের মাশায়েখদের থেকে সময়ে সময়ে কত হাদিস এবং কত কথা শুনে থাকি, কিন্তু অনেক সময় সেগুলো কিতাব থেকে খুঁজে বের করার দরকার মনে করি না। এখানে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক, এভাবেই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। এক হাজার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি এমন ভুল হতে পারে উস্তাদের মুখ থেকে, তবে এখন তো আমরা আরও পেছনের, আরও অধঃপতনের যুগে আছি; এ জমানায় তো ভুল হওয়ার আশঙ্কা আরও বেশি। তাই শব্দের সঠিক অর্থ খুঁজে বের করতে হবে। নিরীক্ষণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

---

[৪৬৬] আবু দাউদ : ১০৭২ তিরমিজি : ৩২২ তিনি একে 'হাদিসে হাসান' বলেছেন। নাসাঈ : ৭৯৩,৭৯৪ ইবনে মাজা : ১১৩৩ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৫৪৫০ ইবনে খুযাইমা : ১০৩৪, ১৩০৬

[৪৬৭] معالم السنن : ১/২৪৭

দৃঢ়তার সাথে ইবারাত পাঠ ও তা শুদ্ধ করার গুরুত্ব

এখানে উস্তাদ ও শায়েখদের ওপর আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব এসে বর্তায়, যা কিছুতেই তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। আর তা হলো : তালিবুল ইলমদের বিশুদ্ধ ইবারাত পড়ার যোগ্য করে তোলা। আভিধানিক ও ব্যাকরণগত তাহকিকগুলো স্পষ্ট করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া। জমিরের মারজাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। প্রতিটি জমিরের সম্পৃক্ততা নির্ণয় করা। সবশেষে ইবারাতের সরল অনুবাদ পুরোপুরিভাবে তাদের বুঝিয়ে বলা।

এরপর আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে ইবারাতের বালাগাত, মানতিক, উসুলে ফিকহ, সংশ্লিষ্ট ইলমের আনুষঙ্গিক পরিভাষা ইত্যাদি বিষয়গুলোও 'নস'-এর চাহিদা ও সম্ভাবনামতে তাদের সামনে উপস্থাপন করা। আল-আযহারের উলামায়ে কেরাম এ পদ্ধতিকে التعيين বলে অভিহিত করেছেন।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ 'নস' পাঠের এ পদ্ধতিই একজন আলেমকে গায়রে আলেম থেকে পৃথক করে দেয়। অনেক আনপড় সাধারণ মানুষ এমন আছেন, যারা সমকালের অনেক বিদগ্ধ ও বরেণ্য আলেমের সংশ্রব লাভ করে ধন্য হয়েছেন। তাদের দরসে উপস্থিত হয়ে ইলমি ফায়দা হাসিল করেছেন। ফিকহ, তাফসির বা হাদিসের শরাহগুলো সমকালীন অনেক আলেম থেকেও বেশি মুখস্থ করেছেন। কিন্তু তার অবস্থা হলো, যখনই কোনো মাসআলার ব্যাপারে তার মনে সংশয় হয়, তখন তিনি কিতাবের শরণাপন্ন হতে পারেন না। কিন্তু একজন আলিম তখন ঠিকই কিতাবের শরণাপন্ন হয়ে সেখান থেকে পুরোপুরি ইস্তিফাদা করে নেন।

* * * *

ষষ্ঠ পথনির্দেশ

‘জানি না’ কথাটির ওপর শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করানো

ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গ চরিত্রের সাথে এখানে আরেকটি বিষয় এসে যুক্ত হয়, এটি তালিবুল ইলমদের প্রতি উস্তাদের অন্যতম দায়িত্বও বটে, তা হলো যেসব বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা নেই ইলম নেই, সেসব বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সোজাসুজি ‘আমি জানি না’ অথবা ‘আল্লাহই অধিক জানেন’ বলে দেওয়ার ওপর শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করানো। তবে এ কথা বলে নির্ভার হয়ে বসে পড়লে চলবে না; বরং গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে তালিবুল ইলমকে অবশ্যই ওই মাসআলাটি খুঁজে বের করতে হবে, অবিলম্বে দ্রুত উদ্‌ঘাটন করে জিজ্ঞেসকারীকে সে সম্পর্কে জানাতে হবে। আর তার জন্য সে বিজ্ঞ কোনো উস্তাদেরও শরণাপন্ন হতে পারে অথবা সমৃদ্ধ কোনো মাকতাবার দ্বারস্থ হতে পারে।

أدب الاختلاف গ্রন্থে আমি একটি উক্তি নকল করেছি, যা ইমাম শাফেঈ ইমাম মালেক থেকে, তিনি বিখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মদ বিন আজালান থেকে বর্ণনা করেছেন–

إذا أخطأ العالم (لا أدري) أصيبت مقالته.

অর্থ : ‘জানি না’ বলে যদি কোনো আলেম তার কথায় ভুলও করে, তবুও সে সঠিক বলল।’

বিখ্যাত তিন জন মনীষী ইলমি ধারাবাহিকতায় কথাটি স্মরণ রেখেছেন এবং তালিবুল ইলমদের কাছে সেটি বর্ণনা করেছেন। এরপর বলেছি, ‘জানি না’ কথার মাধ্যমে তালিবুল ইলমের মাঝে বিনম্র স্বভাবের উদয় হয়। সঠিক ও যথাযথ পন্থায় ইলম প্রচারের মানসিকতা তৈরি হয়। অধিকতর ইলম অর্জন ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষসাধনের জন্য মনে অনুপ্রেরণা পায়। কারণ, ভুল ও দায়সারা উত্তর দিয়ে জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা না বানিয়ে একবার যদি সে প্রশ্নকারীকে ভদ্রচিত্তে ‘জানি না’ বলে দেয়, তবে দ্বিতীয়বার এরূপ ‘জানি না’ বলে অবশ্যই সে আর নীচু হতে চাইবে না। কারণ, একজন আলিমের দায়িত্ব হলো, মানুষকে মূর্খতার অন্ধকার ও সংশয়ের গহীন গর্ত থেকে টেনে তোলা।

ইয়াকুত হামাভি বলেছিলেন, ‘জানি না’ কথাটি ইলমের অর্ধেক।’ অর্থাৎ তা নিন্দনীয় ও মন্দের অর্ধেক। যে সব সময় এ কথার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে আড়াল

করতে চেষ্টা করে, সমাধান খোঁজার ব্যাপারে অলসতার পথ বেছে নেয় তার ব্যাপারেই এটি প্রযোজ্য (আল্লাহই অধিক জানেন)।

তালিমের ময়দানে পূর্বসূরিদের মাঝে একটি প্রথা ছিল যে, তারা নিজ নিজ ইজতিহাদে ভুলের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করে নিতেন। অকাট্য ও সুদৃঢ় প্রমাণ খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কোনোক্রমেই তা সুনিশ্চিত বলে রায় দিতেন না।

'একব্যক্তি বিয়ে করে সহবাস ও মোহর আদায়ের আগেই ইন্তেকাল করেছে।' মাসআলাটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই বলে ফতোয়া দেন যে, নববধূকে 'মোহরে মিসিল' প্রদান করতে হবে; সামান্য কমবেশি করা যাবে না। তা ছাড়া মৃত স্বামীর সম্পদ থেকেও সে উত্তরাধিকার পাবে। আর তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। মাসআলাটি ইলমুল ফিকহে مسألة المفوضة নামে প্রসিদ্ধ।

হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. নিজগ্রন্থে উল্লেখ করে একে 'হাসান' ও 'সহিহ' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৪৬৮]

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবু দাউদ এবং নাসাঈ শরিফের একটি বর্ণনাও আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে।

আবু দাউদ রহ. বর্ণনা করেন, দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত উপর্যুক্ত মাসআলাটি জিজ্ঞেস করতে তারা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.-এর কাছে নিয়মিত আসতে থাকে। অথবা বলেন, কয়েকবার তারা এটি নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি উত্তরে বলেন, আমার বক্তব্য হলো স্ত্রীকে তার গোত্রের অন্যসব মহিলাদের মতো মোহর দিতে হবে। কোনো কমবেশি করা যাবে না। তাকে (মৃত স্বামীর) উত্তরাধিকার দিতে হবে এবং তাকে নির্ধারিত সময় ইদ্দত পালন করতে হবে। এটি যদি সঠিক সমাধান হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, ভুল হলে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে; আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এ থেকে মুক্ত। কিছুদিন পর তারা তাঁকে অবহিত করে যে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একই মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনিও এ রকম সমাধান দিয়েছিলেন। এ কথা শুনে ইবনে মাসঊদ যারপরনাই আনন্দিত হন।[৪৬৯]

---

[৪৬৮] كتاب النكاح : باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها : ৪/১১১ (১১৪৫)

[৪৬৯] كتاب النكاح : باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات : ২/৫৮৯ (২১১৬)

ইমাম নাসাঈ রহ. বর্ণনা করেন যে, ইবনে মাসউদ রা. প্রথমে তাদের বলেন, অন্যদের জিজ্ঞেস করো, এ ব্যাপারে কোনো আছার পাও কি না দেখো! তারা বলে, হে আবু আবদুর রহমান, আমরা তো পাইনি! এরপর তিনি বলেন : আমার মত হলো...!'[৪৭০]

এরপর ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন, মাসআলাটি নিয়ে তারা ইবনে মাসউদের কাছে দীর্ঘ এক মাস যাতায়াত করে। তিনি তাদের কোনো সমাধান দেন না। এক মাস পর বলেন, আমার মত হলো...!';

শেষদিকে তিনি বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত এর চেয়ে জটিল ও কঠিন মাসআলা কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি। অন্য কারও কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো! এরপর তারা দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত মাসআলাটি নিয়ে তার কাছে যাতায়াত করে। শেষ পর্যন্ত তারা বলে, আপনার কাছে না করলে আর কার কাছে জিজ্ঞেস করব আমরা?! আপনি হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের মধ্যে সর্ববিজ্ঞ ও বরেণ্য ফকিহ! এরপর তিনি বলেন, ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আমি নিজ থেকে ইজতিহাদি সমাধান দেব। তা যদি সঠিক হয় তবে ওই আল্লাহর পক্ষ হতে যাঁর কোনো শরিক নেই। আর ভুল হলে আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে; আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এ থেকে মুক্ত ও পবিত্র; আমার মত হলো...!

ইনসাফভিত্তিক চরিত্র আর 'জানি না' কথায় অভ্যস্ততা এ দুটি বিষয়ে আমি أدب الاختلاف গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। সেখান থেকে সামান্য এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। বাকি অংশটি পাঠককে মূল গ্রন্থে দেখে নেওয়ার অনুরোধ করছি। এ ছাড়াও সেখানে আরও অনেক উপকারী বিষয় রয়েছে।

আরেকটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছি; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয়, আকিদা প্রভৃতিবিষয়ক যেসব মাসআলায় তার পারদর্শিতা নেই অথবা যেগুলো সম্পর্কে এর আগে সে যথেষ্ট গবেষণা করেনি সেসব বিষয়ে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন বা অপরিচিত কারও সঙ্গে অবাধ আলাপচারিতায় লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরও তা থেকে নিষেধ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে 'আমি জানি না' অথবা 'এ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন করিনি' জাতীয় কথা বলতে কোনোরকম কুণ্ঠাবোধ করা যাবে না। যারা এ রকম অপ্রস্তুত হয়ে উপর্যুক্ত বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করে,

---

[৪৭০] كتاب النكاح : إباحة التزوج بغير صداق : ৬/১২১ (৩৩৫৪)

তাদের পদস্খলন ও বিপথগামিতা সুনিশ্চিত। অজানা বিষয়ে কথা বলে অন্যকে উদ্ধার করতে গিয়ে তো সে নিজেই পথ হারিয়ে ফেলবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত তার। আল্লাহর শাশ্বত দ্বীনে অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশ থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত কোনো তথ্য ভালো করে না জেনে কোনোভাবেই তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। পাশাপাশি এ অজ্ঞতার সঙ্গে সহাবস্থানও করা যাবে না; বরং বিজ্ঞ শায়খদের শরণাপন্ন হয়ে দ্রুত এ ব্যাপারে অবহিত হতে হবে।

১. যে বিষয়ে তার পারদর্শিতা নেই, সে বিষয়ে নাক গলানো তার জন্য বৈধ নয়।

২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞতা নিয়ে বসে থাকাটাও কোনো জ্ঞানীর কাজ নয়।

৩. আরবি ভাষাবিষয়ক শিক্ষকের কাছে অর্থনৈতিক বা ফিকহি কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করাও উচিত নয়। অথবা আধুনিক মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ প্রাচীনপন্থী ফকিহকে সমসাময়িক মাসআলা জিজ্ঞেস করাও অনুচিত। যে যে বিষয়ে পারদর্শী, তার কাছেই সে বিষয়ের গ্রহণযোগ্য সমাধান পাওয়া যাবে; অন্যদের কাছে নয়।

* * * *

সপ্তম পথনির্দেশ

শিক্ষার্থীদের ওপর গভীর পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দান

তালিবুল ইলম এমনকি আলেমদের জন্যও অজানা বিষয়ে 'জানা নেই' বলে দেওয়াটা তার শিষ্টাচার, নিরহংকারিতা ও স্বচ্ছ হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ। উস্তাদগণ তালিবুল ইলমকে এ শিক্ষার ওপর গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের মনে এ কথা ভালো করে রোপণ করে দেবেন যে, এ কয়েক বছরের অর্জিত ইলমই যাবতীয় ইলম নয়। অনেক আধপড়া তালিবুল ইলম শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক কয়েক বছর অতিবাহিত করেই নিজেদের বিজ্ঞ আলিম হিসেবে মনে করতে থাকে; বরং তাদের অনেকে তো বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে আত্মপ্রকাশ করে মনগড়া কথা বলতে শুরু করে। ইলমের প্রাথমিক স্তরে পদার্পণ করেই নিজেকে চূড়ান্ত জ্ঞানী হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করে।

উদীয়মান অনেক শিক্ষার্থীর মাঝে এ রকম প্রবণতা প্রায়ই লক্ষ করা যায়। অনেকের মাঝে আবার তা প্রকাশ পায় শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর; অথচ তখনো শায়খদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বনির্ভর খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার মতো পূর্ণ যোগ্য তিনি হয়ে ওঠেননি।

এ বিষয়ে তালিবুল ইলমের উদ্দেশে বলা কিছু পূর্বসূরি উস্তাদ ও মুরুব্বির দুটি শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ বাণী উল্লেখ করতে চাই আমি :

১. শিষ্য আবু ইউসুফ রহ.-কে বলা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর একটি উক্তি সুপ্রসিদ্ধ ও প্রবাদতুল্য :

تَزَبَّبْتُ قبل أن تُحَصْرِمِ.

অর্থ : 'সবেমাত্র আঙুর হওয়া শুরু হলো আর তাতেই নিজেকে তুমি কিশমিশ মনে করছ?'

উক্তির প্রেক্ষাপট হলো– একবার আবু ইউসুফ রহ. তার শায়খ ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অনুমতি ছাড়াই দরসের মজলিশ খুলে বসেন। তা শুনে ইমাম আবু হানিফা পাঁচটি প্রশ্ন দিয়ে এক ব্যক্তিকে তার কাছে পাঠান। প্রশ্ন পাঁচটি হলো–

১. ধোয়ার জন্য ধোপার কাছে একব্যক্তি কিছু কাপড় দিয়ে আসে। এরপর তার কাছে কাপড় ফেরত চাওয়া হলে প্রথমবার সে কাপড়ের কথা অস্বীকার করে।

কিন্তু দ্বিতীয়বার সে দাবি করে, ধুতে গিয়ে কাপড় ছিঁড়ে গেছে বা ত্রুটিযুক্ত হয়ে গেছে; এ অবস্থায় ধোপা কি তার পারিশ্রমিক পাবে?

২. নামাজে প্রবেশ সাব্যস্ত হয় সুন্নাত দ্বারা না ফরজ দ্বারা?

৩. চুলায় রাখা মাংস-ঝোলবহনকারী পাতিলে জ্যান্ত পাখি পড়ে গেলে ওই তরকারি খাওয়া বৈধ হবে কি?

৪. কোনো মুসলমানের অন্তঃসত্ত্বা জিম্মী স্ত্রী মারা গেলে তাকে কোন কবরস্থানে দাফন করা হবে?

৫. একব্যক্তির সন্তানবিশিষ্ট স্ত্রীর (যে তার মনিবের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করেছিল) মনিব মারা গেলে তাকে ওই মনিবের পক্ষ থেকে ইদ্দত পালন করতে হবে কি?

সবগুলো প্রশ্নের উত্তরে আবু ইউসুফ রহ. 'হ্যাঁ হ্যাঁ' বলেন আর লোকটি 'না না' বলে তার সবগুলো মত নাকচ করে দেন। একপর্যায়ে লোকটির সব জটিল ও কঠিন প্রশ্নের উত্তরপ্রদানে ব্যর্থ হয়ে তিনি খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়েন। এরপর আবু ইউসুফ নিজের অপরিপক্বতা বুঝতে পেরে পুনরায় আবু হানিফা রহ.-এর কাছে ফিরে এলে তিনি তাকে বলেন, 'কাঁচাকাল পার না করেই তুমি পাকা হতে চাইছ?'

বিশিষ্ট আলিম আবুল ফাতাহ ইবনে জিন্নি এবং তার শায়খ আবু আলি আল-ফারেসির মাঝেও প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটেছিল। একপর্যায়ে শায়খ আবু আলি তার শিষ্য ইবনে জিন্নিকে বলেছিলেন : 'কাঁচা অবস্থায়ই তুমি পাকা হওয়ার চেষ্টা করছ?'[৪৭১]

অর্থাৎ শিক্ষার প্রাথমিক স্তর টপকে একলাফেই তুমি শেষস্তরে আরোহণ করতে চাইছ?! বর্তমানে যারা পূর্ণ যোগ্য না হয়ে নিজেদের বিজ্ঞ আলেম হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে, তাদের অবস্থাও এমন!

تاريخ بغداد এবং الفقيه والمتفقه গ্রন্থে এসেছে :

একবার আবু ইউসুফ রহ. প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে গেলে আবু হানিফা রহ. কয়েকবার তাকে দেখতে যান। শেষবার গিয়ে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় পেয়ে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন উচ্চারণ করে বলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমাকেই মুসলমানদের বিষয়ে ফতোয়া প্রদানের জন্য রেখে যাব বলে আশা করেছিলাম। তোমার ইন্তেকাল হলে তোমার সাথে বিপুল ইলমেরও ইন্তেকাল হয়ে যাবে।

---

[৪৭১] ইবনে খালকানের রচনায় ইবনে জিন্নির বৃত্তান্তে এটি বর্ণিত হয়েছে : ৩/২৬৪

এরপর তিনি পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর মানুষ তার ব্যাপারে আবু হানিফা রহ.-এর কথিত উক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলে মনে মনে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে শুরু করেন। মানুষও তার শরণাপন্ন হতে থাকে। একপর্যায়ে তিনি নিজের জন্য ফিকহের মজলিশ খুলে বসেন এবং আবু হানিফা রহ.-এর মজলিশে আনাগোনা কমিয়ে দেন। আবু হানিফা রহ. লোকদের এর কারণ জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলে, তার ব্যাপারে আপনি যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন তা জানার পর তিনি নিজে একটি স্বতন্ত্র মজলিশ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এরপর ইমাম আবু হানিফা রহ. একজন বরেণ্য ব্যক্তিকে তার মজিলশে কিছু প্রশ্ন দিয়ে পাঠান। বলে দেন, তাকে জিজ্ঞেস করবে : একব্যক্তি কোনো ধোপার কাছে কিছু কাপড় দেয় এক দিরহামের বিনিময়ে সেটি ধোয়ার জন্য। কিছুদিন পর ধোপার কাছে গিয়ে কাপড় চাইলে ধোপা কাপড়টি তার কাছে আর নেই বলে সাফ জানিয়ে দেয়। এরপর কাপড়ের মালিক আবার তার কাছে এলে ধোপা ত্রুটিযুক্ত অবস্থায় কাপড়টি তার কাছে হস্তান্তর করে। এ অবস্থায় ওই ধোপা কি তার পারিশ্রমিক পাবে? আবু হানিফা বলেন, সে যদি হ্যাঁ বলে, তবে বলবে : তুমি ভুল বলেছ! আর যদি না বলে, তবেও বলবে : তুমি ভুল বলেছ! এরপর তিনি গিয়ে আবু ইউসুফের কাছে উক্ত মাসআলা উত্থাপন করেন। তাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে উত্তর দিলে তিনি বলেন, আপনি ভুল বলছেন! এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেন, নাহ সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না! এবারও বলেন, আপনি ভুল বলছেন!

মাসআলাটি জিজ্ঞেস করার জন্য তৎক্ষণাৎ আবু ইউসুফ–ইমাম আবু হানিফার কাছে চলে আসেন। আবু হানিফা তাকে দেখে বলেন, ধোপার মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এসেছ? বলেন, হ্যাঁ! আবু হানিফা বলেন, সুবহানাল্লাহ, যে মানুষের কাছে ফতোয়া বর্ণনা করতে মজলিশ প্রতিষ্ঠা করেছে, আল্লাহর প্রণীত শরিয়ত সম্পর্কে কথা বলতে দরস উদ্বোধন করেছে, এই কি তবে তার অবস্থা?! পারিশ্রমিক প্রদানজাতীয় মাসআলায় সে এত কাঁচা!! আবু ইউসুফ বলেন, হে আবু হানিফা আমাকে শিখিয়ে দিন! আবু হানিফা বলেন, ধোপা যদি ছিনতাইয়ের পর কাপড় ত্রুটিযুক্ত করে, তবে সে পারিশ্রমিক লাভ করবে না। আর যদি ছিনতাইয়ের পূর্বে করে তবে পারিশ্রমিক লাভ করবে। আর তখন ওই ত্রুটি মালিকের ওপর এসে বর্তাবে।

এরপর তিনি বলেন : যে ব্যক্তি অধ্যয়ন বা শিক্ষালাভ থেকে নির্মুখাপেক্ষী হয়ে গেছে মনে করে, সে যেন নিজের এ দুর্গতির জন্য শুধুই কাঁদে!'[৪৭২]

---

[৪৭২] تاريخ بغداد ৫/৪৭৮ : آداب الفقيه والمتفقه ৭২২

ইমাম রামহুরমুযি রহ.-ও ইমাম আলি ইবনুল মাদিনি থেকে একটি বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করেন।

ইবনুল মাদিনি রহ. বলেন, 'আমি কুফায় এসে বিখ্যাত হাদিসবিশারদ আ'মাশের হাদিসগুলো একত্র করি। এরপর বাসরায় এসে ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদির কাছে গিয়ে তাকে সালাম নিবেদন করি। তিনি বলেন, কী আছে তোমার কাছে বলো! আমি বলি, আ'মাশ থেকে কেউই আমার কাছে কিছু বলেনি! এ কথা শুনে তিনি বলেন, এটা কি কোনো আহলে ইলমের কথা হতে পারে? তাহলে আজকাল কে দেবে ইলমের প্রহরা? কে করবে ইলমের সংরক্ষণ? তোমার মতো ব্যক্তি কি এ কথা বলতে পারে? আছে কিছু তোমার কাছে লেখার? আমি বলি, হ্যাঁ আছে! বলেন, তবে লেখো! বলি, আমাকে স্মরণ করিয়ে দিন; হয়তো তা আমার কাছে থাকতেও পারে! তিনি বলেন, তুমি লেখো! যা তোমার কাছে নেই, তা-ই আমি তোমাকে বলব! এরপর তিনি আমাকে ৩০টি হাদিস লেখান; তার একটিও আমি এর আগে শুনিনি! এরপর বলেন, আর বেশি চেয়ো না! আমি বলি, ঠিক আছে, আর চাইব না!

আলি ইবনুল মাদিনি বলেন : এর ঠিক এক বছরের মাথায় সুলাইমান আশ-শাযুকানি এসে আমাকে বলে, চলুন আবুদর রহমান ইবনে মাহদিকে আজ কিছু জিজ্ঞেস করে বিরক্ত করব! আজ তাকে কাবু করবই!

আলি ইবনুল মাদিনি বলেন : সুলাইমান ছিলেন হজের মাসআলা-মাসায়েলের বিষয়ে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ। তিনি বলেন, এরপর আমরা তার কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে তার সামনে বসি। তিনি বলেন, তোমাদের কাছে যা আছে তা বলতে পারো! আমি তোমাকে সুবক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন, হ্যাঁ। কিন্তু হজের বিষয়ে কেউ আমাদের কাছে কিছু বর্ণনা করেনি। এরপর আমাকে যেভাবে ডেঁটেছিলেন, তাকেও সেভাবে ডাঁটেন।

এরপর জিজ্ঞেস করেন, হে সুলাইমান বলো দেখি—এক ব্যক্তি হজের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে কেবল বায়তুল্লাহর তাওয়াফ বাদ রেখে স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার কী বিধান? সুলাইমান তড়িৎ উত্তর দেন :

> 'যেখানে সহবাস করেছে, সেখান থেকে তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যাবে। আর যেখানে পৃথক হয়েছে সেখানে গিয়ে মিলিত হবে।' এরপর আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করেন, তবে বলো কোথায় তারা একত্র হবে আর কোথায় গিয়ে বিচ্ছিন্ন হবে? এ প্রশ্ন শুনে সুলাইমান একদম চুপ হয়ে গেলে আবদুর রহমান তাকে বলেন, লেখো! এরপর তিনি তার কাছে মাসআলা বর্ণনা করে লেখাতে থাকেন।'

এরপর আমরা ত্রিশটি মাসআলা লিখে শেষ করি। প্রতিটি মাসআলাতেই প্রমাণস্বরূপ তিনি একটি বা দুটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমি ইমাম মালেক রহ.-কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এই উত্তর দিয়েছেন... সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এই উত্তর দিয়েছেন... উবায়দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এই উত্তর দিয়েছেন...!!'

সুলাইমান বলেন, এরপর উঠে যাওয়ার পর আবদুর রহমান বিন মাহদি আমাদের বলেন, দ্বিতীয়বার পুনরায় জিজ্ঞেস করতে এসো না কিন্তু!' এরপর আমরা তার কাছ থেকে উঠে চলে আসি। ইবনুল মাদিনি বলেন : এরপর সুলাইমান আমার কাছে এসে বলতে থাকে, মাহদির ঔরস থেকে কেন যে এই লোকটির জন্ম হয়েছিল!! উদ্ধৃতিগুলো যখন বলছিল, মনে হচ্ছিল তিনি তাঁদের সাথে বসা–'ইমাম মালেক রহ. কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এই উত্তর দিয়েছেন... সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এই উত্তর দিয়েছেন.. উবায়দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এই উত্তর দিয়েছেন..!!'

আমি বলব, এগুলো হলো মনীষীদের মাঝে সংঘটিত বিস্ময়কর সব ঘটনা। যার প্রতিটি অক্ষরেই আছে উপদেশ ও শিক্ষা।

ঘটনায় ঘটনা স্মরণ হয়ে যায় :

১৮খণ্ডবিশিষ্ট বিখ্যাত গ্রন্থ الحاوي-এর লেখক, ফিকহের বিষয়ে শাফেঈ মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি রহ.-এর ব্যাপারে ইমাম আবু ইসহাক আশ-শিরাযি রহ.-এর ভাষ্য : 'তিনি ছিলেন পুরো মাযহাবের হাফেজ।'

তিনি বলেন, ওমর বিন খাত্তাব রা. বলেন :

> تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تَعَلَّمون منه، ليتواضعَ لكم من تعلِّمونه.
>
> অর্থ : 'তোমরা ইলম অর্জন করো এবং ইলমের জন্য পর্যাপ্ত সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতিও অর্জন করো! যাদের কাছ থেকে শিখছ তাদের প্রতি বিনয়ী হও, তবে তোমাদের ছাত্ররাও তোমাদের প্রতি বিনয়ী হবে।'[৪৭৩]

কোনো এক পূর্বসূরি বলেন : যে ব্যক্তি নিজ ইলম নিয়ে অহংকার দেখায়, শ্রেষ্ঠত্বের ভাব নেয়, অবশ্যই আল্লাহ তাকে নীচু করে ছাড়বেন। আর যে ইলম নিয়ে বিনয়ী হয়, অবশ্যই আল্লাহ তাকে উঁচু করে দেবেন। ঊর্ধ্বতন ন্যায়নিষ্ঠ আলেমদের দিকে না তাকিয়ে আশপাশের মূর্খ ব্যক্তিদের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিদানই

---

[৪৭৩] أدب الدنيا والدين : ১২০-১২২

তাদের আত্ম-অহংকারের মূল কারণ। যত বড়ো জ্ঞানীই হোক, অবশ্যই তার ওপরেও জ্ঞানী রয়েছে। কোনো মানুষের পক্ষে সব ধরনের ইলম আয়ত্ত করা কোনো কালেই সম্ভব নয়।

এরপর তিনি বলেন, আমি আমার নিজের একটি ঘটনা থেকে তোমাদের সতর্ক করছি। একবার আমি বিভিন্ন কিতাব থেকে মন্থন করে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থ রচনা করি। অনেক কষ্ট-মুজাহাদা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সারনির্যাস সেখানে জমা করি। শেষ পর্যন্ত একে সুবিন্যস্ত রূপ দেওয়ার পর আমার মনে কিছুটা আত্মতুষ্টি ও অহংকারের ভাব চলে আসে, মনে মনে ভাবি, এ বিষয়ে আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী; ঠিক তখনই দুজন বেদুইন এসে তাদের এলাকায় শর্তসাপেক্ষে সংঘটিত একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মাসআলার বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে, সে বিষয়ে চারটি মাসআলা প্রসিদ্ধ ছিল। চারটির কোনো একটির উত্তর দিতেও আমি অপারগ হই। আমি বিষণ্ন মনে গভীর চিন্তা করতে থাকি। তারা বলতে থাকে, আপনি এত বিপুলসংখ্যক লোকদের নেতা হয়েও এর উত্তর দিতে পারছেন না?! আমি বলি, না! এরপর তারা হায় হায় বলতে বলতে চলে যায়।

এরপর আমার ছাত্রদের চেয়েও নিম্নস্তরের এক লোকের কাছে এসে মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলে সে ফটাফট উত্তর দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করে দেয়। সমাধান পেয়ে ওই ব্যক্তির ইলমের প্রশংসা আর গুণ গাইতে গাইতে পরম আনন্দে তারা বাড়ি ফিরে যায়।

এরপর আমি আমার অবস্থা নিয়ে চিন্তা করতে থাকি। এ ঘটনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা গ্রহণ করি। ঘটনাটি চোখে আঙুল দিয়ে আমাকে সতর্ক করে দেয়। নিজের সামর্থ্যের কারণে আত্মতুষ্টি, গর্ববোধ বা পরতুচ্ছতাবোধ থেকে চরমভাবে আমাকে বারণ করে। আমিও সঠিক পথের সন্ধান পাই। ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হই। ওই বেদুইনদের প্রতি কৃতজ্ঞ হই, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে সঠিক পথের দিশা দেন। সরল পথের দিকে পরিচালিত করেন।

* * * *

অষ্টম পথনির্দেশ

যে কোনো গবেষণায় ন্যায়পন্থা অবলম্বনের তাগিদ

শিষ্য ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে পালনীয় উস্তাদ ও মুরুব্বির অন্যতম দায়িত্ব হলো : ইলমি মাসআলাগুলোতে তিনি ইনসাফ বা ন্যায়নিষ্ঠা অবলম্বন করতে তাদের জোর তাগিদ দেবেন। সেমতে তাদের গড়ে তুলবেন। কখনো যদি ভুল হয়ে যায় বা অন্যদের থেকে আগবাড়িয়ে কিছু বলা হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে সব সময় হক ও সঠিক মত গ্রহণের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে তাদের উৎসাহ দেবেন।

এ ব্যাপারে ইমাম ও মনীষীদের থেকে বহু ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। সবগুলো একত্র করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে শিক্ষণীয় ও প্রেরণাদায়ক ঘটনাটি আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর। বিখ্যাত হাদিস বর্ণনাকারী আবু ইয়ালা নিজ গ্রন্থ المسند الكبير-এ সেটি বর্ণনা করেছেন।

মাসরুক বলেন, একবার ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত মিম্বরে উঠে ঘোষণা করেন : 'চার শ দিরহামের ওপরে মোহর বলতে কিছু জানা নেই আমার।' মিম্বর থেকে নেমে আসার পর কুরায়শি এক মহিলা তার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় : হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি মানুষকে চার শ দিরহামের বেশি মোহর ধার্য করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ! তখন মহিলা বলে, আপনি কি কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার এই উক্তিটি শোনেননি :

﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا﴾

অর্থ : 'আর তাদের (নারীদের) একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাকো তোমরা।'[৪৭৪]

এ কথা শোনামাত্র ওমর রা. বলে ওঠেন, হে আল্লাহ মাফ করো আমায়! সবাই ওমর থেকে বেশি জ্ঞানী! এরপর ফিরে এসে আবার মিম্বরে উঠে ঘোষণা করেন, হে লোকসকল, এর আগে চার শ দিরহামের উর্ধ্বে মোহর ধার্য করা থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যা ইচ্ছা যত ইচ্ছা মোহর হিসেবে দিতে পারো; কোনো বাধা নেই।[৪৭৫]

---

[৪৭৪] সুরা নিসা (০৪) : ২০

[৪৭৫] এখানে আমি তা বর্ণনা করেছি ইবনে হাজার রহ.-এর المطالب العالية গ্রন্থ থেকে : ১৫৬৬। তা ছাড়া তাফসিরে ইবনে কাসির গ্রন্থের সুরা নিসার ২০ নং আয়াতের ব্যাখ্যাও দেখা যেতে পারে।

এ ঘটনার বর্ণনাসূত্রে বিদ্যমান মুজালিদ বিন সাইদ আল-হামাদানির ব্যাপারে 'কালাম' থাকায় ইবনে কাসির রহ. একে সহিহ হিসেবে আখ্যা না দিয়ে বরং বলেছেন, ঘটনার ইসনাদ ভালো এবং শক্তিশালী; তবে বর্ণনাসূত্রে মুজালিদ থাকায় এর বিশুদ্ধতায় কিছুটা ঘাটতি রয়েছে।

ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠতার বিষয়ে কী পরিমাণ তাগিদ করেছিলেন তা তার নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হয় :

من بركة العلم وآدابه: الإنصاف فيه، ومن لم ينصف: لم يفهم ولم يتفهم.

অর্থ : 'ইলমের বারাকাত ও আদবের অন্যতম হলো ইনসাফ অবলম্বন করা। যে ব্যক্তি ইনসাফ অবলম্বন করবে না, সে বুঝবেও না এবং কখনো বোঝার যোগ্যও হবে না।'[৪৭৬]

এই ইনসাফের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যসব শিষ্টাচারের মতো দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত মনীষী ইমাম মালেক রহ.। ইবনে আবদুল বার রহ. তাঁর বরাত দিয়ে বলেন : বর্তমানে (তাঁর সময়ে) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অভাব হলো ইনসাফমূলক দৃষ্টিভঙ্গির।[৪৭৭]

ইমাম কুরতুবি রহ. সুরা বাকারার ৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম মালেক রহ.-এর একটি উক্তি নকল করেন। সেখানেই তার মন্তব্য দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল। এরপর অপর সূত্রে ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর উপর্যুক্ত ঘটনাও তিনি উল্লেখ করেন।[৪৭৮] অনন্তর আলি ইবনে আবি তালিব রা. সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন : এক ব্যক্তি আলি রা.-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে আলি রা. তাকে ওই মাসআলার উত্তর দেন। লোকটি বলতে থাকে, আপনি যে রকমটি বলছেন বিষয়টি আসলে সে রকম নয় হে আমিরুল মুমিনীন; বরং এটি এমন এমন হবে! তখন আলি রা. বলেন, 'তুমি ঠিক বলেছ; আমার উত্তর ভুল ছিল! আর প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর অবশ্যই জ্ঞানী রয়েছে!'[৪৭৯]

এরপর ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন : আবু মুহাম্মদ কাসিম আসবাগ বলেন, আমি প্রাচ্যে ভ্রমণকালে কায়রাওয়ানে উপনীত হই। সেখানে বাকর বিন হাম্মাদের কাছ

---

[৪৭৬] جامع ابن عبد البر : ১/৫৩০

[৪৭৭] جامع ابن عبد البر : ৮৬৬

[৪৭৮] تفسير قرطبي : ১/২৮৬

[৪৭৯] جامع ابن عبد البر : ৮৬৫

থেকে মুসাদ্দাদের হাদিসগুলো গ্রহণ করি। এরপর বাগদাদে গিয়ে সেখানকার আলেমদের সান্নিধ্য অবলম্বন করি। এরপর মুসাদ্দাদের হাদিসগুলো পূর্ণ করতে আমি আবার সেখানে ফিরে যাই। একদিন তার কাছে আমি নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস পড়ছিলাম যেখানে বলা ছিল,

أنه قدم عليه قوم من مُضَر من مُجْتَابي النِّمار.

অর্থ : 'একবার নবিজির কাছে মুদার গোত্রের ডোরাকাটা বস্ত্রপরিহিত কিছু লোক এলো।'

এ কথাশুনে তিনি বলেন, এটা বরং مجتابي الثمار হবে। আমি বলি, না তো, এটি مجتابي النمار-ই! এভাবেই আমি আন্দালুস এবং ইরাকের মাশায়েখদের কাছে পড়েছি! তিনি বলেন, ইরাকে প্রবেশ করেছ অজুহাতে তুমি আমাদের ওপর গর্ব করছ! কথায় ভেটো দিচ্ছ!!

এরপর আমাকে বলেন, নিয়ে চলো আমাকে ওই শায়খের কাছে (মসজিদের ভেতরে অবস্থানকারী একজন শায়খ); এ বিষয়ে তার কাছে ইলম রয়েছে। এরপর আমরা গিয়ে তাঁকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি مجتابي النمار হবে; যেমনটি তুমি বলেছ! কারণ, মুদারগোত্রের লোকেরা ছেঁড়া (সেলাই করা) কাপড় পরত। পকেট থাকত তাদের সামনের দিকে। এখানে نمار শব্দটি نمرة এর বহুবচন। অর্থ, দাগ বা চিহ্ন। এ উত্তর শুনে বাকর বিন হাম্মাদ নিজের নাকে ধরে বলতে থাকেন, অবশ্যই এটিই সত্য, যদিও তা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেছে! এটিই সত্য, যদিও তা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেছে! কথাটি বলতে বলতে তিনি সেখান থেকে উঠে আসেন।

এ ঘটনায় তালিবুল ইলমদের জন্য অত্যন্ত উপকারী শিক্ষা রয়েছে। যেমন, আলেমমাত্রই পরিপূর্ণ গবেষণা ও সাব্যস্ত হওয়া ছাড়া কিছুতেই তার অভিমত প্রত্যাহার করবে না। অন্যথায় তা দুর্বলতা ও অপরিপক্বতার নিদর্শন বলে বিবেচিত হবে। আরও রয়েছে, কোনো মাসআলায় জটিলতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিজ্ঞজনদের শরণাপন্ন হওয়া।

ইনসাফমূলক চরিত্রের কিছু নিদর্শন আমি আমার أدب الاختلاف গ্রন্থেও উল্লেখ করেছি। সেখান থেকে সামান্য এখানে বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি :

ইনসাফ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইলমি বৈশিষ্ট্য, সাধারণ সব আদব সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর প্রতিটি তালিবুল ইলমকেই এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

ইমাম ইবনে আবদুল হাদি আল-হাম্বলি রহ. তার جزء الجهر بالبسملة-তে এ বিষয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিলে লেখেন, তালিবুল ইলমগণ যেসব বৈশিষ্ট্য

অর্জন করবে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বৈশিষ্ট্য হলো ইনসাফ অবলম্বন এবং গোঁড়ামি বর্জন।'[৪৮০]

এখানে ইনসাফের অর্থ হলো, সর্বদা সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা লালন করা। কোনোরকম গোয়ার্তুমি বা বিকৃত পন্থা অবলম্বন না করে ন্যায় ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখা।

এ বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের প্রকৃত উৎস আল্লাহ তাআলার এ বাণী :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

অর্থ : 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসংগত কাজ এবং অবাধ্যতা থেকে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।' (সুরা নাহল (১৬) : ৯০)

অন্য আয়াতে :

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

অর্থ : 'এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের ন্যায়বিচার অবলম্বন করা থেকে বারণ না করে। সুবিচার করো এটাই আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।' (সুরা মায়িদা (০৫) : ৮)

হজরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. বলেন,

ثلاث من جمعهنَّ فقد جمع الإيمان: الإنصافُ من نفسك، وبذلُ السلام للعالم، والإنفاقُ من الإقتار.

অর্থ : 'তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, নিঃসন্দেহে তার মধ্যে পূর্ণ ঈমান থাকবে– নিজ থেকে ইনসাফ, আলিমকে সালাম প্রদান, ব্যয়কুণ্ঠতা থেকে বেরিয়ে বেশি করে দান।'

---

৪৮০ বিখ্যাত মনীষী যাইলাঈ রহ. نصب الراية -তে এটি উল্লেখ করেন : ১/৩৫৫

ইমাম বুখারি রহ. তার হাদিসগ্রন্থে এটিকে মুয়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪৮১] হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এটিকে মারফু' হিসেবে উল্লেখ করে তাকে মুয়াল্লাল বলেছেন। তবে সঠিক হলো, এটি মওকুফ।

এটি তাখরিজ করার পর হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, আবুয যিনাদ ইবনে সিরাজ প্রমুখ মনীষী বলেন : উপর্যুক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য ঈমানকে পূর্ণ করে দেয়। ঈমান মূলত এগুলোর ওপরই নির্ভরশীল। কারণ, একজন বান্দা যখন ইনসাফের গুণে গুণান্বিত হবে, তখন সে তার মনিবের কোনো অধিকারই খর্ব করবে না। সকল নির্দেশিত বিষয় হৃষ্টচিত্তে পালন করে যাবে। তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো এড়িয়ে চলবে। এভাবেই বান্দার মধ্যে ঈমানের সকল রুকনের সমাবেশ ঘটবে। আর বেশি বেশি সালাম প্রদানের দ্বারা তার বৈশিষ্ট্যে ও স্বভাব-চরিত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি, দয়া ও বিনয়ের গুণগুলো তার মধ্যে আসতে থাকবে। আর অবাধে দান করার দ্বারা তার মধ্যে উদারতা, আতিথেয়তা ও অপরকে সম্মান করার বৈশিষ্ট্য তৈরি হবে। অল্পেতুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর ওপর ভরসার অভ্যাস তৈরি হবে। আল্লাহভীতি ও দুনিয়ার মোহ ত্যাগের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হবে। এ সকল বিষয় বাস্তবই হাদিসটি মারফু হওয়ার জোরালো দাবি রাখে। কারণ, এগুলো প্রকৃতপক্ষে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের সঙ্গেই মিলে যায়।

আমি বলব : 'একজন বান্দা যখন ইনসাফের গুণে গুণান্বিত হবে, তখন সে তার মনিবের কোনো অধিকারই খর্ব করবে না' বক্তব্যের অধিকতর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এভাবে, তার মনিবের অন্যতম অধিকার হলো, তাঁর অন্যসব বান্দার অধিকারগুলোও সে যথাযথ বুঝিয়ে দেবে। তাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে। তার ওপর মনিবের অন্যতম অধিকার হলো, এই ইলম এবং এই আমানতকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সততা ও ইখলাসের সাথে যথাযথভাবে পৌঁছে দেবে। আহলে ইলম না হলেই যদি তার ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়, তবে আলিম হলে কী পরিমাণ অর্পিত হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়!

একজন আলিমের গবেষণা ও তার অভিমতই অন্যসব গবেষক, শ্রোতা এবং পাঠকবর্গের জন্য সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি বলে বিবেচিত।

ইনসাফ একজন আলিমকে বেহুদা কথাবার্তা, অনৈতিক কলমের আঁচড় থেকে সুরক্ষা দেয়। নিজ ইলমের মধ্যে ভুল ও সংশয়ের অনুপ্রবেশ রোধ করে।

---

[৪৮১] كتاب الإيمان এর ২০ নং অধ্যায়ের অধীনে : ১/৮২ (ফতহুল বারি)

যে ব্যক্তি ইনসাফ থেকে বিমুখ হবে, কোনো সন্দেহ নেই–সে কুপ্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে যাবে।

বিখ্যাত আব্বাসি খলিফা মু'তাসিম তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যে বলেন : যখন কুপ্রবৃত্তি প্রাধান্য পায়, তখন সঠিক সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়।[৪৮২]

ইনসাফের অন্যতম চরিত্রটি ইমাম যাহাবি রহ. আফফান বিন মুসলিম আস-সাফফারের বৃত্তান্তে উল্লেখ করেন। ফাল্লাস বলেন, ইয়াহইয়া আল-কাত্তানকে একদিন একটি হাদিস বর্ণনা করতে শুনে আমি বলি, এটি এভাবে নয়! এরপর দ্বিতীয় দিন আমি ইয়াহইয়ার কাছে আসার পর তিনি বলতে থাকেন, আফফানের কথাই সঠিক! আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন আফফানের এ মতের বিপরীত কিছু আমার অন্তরে উদয় না করেন।'[৪৮৩]

এরপর ইমাম যাহাবি বলেন, এই ছিল আমাদের পূর্বসূরি আলেমদের চরিত্র। হায়, আজ আমরা তাদের আদর্শ থেকে কত দূরে..!!

ইনসাফের অন্যতম প্রধান দাবি হলো, কোনো আলিম তার জানা কোনো সত্যকে কখনো তালিবুল ইলমদের থেকে গোপন করবে না। কারণ, এটি হলো বিদআতিদের স্বভাব; বিদআতিরা নিজেদের পক্ষের বিষয়গুলো লেখে আর ভিন্নমতের আলেমদের সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলে।

বিশিষ্ট মনীষী দারা কুতনি রহ. ইমাম ওয়াকি ইবনুল জাররাহ রহ.-এর বরাত দিয়ে তার একটি উক্তি বর্ণনা করেন, 'আহলে-ইলম তাদের পক্ষে-বিপক্ষে সবকিছুই লিখে থাকেন। আর প্রবৃত্তিপূজারিরা কেবল নিজেদের পক্ষের বিষয়গুলোই লিখে থাকে।'[৪৮৪]

* * * *

---

[৪৮২] تاريخ بغداد : ৩/৫৩৯ ইবনে ফাহমের বৃত্তান্তে..

[৪৮৩] السير : ১০/২৪৯

[৪৮৪] سنن دار قطني : ৩৬

নবম পথনির্দেশ

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের গৃহীত মতের অনুসরণ এবং দুর্লভ ও ব্যতিক্রমধর্মী জ্ঞান বর্জন

শায়খের অন্যতম দায়িত্ব হলো : ইলম, আমল ও ফতোয়া অনুসন্ধানকালে সব সময় জুমহুর আলেমের মতামতকে প্রাধান্য দিতে তিনি তালিবুল ইলমদের উদ্বুদ্ধ করবেন। এমনকি শাখাগত মাসআলাতেও। কিছু পূর্বসূরি আলেমের বরাতে প্রচারিত দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেবেন।

ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদি রহ.-এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি ইবনে আবদুল বার রহ. বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি ইলমি দুর্লভ বিষয় শিক্ষায় মনোনিবেশ করবে, কখনো ইলমের ময়দানে সে ইমাম হতে পারবে না। যে ব্যক্তি সব ধরনের বর্ণনাকারী থেকে নকল করবে সেও কখনো ইলমের ময়দানে ইমাম হতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি সব শোনা বিষয় মানুষের কাছে বলে বেড়াবে সেও কখনো ইলমি অঙ্গনে নেতা হতে পারবে না।'[৪৮৫] তাঁর এ তিনটি কথা নিয়ে সামান্য পর্যালোচনা না করলেই নয় :

প্রথম কথা : এ বিষয়ে সামনে আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় কথা : এখানে তিনি সব ধরনের বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করা থেকে শিক্ষার্থীদের নিষেধ করেছেন বটে। তবে সবার কাছ থেকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেননি। আর মুহাদ্দিসীনের নিকট একটি বিষয় প্রসিদ্ধ যে, ইলম হলো শ্রবণ ও গ্রহণের নাম। পৌঁছানো ও বর্ণনা করার নাম। তিনি সকলের কাছ থেকে ইলম গ্রহণ করা থেকে বারণ করেননি; বরং সবার থেকে বর্ণনা করা থেকে বারণ করেছেন। বর্ণনাকারীর ব্যাপারে পুরোপুরি আস্থাশীল ও নির্ভার হয়ে তবেই তাঁর কথাগুলো বর্ণনা করবে; তা না হলে নয়।

আর তাই আজকের তালিবুল ইলম তথা আগামী দিনের আলেম সব ধরনের শিক্ষক থেকেই ইলম অর্জন করতে পারবে। সবার কাছ থেকে হাদিস গ্রহণ করতে পারবে। তবে তার মধ্যে সত্য-মিথ্যে এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা থাকতে হবে। বর্তমানে সকলেই যেন ইলম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের

---

[৪৮৫] جامع ابن عبد البر : ১৫৩৯ جامع الخطيب : ১৩৬২। সহিহ মুসলিমের ভূমিকাতেও চোখ বুলানো যেতে পারে : ১/১১

পসরা সাজিয়ে বসে আছে। বিশেষত গণমাধ্যম ও টিভি চ্যানেলগুলোতে। আজকের তালিবুল ইলমদের এসব নব উদ্ভাবিত বিষয়ে অনুপ্রবেশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যুগের চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত সমকালীন পারদর্শী ও দূরদর্শী শায়খ কখনো এতে প্রবেশ করার পরামর্শ দিয়ে দুঃসাহস দেখাবেন না। এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেমদের মধ্যেও অনেক সময় অস্থির ও সংশয়ভাব দেখা যায়।

যেমন প্রাথমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষার্থী যদি أضواء على السنة المحمدية কিতাবটির প্রতি আসক্ত হয়ে তা খুঁজে বের করে পড়তে শুরু করে, অথচ এ কিতাব যে কত ভয়ানক ও বিভ্রান্তকারী সে সম্পর্কে তার ন্যূনতম কোনো ধারণা নেই। তেমনি فجر الإسلام অথবা ضحى الإسلام অথবা ظهر الإسلام অথবা يوم الإسلام-জাতীয় বই কিনে অধ্যয়ন শুরু করে, তবে সেটি তাকে উপকারের চেয়ে অপকারই বরং বেশি করবে। কারণ, এগুলোর বিষয়বস্তুর স্বচ্ছতা সম্পর্কে তার কোনো ধারণা নেই। এ বইগুলোর রচয়িতাগণ কী ধরনের বক্রতা ও মস্তিষ্কবিকৃতির শিকার, সে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। লেখকদের মধ্যে আবার অনেকে শরয়ি বিচারবিভাগের কাজি হিসেবেও নিয়োগ পেয়েছিলেন!!

তা ছাড়া جناية الشافعي على الحديث ، جناية البخاري على الفقه ، جناية سيبويه على النحو ইত্যাদি বই-পুস্তক পড়েও মস্তিষ্কবিকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা। এমনকি সংশয়ের বেড়াজালে ঘুরপাক খেয়ে একসময় পুরো ইসলামধর্ম সম্পর্কেই সন্দেহের দানা বাঁধতে থাকে তার মনে!!

তবে হ্যাঁ, সে যদি পূর্ণ যোগ্য হয়ে ওঠে। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় তার মাঝে। কুপ্রবৃত্তিপূজারি বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে সেগুলো পড়তে ও শুনতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, আলিম হিসেবে সমকালীন সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তাকে সে রকম প্রস্তুত হতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের আরোপিত সকল প্রশ্ন ও অভিযোগ সম্পর্কে অবগত হতে অবশ্যই সেগুলো অধ্যয়ন করতে হবে তাকে। এরপর সঠিক ব্যাখ্যা এবং নির্দেশিত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সেগুলোর যথাযথ জবাব খুঁজে বের করতে হবে তাকে। এভাবেই সে ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ সাব্যস্ত করতে সাধ্যমতো চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

তবে মানুষের কাছে কোনোকিছু বর্ণনা করার সময় অবশ্যই লোকদের বোধশক্তি এবং তাদের চরিত্র সম্পর্কে তাকে ভালোরকম অবগত থাকতে হবে। সত্য হলেও তাদের বিবেকবিরুদ্ধ কোনোকিছু তাদের সামনে বর্ণনা করা

থেকে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সঠিক ও সত্য ইলম প্রচার সম্পর্কেই যদি এই মূলনীতি হয়, তবে পথভ্রষ্টকারী ইলম থেকে তাকে কী রকম সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?!!

ইমাম বুখারি রহ. বলেন,

'অধ্যায় : সম্প্রদায় বুঝে ইলম বর্ণনা করা; কারণ হতে পারে অনেক বিষয় তারা বুঝবে না। আলি রা. বলেন, মানুষের কাছে তাদের পরিচিত বিষয়গুলোই বর্ণনা করো। কারণ, তোমরা কি চাও, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করুক?!'[৪৮৬] এরপর তিনি এ বক্তব্যের সনদ উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে ফাতহুল বারিতে ইবনে হাজার রহ.-এর মন্তব্য অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত।

তৃতীয় কথা : এটি বলার পেছনে কারণ হলো, আগেকার যুগে শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে ভ্রমণ করত। তখন শায়খদের কাছ থেকে শোনা সকল কথা তারা শুনত ও লিখত। কোনো সন্দেহ নেই–তারা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ইলমই শিখত। কিন্তু ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদি এখানে আলেমের জীবনে গ্রহণ করে নেওয়ার মতো অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়ের দিকে তালিবুল ইলমদের দৃষ্টি আকর্ষণের ইচ্ছা করেছেন। যেন তারা তাদের ইলমি জীবনে বিচক্ষণ হয়, বুদ্ধিমান হয়। কারণ, ইলম অর্জনকালে তারা অনেক দুর্লভ ও অভিনব বিষয় সম্পর্কে অবগত হবে। তখন সে যদি নিজের ওপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল না হয়, তবে সেটিই একসময় তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আপনি দেখে থাকবেন, তারাজুমের গ্রন্থগুলোতে একজন বর্ণনাকারীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়– 'অমুক মনীষীর আকল তার ইলমের চেয়ে বড়ো'। আবার প্রয়োজনে কারও মন্দের দিক বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়– 'অমুক মনীষীর ইলম তার আকলের চেয়ে বড়ো'। এটিই একজন আলিমকে তার সমাজকর্ম পরিচালনাকালে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

কখনো কখনো অনেক তালিবুল ইলম কথা বলার সময় ভেবে থাকে যে, অবশ্যই আমার জন্য কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলের গণ্ডির বাইরে যাওয়া উচিত হবে না; এভাবে সে আম জনতার সামনে এমন কথা উচ্চারণ করে বসে, যার দ্বারা মানুষের মন-মস্তিষ্কে উত্তেজনা তৈরি হয়।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, 'আমি এমন কিছু হাদিস বর্ণনা করেছি, এখন আমার মন বলছে যদি প্রত্যেকটি হাদিসের পরিবর্তে আমাকে দুটি করে বেত্রাঘাতও করা হতো, তারপরও আমি হাদিসগুলো বর্ণনা না করতাম।' ইমাম হাকিম রহ. ইমাম

---

[৪৮৬] كتاب العلم : অধ্যায় : ৪৯

মালেকের উপর্যুক্ত উক্তিটি বর্ণনা করে[৪৮৭] তাতে একটি মন্তব্যও জুড়ে দিয়েছেন : 'ইমাম মালেক বিন আনাস রহ. এত আল্লাহভীরু ও স্বল্পবর্ণনাকারী হয়েও তিনি এ কথা বলছেন। তবে যারা জনবহুল সমাবেশে অবাধে বিপুল পরিমাণে হাদিস বর্ণনা করে থাকে, তাদের কী অবস্থা হতে পারে?!!

আর ইমাম ইবনে মাহদির 'দুর্লভ ও ব্যতিক্রমধর্মী ইলম থেকে সতর্কতা অবলম্বন' উক্তির ব্যাপারে আমি বলব : এ সতর্কীকরণ কেবল সেইসব ইলমের ক্ষেত্রে, যেগুলো বিশেষভাবে নিজে আমল করার জন্য শিক্ষা করা হয়। অথবা অন্যের জন্যে পড়ে সেমতে ফতোয়া দেওয়া হয়। এই দুর্লভ ও ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়গুলো এক জনের জন্যেও হতে পারে; একাধিক লোকের জন্যেও হতে পারে। আকিদাবিষয়কও হতে পারে। আবার সাধারণ বিধানসংক্রান্তও হতে পারে।

এখানে ইলম ও আলেমদের বর্ণিত বিরল ও ব্যতিক্রমী বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা উদ্দেশ্য। যেন একজন আলিম সর্বদা হক ও সরল পথের ওপর অটল থাকতে পারেন। কারণ, সে তো সাধারণ মানুষদের জন্য আদর্শ। তাঁকে দেখেই অন্যরা শিখবে।

أثر الحديث الشريف গ্রন্থে উল্লিখিত আলেমদের বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী কথা ও কাজ থেকে সতর্ক থাকার বিষয়টি এরই মধ্যে গত হয়েছে। তবে এখানে কিছুটা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। তবে এ বিষয়ে যথেষ্ট ও বর্ণনাসমৃদ্ধ আলোচনা معيد النعيم، مقالات الكوثر ، فتاوى البرزلي প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আগ্রহী পাঠকদের প্রতি সেখানেই তা দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল।

বায়হাকি রহ. ইরাকের বিশিষ্ট শাফেঈ মাযহাবের ইমাম আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ থেকে, আর তিনি ইরাকের বিশিষ্ট মালেকি মাযহাবের ইমাম কাজি ইসমাইল ইবনে ইসহাক রহ. থেকে তার একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন :

'আমি খলিফা মু'তাযিদের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি আমার কাছে একটি কিতাব হস্তান্তর করেন। কিতাবটি খুলে দেখি তাতে আলেমদের স্খলন এবং ব্যতিক্রমী সব বিষয় (বিভিন্ন মাসআলায় তাদের একান্ত ব্যক্তিগত মতামত) লেখা রয়েছে। তা দেখে আমি বলি, হে আমিরুল মুমিনীন, এ কিতাবের লেখক তো যিন্দিক মনে হচ্ছে! মু'তাযিদ বলেন, কেন, কথাগুলো কি সঠিক নয়? আমি বলি, কথাগুলো নিজ নিজ স্থানে ঠিক আছে; তবে যে ব্যক্তি মদকে বৈধ করেছে, সে

---

[৪৮৭] معرفة علوم الحديث : ১০৮

মুতআকে (চুক্তিভিত্তিক নারী-পুরুষের সাময়িক দৈহিক মিলন) বৈধ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে মুতআকে বৈধতা দেবে, সে গান-বাদ্য বা মদকে বৈধ করতে পারবে না। আর সব আলেমেরই কিছু-না-কিছু স্খলন থাকে; ব্যক্তিগত কিছু সিদ্ধান্ত থাকে; যে ব্যক্তি আলেমদের ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্তগুলোকে উৎস বানিয়ে সেমতে আমল করতে থাকে, একসময় সে তো ইসলাম থেকেই হাত ধুয়ে বসবে।' এ কথা শুনে মু'তাযিদ গ্রন্থটি পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[৪৮৮]

আরেকটি ঘটনা দ্বারা বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়গুলোর ওপর আমলের কারণে মানুষের পথভ্রষ্টতায় পতিত হওয়ার প্রমাণ মেলে। ইমাম বুঅজুলি রহ. নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন : 'আমার স্পষ্ট মনে আছে তখন আমি ছিলাম কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণের বয়সে। দিনটি ছিল মাহে রমজানের প্রথম দিন। সব মানুষই রোজার নিয়ত ছাড়া রাতযাপন করেছে। আমি মনে মনে বলি, মালেকি মাযহাবের কিছু ইমামের ব্যতিক্রমধর্মী মতের ভিত্তিতে এ দিনের কাজা আমি আদায় করব না। এ ঘটনা জানতে পেরে আমার উস্তাদ আমার কান ধরে বলতে থাকেন, তুমি যদি এই নিয়তে ইলম অধ্যয়ন করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকো, তবে ইলম অর্জনের কোনো দরকার নেই তোমার! তুমি যদি এসব বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী মত অনুসরণ করো, তবে যিন্দিক হওয়ার আশঙ্কা করছি তোমার ওপর'–ঠিক এভাবেই তিনি বলেন।'[৪৮৯]

যেসব মুফতি শরিয়তের বিষয়গুলো আমির ও সম্ভ্রান্ত লোকদের জন্য তুলনামূলক সহজ ও সংক্ষিপ্তরূপে উপস্থাপন করেন, তাদের ব্যাপারে বিখ্যাত মনীষী তাজুদ্দীন সুবকি রহ. معيد النعيم গ্রন্থের সাতচল্লিশ নং অধ্যায়ে বলেছেন, 'এটা তো আল্লাহর দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ।'[৪৯০] দীর্ঘ আলোচনা এবং শৈথিল্য অন্বেষণজাতীয় কিছু উদাহরণ উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, এ রকম অভ্যাস যার আছে, কোনো সন্দেহ নেই ধীরে ধীরে সে যিন্দিক হওয়ার দিকে ধাবিত হয়ে যাবে।

اللامذهبية قنطرة اللادينية প্রবন্ধে ইমাম কাউসারি রহ. বলেন, দ্বীনের বিষয়ে শিথিলতা অন্বেষণকল্পে প্রত্যেক ইমাম থেকে নির্দিষ্ট কিছু কিছু খোঁজা এবং মনের মতো করে তার ওপর আমল করা নিছক কুপ্রবৃত্তিপূজা ছাড়া কিছুই নয়। যত বৈধই হোক; ধীরে ধীরে একসময় সে পুরো দ্বীন থেকেই ছিটকে পড়বে।

---

[৪৮৮] سنن بيهقي : ১০/২১১

[৪৮৯] فتاوي البرزلي : ১/৮৭

[৪৯০] পৃষ্ঠা : ৮১

আলেমদের থেকে বর্ণিত দুর্লভ ও ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়গুলোর পেছনে পড়া থেকে যে সকল মুজতাহিদ কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম ইবনুল মুবারক রহ. অন্যতম। فضائل أبي حنيفة গ্রন্থে ইবনে আবিল আওয়াম আলি বিন হাসান বিন শাকিক থেকে তার উক্তিটি বর্ণনা করেছেন : 'আমি সাহাবিদের মতবিরোধ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করি–সবার মতই কি সঠিক? তিনি বলেন, কেবল একটি সঠিক। আর ভুলগুলো তাদের থেকে বানোয়াট (যা আমরা গ্রহণ করব না) আমি জিজ্ঞেস করি, সেগুলো গ্রহণ করলে কি 'বানোয়াট' হিসেবে গণ্য হবে? বলেন, হ্যাঁ এমনটিই মনে করি আমি; তবে কোনো গবেষক যদি বিভিন্ন মত খুঁজতে গিয়ে তা হক মনে করে গ্রহণ করে এবং তা থেকে কোনো মাসআলা খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়, তবে তার ব্যাপারটি ভিন্ন![৪৯১]

الموافقات গ্রন্থে ইমাম শাতেবি রহ. কুফাবাসীর সাথে সংঘটিত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.-এর একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন :

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন : আমরা তখন কুফাতে ছিলাম। তারা আমার সাথে মতবিরোধপূর্ণ মদের বিষয়ে বিতর্ক করতে মনস্থ করে। আমি তাদের বলি, এ বিষয়ে তোমাদের কাছে সাহাবিদের থেকে বর্ণিত কোনো কিছু থাকলে তা পেশ করো! যদি ওই ব্যক্তি থেকে আমরা শক্তভাষায় তা প্রতিহত না করতে পারি, তবে তোমাদের মতই প্রাধান্য পাবে।' এরপর তারা এ ব্যাপারে যে বর্ণনাই উত্থাপন করছিল, তা-ই আমরা কঠোরভাষায় খণ্ডন করছিলাম। শেষ পর্যন্ত বাকি রইল কেবল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বর্ণনা; তাদের উত্থাপিত যুক্তিগুলো ইবনে মাসউদ থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত ছিল না। ইবনুল মুবারক বলেন, হে নির্বোধ–মনে করো ইবনে মাসউদ এখানে বসা আছেন এবং তোমাকে বলছেন–যাও, এ-জাতীয় মদ তোমার জন্য হালাল; কিন্তু আমরা ও রাসুলের অন্যসব সাহাবিরা যেহেতু মদের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, সেহেতু তোমাকে সতর্ক হওয়া বা শঙ্কিত হওয়া উচিত!! তখন তাদের একজন বলে ওঠে, হে আবু আবদুর রহমান, তবে বিশিষ্ট ইমাম নাখঈ, শা'বি (প্রমুখ আরও অনেক ইমামের নাম উচ্চারণ করে বলে) তবে কি তারা হারাম পানীয় পান করতেন? আমি বলি, নিজেদের মিথ্যে যুক্তি প্রমাণ করতে এখানে ওইসব ইমামদের নাম উচ্চারণ করো না! কারণ, তাদের অনেকের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ছিল এমন এমন...!! তাঁদের কারও কারও হয়তো দুয়েকটি বিষয়ে পদস্খলন ঘটেছে, তার

---

[৪৯১] فضائل أبي حنيفة : ৫৬৯

মানে এই নয় যে ওসব পদস্খলন ও ব্যতিক্রমী কাজগুলোকে প্রমাণ বানিয়ে অবাধে তার ওপর আমল করা যাবে!! তোমরা যদি তা না মানো, তবে বিখ্যাত মনীষী আতা, তাউস, জাবের বিন যাইদ, সাইদ বিন জুবাইর, ইকরামাদের ব্যাপারে তোমরা কী বলবে?! তারা বলে, তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ মনীষী। এরপর আমি বলি, তবে নগদ (হাতে হাতে) এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম গ্রহণের ব্যাপারে তোমরা কী বলবে? তারা বলে, হারাম! আমি বলি, কিন্তু ওসব মনীষী তো এটাকেও হালাল বলতেন। তবে কি তারাও হারামের ওপর ইন্তেকাল করেছেন?!! এ কথা শুনে তারা নিরুত্তর হয়ে যায়। বিতর্কে হেরে যায়।[৪৯২]

এরপর ইমাম শাতেবি বলেন : ইবনুল মুবারক রহ.-এর কথাই সঠিক।

বায়হাকি রহ. ইমাম আওযাইর বরাত দিয়ে বলেন : ইরাকবাসীর মতামতের মধ্যে পাঁচটি মত এবং হিজাযবাসীর মতামতের মধ্যেও পাঁচটি মত অগ্রাহ্য বিবেচিত হবে...এরপর তিনি সবিস্তারে সেগুলো উল্লেখ করেন।[৪৯৩]

আবু বকর আল-আজুরি বলেন : আহলে ইলমের মধ্যে কেউ কেউ দাবা খেলেছেন অজুহাতে কেউ যদি দাবা খেলার অবৈধতার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তবে তাকে বলা হবে, এটা হচ্ছে ইলম বর্জনকারী প্রবৃত্তিপূজারিদের খোঁড়া অজুহাত। কোনো মনীষী থেকে কোনো বিষয়ে ব্যতিক্রমী কিছু ঘটলেই যে তা দলিল হয়ে যাবে, এটা ভুল। এ থেকে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। আলেমদের পদস্খলন বিষয়ে আমাদের কঠোর সতর্ক করা হয়েছে।[৪৯৪]

এরপর তিনি ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকেও তাঁর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনটি বিষয় পথভ্রষ্টকারী : 'বিপথগামী ইমাম, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের বিতর্ক এবং আলিমের পদস্খলন।'

পূর্বসূরিদের থেকে বর্ণিত কিছু বিরল উক্তির বিবরণ দিয়ে ফিকহ, হাদিস ও ইলমুল কালামের বিশিষ্ট ইমাম আবু আলি আল-কারাবিসি বরং একটু আগবাড়িয়ে বলেছেন : 'কেউ যদি বলে, তাঁরা তো ছিলেন বিখ্যাত সব মনীষী! আমরা বলব, এক হাজার জাহেলের পদস্খলন ইসলামকে ধ্বংস করবে না; ইসলামকে ধ্বংস করতে কেবল একজন আলেমের পদস্খলনই যথেষ্ট।'[৪৯৫]

---

[৪৯২] ১২৩/4

[৪৯৩] في سننه الكبرى : ১০/২১১

[৪৯৪] تحريم النرد والشطرنج والملاهي : ১৭০

[৪৯৫] طبقات الشافعية الكبرى : ২/১২৫

কোনো সন্দেহ নেই, তিনি সত্য বলেছেন, সুন্দর বলেছেন; তবে যদি মূর্খতাপূর্ণ এ পদস্খলনকেই সত্য ও বিশুদ্ধতার মাপকাঠি বানিয়ে অন্যসব মতকে ভুল ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়, তবে তো আর পরিতাপের সীমা থাকবে না।

ইবনে আবদুল বার তার জামে গ্রন্থে বলেছেন : 'প্রজ্ঞাবান মনীষীগণ আলেমের পদস্খলনকে নৌকা-ফাটলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ, নৌকা তলিয়ে গেলে তার সাথে অনেক মানুষও পানিতে তলিয়ে যাবে।'[৪৯৬]

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়–এ ধরনের বক্তব্যকে ভুল ও পদস্খলন বলার পেছনে কী যুক্তি?

এর উত্তর হবে : আবু দাউদ রহ. এবং প্রমুখ হাদিসবিশারদ মুয়াজ বিন জাবাল রা. থেকে একটি ঘটনা নকল করেছেন। আর তিনি ছিলেন আচারনিষ্ঠ ও সত্যবাদী একজন সাহাবি। বিখ্যাত তাবেই এবং মুয়াজ বিন জাবাল রা.-এর অন্যতম ছাত্র ইয়াযিদ বিন আমিরা বলেন, মুয়াজ বিন জাবাল রা. যখনই কোনো ইলমি মজলিশে বসতেন তখন বলতেন :

الله حكم عدل.

'আল্লাহ চিরপ্রজ্ঞাময়, চিরন্যায়বান।'

একবার তিনি তার এক মজলিশে বলছিলেন,

وراءكم فتنٌ يكثُر فيها المالُ، ويُفتح فيها القرآن، حتى يأخذَه المؤمنُ والمنافق، والحرُّ والعبد، والرجلُ والمرأة، والكبير والصغير، فيوشكُ قائلٌ أن يقول: فما للناس لا يتَّبعوني وقد قرأتُ القرآن؟ والله ما هم بمتَّبعيَّ حتى أبتدعَ لهم غيره!.

অর্থ : 'তোমাদের সামনে এক ফেতনার জমানা অপেক্ষা করছে সে সময় অর্থসম্পদের প্রাচুর্য ঘটবে। কুরআনকে উন্মুক্ত করা হবে; এমনকি মুমিন-মুনাফিক, স্বাধীন-পরাধীন, নারী-পুরুষ, ছোটো-বড়ো সকলেই তা হাতে নেবে। তাদের মধ্যে অনেকে বলবে, আমি তো কুরআন পড়েছি অথচ মানুষ কেন আমার অনুসরণ করছে না?! কসম সৃষ্টিকর্তার, তাদের জন্য নতুন নতুন বিষয় (বিদআত) সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তারা আমার অনুসরণ করবে না!!'[৪৯৭]

---

[৪৯৬] পৃষ্ঠা : ১৮৭৩ আদাবুল ফকিহ ওয়াল মুতাফাককিহ গ্রন্থে খতিব রহ. উক্তিটি আবদুল্লাহ বিন মু'তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন : ৬৪৬

[৪৯৭] سنن أبي داود كتاب السنة : ৫/১৮৬ (৪৫৯৬) تاريخ يعقوب بن أبي سفيان : ২/৩২১

'তোমরা বিদআত থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই বিচ্যুতি। প্রজ্ঞাবানদের পদস্খলন থেকে সতর্ক থাকো। কারণ শয়তান কখনো কখনো জ্ঞানীদের মুখ থেকেও ভুল কথা বের করে দেয়। আবার অনেক সময় মুনাফিকের মুখ থেকেও সত্য বেরিয়ে যায়।

ইয়াযিদ বিন আমিরা বলেন : আমি জিজ্ঞেস করি, প্রজ্ঞাবানদের মুখ থেকে বিচ্যুতি আর মুনাফিকদের মুখ থেকে সত্য কীরূপে উচ্চারিত হতে পারে?

তিনি আমাকে বলেন, জ্ঞানীদের উচ্চারিত সংশয়যুক্ত কথা; যেগুলোর বিষয়ে তোমার মনে সন্দেহের অবতারণা হয়, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়, সেগুলো প্রচার করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, হতে পারে তারাও একসময় সত্য বুঝতে পেরে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসবে। কারণ, হকের মাঝে রয়েছে আল্লাহর নুর।'

ইমাম বায়হাকি রহ. বলেন, মুয়াজ বিন জাবাল রা.-এর বক্তব্য অনুযায়ী জ্ঞানীদের পদস্খলন থেকে কখনো বিমুখ হওয়া যাবে না। তবে তাদের উচ্চারিত যেসব বক্তব্যে নুরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, সেগুলো বর্জিত হবে। এখানে নুর বলতে কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসুল, ইজমা ও কিয়াসসম্মত স্পষ্ট ধারণা উদ্দেশ্য।'

মুয়াজ বিন জাবাল রা. এখানে ইসলামবহির্ভূত কুসংস্কার সৃষ্টিকারী একটি দল সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে ঈমান ও হিকমায় পরিপূর্ণ সত্যনিষ্ঠ আলেমদের অনুসরণ করার প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করছেন। তবে সত্যনিষ্ঠ আলেমদের থেকেও অনেক সময় বিচ্যুতিমূলক কথা প্রকাশ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ওইসব বিচ্যুত ও সংশয়যুক্ত কথা অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলনির্ভর মতাদর্শ গ্রহণ করতে হবে। দুর্লভ ও ব্যতিক্রমধর্মী কথা ও কাজ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

আলেমদের পদস্খলন চেনার জন্য তিনি একটি মূলনীতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছেন, এ ধরনের কথাতে সংশয় ও দুর্বোধ্যতা আচ্ছন্ন থাকবে। স্বচ্ছ কোনো ধারণা পাওয়া যাবে না তা থেকে। মনের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে–এটা আবার কেমন কথা?!!

অপরদিকে হক কথার মধ্যে কখনো কোনো সংশয় থাকবে না। তাতে থাকবে আল্লাহপ্রদত্ত নুর; শোনার সাথে সাথে হৃদয়ে এক প্রকার শান্তি ও স্থিরতা অনুভূত হবে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. থেকেও এ বিষয়ে মূল্যবান কিছু পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে তিনি আলেমদের পদস্খলন থেকে বাঁচার তাগিদ দিয়েছেন।

ইমামদের অনুসরণ করার বিষয়ে সরল পথের সন্ধান দিয়েছেন। সেখান থেকে কিছু আমি এখানে বর্ণনা করছি। তিনি বলেন :

এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় পালনীয়। প্রথমটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো : আল্লাহ, তাঁর রাসুল, কিতাবুল্লাহ ও দ্বীনের যথাযথ কদর করা। অসত্য ও রাসুলের আদর্শবিরোধী সকল কথা ও কাজ বর্জন করা।

দ্বিতীয় বিষয় : ইমাম ও মনীষীদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া। আর তাদের মর্যাদা দেওয়ার মানে এই নয় যে তাদের বর্ণিত সকল কিছুই নির্দ্বিধায় গৃহীত হবে! বিনা প্রমাণে সবকিছু পালনীয় বিবেচিত হবে! যেসব বিষয়ে স্পষ্টভাবে কুরআন-হাদিসে কিছু বর্ণিত নয়, সেসব বিষয়ে তাদের মতামত ও ফতোয়াগুলো এককথায় গ্রহণযোগ্য হবে! তবে সত্যটা লুকিয়ে থাকতে পারে তাদের মতের বিপরীতেও। এ কারণেই তাদের থেকে বর্ণিত সকল কিছুই বিনা বাক্যে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাদের থেকেও স্খলনের আশঙ্কা আছে। এ বিষয়গুলো সব সময় মাথায় রাখতে হবে তালিবুল ইলমদের। এ কারণে কখনো তাদের সম্পূর্ণ দোষীও সাব্যস্ত করব না আবার নিজেরাও সেগুলো নিয়ে মাতামাতি করব না; এসব বিষয়ে বরং সাহাবিদের থেকে বর্ণিত মতকেই আমরা প্রাধান্য দেব। যাকে আল্লাহ তাআলা স্বচ্ছ ও পরিষ্কার মন দিয়েছেন, ঈমানের জন্য আত্মাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সহজেই সে এগুলো ধরতে পারবে। যারা ইসলামি শরিয়ত সম্পর্কে নিদারুণ জাহেল তারা এসব বিষয় কখনো আন্দাজ করতে পারবে না।

অপরদিকে শরিয়তের বিষয়ে বিজ্ঞ লোকেরা নিশ্চিতভাবেই জানে যে ইসলামের জন্য যে সকল মনীষী জীবনভর কষ্ট-পরিশ্রম করেছেন, জাতীয় চেতনা ও সার্বভৌমত্ব উন্নীত করতে যাদের প্রয়াস ছিল নিরলস ও বিরামহীন–তাদের মুখ থেকে কখনো কখনো ব্যতিক্রমধর্মী কোনো উক্তি বের হতেই পারে। আর সেগুলো তাদের নিজ নিজ ইজতেহাদপ্রসূত। সে জন্যে তারা পুরস্কৃতও হবেন আল্লাহর দরবারে; তবে ধর্মাচার পালনের ক্ষেত্রে তাদের সেসব বিরল ও ব্যতিক্রমী মতের পেছনে পড়া যাবে না কোনোভাবেই। পাশাপাশি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলা যাবে না। মানহানি করা যাবে না বিন্দুমাত্রও। অসম্মান প্রদর্শন করা যাবে না তাদের শানে। অস্বীকার করা যাবে না ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য তাদের সীমাহীন অবদানের কথা।'[৪৯৮] এখানেই শেষ হলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর অমূল্য উপদেশমালা।

---

[৪৯৮] إعلام الموقعين : ৩/২৯৪

আজকাল অনেক শিক্ষার্থী এমনকি ইলমপিপাসু ব্যক্তিবর্গও বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়গুলোর পেছনে উঠেপড়ে লেগেছে। সাহাবিদের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে ইসলামের মতের বিরুদ্ধে দুর্বল বর্ণনা ও মনীষীদের ব্যক্তিগত মতামতকে অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। তাই এ বিষয়ে আমি একটু বাড়িয়ে আলোচনার প্রয়াস নিয়েছি।

এসব দুর্লভ মত অনুসন্ধানকারীদের ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাকে ভন্ডুল করার জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতামত হলো কুরআন-সুন্নাহনির্ভর। আর তাই সেগুলোর মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতাও অতুলনীয়। বিষয়টি তাদের ভালো করে অনুধাবন করতে হবে। ইজতেহাদ করতে গিয়ে কোনো কোনো মনীষী হয়তো ব্যতিক্রমী কিছু বলেছেন, তবে সেগুলোর পেছনে পড়া এবং সেগুলো নিয়ে ঢাক-ঢোল পেটানো থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর একটি উক্তি পর্যালোচনা না করলেই নয় : ‘তুমি যখন ইখতেলাফপূর্ণ বিষয়ে কাউকে তোমার মতের বিপরীতে আমল করতে দেখবে, তখন তাকে নিষেধ করো না।’

মানে হলো ইখতেলাফটি যখন প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয় এবং ইমাম ও আলেমদের মুখে মুখে বহুল আলোচিত হয়, তখনই এ নিয়মটি প্রযোজ্য হবে। তাদের মুখে মুখে একটি কবিতা প্রচলিত ছিল :

فليس كلُّ خلافٍ جاءَ معتبَرًا ☆ إلا خلافٌ له حظٌّ من النظَرِ

অর্থ : ‘প্রতিটি মতবিরোধই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নয়; তবে যে মতবিরোধের আড়ালে প্রচুর গবেষণা লুকিয়ে থাকে তার ব্যাপারটি অবশ্য ভিন্ন।’[৪৯৯]

তবে বিরল মতবিরোধপূর্ণ মাসআলার ওপর কাউকে আমল করতে দেখলে চুপ থাকা বৈধ হবে না। প্রবক্তা বা কর্তাকে সতর্ক করে দিতে হবে। এর আগে ইবনে হাযাম রহ.-এর উক্তিতে এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়ের অনেক উদাহরণ গত হয়েছে (যদিও সেগুলো তিনি যারা ইখতেলাফকে রহমত বলে মনে করে তাদের মতামত খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন) বরং এ ধরনের মতানৈক্য ও বিরোধীদের অসত্য প্রমাণ করা আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে আলেমদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং একটি আমানত।

---

[৪৯৯] কবিতাটি ইমাম আবুল হাসান ইবনে হাসসার আল-মালেকির রচিত (মৃত্যু : ৬১১)। এটি তার কাসিদায় বর্ণিত সর্বশেষ কবিতা। যাতে মক্কি ও মাদানি সুরার আলোচনা সংবলিত প্রায় বাইশটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ আছে। আর সেগুলো যথাযথভাবে বর্ণিত আছে ইমাম সুয়ুতি রহ.-এর الإتقان গ্রন্থে : ১/৪৫

ইবনে রজব হাম্বলি রহ. তার অমূল্য গ্রন্থ جامع العلوم الحكم -এ লেখেন : আল্লাহ, তাঁর রাসুল, তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে আলেমদের ওপর অর্পিত[৫০০] অন্যতম দায়িত্ব হলো কিতাব-সুন্নাহের দোহাই দিয়ে মানুষকে বিচ্যুতকারী ওসব ভণ্ড নেতাদের বক্তব্য যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে খণ্ডন করা। পাশাপাশি আলেমদের থেকে বর্ণিত বিরল, ব্যতিক্রমী ও দুর্বল বিষয়গুলো এড়িয়ে কিতাবুল্লাহ ও সহিহ হাদিসনির্ভর বিশুদ্ধ মতামত তাদের সামনে তুলে ধরা।[৫০১]

তিনি আরও বলেন : যেসব বিষয়ে ওলামায়ে উম্মাহের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসবের বিপরীতে কাউকে আমল করতে দেখলে তাকে কঠোরভাবে সতর্ক করতে হবে। আর ইখতেলাফপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের অনেক মনীষী বলেছেন, মুজতাহিদ হিসেবে অথবা পূর্ণ মুকাল্লিদ হিসেবে আমল করলে তাকে ওই আমল থেকে বারণ করা হবে না। তবে যেসব ইখতেলাফ সর্বসম্মত হারাম কাজের দিকে নিয়ে যায় الأحكام السلطانية গ্রন্থে কাজি আবু ইয়ালা আল-ফারা রহ.[৫০২] সেসব বিষয়কে এর ব্যতিক্রম বলেছেন (অর্থাৎ সেগুলোর ওপর আমল থেকে তাদের বারণ করতে হবে)। যেমন : সুদ, মুতআর বিয়ে; কারণ এটা ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যায়। ইমাম আহমদ রহ. থেকে দাবা খেলায় লিপ্ত ব্যক্তিকে তা থেকে বারণ করার অভিমত বর্ণিত হয়েছে। সে যদি বিনা ইজতিহাদে বা পূর্ণ তাকলিদ ছাড়া আমল করে তবেই তাকে নিষেধ করা হবে বলে এর তাবিল করেছেন কাজি আবু ইয়ালা আল ফারা রাহ.।

---

[৫০০] এখানে তিনি বিশেষভাবে আলেমদের কথা বলেছেন। কারণ, সত্যের দিকে উৎসাহিত করা এবং অসত্য থেকে মানুষকে সতর্ক করা আলেমদের ওপর আরোপিত অন্যতম দায়িত্ব। তাঁরা ছাড়া অন্যদের জন্য এ স্তরে এসে বাড়াবাড়ি করার কোনো সুযোগ নেই। বর্তমান সমাজে প্রায় প্রতিটি লোকই নিজেকে এ স্তরে উপনীত বলে মনে করে। আল্লাহর শরিয়ত নিয়ে যে যেভাবে পারে কথা বলার চেষ্টা করে। বর্তমানে একটি কথা প্রায় প্রবাদতুল্য : ইসলামধর্মে ধর্মশাস্ত্রী বা পাদরি বলে কিছু নেই।' এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য–প্রতিটি মুসলিমকেই দ্বীনের বিষয়ে কথা বলতে হবে। কথাটি যদিও সত্য ও পালনীয়। কিন্তু বর্তমানে একে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপপ্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে।

[৫০১] ১/২২৩-২২৪

[৫০২] ২৯৭

কুরআন-সুন্নাহের স্পষ্ট বিবরণের ফলে যেসব বিষয়ের ইখতেলাফ দুর্বল ও গৌণ সাব্যস্ত হয়, সেগুলোই আলেমদের ব্যতিক্রমী ও দুর্লভ বিষয় বলে বিবেচিত হবে (আল্লাহই অধিক জানেন)।

الموافقات গ্রন্থে ইমাম শাতেবি রহ. আলেমদের পদস্খলন বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেন। সেখানে ওমর ও মুয়াজ রহ. থেকে বর্ণিত হাদিস এবং সুলাইমান আত-তাইমির উক্তি বর্ণনা করে তিনি বলেন : 'অধ্যায় : কোনোভাবেই আলেমদের থেকে বর্ণিত ব্যতিক্রমী বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। তাকলিদস্বরূপ সেগুলোর ওপর আমলও করা যাবে না। কারণ, এসব হলো বানোয়াট। শরিয়তবিরোধী। ফলে সেগুলো ব্যতিক্রমী হিসেবে অভিহিত। স্বাভাবিক বিষয় হলে সেগুলোর কপালে এ 'বিরল ও ব্যতিক্রমী' উপাধি জুটত না। সেগুলোর প্রবক্তাদের প্রতিও পদস্খলনের অভিযোগ উঠত না। তবে স্মরণ রাখতে হবে, ব্যতিক্রমী মত অবলম্বনের কারণে তাঁকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। তাকে অবমূল্যায়ন করার বা তার প্রতি কটূক্তি করার কোনো অবকাশ নেই। ইলমি ময়দানে তাঁর যে মর্যাদা ও স্তর রয়েছে তা ক্ষুণ্ন করার কোনো অনুমতি নেই।'

'অধ্যায় : শরয়ি মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে এসব ব্যতিক্রমী বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল হওয়া যাবে না। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এগুলো ইজতেহাদপ্রসূত নয়। ইজতেহাদি কোনো মাসআলাও নয়। যদি হয়েও থাকে তবুও অপাত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। অযোগ্য মুজতাহিদের মতো কাণ্ড পরিলক্ষিত হয়েছে। অপরদিকে শরয়ি মাসায়েলের মাঝে ইখতেলাফের ক্ষেত্রে কেবল গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী দলিলই ধর্তব্য। এর দ্বারাই একটি মাসআলা শক্তিশালী বা দুর্বল হয়ে যায়।'

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, মুজতাহিদ নয়; তবে দ্বীনের ব্যাপারে মুতাফাক্কিহ–এ ধরনের লোকদের জন্য কি এসব ব্যতিক্রমী মত চেনার ও তাতে পার্থক্য করার কোনো মূলনীতি তৈরি আছে?

এর উত্তর হলো– হ্যাঁ, যদিও সেটি মৌলিক নয়। আর তা হলো, যেসব উক্তি ও মতের ক্ষেত্রে ভুল ও স্খলন পরিলক্ষিত হয়েছে শরিয়তে তা নিতান্তই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রবক্তাগণ নিজ নিজ মন্তব্যে মুনফারিদ। অন্য কেউ তার এ মতে সহযোগিতা বা সহমত পোষণ করেনি। আর তাই একজন ব্যক্তি যদি বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয়ে মুনফারিদ হিসেবে কোনো অভিমত প্রকাশ করে, তবে নিশ্চিত জেনে রাখা দরকার যে, হক ও সত্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মুজতাহিদের পক্ষেই থাকবে; মুকাল্লিদদের পক্ষে নয়।'

লক্ষ করুন, এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কায়্যিম এবং ইবনে রজব হাম্বলির অভিমত প্রায় অভিন্ন।

তাই একজন দক্ষ শিক্ষক ও উস্তাদের কর্তব্য হবে, শিক্ষার্থীদের তিনি এমন সব ইলমি স্বভাবের ওপর গড়ে তুলবেন যা সাময়িকভাবে ছোটো ও শাখাগত মনে হলেও ভবিষ্যৎজীবনে তা বড়ো ও অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী সাব্যস্ত হবে।

তালিবুল ইলম যেন কিছুতেই এসব ব্যতিক্রমী মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রশ্ন উত্থাপন না করে যে, এটা তো ইবনে আব্বাসের মতো মহান মনীষীর কথা, ইবনে ওমর রা.-এর অভিমত; আর তাদের অনুসরণ তো হক ও প্রশংসনীয়। অথবা এটা তো বিখ্যাত ও বরেণ্য তাবেই সাইদ ইবনুল মুসাইয়াবের উক্তি বা বিখ্যাত কাজি শুরাইহের অভিমত..!!

যদি কেউ এ রকম বলে, তবে আমরা তাকে বলব : তুমি একজনের কথা নিয়ে বসে আছ? আর অসংখ্য সাহাবি, শত শত তাবেই, হাজার হাজার তাবে তাবেই এবং তাদের পরে অজস্র ইমাম ও মনীষী সে মত থেকে ফিরে এসেছেন। বর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে আবার অনেকে এমন আছেন যাদের থেকে বিরল ও ব্যতিক্রমী বিষয় প্রকাশ পেয়েছে বটে; তবে নিজ নিজ ইজতেহাদের কারণে তারা পুরস্কৃত হয়েছেন আর তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের বিপরীতে গিয়ে নিজেকে কলঙ্কিত ও অপরাধী সাব্যস্ত করছ...!!

* * * *

দশম পথনির্দেশ

প্রত্যেক দেশের স্থানীয় আলেমদের ইলম ও আমলের স্বীকৃতি দান

বিজ্ঞ শায়খের উচিত হলো, নিজ দেশের সাধারণ মুসলমানদের সাথে কী রকম আচরণ করবে সেটি তিনি শিক্ষার্থীদের ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। এ ক্ষেত্রে তাদের হেকমতপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ দেবেন। দরসে হোক বা আম মাহফিলে; ফতোয়া প্রদানকালে হোক বা বিচারকাজ সমাধাকালে—যতদিন মানুষের মাঝে কল্যাণ থাকে, সৎ কাজের ওপর তারা অটল থাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মাযহাবের ওপর অবিচল থাকে—ততদিন তাদের সঙ্গে প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করার কথা বলবেন। তাদের নিজেদের ঈমান, আমল ও আকিদার ওপরই ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দেবেন। ধর্মপালন বিষয়ে এই সরলমনা মুমিন মুসলমানদের মনে কোনোরূপ সংশয়-সন্দেহ তৈরি করা উচিত নয় বলে তাদের অবহিত করবেন। বলবেন, ইমামদের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো তাদের সামনে প্রকাশ করা উচিত নয়। যদিও ফতোয়া প্রদানকালে আলিমরা নানান মত-অভিমতের উল্লেখ করে থাকেন প্রধান মতটি প্রমাণের জন্য।

এ ধরনের ফেতনা শুধু সেসব শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই ঘটে থাকে, যারা মাযহাব সম্পর্কে শিথিল অবস্থানে থাকা দেশগুলোতে শিক্ষালাভ করে নিজেদের দেশে ফিরে যায়। আর তাদের দেশের সাধারণ মানুষ হয় একটি মাযহাবের অনুসারী। তারা পরিচিত থাকে কেবল একটি মাযহাবের সঙ্গেই। এরপর সেইসব শিক্ষার্থীরা সেখানে ভিন্ন মাযহাবের ভিন্ন মতগুলো তাদের মাঝে প্রচার করতে থাকে। হেকমতপূর্ণ পন্থা অবলম্বন না করে জনসাধারণের মনে সংশয়ের বীজ বপন করে। এভাবেই তার এ জ্ঞানসাধনা তার জন্য এবং স্বজাতির জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। নিজে বিপথগামী হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মুসলমানদেরও সে বিপথগামী করে ছাড়ে। একজনের পথভ্রষ্টতা একাধিক মানুষের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়।

আমার অভিমত হলো, যতদিন মানুষের মাঝে কল্যাণ থাকবে, ইসলামি ভাবধারায় তারা জীবনযাপন করবে, ততদিন প্রত্যেক মুসলিম দেশের স্থানীয় মুসলমানদের তাদের মাযহাবের ওপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমার এ অভিমতটি ধর্মীয় বিদআত নয় এবং অন্ধ মাযহাব অনুকরণও নয়; বরং এটিই

সালাফে সালেহিনের মতাদর্শ। এ বিষয়ে أدب الاختلاف গ্রন্থে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখান থেকে মূল অংশটি এখানে উল্লেখ করছি :

বিশেষভাবে এখানে দুজন স্বনামধন্য ইমাম ও মুজতাহিদের দুটি প্রশংসনীয় সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করব, যারা সকল মানুষকে একটি মাযহাব বা অভিন্ন মতাদর্শের ওপর একত্র করার ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন।

১. ইমাম দারেমি রহ. তার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, একবার হামিদ তাবিল খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ রহ.-কে বলেন, হে আমিরুল মুমিনীন, সকল মানুষকে যদি একটি মতাদর্শের ওপর পরিচালিত করতেন!! উত্তরে তিনি বলেন, মানুষ ইখতেলাফ ছেড়ে দিক এটা আমার পছন্দ নয়। এরপর তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক ও গভর্নরদের কাছে এই বলে চিঠি পাঠান যে, বিচারকগণ প্রতিটি অঞ্চলের স্থানীয় ফকিহদের মতামতের ভিত্তিতেই যেন বিচার ও ফায়সালা করে।'[৫০৩]

দামেস্কের বিখ্যাত কাজি এবং নির্ভরযোগ্য তাবেঈ সুলাইমান বিন হাবিবের বরাত দিয়ে আবু যুরআ দামেস্কি রহ. বলেন : একবার ওমর বিন আবদুল আজিজ রহ. সকল অঞ্চলের সকল মুসলমানকে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের ওপর একত্র করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু পরে তার এ ইচ্ছা থেকে সরে এসে তিনি বলেন, প্রতিটি অঞ্চলেই রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণের পদচারণা ছিল। সেসব অঞ্চলের বিচারকদের রায়ে তারা সন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছিল। অনুমতি দিয়েছিল। ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সেভাবেই বিচারকার্য পরিচালিত হয়ে আসছে। যেমন পরস্পর চুক্তিসংক্রান্ত আইনকানুনে এবং তারা সে মাযহাবের ওপরেই দিন যাপন করছে।' এরপর তিনি তার ইচ্ছা থেকে ফিরে আসেন। তিনি কখনো এমন কিছুর বাস্তবায়ন চাইতেন না যা তাদের জন্য পীড়াদায়ক হয়। মেনে নিতে কষ্ট হয় তাদের (যদিও তা শরিয়তসম্মত হয়)। অচিরেই সে সংক্রান্ত ঘটনা আলোচিত হবে।

২. ইমাম মালেক রহ.-এর কাছে যখন সরকারিভাবে তার রচিত 'মুয়াত্তা' গ্রন্থের বিধানকে সর্বত্র প্রচলিত করার প্রস্তাব আসে, তখন তিনি বিভিন্ন উপায়ে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, মানুষকে এক মাযহাবের ওপর জোরপূর্বক নিয়ে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কোনোভাবেই উচিত নয়। এভাবেই তিনি মানুষের ধর্ম পালন সহজ করার জন্য উক্ত প্রস্তাবের তুমুল বিরোধিতা করেছিলেন।

---

[৫০৩] باب اختلاف الفقهاء : ১/১৫১

ইবনে আবি হাতিম বলেন : ইমাম মালেক রহ. বলেন, একবার খলিফা আবু জাফর মনসুর আমাকে বলেন, এ বিষয়ের সবগুলো ইলমকে (পুরো বিচারব্যবস্থাকে) একটি ইলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাই আমি। সব অঞ্চলের সব শাসক ও অধিপতির কাছে চিঠি লিখে সেই একক ইলমের ওপর আমল করার আদেশ জারি করে দিতে চাই। যে এর বিরোধিতা করবে তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। তাঁর উত্তরে আমি বলি, হে আমিরুল মুমিনীন একটু ভাবুন, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের বেশির ভাগ বিজয় দেখে যেতে পারেননি। তাঁর সময়ে মুসলমান প্রায় একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। এভাবেই তিনি দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেছেন। এরপর আবু বকর রা. ইসলামের ঝান্ডা ধারণ করেন। তাঁর শাসনামলেও ইসলাম খুব বেশি অঞ্চল বিজয় করতে পারেনি। এভাবেই তিনি দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করেন। এরপর ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে ইসলামের বিজয়ধ্বনি শুরু হয়। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য মুসলমানদের পদতলে আসে। এরপর সেসব অঞ্চলে সাহাবিগণ গিয়ে নিজেদের মতো করে শাসন পরিচালনা করেন। আর স্থানীয় বাসিন্দাগণ সেটাকেই মাযহাব হিসেবে মেনে নিয়েছে। এই মুহূর্তে যদি আপনি তাদের ওপর অচেনা কোনো শরিয়ত চাপিয়ে দেন তবে সেটাকে তারা বরং কুফর হিসেবে মনে করবে। তাই আপনি বরং তাদের নিজ নিজ মাযহাবমতে আমলের ওপরেই ছেড়ে দিন। এ কথা শুনে তিনি বলেন, আপনি তবে একমত হননি; আচ্ছা তবে এই সিদ্ধান্তের ওপর অবিচল থাকতে মুহাম্মদের কাছে চিঠি লিখুন! (অর্থাৎ তার ছেলে এবং পরবর্তী খলিফা মাহদির কাছে)।[৫০৪]

---

[৫০৪] ঘটনাটি হলো তাবেইনদের যুগের; যখন প্রসিদ্ধ চার মাযহাবেরও সৃষ্টি হয়নি। বোঝা গেল, তখনো মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব অনুসরণ করত। একেক অঞ্চলে একেক মতাদর্শের প্রচলন ছিল। সেখানে তাদের মাঝে কোনোপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। মাযহাবগত কোনো বাড়াবাড়ি ছিল না। ফেতনার ছড়াছড়ি ছিল না তাদের মাঝে। ইমাম মালেক রহ. এখানে এ বিষয়টির প্রতিই খলিফার মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। ওমর বিন আবদুল আজিজও উল্লিখিত শঙ্কার কারণে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। ইমাম মালেকের কাছে লাইস বিন সা'দের প্রেরিত প্রসিদ্ধ চিঠির মধ্যে লেখা ছিল : 'এর মধ্যে হলো, কেবল একজনের সাক্ষী ও সত্যান্বেষী একজনের শপথের ভিত্তিতে ফায়সালা করা। আর আপনি তো জানেন (ইমাম মালেককে সম্বোধন) মদিনার কাজিগণ এ মূলনীতির ভিত্তিতেই ফায়সালা করেন। কিন্তু রাসুলের সাহাবিগণ শামে, হোমসে এমনকি ইরাকেও এই নিয়মে ফায়সালা করেননি। তৎকালীন খলিফা

القسم المتمم অধ্যায়ে ইবনে সা'দের বর্ণনায় ওয়াকেদি রহ. থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ হয়েছে। শায়খ ওয়াকেদি রহ. বলেন, আমি মালেক বিন আনাসকে বলতে শুনেছি : খলিফা আবু জাফর মনসুর হজে আসার পর আমাকে তলব করেন। আমি তার কাছে উপস্থিত হলে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আর আমি উত্তর দিয়ে যাই। একপর্যায়ে তিনি বলেন, আমি চাই আপনি আপনার রচিত 'মুয়াত্তা' গ্রন্থটির একাধিক কপি লিখে আমার কাছে পাঠাবেন। আর আমি সেগুলো প্রতিটি অঞ্চলের শাসক ও গভর্নরদের কাছে পাঠিয়ে দেব। অন্যসব মূলনীতি ছেড়ে এ কিতাবের মূলনীতি অনুসারেই ফায়সালা করার নির্দেশ দেব তাদের। কারণ, আমি চাই মদিনার নিয়মেই সর্বত্র বিচারকার্য পরিচালিত হোক। এর বাইরে বাকিগুলো তারা বর্জন করুক।

উত্তরে আমি বলি, হে আমিরুল মুমিনীন, এমনটি আপনি করবেন না! কারণ, মানুষ একটি মতাদর্শের ওপর অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা সে ব্যাপারে হাদিসও শুনেছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াত তাদের কানে পৌঁছেছে। সে হিসেবে তারা আমল করা শুরু করেছে। এখন তাদের ওপর উল্টো কিছু চাপিয়ে দিলে তার ওপর আমল করা তাদের জন্য বড়ো কঠিন হবে। আপনি বরং তাদেরকে তাদের আমলের ওপরই ছেড়ে দিন। তারা নিজেদের আমলের ওপরই অবিচল থাকুক!

এরপর খলিফা বলেন, আপনি যদি আমার সাথে একমত হতেন তবে অবশ্যই আমি সবার কাছে এ নির্দেশ পাঠাতাম![৫০৫]

আবু বকর, ওমর, উসমান ও আলি রা.-ও এ মূলনীতি পরিবর্তন করতে তাদের কাছে কোনো আদেশ পাঠাননি।

এরপর ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হন। আর তিনি ছিলেন সুন্নাহ প্রতিষ্ঠায় আপোষহীন। পরিপূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ছিলেন সদা তৎপর। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে ছিলেন সচেষ্ট। তো রুযাইক বিন হাকিম তাঁর কাছে পত্র লেখে : 'হে আমিরুল মুমিনীন, মদিনায় আপনি একজনের সাক্ষী এবং সত্যবাদী একজনের শপথের ভিত্তিতে ফায়সালা করে থাকেন।' এর উত্তরে তিনি লেখেন : 'মদিনায় আমরা এ মূলনীতিতেই ফায়সালা করতাম। কিন্তু শামের আলেমদের আমলের ভিত্তিতে এখন আমরা দুজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য অথবা একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই ফায়সালা করছি।' ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর إعلام الموقعين এ (৩/৯৭) উল্লেখ আছে।

৫০৫ طبقات ابن سعد : ৪৪০ الانتقاء : ৮০

ঘটনার বর্ণনাকারী ওয়াকেদির স্তর বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম যাহাবি রহ. বলেন : যদিও তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী, তবে তিনি যে সত্যবাদী এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন; সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই।'[৫০৬]

যুবাইর বিন বাক্কারের বর্ণনায় এসেছে, মালেক বিন আনাস রহ. খলিফা আবু জাফর মনসুরকে বলেন, প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষের আমল ও আকিদা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এখন আবার তা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়াটা হবে বড়ো কঠিন ব্যাপার।'[৫০৭] আল্লামা কাউসারির করা মন্তব্যটিও সেখানে দেখা যেতে পারে।

ترتيب المدارك গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, খলিফা মাহদি একবার ইমাম মালেক রহ. কে বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনি এমন একটি কিতাব রচনা করুন যা পুরো উম্মতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। সব মানুষকে আমি সেটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেব। এ কথা শুনে ইমাম মালেক বলেন, দেখুন মাগরিববাসীর জন্য তাদের স্থানীয় আলিমরাই যথেষ্ট। আর শামদেশের জন্য আছেন তাদের বিখ্যাত ফকিহ আওযাঈ। ইরাকবাসীর কথা আর না-ই বলি।'[৫০৮] মাগরিব (মরক্কো) অঞ্চলে ইমাম মালেকের শিষ্যগণ ছড়িয়ে পড়িয়েছিলেন। আর শামে ছিলেন অসংখ্য ফকিহ ও মুজতাহিদ। ফলে সেখানে আর নতুন কিছু প্রয়োগের দরকার ছিল না; বরং স্থানীয় আলিমদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

الحلية গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, 'খলিফা রশিদ আমার সঙ্গে তিনটি বিষয়ে পরামর্শ করেন। তার মধ্যে একটি হলো, মুয়াত্তা গ্রন্থকে পুরো সাম্রাজ্যজুড়ে প্রচার করা এবং মানুষকে তার বিধানমতে আমল করার নির্দেশ দেওয়া।' এর উত্তরে তিনি বলেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিগণ শাখাগত বিভিন্ন মাসআলায় মতবিরোধ পোষণ করেছেন। এরপর তারা পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন। আর তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতামতের ব্যাপারে ছিলেন সঠিক।'[৫০৯]

খতিব রহ. এর الرواة عن مالك গ্রন্থে এসেছে, খলিফা রশিদ বলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, আপনার এ কিতাব কি আমরা ছেপে পুরো সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দেব? যেন সব মানুষ একই নীতি অনুসারে চলে! ইমাম মালেক বলেন, হে আমিরুল

---

[৫০৬] السير : ৭/১৪২

[৫০৭] الانتقاء গ্রন্থে ইবনে আবদুল বার তা বর্ণনা করেছেন : ৮১

[৫০৮] سير أعلام النبلاء : ৮/৭৮ ১/২১৮

[৫০৯] ইমাম যাহাবি السير গ্রন্থে এর সনদকে حسن বলেছেন।

মুমিনীন, আলিমদের ইখতেলাফ তো এই উম্মতের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। সকলেই তাদের নিজেদের কাছে যা সহিহ মনে হচ্ছে সেমতে আমল করছে। সবাই তো হেদায়াতের ওপরই আছে। সকলই তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করছে।'[৫১০]

الحلية গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে, একবার খলিফা মামুন মালেক বিন আনাসকে বলেন, আসুন, আমি সব মানুষকে মুয়াত্তার ওপর আমল করার নির্দেশ দিতে চাই। ঠিক যেমন ওসমান রা. মানুষকে কুরআনের একটি নুসখাকে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর উত্তরে মালেক রহ. বলেন, এটা আপনি পারবেন না! কারণ, রাসুলের মৃত্যুর পর সাহাবিগণ পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন। সেখানে তারা মানুষের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন। ওই হাদিসগুলোর ওপর ভিত্তি করেই প্রত্যেক দেশে ইলমের ভান্ডার গড়ে উঠেছে।'[৫১১]

তবে কাজি ইয়ায রহ. বলেন, মালেক বিন আনাস খলিফা মামুনের শাসনামল পাননি। এর আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। আর তাই এখানে খলিফা মামুনের উল্লেখ করাটা হবে কল্পকথা।'[৫১২]

উপর্যুক্ত সকল বর্ণনার সারনির্যাস হলো, ইমাম মালেক রহ. সাহাবি এবং সাহাবিদের পর উম্মতের ইখতেলাফের বিষয়টি স্বীকার করে নেন। পাশাপাশি সকল মানুষকে একটি মাযহাব বা অভিন্ন মতাদর্শের ওপর একত্র করার বিষয়টিও তিনি অসম্ভব বলে নাকচ করে দেন। খতিব রহ.-এর বর্ণনাসূত্রে উল্লিখিত তাঁর বক্তব্যটি আবারও পড়ুন, 'আলিমদের ইখতেলাফ তো এই উম্মতের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ।' পড়ুন الحلية -তে বর্ণিত তাঁর অপর বক্তব্যটিও–'সবাই নিজ নিজ অবস্থানে হকের ওপর আছে।'

আরও একটি বক্তব্য বর্ণিত আছে, 'অন্যসব ইমামের মতামতকে শ্রদ্ধা করা। তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করা।' অথচ তিনি ছিলেন বিখ্যাত ইমাম ও মুজতাহিদ। যা বলতেন, চেষ্টা-সাধনা আর অক্লান্ত পরিশ্রম করেই বলতেন। নিশ্চিত হয়ে নিতেন যে এটিই সঠিক; অন্যটি নয়। এর পরও তিনি ভিন্ন মত পোষণকারীদের মতামতকে কখনো খাটো করতেন না। অকপটে স্বীকার করে নিতেন। শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। এভাবেই তিনি খলিফাকে পুরো বিষয়টি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

---

[৫১০] كشف الخفاء للعجلوني : ১/৬৫ (১৫৩)
[৫১১] ৬/৩৩১
[৫১২] ترتيب المدارك : ১/২৪৩

উপর্যুক্ত ঘটনাগুলো দ্বারা আলিমদের প্রতি তার সীমাহীন শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের বিষয়টিও উঠে এসেছে। বোঝা গেল, কখনো আলিমদের সিদ্ধান্তকে খাটো করে না দেখা। অসত্য বা ভিত্তিহীন বলে আখ্যা না দেওয়া। শরিয়তনির্ভর হলে তাকে তার ওপর আমল করতে দেওয়া। ইবনে আবি হাতেম থেকে বর্ণিত ইমাম মালেকের উক্তিটি আবার পড়ুন, 'আপনি যদি অপরিচিত কোনো কিছুর দিকে তাদের ফিরে যেতে বাধ্য করেন, তবে সেটাকে তারা একপ্রকার কুফুর হিসেবে মনে করে বসবে!!' অথচ খলিফা চাচ্ছিলেন ইমাম মালেকের রচিত প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ 'মুয়াত্তা' গ্রন্থকেই তাদের ওপর প্রয়োগ করতে, যা তৎকালীন প্রায় সকল আলিমের কাছে একক গ্রহণযোগ্য হাদিসগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত ছিল।

সাধারণ মুসলমানদের এ মাযহাবপ্রীতিকে ইমাম মালেক আদৌ অন্ধ অনুসরণ বা পথভ্রষ্টতা ভাবেননি; যা বর্তমানযুগের তথাকথিত লা-মাযহাবীরা ভেবে থাকে এবং অবাধে তা প্রচার করে থাকে। জনসাধারণকে নিজ নিজ মত ও পথ থেকে বিচ্যুত করার কল্পনাও কোনোদিন তিনি করেননি ।

ইমাম মালেক রহ. থেকে তাঁর শিষ্যরাও এ গুণগুলো খুব ভালোভাবে আঁকড়ে ধরেন। তারা যেখানেই যেতেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণের আমলের ওপর থাকাটাই পছন্দ করতেন। এ বিষয়ে الاستذكار গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তার শায়খ আবু ওমর আহমদ বিন আবদুল মালিক বিন হাশেমকে বলতে শোনেন, আবু ইবরাহিম ইসহাক বিন ইবরাহিম 'মুয়াত্তা'য় বর্ণিত ইবনে ওমরের হাদিস অনুযায়ী নামাজে প্রতিবার রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার পর 'রফে ইয়াদাইন' করতেন। আর তিনি ছিলেন আমার দেখা সবচেয়ে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ফকিহ। শায়খের এ উক্তি শুনে ইবনে আবদুল বার আবু ওমর– আহমদকে জিজ্ঞেস করেন, তবে আপনি কেন রফে ইয়াদাইন করেন না?! আপনি করলে তো আমরাও আপনাকে অনুসরণ করতাম। উত্তরে তিনি বলেন, আমি ইবনুল কাসিমের রেওয়ায়েতের বিপরীত আমল করতে চাই না। কারণ, আমাদের এখানে সবাই এভাবেই আমল করে আসছে। আর বৈধ কোনো বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীত আমল করা ইমামদের শান নয়।'[৫১৩]

التمهيد গ্রন্থে ইবনে আবদুল বার আরও বলেন, 'আমরা ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়ার উপর্যুক্ত বর্ণনাগুলো গ্রহণ করে নিয়েছি। কারণ, এ অঞ্চলে তাঁর সুখ্যাতি, তাঁর প্রতি মানুষের অগাধ শ্রদ্ধা এবং ইলম ও আমলে তাঁর বিশাল

---

[৫১৩] ৪/১৫২

দখলের বিষয়টি এখানকার লোকদের মুখে মুখে প্রসিদ্ধ রয়েছে। তাঁর বর্ণনাগুলো এখানে বেশি প্রচলিত; যা তারা তাদের শায়খ ও আলিমদের থেকে লাভ করেছেন। প্রতিটি সম্প্রদায়ের উচিত তাদের পূর্বসূরিদের আমলের ওপরই অবিচল থাকা। তাদের রেখে যাওয়া শ্রেষ্ঠ পথ ও পদ্ধতিকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরা। এমনকি এর বিপরীতে এর চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কিছু পাওয়া গেলেও!'[৫১৪]

বরং ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, মানুষের উচিত হলো এ সকল মুস্তাহাব কাজ রেখে উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করা। কারণ দ্বীনের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি হলো সবকিছুর ঊর্ধ্বে।'[৫১৫] বিস্তারিত সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

এখন সম্মানিত পাঠক আজকের নির্মম বাস্তবতার প্রতি একটু খেয়াল করুন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর অনুসরণের দাবিদার এসব লোকের কাণ্ডকীর্তি একটু চোখ খুলে দেখুন। এরাই সেসব লোক, যারা একদিকে সালাফে সালেহিনের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত দাবি করছে, অপরদিকে تاريخ بغداد নামক গ্রন্থে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট পন্থায় ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বৃত্তান্ত রচনা করে তা ছেপে প্রচার করছে। আবার মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার একটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায়কে তারা বেছে নিয়ে সেখান থেকে ১২৫ টি মাসআলা খুঁজে বের করে তারা দাবি করেছে যে, এই ১২৫ টি মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা না কি সরাসরি হাদিসের বিপরীত আমল করেছেন; নিজের ইজতেহাদ ও ব্যক্তিগত মতকে হাদিসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর সেগুলো স্বতন্ত্র কিতাবরূপে ছেপে তার নাম দিয়েছে তারা كتاب الرد على أبي حنيفة ।[৫১৬]

তারা এই বিচ্ছিন্ন অধ্যায়টিকে পূর্ণ স্বতন্ত্র বইরূপে ছেপে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচার করেছে বিনামূল্যে। অথচ ভারতী উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমান ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাবমতেই আমল করে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। মাযহাব হিসেবে তারা একমাত্র হানাফি মাযহাবকে চিনে থাকে।

আমি আমার আগের কথায় ফিরে আসছি। বিপরীত মত অবলম্বনকারী ইমামদের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা উচিত। সেগুলো স্বীকার করে নেওয়া উচিত। তাদের ইজতেহাদের প্রশংসা করা উচিত। যেমনটি ইমাম মালেক রহ. থেকে

---

[৫১৪] ১/১০

[৫১৫] مجموع الفتاوى : ২২/৪০৬-৪০৭

[৫১৬] সাথে সাথে আমার তাহকিক করা মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবার ২০ নং খণ্ডের ভূমিকাটিও পাঠককে দেখে নেওয়ার অনুরোধ রইল।

বর্ণিত এবং প্রসিদ্ধ রয়েছে। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এখানে আরও এক জন বিখ্যাত মনীষীর উক্তি বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি।

খতিব রহ.-এর রচিত آداب الفقيه والمتفقه গ্রন্থে ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ.-এর একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, 'তুমি যখন ইখতেলাফপূর্ণ কোনো মাসআলায় তোমার মতের বিপরীত কাউকে আমল করতে দেখবে, তখন তাকে বারণ করবে না।'[৫১৭]

আবু দাউদ রহ. বলেন, মাগরিবের অব্যবহিত পূর্বে দুই রাকাত নফল নামাজের ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ.-কে জিজ্ঞেস করার পর তাকে বলতে শুনেছি, আমি এর ওপর আমল করি না; যদিও করতে কোনো সমস্যা নেই।' আবু দাউদ বলেন, অথচ এর কিছুদিন আগেই আমি তাকে 'এই আমলটি সুন্দর ও করা উচিত' বলতে শুনেছি।[৫১৮]

এর প্রায় কাছাকাছি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর একটি উক্তিও এখানে বর্ণনা করা যায়, যা খতিব রহ. বর্ণনা করেছেন :

قولُنا هذا رأيٌ، وهو أحسنُ ما قَدَرنا عليه، فمن جاءنا بأحسنَ من قولنا، فهو أولى بالصواب منا.

অর্থ : 'আমাদের এ মত হলো কেবল একটি সিদ্ধান্ত। এটিই আমাদের গবেষণালব্ধ শ্রেষ্ঠ অভিমত। কারও কাছে যদি এর চেয়ে উত্তম ও সুন্দর কিছু থাকে, কোনো সন্দেহ নেই তবে সেটিই সঠিক ও অধিক বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।'[৫১৯]

বরং الانتقاء গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর আরও একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে:

هذا الذي نحن فيه رأي، لا نجبر أحداً عليه، ولا نقول: يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسنُ منه فليأتِ به.

অর্থ : 'এটিই আমাদের অভিমত। কারও ওপর আমরা চাপাচাপি করছি না। এও বলছি না যে, সবাইকে এর ওপর আমল করতেই হবে। কারও কাছে

---

[৫১৭] ৭৬০-৭৬১

[৫১৮] مسائل الإمام أحمد الفقهية لأبي داود : ৭২

[৫১৯] تاريخ بغداد : ১৩/৩৫২

যদি এর চেয়ে উত্তম ও বিশুদ্ধ কোনো হাদিস থাকে, তবে তা সে নির্দ্বিধায় উত্থাপন করতে পারে।'[৫২০]

অপর বিখ্যাত মুজতাহিদ ইমাম আহমদ রহ. থেকেও একটি উক্তি প্রসিদ্ধ রয়েছে। আর তা বর্ণিত হয়েছে سير أعلام النبلاء গ্রন্থে। (ইমাম আহমদ রহ. বলেন,) ইসহাকের মতো ব্যক্তিদের জন্য খুরাসানের পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও তিনি আমাদের সঙ্গে মতবিরোধ করেছেন কিছু বিষয়ে। আর মানুষ তো একজন আরেক জনের সঙ্গে মতবিরোধ করেই।'[৫২১]

এ ব্যাপারে ইবনুল মুবারক রহ.-এর একটি উক্তি কতই-না চমৎকার–'অবশ্যই আমি যে কোনো হাদিস শোনার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলি। অনেক সময় তার ওপর আমি আমল করি না। এগুলো অন্যদের কাছে বর্ণনাও করি না। তবে শিক্ষার্থী ও বন্ধুদের কেউ যখন ভিন্ন মাযহাব বা মতের ওপর কাউকে আমল করতে দেখে বিব্রত বোধ করে, তখন আমি তাদের বলি, সে হাদিসের ওপরেই আমল করছে।'[৫২২] বর্তমান সময়ে আমরা যদি এরূপ মন নিয়ে হাদিস চর্চা করতাম, তবে তা নিজেদের জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য কল্যাণ বয়ে আনত। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় থাকত। বিরোধের সময় বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হয় আগের উক্তিটি থেকে সেটাও ফুটে উঠেছে। আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠ সকল মনীষীর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

التمهيد গ্রন্থে তিনি বলেন, 'স্বামী তার স্ত্রীকে চুম্বন করেছে। ওই স্বামীর ব্যাপারে ইমাম আওযাঈ রহ. বলেন, সে যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতে আসে, তবে আমি বলব, অজু করতে হবে। আর অজু না করলেও আমি দোষারোপ করব না তাকে।'[৫২৩] আর ইমাম আওযাঈ ছিলেন তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইমাম ও মুজতাহিদ।

التمهيد গ্রন্থে আসরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আহমদ বিন হাম্বাল)-কে ভিন্ন মতাবলম্বনকারীদের ব্যাপারে বলতে শুনেছি, 'তার ব্যাখ্যার নেপথ্যে যদি হাদিসের কোনো প্রমাণ থাকে তবে তার পেছনে নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধে নেই।'[৫২৪]

---

[৫২০] ৪০

[৫২১] ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه : ১১/৩৭১

[৫২২] الكفاية للخطيب : ৪০২

[৫২৩] ২১/১৭২। الاستذكار গ্রন্থেও প্রায় একই অর্থে এরূপ বর্ণিত হয়েছে : ১/৩২৩

[৫২৪] ১১/১৩৯

পরবর্তীকালে ইমাম আহমদ রহ.-এর শিষ্যরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাদের ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে হলে অনেক দীর্ঘ কলেবর প্রয়োজন। আমার মনে হয় সেগুলো উল্লেখ না করলেও চলবে। মূল উৎসতেই আগ্রহীরা দেখে নিতে পারবে।

তবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আর তা হলো, প্রতিটি তালিবুল ইলম; বরং প্রতিটি মুসলমান, যখন নামাজ, রোজা, হজ বা অন্যসব ইবাদাত পালন করবে, তখন সে ব্যাপারে আল্লাহর হক ও যথাযথ নিয়মটি তারা ভালো করে জেনে নেবে। পরিপূর্ণ ইলম ও জ্ঞান ছাড়া আমল পরিবর্তন করতে যাবে না। যদি তাকে বলা হয়, ইমাম আবু হানিফা রহ. তো এরকম বলেছেন।

আমি বলব, সে ক্ষেত্রে তাকে আবু হানিফার মতের ওপর আমল করার সময় মনে মনে এ ধারণা করবে যে, ইমাম আবু হানিফার বুঝ ও ইজতেহাদ মতো আমি আমল করছি। আর তার অন্তরে থাকবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করা। বস্তুনিষ্ঠভাবে তাঁর আদেশ-নিষেধের ওপর আমল করা।

তবে অধিকাংশ মুসলিম আলিম নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কথা ও হাদিস একত্র করতে এবং একসঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সেগুলো বুঝতে অপারগ ছিলেন, সে কারণেই এই চার মাযহাবের সৃষ্টি। পরবর্তী সময়ে ওলামায়ে কেরাম এই চারটি মত-পদ্ধতিতেই বিচারকাজ পরিচালনা করেন এবং এই চার মাযহাবের আদলেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল বিষয়ের বিধানাবলি তৈরি করেন। এভাবেই কেউ হানাফি, কেউ শাফেঈ, কেউ মালেকি আবার কেউ হাম্বলি মাযহাবলম্বী হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিম আদর্শ অনুসরণের দিক থেকে সে মুহাম্মদি। আর মত অবলম্বনের দিক থেকে সে হানাফিও, শাফেঈও, মালেকিও, হাম্বালিও...!

* * * *

একাদশ পথনির্দেশ

স্বতঃসিদ্ধ আহকাম ও আখবার অন্বেষণের গুরুত্ব

দুর্লভ অর্থবোধক মত এবং ব্যতিক্রমী সব বিষয় পরিহার করে প্রধান ও শক্তিশালী মতামত খোঁজা শুধু একজন শায়খেরই নয়, প্রতিটি তালিবুল ইলমেরও অন্যতম দায়িত্ব। এমনকি তা বিশুদ্ধতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়লেও তা হবে জ্ঞান, বুদ্ধির বিবেচনা এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়। যইফ বর্ণনা সেটাই, যা প্রসিদ্ধ সনদের কারণে যইফ বিবেচিত হয়। যেমন, আপনি কোনো হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, মুহাদ্দিস দারা কুতনি এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি যদি বাস্তবেই কিতাবুল্লাহ এবং হাদিসের অন্যসব সহিহ গ্রন্থ থেকে কোনো বর্ণনা উল্লেখ করেন, তবে তা বর্ণনা করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে হ্যাঁ, সেটি হতে হবে আপনার দেশ ও অঞ্চলের জন্য অধিক সমীচীন।

পাশাপাশি কুরআনুল কারিমের তাফসিরের বেলায় নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী মতামত খুঁজতে হবে। বিষয়টি ফিকহি হোক বা অন্যকিছু। একজন আলিম আল্লাহর চিরন্তন এই দ্বীনের ব্যাপারে কখনো অপরিচিত, ব্যতিক্রমী বা দুর্বল কোনো বর্ণনা মুখে উচ্চারণ করবে না।

শরিয়তের একাধিক ইলমে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের এটাই সবচেয়ে বড়ো ফায়দা। কারণ, একজন তালিবুল ইলম যখন হাদিসের পরিভাষাগুলো বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ফিকহের মূলনীতি সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করে, তখন তার সামনে ইলমের অধিকাংশ পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। তার জ্ঞানভান্ডার পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত হয়। তার কথাগুলো সহিহ হয়। তার চিন্তা-চেতনার উন্নতি ঘটে। কারণ, এ দুটি ইলমই সকল আকলি ও নকলি ইলমের মানদণ্ড।

লক্ষ করে থাকবেন, অনেক বক্তা এ রকম অনেক ঘটনা এবং অসংখ্য উপদেশ তাদের মাহফিলগুলোতে প্রচার করে থাকেন, যেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে সেগুলো দুর্বল বা বানোয়াট। তো এসব ঘটনা বা উপদেশ দিয়েই শ্রোতারা তাদের ঈমান পরীক্ষা করে থাকে। সবক হাসিল করে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দুরভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলে তাদের মন ভেঙে যায়। ঈমানি চেতনা স্তিমিত হয়ে যায়। ওই বক্তার প্রতিও তার কুধারণা জন্ম হয়। কখনো কখনো এগুলোর প্রভাব নিজেদের পাশাপাশি চারপাশে থাকা অন্যদের ওপরও পড়ে। এভাবে ওই শ্রোতা একসময় বিশ্বাসের ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলে। কোনো

উপদেশকারীকেই পাত্তা দেয় না আর। ফলে বিশুদ্ধ উপদেশ বা ঘটনা শোনার পরও তার ঈমানি চেতনা আর জাগরিত হয় না।

আর যদি ওই উপদেশ বা ঘটনাগুলো হয় নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে; তাঁর মুজিযা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যবিষয়ক, তাঁর মর্যাদা বা নবুয়তের প্রমাণবাহক... তবে তো দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ওই শ্রোতার সামনে যখন বিষয়টির দুর্বলতা বা অসত্যতা প্রকাশ পাবে, তখন নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানা অন্যসব সহিহ তথ্যগুলো সম্পর্কেও সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এর ফলে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়ও ভাটা পড়বে। বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। প্রতিটি আলেমকেই এ সম্পর্কে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পাশাপাশি প্রতিটি শ্রোতা সব সময় তার ঈমান ও অন্তরকে পর্যবেক্ষণ করবে। কেউ যদি এ বিষয়ে কোনো দুর্বল বা অসত্য কিছু বলে ফেলে, তবে সেই অসত্যের দ্বারা তার জানা অন্যসব সত্য ঘটনাগুলো যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সব সময় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

* * * *

প্রতিটি বর্ণনার উৎস ও যোগসূত্র যাচাইয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করানো

বিজ্ঞ শায়খ ও উস্তাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো : তালিবুল ইলমদের তিনি ইলমি বৈশিষ্ট্যের ওপর গড়ে তুলবেন। আর ইলমি বৈশিষ্ট্যের প্রধান হলো, প্রতিটি তথ্যকে তার মূল উৎস থেকে খুঁজে বের করা। আরেকটু বাড়িয়ে বললে কখনো কোনো ছাত্রকে যদি কোনো বাহাস বা পর্যালোচনা লিখতে বলেন, তবে অবশ্যই প্রতিটি ইলমের মূল উৎস ঘেঁটে ভালোরকম যাচাই করে তবেই উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

এ ক্ষেত্রে আমি একটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই। ধরুন, আমি ইমাম যাহাবির ميزان الاعتدال গ্রন্থে কোনো বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা বা দুর্বলতার বিষয়টি জানতে পারলাম। তো এখন আমার কর্তব্য হলো এই নির্ভরযোগ্যতা বা দুর্বলতার বিষয়টি তার মূল উৎস থেকে খুঁজে বের করা। মনে করুন, ইবনে মুঈন, আহমদ, আবু হাতিম, আবু যুরআ প্রমুখ ইমাম কর্তৃক কোনো রাবিকে নির্ভরযোগ্য করার বিষয়টি ميزان الاعتدال থেকে আবিষ্কার করলাম। এখন আমার দায়িত্ব হলো যতদূর সম্ভব তাদের লিখিত কিতাবগুলোতে এ বিষয়ে তাদের উক্তিগুলো খুঁজে বের করা। কেবল পৃষ্ঠা নং, পরিচ্ছেদ নং এবং ميزان الاعتدال এর বৃত্তান্ত নং লিখে দিলেই শেষ হয়ে যাবে না। আমি মনে করি, এটাই সর্বোত্তম পন্থা। আমি নিজে এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। আমি পরবর্তী সময়ে রচিত এসব কিতাবকে ইলমের রত্নভাণ্ডার নয় (যেমনটি আজকাল অনেক শিক্ষার্থী মনে করে থাকে); ইলমের উৎসের রত্নভাণ্ডার মনে করি।

ঠিক তেমনি বর্তমান যুগের প্রযুক্তি ও কম্পিউটার কিন্তু ইলমের রত্নভাণ্ডার নয়; দ্রুত ইলমের উৎস খোঁজার অন্যতম উপকরণ।

অপর পর্যালোচনা : ইমাম ইবনে হাজার আল-হাইতামি রহ. ইমাম নববি রহ. থেকে একটি ফিকহি বিধান বর্ণনা করেছেন। তো আমি المجموع গ্রন্থ ঘেঁটে তা খুঁজে বের করেছি। কিন্তু সেখানেও তিনি উমরানির রচিত البيان গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখন কেবল المجموع গ্রন্থের ওপর ভরসা করে বসে পড়লে চলবে না; বরং আমাকে البيان গ্রন্থটি ঘেঁটে ওই বিধানটি খুঁজে বের করতে হবে। এরপর আমি তা খুঁজে বের করে দেখলাম, সেখানে তিনি مختصر المزني গ্রন্থ

থেকে বিধানটি বর্ণনা করেছেন। এখন আমার দায়িত্ব হলো مختصر المزني গ্রন্থ ঘেঁটে তা বের করা। এভাবেই পর্যায়ক্রমে ঘেঁটে বিষয়টির মূল উৎস উদ্ধার করা।

মাসআলার যোগসূত্রের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা যাচাই করা

প্রতিটি গবেষকের উচিত, প্রত্যেক আলিম ও মনীষী অন্য মাযহাব সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, সেই উক্তির বিশুদ্ধতা যাচাই করা। যেমন : আবু বকর আল-জাসসাস যখন তার কিতাব أحكام القرآن-এ অন্য মাযহাব সম্পর্কে কোনো উক্তি করেন, তখন ওই উক্তিটি ওই মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব ঘেঁটে তার বিশুদ্ধতা যাচাই করা।

তেমনি ইলকিয়া আল-হাররাসি শাফেঈর নিজ গ্রন্থ أحكام القرآن -এ রচিত অ-শাফেঈদের সম্পর্কে করা বর্ণনাগুলো ওই মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো ঘেঁটে যাচাই করা। আবু বকর ইবনুল আরাবি আল-মালেকির বর্ণনাগুলোর বিশুদ্ধতাও তেমনি যাচাই করে দেখতে হবে।

এই নিয়মটি প্রায় সকল ইলম, যেমন : ফিকহ, উসুলে ফিকহ, হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে; বরং আরেকটু বাড়িয়ে বললে প্রতিটি মাযহাবের আলোচনাগুলো ওই মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকেই জানতে হবে।

আমাদের শায়খগণ আরেকটি বিষয়ের প্রতি জোর তাগিদ দিতেন, সেটা হলো : প্রতিটি মাসআলা ওই মাযহাবের কিতাব থেকে গ্রহণ করার সময় ওই বিষয়ের অধ্যায় থেকেই তা গ্রহণ করতে হবে। যেমন, নামাজের বিষয়ে মাসআলাগুলো নামাজের অধ্যায় থেকেই খুঁজে বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে হজের অধ্যায়ের কোনো বর্ণনা দ্বারা নামাজের কোনো মাসআলা প্রমাণ করা যাবে না। তবে যদি নামাজের অধ্যায়ে এ মাসআলার উল্লেখ থাকে, তখন ভিন্ন কথা। কিন্তু তারপরও তা ওই স্থানে দেখে নিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

এবং প্রতিটি গবেষণাকাজে বা প্রতিবার যোগসূত্র উদ্ধারের পর কিতাবের হাশিয়ায় অধ্যায় ও পৃষ্ঠা নং-সহ তা লিখে রাখতে হবে। যেন দ্বিতীয় বার পড়ার সময় সহজেই বের করা যায়; পুনরায় কষ্ট না করা লাগে।

এভাবে যদি আমি মাসআলার যোগসূত্র খুঁজে বের করতে পারি, তবে মনে করব, প্রথম স্তরটি আমি সফলতার সাথে পার হতে পেরেছি।

এখন যাওয়া যাক দ্বিতীয় স্তরের দিকে, সেটি হলো প্রতিটি বর্ণনাকে তার উৎসের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে দেখা। কারণ, অনেক সময় ইমামগণ বর্ণনাকে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেন। আর সংক্ষিপ্ত করতে গিয়েই অনেক সময় বিপত্তি

বেঁধে যায়। অর্থে তারতম্য ঘটে। এ জন্য যোগসূত্রের সত্যতা যাচাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত অর্থের সাথে তার মিল আছে কি না সেটাও দেখে নিতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায় মুদ্রিত কিতাবের ইবারাত বিশুদ্ধ থাকলেও সংক্ষিপ্ত করার কারণে বা সম্পাদনা করার কারণে তাতে অর্থের তারতম্য ঘটে যায়। কেন তবে আমি কেবল সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত বিষয়টি নিয়েই বসে থাকব?! কেন আমি এ সংশয়পূর্ণ অবস্থানে থাকব?! আজকাল তো তাহকিককৃত গ্রন্থগুলোতেও অসংখ্য মুদ্রণজনিত ভুল ধরা পড়ে!!

এরপর আসবে তৃতীয় স্তর : সেটি হলো, এসব বর্ণনা আমি কীভাবে বুঝব? কীভাবে এগুলোর ওপর নির্ভরশীল হব? পূর্বঅভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে কীভাবে একে আমি সংশোধন করব? আমার কাছে যা অশুদ্ধ মনে হচ্ছে কোন পদ্ধতিতে তার সমালোচনা করব? এ স্তরটি খুবই স্পর্শকাতর। আল্লাহ যাকে সামর্থ্য দিয়েছেন এবং যাকে সরল বুঝ দান করেছেন কেবল সে-ই এ স্তরে সফল হতে পারে। এ স্তরের যোগ্যতা অর্জিত হয় শায়খদের সুদীর্ঘ সংশ্রব আর নিরলসভাবে ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানার্জনের পর; কিতাবের পাতা উল্টানো আর প্রযুক্তি-পর্দার সামনে বসে থাকার দ্বারা নয়।

এ পদ্ধতি অবলম্বনের পেছনে রয়েছে দুটি বিষয় : ১. প্রতিবন্ধক ২. সঞ্চালক।

প্রতিবন্ধক : শিক্ষার্থীকে এসব স্তর পার হওয়ার জন্য বিপুল চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে তাকে। ভীষণ ধৈর্য ধরতে হবে। কারণ, একজন গবেষককে একটি বিশুদ্ধ শব্দ খুঁজতে গিয়ে ব্যয়বহুল নিত্যনতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার গবেষণা সফলও হতে পারে, বিফলেও যেতে পারে। খুঁজে পেতেও পারে, নাও পেতে পারে। আর তা করার জন্য তাকে ওই কিতাবগুলো কিনতে হবে। অথবা একই কিতাবের বিভিন্ন একাধিক সংকলন সংগ্রহ করতে হবে। কখনো কখনো কোনো বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চিত হতে ছোটো ছোটো অনেক পুস্তিকাতেও নজর বুলাতে হবে।

সঞ্চালক : একটিমাত্র শব্দ অথবা বাক্যের কারণে পুরো মাসআলায় সৃষ্ট জটিলতা উদ্‌ঘাটন করে সঠিক ও বিশুদ্ধ মত জানার পর মনে প্রবল প্রশান্তি ও অত্যন্ত প্রফুল্লতা অনুভব হবে। বিশেষত জটিলতাটি যখন সৃষ্টি হয় একটিমাত্র অক্ষর বিলুপ্ত হওয়ার কারণে। অর্থাৎ 'বৈধ না' এর স্থলে যদি মুদ্রণে শুধু 'বৈধ' ছেপে আসে। আর 'না' পড়ে যায়, তবে কী রকম সমস্যার হতে পারে?! অথবা কোনো একটি হাদিসকে তার মূল উৎস থেকে জানা যাবে, যা ঘটনাক্রমে হয়তো মুদ্রিত কিতাবে উল্লেখ হয়নি... ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক–ধরুন, আমি ছোটো একটি পুস্তিকা তাহকিক করতে বসলাম, যাতে এক শ টি বর্ণনা রয়েছে। এরপর প্রতিটি বর্ণনার উৎস ও যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে সবক'টি যদি সঠিক ও পূর্ণরূপে বের করতে পারি, তবে তো খুশির সীমা নেই। মুআল্লিফের পক্ষ থেকে অর্পিত একটি দ্বীনি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরে তখন আমি নিজেকে গর্বিত মনে করব। পাঠককে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য একটি তাহকিক উপহার দিতে পেরে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করব।

আর যদি এক শ টি বর্ণনার মধ্যে নিরানব্বইটি বর্ণনার উৎস ও যোগসূত্র খুঁজে পাই। কিন্তু একটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তেমন নির্ভরযোগ্য কোনো উৎস ও যোগসূত্র খুঁজে না পাই। আর সে ব্যাপারে মুআল্লিফের মনেও সংশয় ছিল; তবে ধরে নেব, এই নিরানব্বইটি মাসআলার ক্ষেত্রে আমার ওপর অর্পিত দ্বীনি দায়িত্ব আমি পালন করতে পেরেছি। আর একটি মাসআলার ক্ষেত্রে আরও বেশি চেষ্টা করেছি, সংশয় দূর হচ্ছিল না; তবে শেষ পর্যন্ত যখন সংশয় দূর হবে, তখন এ বর্ণনাটি সঠিক সাব্যস্ত করার কারণে মুআল্লিফও হয়তো আলমে বরযখে থেকে আমার ওপর খুশি হবেন ইনশাআল্লাহ।

এ জাতীয় তাহকিক করার সময় যা যা লক্ষণীয়

এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১. এই সতর্কীকরণ ও সংশোধনের কাজটি যেন হয় অত্যন্ত আদবের সাথে; দম্ভ ও বিদ্রুপের উদ্দেশ্যে নয়। মুআল্লিফ যদি এক শ বর্ণনার মধ্যে কেবল একটিতে সংশয় প্রকাশ করতে পারেন, তবে মুহাক্কিক হিসেবে আমার কাজে কি সংশয় প্রকাশ হতে পারে না? তাই উচিত হবে মুখ হেফাজত করার আগে অন্তর হেফাজত করা। অন্তরে যেন কোনো গর্ব বা অহংকার উদিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আলিম ও ইমামদের মর্যাদার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিকে অবনত করে দেওয়া। কারণ, আমাদের সকল ইমামের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত। আর এই একটিমাত্র সংশয় তাদের সহিহ বর্ণনাসমুদ্রের সামনে অতি সামান্যই।

এটিই সেই উক্তির সারমর্ম, যা ইবনে আবদুল বার ইমাম মালেক থেকে আর তিনি সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণনা করেছেন, 'প্রত্যেক আলিম, ভদ্র ও সম্মানিতের মাঝে কোনো-না-কোনো ত্রুটি থাকে। তবে যার ভালোর পাল্লা ভারি, তার মন্দগুলো ঢাকা পড়ে যায়। অপর দিকে যার মন্দের পাল্লা ভারি, তার ভালোগুলো বিস্মৃত হয়ে যায়।'[৫২৫]

---

[৫২৫] جامع ابن عبد البر : ১৫৪০

এরপর অন্য একজন থেকে তিনি আরেকটি উক্তি বর্ণনা করেছেন : 'কোনো আলিমই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়; যে ব্যক্তি ভুল কম আর শুদ্ধ বেশি করল, সে-ই আলেম। অপর দিকে যে ব্যক্তি শুদ্ধ কম আর ভুল বেশি করল, সে-ই জাহেল।'

এটাই মূলনীতি; তবে কোনো বিবেকবানের জন্য এ মূলনীতির ওপর দ্বিধা করা উচিত নয়। শর্ত হলো, তার এই অধিক শুদ্ধির প্রক্রিয়াটি হবে কোনো একটি নিয়মের ভিত্তিতে, নির্দিষ্ট ও গ্রহণযোগ্য কোনো পন্থায়। তবেই তার স্বল্প মন্দগুলো ঢাকা পড়বে। তা না হলে তার এই শুদ্ধের প্রক্রিয়াটি হবে ধনুকবিহীন তির। কারণ, সে কারও দিকনির্দেশনা ছাড়াই পথ অতিক্রম করতে বের হয়েছে।

২. সংশোধন করার সময় খুবই সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষত কোনো বিধান প্রত্যাখ্যান করার সময়। কারণ, তা খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর। অপর দিকে কোনো বিধান সাব্যস্ত করা তুলনামূলক সহজ। যেমন : কোনো মুআল্লিফ যদি সহিহ বুখারির দিকে কোনো হাদিসকে সম্বন্ধ করেন এবং তিনি সহিহ বুখারিতে তালাশ করে তা না পান, তবে এভাবে বলবেন (যেমনটি আমাদের পূর্বসূরি আকাবির আমাদের শিখিয়ে গেছেন, তারা হাদিস বা রাবিদের সম্পর্কে বলতেন), لا أعرفه (আমার জানা নেই) অথবা لا يُعرف (জানা যায়নি)। অনেকে আবার বলে থাকেন, لم أجد له أصلا (কোনো ভিত্তি খুঁজে পাইনি) বা لا أصل له (এ হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই)। উপর্যুক্ত দু-ধরনের লোকদের কথার মধ্যে কত ব্যবধান!! এটাই আমাদের জন্য ইলমি ও আমলি শিক্ষা।

এখানে একটি ইলমি উদাহরণ দেওয়া সমীচীন মনে করছি :

ইমাম বুখারি রহ. তাঁর সহিহ গ্রন্থের সূচনা করেছেন إنما الأعمال بالنيات হাদিসটি দ্বারা। যা তিনি ইমাম মালেক রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি موطأ গ্রন্থেও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানির সূত্রে বর্ণিত আছে।[৫২৬] موطأ-এর দিকে এ হাদিসের যোগসূত্র তৈরি করেছেন ইবনে দাহিয়া। বিষয়টি পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইবনে হাজার রহ. موطأ থেকে এ হাদিসের রেওয়ায়াতই প্রত্যাখ্যান করে বসেন।[৫২৭] আবার ইমাম সুয়ুতি রহ. হাফেজ ইবনে হাজারের কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এটি موطأ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের বর্ণনায় كتاب النوادر-এর তিন পাতা পূর্বে উল্লিখিত আছে।[৫২৮]

---

[৫২৬] ৩/৫১৩ (৯৮২)

[৫২৭] فتح الباري ১/১১ : التلخيص الحبير : ১৫৫

[৫২৮] تنوير الحوالك : ১/১০-সহ একাধিক গ্রন্থে

প্রত্যাখ্যানকালে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন

এটি একটি চরম শিক্ষণীয় ঘটনা যে, মুয়াত্তার হাদিসের যোগসূত্র বর্ণনায় ইবনে দাহিয়ার মতটি বিশুদ্ধ আর ইবনে হাজারের মতো প্রাজ্ঞ ইমামের মতটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, আমি ওপরে বলেছি, একটা কিছু সাব্যস্ত করা যতটা সহজ, কোনো কিছু নাকচ বা প্রত্যাখ্যান করা ততটাই কঠিন। এর জন্য দরকার দীর্ঘ গবেষণা এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ। অন্যথায় ইমাম ইবনে হাজারের মতো বিজ্ঞ ও বরেণ্য ইমাম এবং মুহাদ্দিস যেখানে হোঁচট খেয়েছেন, সেখানে আমি আপনি তো কিছুই না। আল্লাহ তাআলা ইসলামের আচারনিষ্ঠ সকল মনীষীর খেদমতকে কবুল করে নিন!!

প্রত্যাখ্যান

প্রত্যাখ্যান বা নাকচের বিষয়টি কখনো হয় স্পষ্ট। যেমনটি ইবনে দাহিয়া এবং ইবনে হাজারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। আবার কখনো হয় অস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম। যেমন আপনি বললেন, অমুকের হাদিসটি যইফ।' এখানে সূক্ষ্ম পন্থায় আপনি তার হাদিসগুলো অগ্রহণযোগ্য বলছেন। অর্থাৎ অন্য সূত্রে এ হাদিসের কোনো বিশুদ্ধ সনদ নেই।

অথবা বললেন, হাদিসটি গরিব। অর্থাৎ হাদিসের কেবল একটি সনদই রয়েছে। অথবা বললেন, হাদিসটি আযিয। অর্থাৎ হাদিসের কেবল দুটি সনদই রয়েছে। এখানে অস্পষ্টভাবে তার হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। এ জাতীয় বক্তব্যের মূল অর্থ হলো, এ গরিব হাদিসের অন্য কোনো সনদ নেই যা তাকে 'আযিয' করে তুলবে। বা 'আযিয'কে করে তুলবে 'মাশহুর'।

এ রকম অস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম প্রত্যাখ্যান কাজের জন্য দরকার ইলমে হাদিসের ইমাম, যিনি হাদিস বিষয়ে দীর্ঘ সাধনা করেছেন। অজস্র হাদিস সনদসহ মুখস্থ করেছেন। তবেই তার এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। পাশাপাশি তাকে ভীষণ সতর্ক হতে হবে। আর পরবর্তী আলিমরা এসে তো পূর্ববর্তীদের অপূরণীয় বিষয়গুলো পূর্ণ করবে, ভুলগুলো শুদ্ধ করবে। كشف الدراسات গ্রন্থে এ জাতীয় অনেক ঘটনার বিবরণ রয়েছে। এমন কি এরপরেও এ রকম ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা ও ধীরতা অবলম্বন করা হবে প্রতিটি তালিবুল ইলমের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ সকলকে তাওফিক দিন!

* * * *

ত্রয়োদশ পথনির্দেশ

ফতোয়ার জন্য বিজ্ঞ প্রজন্ম তৈরি এবং দক্ষ উস্তাদের মাধ্যমে তাদের তত্ত্বাবধান

উস্তাদ ও শিক্ষার্থীর জন্য তাত্ত্বিক ও গঠনমূলক দীর্ঘ আলোচনার পর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের ইচ্ছা করছি। উস্তাদ কর্তৃক শিষ্যদের যোগ্য করে তোলার পরবর্তী ধাপ হলো, তালিবুল ইলমদের তারা আল্লাহর এই শাশ্বত দ্বীন ও শরিয়তের বিষয়ে ফতোয়া প্রদানের যোগ্যরূপে তৈরি করবেন। এখানে ব্যাপক কিছু কথা বলছি, যা ফতোয়ার পাশাপাশি অন্যসব শরয়ি বিষয়সংশ্লিষ্টও।

মাসআলা, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, উত্থাপিত, ঘটনা, কাহিনি...মুফতির কাছে যে বিষয়টি নিয়ে মানুষ শরণাপন্ন হয় সেটিকে আপনি যা-ই বলুন না কেন, অধিকাংশ সময় সেটি হয় খুবই সিম্পল ও স্বাভাবিক বিষয়। তখন উত্তরও হয় সহজ ও সাধারণ। আবার কখনো সেটি হয় ভীষণ দুর্বোধ্য; যার পেছনে থাকে অনেকগুলো কারণ বা ঘটনা। আজকাল আমরা যাকে 'ব্যাকগ্রাউন্ড' বলে থাকি। তো সে ক্ষেত্রে মুফতির জন্য কেবল প্রশ্নের পাতা পড়ে নিলেই চলবে না অথবা মোবাইলে বা প্রশ্নকারীর উচ্চারিত বক্তব্য শুনে নিলেই চলবে না; বরং বিষয়টি তখন গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। কাগজের পেছনে যে কারণ বা ঘটনাটি লুকিয়ে আছে, সেটি তাকে আবিষ্কার করতে হবে। প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেটি খুঁজে বের করতে হবে। অনুপস্থিত থাকলে তাকে উপস্থিত করে সুকৌশলে তার কাছ থেকে সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে।

আবার কখনো মাসআলাটি হয় সমসাময়িক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াবিষয়ক; যা বর্তমানের কাফের-মুশরেকরা আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। আর মুফতি সাহেব এসব বিষয়ে পারদর্শী বা দূরদর্শী না হওয়ায় বিষয়টি তার জন্য জটিল হয়ে দাঁড়ায়। তখন এসব বিষয়ে বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদকে ডেকে এনে তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। তার সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়।

সেটি যদি সকল মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য ব্যাপক কোনো বিষয় হয়, তখন এ পরিস্থিতিতে উচিত হলো সকল ইমামের মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেবল একাকী গবেষণা করে ফতোয়া না দিয়ে নির্ভরযোগ্য বড়ো বড়ো মুফতি মিলে সম্মিলিত ইলমি কমিটি গঠন করা এবং সমস্ত মুফতি বসে বিষয়টি নিয়ে

গবেষণা করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান খুঁজে বের করা।

বিজ্ঞ শায়খের উচিত, ফতোয়ার জন্য তালিবুল ইলমদের তিনি ধীরতার সঙ্গে গড়ে তুলবেন। এ ক্ষেত্রে সুকৌশলী ও প্রাজ্ঞ শিক্ষকের নীতি অবলম্বন করবেন। প্রথমে ছোটো ছোটো মাসআলার সমাধান এরপর ধীরে ধীরে বড়ো ও জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য তাদের যোগ্য করে তুলবেন।

এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের আলিমদের একটি সুন্দর উদ্যোগের প্রশংসা না করে পারছি না (আল্লাহ তাদের জান্নাতের সর্বোচ্চ আসন দান করুন আর যাঁরা বেঁচে আছেন সকল অনিষ্ট হতে রক্ষা করে তাদের দীর্ঘজীবী করুন) দ্বীনি জামিয়াগুলো থেকে ফারেগিন তালিবুল ইলমদের জন্য ফতোয়ার বিষয়ে পড়াশোনা করতে তারা একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করেছেন। সেখানকার প্রায় প্রতিটি জামিয়াতেই এ ব্যবস্থা চালু আছে আলহামদুলিল্লাহ। অভিজ্ঞ মুফতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওই বিভাগের শিক্ষার্থীদের দুই/তিন বছর মেয়াদে বিজ্ঞ শায়খদের তত্ত্বাবধানে ফতোয়াবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান প্রদান করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা বুঝে তাদের সনদ প্রদান করা হয়।

কোনো কোনো জামিয়ার ইফতা বিভাগের শিক্ষার্থী ও শায়খদের সংখ্যা আমাদের আরববিশ্বের একটি শরিয়া কলেজের পুরো শিক্ষার্থীদের সংখ্যার সমান। সেখানে এমনও জামিয়া আছে, যেখানে কেবল ফতোয়া বিভাগের শায়খদের সংখ্যাই প্রায় ষাট। আবার প্রত্যেক শায়খের অধীনে আছে ফতোয়া-শিক্ষার্থী অসংখ্য তালাবা। হায়, আরববিশ্বের শরিয়া কলেজগুলো যদি ওসব জামিয়াকে অনুসরণ করত এবং প্রতিটি কলেজে স্বতন্ত্র একটি ইফতা বিভাগ চালু করত!!

তাঁদের প্রতি আমার একটি প্রস্তাব : ইফতা বিভাগের মতো হাদিসের তাখরিজের বিষয়ে গবেষণার জন্য, হাদিসের রিজালের জারহ-তা'দিল বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠার সাথে রাবিদের ওপর হুকুম প্রয়োগের জন্য, সনদ নিয়ে গবেষণার জন্য, হাদিসের মতন শুদ্ধ ও অশুদ্ধ আখ্যা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ মুহাদ্দিসদের তত্ত্বাবধানে যদি প্রতিটি জামিয়ায় স্বতন্ত্র একটি 'হাদিস বিভাগ' বা উলুমুল হাদিস বিভাগ চালু করা হতো, তবে সেটি উম্মতের জন্য একটি বিরাট কল্যাণকর এবং ঐতিহাসিক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতো।

ইলমের পাশাপাশি মুফতির মধ্যে অনেকগুলো শর্ত ও গুণ থাকা চাই। তার মধ্যে– সব সময় আল্লাহর ভয় এবং তাঁর নজরদারির বিষয়টি খেয়াল রাখা, দ্বীনের বিষয়ে তাঁর কাঁধে অর্পিত বিশাল দায়িত্বের অনুভূতি উপলব্ধি করা। সব

সময় আল্লাহর ওপর ভরসা ও তাওয়াক্কুল করা। এরপর সমসাময়িক সকল সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা, সেগুলো গভীরভাবে বোঝা। এরপর প্রশ্নকারীকে চতুর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা। তার উদ্দেশ্য ও মানসিকতা অনুধাবন করা। এ সকল শর্ত নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা বিভিন্ন কিতাবে উল্লিখিত রয়েছে।

তবে দুটি বিষয় এখানে বিস্তারিতভাবে না বললেই নয়–

১. প্রশ্নকারীর প্রতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আমি বলছি, ফতোয়াপ্রদানে তাড়াহুড়ো বর্জন করা। ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন করা। সময় নিয়ে গবেষণা করে ঘটনার আগাগোড়া এবং প্রশ্নকারীর মানসিকতা বুঝে তারপর ফতোয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া। বিশেষত স্যাটেলাইটের এ যুগে আজকাল ফতোয়ার বিষয়টি ব্যাপক হয়ে গেছে। একজন লোকের বক্তব্য বিশ্বের যে কেউ যে কোনো প্রান্তর থেকে শুনতে পাচ্ছে।

অনেকে ফতোয়ার বিষয়ে তাড়াহুড়ো করেন। মুখের ওপর ফতোয়া মেরে বসেন। বিষয়টি ব্যক্তিগত ও একজনের জন্য হোক অথবা ব্যাপক ও সবার জন্য হোক; নিছক প্রশ্নকারীর মধ্যেই ফতোয়াটি আর সীমাবদ্ধ থাকছে না। এখানে পদস্খলন বা সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে হাজার হাজার লোক; বরং লক্ষ-কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। কারণ, বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষ একযোগে তা দেখতে পাচ্ছে এবং শুনতে পাচ্ছে। এখানে ফতোয়ার বিষয়ে ত্রুটি হলে তার পরিণাম হবে অনেক ব্যাপক এবং ভীষণ ভয়াবহ।

কখনো কখনো মুফতি সাহেবের উদ্দেশ্য হয় যে, এটা হলো সাধারণ সমাধান। কিন্তু টিভিতে দেওয়া তার এ ফতোয়াটিই হয়ে যায় সার্বজনীন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক অনেক দুর্ঘটনার জন্ম হয়। তাই মুফতি সাহেবকে এ বিষয়ে ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আবার অনেক শ্রোতা আছেন যারা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এ রকম ফতোয়ার প্রতীক্ষায় থাকে। শোনার সাথে সাথে সে মাঠে নেমে পড়ে। কিন্তু ওই মুফতি সাহেব যদি এই ভণ্ড শ্রোতার ব্যাপারটি জানতেন, তবে কখনো তার ব্যাপারে এই ফতোয়া দিতেন না। অথবা দিলেও তাকে সতর্ক করে দিতেন।

এ ছাড়াও জনসমক্ষে ফতোয়া প্রদানের সময় মুফতি সাহেবের বাক্‌স্খলন বা প্রেক্ষাপট না জানা থাকার কারণে তার মস্তিষ্কস্খলনের আশঙ্কা থাকতে পারে। অথবা প্রশ্নটি ভিন্ন অর্থে বোঝার আশঙ্কা থাকতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সতর্কবাণীর সঙ্গে সঙ্গে এখানে অপর একটি অধিক তাৎপর্যপূর্ণ সতর্কবাণীও এসে যায়। সেটি হলো, মুফতিকে অবশ্যই প্রশ্নকারীকে গভীর ও নিবিড়ভাবে

অবলোকন করে তার মনের সুপ্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। কারণ, অনেক সময় প্রশ্নকারী বিদেশে থেকে ফোনালাপের মাধ্যমে সমাধান চায়। অথবা মেসেজ পাঠায়। তখন মুফতি সাহেব তাকে দেখতে পান না। অথচ অনেক সময় সমাধানটি তার চেহারা বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। অথবা নিজ গ্রামের ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট জুড়ে থাকে এর সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ বিষয়ে কিছু ঘটনা সামনে উল্লেখ করার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ।

موطأ গ্রন্থে ইমাম মালেক রহ. বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস রা.-কে একবার রোজাদার ব্যক্তির চুমুর বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বৃদ্ধের জন্য বৈধ আর যুবকের জন্য সেটি মাকরূহ বলেন।[৫২৯]

মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকেও ইবনে আব্বাস এবং ওমর রা. থেকে এ ধরনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[৫৩০] আবার মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে মাকহুল থেকে এবং ইবনে ওমর থেকে এ জাতীয় বর্ণনা এসেছে।[৫৩১]

মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবায় বর্ণিত, একব্যক্তি ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তওবা কবুল হবে কি? তিনি উত্তর দেন, না; বরং সোজা জাহান্নামে যেতে হবে তাকে! লোকটি চলে গেলে সাথিগণ বলে, এ বিষয়ে এর আগে তো আমাদের কাছে ভিন্ন ফতোয়া বলেছেন আপনি! তখন তিনি বলেন, লোকটিকে আমার কাছে ক্ষুব্ধ মনে হয়েছে। খুব সম্ভবত সে কোনো মুমিনকে হত্যা করতে চায়।' বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি ওই লোকটির পেছনে পেছনে গোয়েন্দা পাঠালে ঠিকই তারা তাকে সে রকমই আবিষ্কার করে।[৫৩২]

বুখারি ও তিরমিজিতে আছে, ইরাকি একব্যক্তি ইবনে ওমর রা.-কে কাপড়ে লাগা মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, দেখো, এই লোক মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে; অথচ এরাই নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরের নাতিকে হত্যা করেছে! মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয় হাসান ও হুসাইন হলো জান্নাতের দুটি সুগন্ধি ফুল।'[৫৩৩]

---

[৫২৯] ১/২৯৩ (১৯)

[৫৩০] (৭৪১৮,৭৪২০)

[৫৩১] (৯৫১১, ৯৫২৭)

[৫৩২] في المصنف : ২৮৩২৬

[৫৩৩] البخاري : ৩৭৫৩, ৫৯৯৪ الترمذي : ৩৭৭০

বুখারির অপর বর্ণনায় 'ইবনে ওমর ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, বাড়ি কোথায় তোমার? তার এ অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে তিনি এ রকমই পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন।

تحفة الأحوذي গ্রন্থে বলেন, ছোটো ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অতি বাড়াবাড়ি আর বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাদের সীমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শনের কারণেই ইরাকবাসীকে ইবনে ওমর এ রকম প্রশ্ন করেছিলেন। এরপর প্রশ্নকারীর দিকে মনোনিবেশ করে তাকে তার ঠিকানা বলতে বলেছিলেন।[৫৩৪]

আবুল কাসেম কুশাইরি রহ. বলেন, একবার বিশর আল-হাফির বোন এসে আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, আমরা প্রায়ই আমাদের ঘরের ছাদে বসে সুতা কেটে থাকি, তখন বনি তাহেরের নিরাপত্তারক্ষীরা আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তাদের বাতির আলো এসে আমাদের ওপর পড়ে। এখন সেই আলোতে বসে সুতা কাটা আমাদের জন্য বৈধ হবে কি? তখন আহমদ বিন হাম্বল বলেন, কে তুমি (আল্লাহ তোমাকে সুস্থ রাখুন!) মেয়েটি উত্তর দেয়, বিশর আল-হাফির বোন! এ কথা শুনে আহমদ বিন হাম্বল কাঁদেন আর বলতে থাকেন, তোমাদের মতো পুণ্যবতীদের ঘরেই ওই রকম সত্যনিষ্ঠ ও আল্লাহভীরু লোকের জন্ম হয়; তাদের আলোতে সুতা কেটো না!'[৫৩৫]

এ ধরনের ঘটনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের মনীষীদের জীবনে বহুবার ঘটেছে। এ জন্য প্রশ্নকারী ও প্রশ্নের পেছনের প্রেক্ষাপট তাকে বুঝতে হবে গভীরভাবে। যেন উত্তরটি হয় সঠিক ও লক্ষ্যোত্তীর্ণ।

আজকাল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষের সকল প্রশ্নের শরিয়তসম্মত উত্তর প্রদানের জন্য নেওয়া সমকালীন আলিমদের উদ্যোগগুলো সত্যিই প্রশংসনীয়।

২. ফতোয়াবিষয়ক গবেষকদের যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে, তা পূর্বসূরি চার ইমামের নিম্নোক্ত চারটি কিতাবের নির্দিষ্ট অংশে বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। এ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের আমি সেগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করার পরামর্শ দিচ্ছি : খতিব রহ.-এর রচিত آداب الفقيه والمتفقه (পৃষ্ঠা : ১০৩২-১২২০), ইবনে আবদুল বার রহ.-এর রচিত جامع بيان العلم (পৃষ্ঠা : ১৫০০-২৪১৩) এগুলো খুবই উপকারী, ইবনুস সালাহ রচিত أدب المفتي والمستفتي।

---

[৫৩৪] ১০/২৭৫

[৫৩৫] الرسالة القشيرية : ২/১৫৯ تاريخ بغداد : ১৬/৬২৪

তা ছাড়া উক্ত কিতাব ও অন্যান্য কিতাব থেকে সংগ্রহকৃত ইমাম নববি রহ.-এর রচিত المجموع এর ভূমিকা (১/৪০-৫৮)

সমসাময়িক আলিমদের মধ্যে ডক্টর উস্তাদ ইউসুফ আল-কারযাভির রচিত الفتوى بين الانضباط والتسيب -সহ তার অপরাপর গ্রন্থগুলো।

এ ছাড়াও মৌরিতানিয়ান বংশোদ্ভূত শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু বাইয়ার রচিত صناعة الفتوى وفقه الأقليات-ও উপকারী। তাঁরা সবাই সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি এবং অমুসলিম দেশে মুসলিম অভিবাসীদের প্রয়োজন সম্পর্কে ছিলেন অধিক জ্ঞাত। আল্লাহ তাঁদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা কবুল করুন।

* * * *

চতুর্দশ পথনির্দেশ

সমসাময়িক রীতি-সংস্কৃতিকে গুরুত্বদান
বুঝতে হবে সমকালীন যুগ ও প্রেক্ষাপট

একজন বিজ্ঞ ও সচেতন শায়খের অন্যতম দায়িত্ব হলো, আজকের তালিবুল ইলম আর আগামী দিনের আলিমদের তিনি সমসাময়িক যুগ এবং সকল প্রেক্ষাপট ভালোভাবে বুঝতে তাদের উৎসাহ দেবেন। কারণ, একজন তালিবুল ইলমের জন্য তার জীবনের বাস্তবতা থেকে উদাসীন থাকা কোনোভাবেই উচিত নয়। তবে এমনভাবে মেশা যাবে না, যার দ্বারা তার ইলম অন্বেষণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। অথবা তাকে অন্য সবার চেয়ে পেছনে ফেলে দেয়। হিন্দ ইবনে আবি হালার বর্ণিত দীর্ঘ হাদিস থেকে বোঝা যায়, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাস ও পেশা সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করতেন।'

এর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ ও অভাবনীয় কিছু উপকার সাধিত হবে,

১. সাধারণ মানুষ ওই আলিমের কথা, কাজ ও আচরণের মাধ্যমে ইসলামি শিষ্টাচার ও উৎকৃষ্ট সব চারিত্রিক গুণাবলি প্রত্যক্ষ করবে। তারা এমন আলিমকে খুঁজে পাবে, যে তাদের গুরুত্ব দেয়, তাদের খোঁজ নেয়, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করে, তাদের আশাবাদী করে তোলে, তাদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নেয়। এমন আলিম নয় যে প্রতি সপ্তাহে শুধু একবার মিম্বরে উঠে তাদের সামনে মুখস্থ বিদ্যা পাঠ করে।

২. তাদের গুরুত্ব দেওয়ার কারণে একজন আলিম অনুভব করবে আত্মপ্রশান্তি। কাছের কি দূরের, সবার কাছ থেকেই পাবে সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদা।

৩. এর ফলে তার বক্তব্য ও ফতোয়াগুলো হবে সঠিক ও বিশুদ্ধ। কারণ, সে সমসাময়িক প্রেক্ষাপট জেনে ও বুঝে কথা বলছে। ঠিক যেমন একজন ডাক্তার পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে সহজেই রোগীর চিকিৎসা-বিধান করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান আশ-শাইবানি রহ.-এর অভ্যাস আলোচনা করা যেতে পারে; তিনি প্রায়ই তখনকার রংশিল্পী ও আর্টিস্টদের কাছে গিয়ে তাদের আচার-আচরণ, ওঠা-বসা ও লেনদেনের খোঁজ নিতেন। এটা ছিল আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে তাঁর বোধগম্যতার শীর্ষ চূড়া। এ কাজের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন শিল্পমনা লোকদের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করতেন। প্রাচীন ব্যবসা-পদ্ধতি আর আধুনিক লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নিতেন। যেন তাঁর বক্তব্য ও

ফতোয়াগুলোতে কোনোরূপ ত্রুটির সংমিশ্রণ না থাকে। নির্ভুলভাবে ও অবাধে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার করে যেতে পারেন।[৫৩৬]

এ থেকে আরেকটি ফায়দা অর্জিত হয়; তা হলো, সচেতন ও দূরদর্শী আলিম কখনো স্বার্থান্বেষী ও কুপ্রবৃত্তি পূজারিদের দ্বারা প্রতারিত হয় না। এ ধরনের লোকেরা নিজেদের হীন স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে থাকে। আর সরলমনা আলেম তার অন্তরিচ্ছা না বুঝে ফতোয়া দিয়ে বসে। এরপর এটাকে সে সাইনবোর্ড বানিয়ে মানুষের মাঝে প্রচার করে সহজেই নিজের উদ্দেশ্য হাতিয়ে নেয়।

পবিত্র মদিনা নগরীতে আমি বসবাস করেছি দীর্ঘ পঁচিশ বছর। সেখানে এমন অনেক পুণ্যময় আলিমকে পেয়েছি, যাদের একটুখানি দোয়া ও বরকতের আশায় আমরা বসে থাকতাম। কেউ যদি তাঁদের ইলমি সূক্ষ্ম কোনো বিষয় বা ফিকহি কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করত, আরবি ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের কাছে জানতে চাইত, সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে দিতেন। তবে হিজরি পঞ্চদশ শতকের গোড়ার রীতি-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ!

যুগের প্রেক্ষাপট যতই উন্নত থেকে উন্নততর হবে, আলিমের মেধা ও বুদ্ধি-বিবেচনা ততই চৌকস হতে থাকবে। ততই তাঁর গবেষণা ও দাওয়াতি পন্থা ক্ষুরধার হতে থাকবে। এভাবেই ধীরে ধীরে একদিন সে সর্বজনস্বীকৃত আলিম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।

এটাই নিম্নোক্ত সুরা ইবরাহিমের আয়াতের সারমর্ম (আল্লাহই ভালো জানেন) :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾

অর্থ : 'আমি সব রাসুলকে তাদের জাতীয় ভাষা দিয়েই প্রেরণ করেছি।[৫৩৭]

জাতীয় ভাষাধারণ করতে হলে অবশ্যই তাদের ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ, পরিভাষা ও রেওয়াজ সম্পর্কেও তাকে অবগত হতে হবে। যেন পুরোপুরিভাবে তাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে পারে। কোনোরূপ দুর্বোধ্যতা বা অস্পষ্টতা না থাকে তার কথা ও কাজে। সকল সন্দেহ-সংশয় দূর করে সুদৃঢ় মনোবল নিয়ে বলিষ্ঠকণ্ঠে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করতে পারে। এখন যদি ওই আলিম

---

[৫৩৬] আল্লামা কাউসারি রহ. بلوغ الأماني তে এমনটিই বলেছেন : ৪৪

[৫৩৭] সুরা ইবরাহিম : ৪

যুগের সংশয়গুলোই না বোঝেন ভালো করে, তবে কীভাবে তিনি এগুলোর সমাধান বের করবেন?!

আর আমরা ভালো করেই জানি, উপর্যুক্ত সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য একজন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পাওয়া বাস্তবেই অসম্ভব; তাহলে আরও যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বলিনি সেগুলোর ব্যাপারে কে ভাববে?! বিশেষত এই বর্তমান যুগে যেখানে মুসলমানরাই নিজেদের ছেলেদের ইলম অন্বেষণের জন্য উৎসাহিত করছে না। আর তাই পুরোমাত্রায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। কোমর বেঁধে মাঠে নামতে হবে আলিমকে। অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে তাদের। সময় ও প্রেক্ষাপট তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে করুণ সুরে।

পূর্বের কথায় ফিরে আসছি। ব্যস্ত এ পৃথিবীতে কোনো অলস তালিবুল ইলমের স্থান নেই। আর তাই আদর্শ তালিবুল ইলম গঠন করতে ইচ্ছুক শায়খ ও উস্তাদদের উচিত হবে, শিক্ষার্থীদের মাঝে এ দিকটি তুলে ধরা। জাগরণ, সদা সতর্কতা অবলম্বন এবং যুগচাহিদা সম্পর্কে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা। কোনোভাবেই একে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ না ভাবা। তা করতে পারলে তাদের চেষ্টা-সাধনা আর উম্মতের জন্য তাদের অসামান্য অবদান আর সীমাহীন ত্যাগগুলো একদিন সার্থক বিবেচিত হবেই ইনশাআল্লাহ।

* * * *

পঞ্চদশ পথনির্দেশ

তালিবুল ইলমদের মধ্যে সাহিত্য-সমালোচনার যোগ্যতা তৈরি

উস্তাদ ও বিজ্ঞ শায়খের অন্যতম দায়িত্ব হলো, শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত সমালোচনার যোগ্যতা তৈরি করা। তার শোনা প্রতিটি কথা এবং তার পড়া প্রতিটি পাঠ সে সমালোচনা ও পর্যালোচনার দৃষ্টিতে দেখবে এবং পড়বে। এর দ্বারা তার মধ্যে সচেতনতা ও জাগরণ তৈরির পাশাপাশি নানা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার প্রেরণা তৈরি হবে। তা করতে গিয়ে আজকের শিক্ষার্থী এবং আগামী দিনের আলিমরা নিজেদের জ্ঞানকে ঝালাই করে নিতে পারবে। শ্রুত বক্তব্য বা পঠিত পাঠে কোনো তারতম্য দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা সংশোধন করতে পারবে। এভাবে একজন আলিম নতুন কোনো তথ্য ও জ্ঞানের সম্মুখীন হলে নিজের ইলম নিয়ে সে লজ্জায় পড়বে না। তার বিবেক কখনো নিস্তেজ হবে না।

শিক্ষাজীবনের শুরুতে এ ব্যাপারে আমি যে সকল ঘটনা শুনেছি উদাহরণস্বরূপ সেগুলো থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি–

আলেকজান্দ্রীয় ইমাম ইবনে আতাউল্লাহ রহ.-এর প্রসিদ্ধ الحكم العطائية এর প্রশংসায় রচিত প্রবাদতুল্য একটি কথা আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়; রাবেয়া আল-আদাবিয়্যা রা. বলেন, কুরআন ছাড়া অন্যকিছু পাঠের দ্বারা যদি নামাজ হতো, তবে আমি নামাজে ইবনে আতাউল্লাহর হিকমাহগুলো পড়তাম।'

এরপর আমরা গবেষণা করে দেখলাম যে, ইবনে আতাউল্লাহর মৃত্যু ৭০৯ হিজরিতে। আর রাবেয়া আল-আদাবিয়্যার মৃত্যু ১৩৫ হিজরিতে। তো কীভাবে রাবেয়া রা.-এর মুখ থেকে এমন কথা বের হতে পারে?!

এমনকি الحكم গ্রন্থের এর একটি পুরাতন সংস্করণে বইয়ের কভারে গ্রন্থকারের নামের ঠিক ওপরে দুটি কবিতা লেখা দেখি। কবিতাদুটিতে উপর্যুক্ত অসত্য উক্তির ভাবার্থ নিহিত ছিল। খুব সম্ভবত ওই কবির নামের শেষে الملاح উপাধি আছে!!

আরেকটি উদাহরণ : ছাত্রজীবনে আমি কোথায় যেন পড়েছি, সমরকন্দের সকল আলিম মিলে একবার ইমাম বুখারি রহ.-কে সমরকন্দ থেকে বের করে দেয়। কারণ, তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়, একই গাভীর দুধ দুজন বাচ্চা পান

করলে তাদের মাঝে দুধভাইয়ের বিধান প্রযোজ্য হবে কি? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, তাদের মাঝে দুধভাইয়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। ইমাম বুখারির এ উত্তর শুনে সমরকন্দের আলিমরা তাকে সমরকন্দ থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

এরপর ১৩৭৮ হিজরি শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় দিন আমি ফিকহে হানাফির দরসে গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে শায়খ হিসেবে ছিলেন আল্লামা আবদুল্লাহ সিরাজুদ্দিন রহ.। আমি ভাবছিলাম এমন একটি ঘটনা জেনে আমি অনেক কিছু জেনে গেছি। এরপর তাঁকে ঘটনা খুলে বলার পর তিনি নিম্নোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেন :

لا تصدق كل ما تقرأ.

অর্থ : 'যা-ই পড়ো, তা-ই বিশ্বাস করে ফেলো না!'

এ থেকে আমি আমার জীবনের জন্য বড়ো একটি শিক্ষা গ্রহণ করি। সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ একটি মানদণ্ড আবিষ্কার করি। প্রতিটি মানুষকে এবং বিশেষত প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এ নিয়মটি স্মরণ রাখা চাই। পড়লেই বিশ্বাস করে নেবে অথবা শুনলেই সত্য মনে করে বসবে এমনটি যাতে না হয় কোনো সময়। সত্য-মিথ্যা সাব্যস্ত করতে হলে ইলমের মাধ্যমে যাচাই করে তবেই করবে।

এ ঘটনার দ্বারা আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখলাম। সেটি হলো, উস্তাদ এসব উপলক্ষ এবং সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ছাত্রদের সামনে এমন গোছালো উত্তর পেশ করবেন, যেন সেই উত্তরটি তাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হয়ে যায়। তা দ্বারা সবকিছু সে যাচাই করতে পারে।

এখানে ইমাম শাফেঈ এবং তাঁর ছাত্র মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকিমের মাঝে ঘটিত আরেকটি ঘটনা আমার স্মরণ হয়ে গেল।

বিস্তারিত ঘটনা বায়হাকি রহ.-এর রচিত مناقب الشافعي গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে : একবার মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ইমাম শাফেঈ রহ.-এর বরাতে একটি উক্তি নকল করেন। এরপর এ সম্পর্কে ইমাম শাফেঈর কাছে সংবাদ গেলে তিনি ওই উক্তির ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। এরপর তাঁর অস্বীকারের সংবাদটি শাফেঈর ভক্ত পিতা আবদুল্লাহ বিন আবদুল হাকিমের কানে পৌঁছলে ছেলের এই ভুল প্রচারের কথা ভেবে তিনি ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। এরপর ছেলে মুহাম্মদ বিষয়টি জানতে পেরে ইমাম শাফেঈর কাছে যান এবং সময়, তারিখ ও উপলক্ষ বলে বলে তাঁকে ওই উক্তির কথা স্মরণ করালে ইমাম শাফেঈ সেটি স্মরণ করতে সক্ষম হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম শাফেঈ একটি মূলনীতি আবিষ্কার করে মুহাম্মদকে বলেন, 'হে মুহাম্মদ, জীবিত কারও কাছ থেকে কোনো উক্তি বর্ণনা

করো না; কারণ, জীবিত ব্যক্তি বার্ধক্যজনিত কারণে হয়তো ভুলেও যেতে পারে।' তখন বর্ণনাকারী বেচারা হয়তো বিরাট অপবাদের সম্মুখীন হবে। এর সঙ্গে অনেক সময় মৌলিক অধিকার ও আত্মসম্মানবোধ খর্ব হওয়ার মতো অনেক বিষয় জড়িয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীদের মাঝে সমালোচনামূলক যোগ্যতা ও প্রতিভা তৈরির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো–ইবারাতের হরফগুলো যথাযথভাবে বোঝা, প্রতিটি উপকারী বিষয় পূর্বসূরি শায়খ ও সত্যনিষ্ঠ আলিমদের মতো করে নিরীক্ষণ করা। কেবল বাহ্যিক অর্থ নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকা। তা না হলে তো বলা হবে :

ظاهرية ولا ابن حزم لها.

অর্থ : 'এ রকম যাহেরিদের জন্য আজ কোনো ইবনে হযম নেই'

পাশাপাশি বাক্যের কোনোরূপ অপব্যাখ্যা বা অর্থকে বিকৃত করার মতো অপচেষ্টা না করা। আমাদের শায়খগণ বলেন, অপব্যাখ্যা হলো নাস্তিকতার সুড়ঙ্গ। এ রকম অপব্যাখ্যাকারীরা শব্দ ও বাক্য নিয়ে গবেষণা করে না। তার ভেতরের মর্ম নিয়েও চিন্তা করে না; যেন বাক্যের অর্থ নিজের মতো করে ঢেলে সাজাতে পারে।

এখানে আরেকটি বিষয় আলোচনা না করলেই নয়; তা হলো : বাক্যের অর্থ ও মর্ম বোঝার জন্য এবং বাক্যের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য একাধিক পন্থায় চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করা। যদি গরমিল মনে হয়, তবে তাতে মুদ্রণজনিত ভুল আবিষ্কারের চেষ্টা করা। আজকালের শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় বই প্রকাশে বর্তমানে লাইব্রেরি আর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। শরিয়তের সংরক্ষণ এবং বিলম্বে হলেও নির্ভুলভাবে ধর্মীয় বই প্রকাশের বিষয়টি তাদের কাছে একেবারেই মূল্যহীন। ফলে ভুলেভরা বইয়ে ছেয়ে গেছে আজ আলিমদের লাইব্রেরিগুলো। এগুলোর ওপরই তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানগণ কী রকম বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, তা তারা অনুধাবন করতে পারছে না। ফলে মুসলমানরাও আজকাল ভুল পড়ছে, ভুল বুঝছে, ভুল মুখস্থ করছে, ভুল শিক্ষা দিচ্ছে। ধীরে ধীরে এই ইলম তাদের কাছে অপরিচিত ও অনারবীদের ভাষায় রূপ নিচ্ছে। এখানে উস্তাদদের উচ্চারিত একটি সাধারণ কবিতা আমার স্মরণ হয়ে গেল :

أقول له : زيد ، فيسمعه عمرو ☆ وينطقه خالد، ويكتبه بكر

অর্থ : 'আমি বলি, যায়েদ; আর সে শুনে আমর। তিনি বলেন, খালেদ। আর সে লেখে বকর।'

আমি আগেই বলেছি, যত বিপদ, সব রচনা আর গ্রন্থের মধ্যে। এ কারণেই পূর্বসূরি আলিমগণ উস্তাদ ছাড়া কেবল কিতাবের পাতা থেকে ইলম অর্জন করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কারণ, কিতাবে বিকৃতিসাধন হতে পারে, আর তা পড়ে বিকৃত হতে পারে শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কও। আমি এও বলেছি, আগেকার তুলনায় আজকের জমানায় আমরা অধিকতর আশঙ্কার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছি। বিকৃত গ্রন্থের একটি সংস্করণেই প্রায় তিন হাজারের মতো কপি ছেপে বের হচ্ছে।

এ কারণেই তালিবুল ইলমদের উপর্যুক্ত দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বের সঙ্গে আমল করতে হবে : বাক্যের মর্মার্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিতাব থেকেও সেটি খুঁজে বের করে দুটোকে পাশাপাশি মিলিয়ে দেখতে হবে। এর মাধ্যমে বাক্যের জটিলতার কিছুটা হলেও নিরসন হবে। না হলে দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ মুদ্রণজনিত কোনো ভুল আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে। দুটি পর্যায়:

১. আগে নিজের যোগ্যতা এবং বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে ভুল বের করো!

২. সমাধান না হলে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের দোষ বের করো!

তাহকিককৃত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলোতে মুহাক্কিকগণ পূর্বের নুসখায় যেসব ত্রুটি চিহ্নিত করেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে এ ধরনের মুদ্রণজনিত ভুলগুলো ধরার মোটামুটি একটা যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়। এ সাধারণ যোগ্যতা দিয়েই এরকম অনেক ভুল সংশোধন করা সম্ভব।

কোনো গবেষক দৈনিক অন্তত কয়েক ঘণ্টা যদি এরকম ইলমি অধ্যয়ন করেন এবং মুদ্রণজনিত ভুলগুলো খুঁজে খুঁজে বের করেন, তবে দেখা যাবে একমাস পর সেগুলো স্বতন্ত্র একটি উপকারী ইলমের ভান্ডারে পরিণত হয়েছে, যার দ্বারা তার এবং অন্যদের উপকৃত হওয়ার একটি পথ তৈরি হয়েছে। আর যদি এক বছর করেন, তবে দেখা যাবে তা বিশাল ইলমের সমুদ্রে পরিণত হয়েছে।

অতি সম্প্রতি এ ধরনের মুদ্রণজনিত একটি বড়ো ভুল আমার চেখে ধরা পড়েছে। সেটি হলো : ইমাম বুখারি রহ.-এর রচিত الأدب المفرد গ্রন্থে হাদিসের একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে :

حدثنا مخلد بن مالك قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: أخبرنا ابن المبارك، عن بكر بن عبد الله المزني..

এখানে বকর আল-মুযানি থেকে ইবনুল মুবারক রহ.-এর বর্ণনা করার বিষয়টি নিয়ে আমার মনে সন্দেহের দানা বাঁধে। এটা যাচাই করার জন্য প্রথমে تهذيب الكمال গ্রন্থটি হাতে নিই। বহু ঘাঁটাঘাঁটির পর এ দুজনের মধ্যে কোনো

রেওয়ায়াতই আমি খুঁজে পাইনি। এরপর تاريخ -এর বিভিন্ন গ্রন্থ ঘেঁটে দেখি ইবনুল মুবারকের জন্ম ১১৮ হিজরিতে, আর বকর আল-মুযানির মৃত্যু ১০৬ কি ১০৮ হিজরিতে। তাহলে ইবনুল মুবারক কীভাবে বর্ণনা করবেন বকর ইবনুল মুযানি থেকে?! এখন এই ত্রুটি দূর করার কী উপায়? না কি সনদে ইবনুল মুবারক আর বকরের মাঝে কোনো রাবি বাদ পড়েছে?

এরপর مصنف ابن أبي شيبة গ্রন্থ খুলে দেখি, এখানে রাবির নাম ইবনুল মুবারক নয়; মুবারক বিন ফুজালা! তিনিই বকর আল-মুযানি থেকে সেটি বর্ণনা করেছেন। এখন যেহেতু الأدب المفرد গ্রন্থে ابن المبارك নামটি এসেছে, তবে হয়তো ইবনে ফুজালা এবং ইবনুল মুবারকের মাঝে متابعة হয়েছে; নয়তো ابن শব্দটি এখানে মুদ্রণজনিত ভুলে চলে এসেছে। কোনটি সঠিক, তা নির্ণয় করা সত্যিই কঠিন!

দীর্ঘ গবেষণার পর আমি التاريخ الكبير গ্রন্থে উল্লিখিত সনদটি আবিষ্কার করি, যা ইবনে আসাকির রহ. তার ইতিহাসগ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখতে পাই :

المبارك بن فضالة عن بكر المزني

তা ছাড়া ইমাম আহমদ রহ.-এর الزهد গ্রন্থেও সনদটি এভাবে উল্লেখ আছে :

المبارك، عن بكر بن عبد الله

এরপর নিশ্চিত হই যে, এখানে মুদ্রণজনিত ভুলই ঘটেছে। সঠিক হলো ابن শব্দটি বাদ দিয়ে পড়া। পরবর্তী সময়ে অবশ্য الأدب المفرد গ্রন্থের ১৪৩২ হিজরির নতুন সংস্করণে এটি সংশোধন করা হয়েছে।[৫৩৮]

এ কারণেই তালিবুল ইলমদের বলছি, একটা কিছু পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তা বিশ্বাস করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এ ক্ষেত্রে শায়খ ও উস্তাদদের দায়িত্ব হবে, তালিবুল ইলমদের সচেতন করে তোলা। এ ধরনের ভুল ও প্রমাদ খুঁজে বের করার যোগ্যতা তাদের মধ্যে তৈরি করা।

পাশাপাশি সমালোচনা ও ত্রুটি উন্মোচন করার সময় ভীষণ সতর্কতা অবলম্বন করা। মনীষীদের প্রতি যথাযথ আদব-লেহায বজায় রাখা। সমালোচনা আর সতর্কতার পাল্লা যেন সমান সমান থাকে। একটি অন্যটির ওপর প্রাধান্য বিস্তার

---

[৫৩৮] ২/২৩০ অথবা ২/১৯৬

না করে। সমালোচনার পাল্লা ভারি হলে তালিবুল ইলমের পদস্খলন ঘটবে, বেয়াদব সাব্যস্ত হবে। আর আদবের পাল্লা ভারি হলে ইলমের যথাযথ হক আদায়ে সে ব্যর্থ হবে। সঠিক ব্যাখ্যা ও তাহকিক করা তার পক্ষে কঠিন হবে।

প্রাণপ্রিয় তালিবুল ইলম ভাইদের জন্য ১৩৭৮ হিজরিতে ঘটিত আমার উস্তাদ ও মুরুব্বি আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর একটি ঘটনা আমি এখানে বর্ণনা করছি।

ফারাফিরা এলাকায় অবস্থিত মাদরাসাতুস সাইয়াফা-তে একদিন আমি আমার কক্ষে অবস্থান করছিলাম। আলেপ্পোর ফারাফিরা এলাকায় ছিল বহু দ্বীনি মাদরাসা (আলেপ্পোসহ মুসলমানদের সকল এলাকাকে আল্লাহ নিরাপদে রাখুন, শত্রুদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করুন)। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কি شرح العزيزي على الجامع الصغير গ্রন্থটি আছে? বললাম, হ্যাঁ! এরপর তাঁর কাঙ্ক্ষিত ভলিয়মটি বের করে তাঁর হাতে দিলাম। ওই কিতাব থেকে তিনি একটি বাক্য পড়লেন। দ্বিতীয় বার আবার ওই বাক্যটি পড়লেন। এরপর কিতাবটি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, শায়খগণ এভাবেই বলে থাকে..শায়খগণ এভাবেই বলে থাকে..আসলে আমরাই তাঁদের কথা বুঝে উঠতে পারি না।

এর ঠিক তিরিশ বছর পর মদিনা মুনাওয়ারার একটি মজলিশে আমি শায়খের সঙ্গেই ছিলাম। তখন ইমাম আহমদ রহ.-এর মুসনাদ নিয়ে কথা উঠল। ওই মুসনাদের বিষয়ে উস্তাদ আহমদ শাকের রহ.-এর সীমাহীন ত্যাগ ও কোরবানির বিষয়ে সবাই কথা বলছিল। পাশাপাশি ডক্টর হুসাইনী আবদুল মজিদ হাশেম কর্তৃক সেটি পূর্ণ করার বিষয়েও প্রশংসা হচ্ছিল। তখন কথাপ্রসঙ্গে শায়খ বললেন : 'মুসনাদের ওপর তালিক করার জন্য আজিজির মতো ব্যক্তিদের থেকে কেন নকল করা হয়?! এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে, মুসনাদে আহমদ হলো হাদিসের একটি নির্ভরযোগ্য ও মৌলিক গ্রন্থ। আর তাই তার ব্যাখ্যা বা তাহকিকের জন্যও ওইরকম বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ আলিমের প্রয়োজন।

এভাবেই তাঁরা আমাদের ইলমি তারবিয়াত দিয়ে গড়ে তুলেছেন। প্রথম বার আমার শিক্ষাজীবনের শুরুতে এই তিনিই আমার সামনে বলেছেন, 'শায়খগণ এভাবেই বলে থাকে.. আসলে আমরাই তাঁদের কথা বুঝে উঠতে পারি না।' আবার তিরিশ বছর পর যে সময় আমি কয়েকটি গ্রন্থের খেদমত করে তা প্রকাশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, সে সময় এই তিনিই মজলিশে তাঁর দ্বিতীয় বক্তব্যটি উচ্চারণ করলেন।

উপর্যুক্ত দুটি বাক্যতেই আমাদের জন্য দারুণ শিক্ষা এবং চমৎকার উপদেশ রয়েছে :

১. ইলমি তারবিয়াতের ক্ষেত্রে ধীরতা অবলম্বন করা।

২. সমালোচনার ক্ষেত্রে আলিমদের প্রতি আদবের দিকটি খেয়াল রাখা।

৩. কিতাব যাচাইয়ের বিষয়েও এখানে শিক্ষা রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি কিতাবের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া।

অন্যদের কিতাবের জন্য হাদিস তাখরিজ করার সময় তাঁরা কীরূপ সতর্কতা ও আদবের পরিচয় দিয়েছিলেন আমাদের পূর্বসূরি আলিম, ইমাম ও আকাবিরদের মাঝেই এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রয়েছে। এটি একটি সরল ও স্বাভাবিক উদাহরণ। যেমন الإحياء গ্রন্থের জন্য হাদিস তাখরিজের ক্ষেত্রে, نصب الراية , الدراية , التلخيص الحبير এবং البدر المنير -এর মতো ফিকহের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলোর জন্য হাদিস তাখরিজের ক্ষেত্রে। তেমনি উসুল এবং তাফসিরের গ্রন্থসমূহের জন্য হাদিস তাখরিজের ক্ষেত্রেও।

দেখবেন–ইমাম যাইলাঈ, ইবনে কাসির, আল-ইরাকি, ইবনুল মুলকিন, ইবনে হাজার প্রমুখ হাফেজুল হাদিস মনীষী হাদিস বা রাবিদের বিচার করতে গিয়ে অবাধে বলছেন, এটা যইফ, ওটা বানোয়াট। এটা বাতিল, ওটা ভিত্তিহীন ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বীনের ব্যাপারে তাঁরা যে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং যে স্তরে তাঁরা পৌঁছেছেন, সেই স্তরের মানুষদের মুখেই কেবল এসব কথা শোভা পায়; তাই বলে তাদের রচিত কোনো গ্রন্থে আদবের সীমা ছাড়িয়ে কোনো রাবিকে তারা কটাক্ষ করছেন, মানহানি করছেন বা তাদের বিদ্রূপ করছেন, এমন কোনো দৃষ্টান্ত আপনি খুঁজে পাবেন না।

তবে বিশিষ্ট হাফেজুল হাদিস ইবনে তাহের আল-মাকদিসি[৫৩৯] যখন হারামাইন শরিফাইনের ইমামের শানে বিদ্রুপমূলক কথা উচ্চারণ করেছে, তখন হাফেজ ইবনে হাজার ঠিকই তাঁর সমালোচনা করে ছেড়েছেন।

ইজতেহাদের ব্যাপারে হজরত মুয়াজ বিন জাবাল রা.-এর বক্তব্য নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে[৫৪০] তিনি বলেন যে, আবু তাহের বলেছেন, উসুলে ফিকহের

---

৫৩৯ তিনি মাদরাসায়ে ইবনে হাযমের শিক্ষার্থী এবং الجمع بين الصحيحين -এর গ্রন্থকার আবু আবদুল্লাহ আল-হুমাইদির বিশিষ্ট ছাত্র। আর ইবনে হাযমের অন্যতম শাগরিদ ছিলেন আল-হুমাইদি; যার জিহ্বাকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তরবারির সঙ্গে তুলনা করা হয়।

কিতাবের মধ্যে হারামাইনের ইমামের বক্তব্যটি এ ব্যাপারে আমার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ঠেকেছে।'[৫৪১] মুয়াজ রা.-এর বক্তব্যের ব্যাপারে এখানে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় হলো ইবনে তাহির আল-মাকদিসির এ উক্তি : 'সে যদি সত্যিই রেওয়ায়েতের বিষয়ে আলিম হতো তবে কিছুতেই এ রকম অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বলত না।' আমি (ইবনে হাজার) বলব, তিনি এ ক্ষেত্রে হারামাইনের ইমাম সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন। ইচ্ছা করলে এখানে তিনি আরেকটু শালীন ও নরম ভাষা ব্যবহার করতে পারতেন।'

ইবনে হাজার রহ.-এর বক্তব্যের দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনিও ইবনে তাহিরের অভিমত স্বীকার করে নিয়েছেন। এমনকি ইবনে হাজার নিজেও ইমামুল হারামাইন সম্পর্কে কথা বলেছেন; তবে তা ছিল শালীন ও অপেক্ষাকৃত কোমল ভাষায়। কিন্তু ইবনে তাহিরের এ উক্তির মধ্যে অসতর্কতা এবং কঠোরতা থাকায় সেটাকে তিনি 'অশালীন' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এখানেই রয়েছে আমাদের জন্য শিক্ষা। বর্তমান সময়ে তথাকথিত আলেমদের জন্য রয়েছে এখানে চমৎকার উপদেশ, যারা পূর্বসূরি ওলামা ও ফুকাহাদের প্রতি কটূক্তি করছে। বিজ্ঞ ইমাম ও ফকিহদের নিয়ে তারা যে বিরূপ মন্তব্য করছে; এমনকি তাদের গালমন্দ পর্যন্ত করছে, বলছে– নিজের মাযহাব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাকি তারা হাদিসকে নিজেদের মতো করে বর্ণনা করেছেন। ইমাম গাযালি রহ.-এর বিখ্যাত গ্রন্থ الإحياء -এর ব্যাপারেও তারা প্রশ্ন তুলেছে, তা নাকি সব মিথ্যা ও জাল হাদিসে ভরপুর..ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আজ যদি ইবনে হাজার জীবিত থাকতেন, তবে ওসব কটূক্তি ও গালমন্দকারীদের ব্যাপারে তিনি কী বলতেন!!

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল ন্যায়নিষ্ঠ মনীষীদের মেহনতগুলো কবুল করুন। ভালো হয়েছে, মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটার আগেই তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে চলে গেছেন। কবি বলেছেন–

مررت على المُروءة وهي تبكي ☆ فقلت: على مَ تنتحبُ الفتاةُ ؟

---

[৫৪০] التخليص الحبير : ৪/১৮৩

[৫৪১] البرهان : ২/৫০৫ (৭২০)। ইমাম যাহাবিও السير : ১৮/৪৭১-এ হারামাইনের ইমামের সমালোচনা করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম সুবকি রহ. তাকে একহাতে নিয়েছেন। কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেছেন الطبقات : ৫/১৮৭। কিন্তু সে তুলনায় ইবনে হাজারের সমালোচনা ছিল যথেষ্ট কোমল ও ভদ্রোচিত। এটাই আমার এখানে বলা উদ্দেশ্য।

فقالت: كيف لا أبكي وأهلي ☆ جميعا - دون خلق الله - ماتوا!!

অর্থ : মনুষ্যত্বের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে আমি কাঁদতে দেখি। জিজ্ঞেস করি, তরুণীটি কাঁদছে কেন? উত্তর দেয়, কেনই-বা কাঁদব না; আল্লাহর সৃষ্টি ছাড়া আমার তো সব মারা গেছে!!

তালিবুল ইলমদের মধ্যে সমালোচনামূলক যোগ্যতা, আদব ও শিষ্টাচার অবলম্বনের ব্যাপারে আলোচনা অনেক দীর্ঘ। এ দুটি বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ধরে তাদের ইলমি পথ অতিক্রম করার বিষয়ে আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এ দুটো একটি অপরটির সম্পূরক। সবক'টি বিষয়েই রয়েছে বিস্তর ও দীর্ঘ আলোচনা। তবে আমার জন্য কেবল উপর্যুক্ত সামান্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

* * * *

চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষার্থীদের সঠিক ও সুনিপুণভাবে গড়তে শিক্ষকের পালনীয় কিছু পথনির্দেশ

প্রথম পথনির্দেশ

শিক্ষা-দীক্ষাদানে ধীরতা অবলম্বন

দ্বিতীয় পথনির্দেশ

ইলমের আদব সম্পর্কে অবগত করা এবং সেগুলো বাস্তবায়নে তালিবুল ইলমদের অভ্যস্ত করানো

তৃতীয় পথনির্দেশ

বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি করা

চতুর্থ পথনির্দেশ

পূর্ববর্তী আচারনিষ্ঠ আলেমদের জীবনী অধ্যয়ন করা এবং ইলম অর্জনে তাদের সীমাহীন ত্যাগ সম্পর্কে তাদের অবহিত করা

পঞ্চম পথনির্দেশ

পার্থিব তুচ্ছ চাহিদা আর প্রবৃত্তিপূজারিদের অভ্যাস বর্জন করে উন্নত মনোভাব লালনের প্রতি গুরুত্বপ্রদান

ষষ্ঠ পথনির্দেশ

জ্ঞান ও পরিচর্যাগতভাবে ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ হিসেবে অভিহিত করার প্রতি গুরুত্বপ্রদান

পরিশিষ্ট ..

সম্মানিত পাঠক এবং প্রাণপ্রিয় উস্তাদবৃন্দ!

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষার্থীদের সঠিক ও সুনিপুণভাবে গড়তে শিক্ষকের পালনীয় কিছু পথনির্দেশ

প্রথম পথনির্দেশ

শিক্ষা-দীক্ষাদানে ধীরতা অবলম্বন

শিক্ষার্থীদের ধীরপদক্ষেপে গড়ে তোলার বিষয়টি ইলম শিক্ষাদানের চেয়ে কোনো অংশেই কম গুরুত্বের নয়। এর আগে আলোচনা হয়েছে এ বিষয়ে। এখানে শুধু ইমাম নববি রহ.-এর বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরছি–

'উস্তাদের উচিত হলো, ধীরে ধীরে তালিবুল ইলমদের উন্নত শিষ্টাচার ও পুণ্যময় চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া। সর্বক্ষণ নিজের কথা ও কাজ পর্যবেক্ষণ করে আত্মিক ত্রুটি সংশোধন করা। প্রকাশ্য-গোপনীয় সব ধরনের কথা ও কাজে এসব শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ রাখা। সর্বপ্রথম কথা হলো, উস্তাদ ছাত্রদের সব সময় নিয়ত ও সততা বিশুদ্ধ করতে উৎসাহ দেবেন। সর্বক্ষণ আল্লাহর নজরদারির বিষয়টি তাদের মস্তিষ্কে ভালোভাবে বসিয়ে দেবেন। বোঝাবেন, আল্লাহর ভয় ও সচ্চরিত্রের মাধ্যমেই ইলম ও মা'রেফাতের দরজা খুলতে থাকবে। তখন হৃদয় প্রশস্ত হয়ে ধীরে ধীরে তাতে সকল প্রকার তত্ত্ব ও প্রজ্ঞার প্রবেশ ঘটবে। দুনিয়াতে তাকে নির্মুখাপেক্ষী করবে। তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এ পৃথিবী হলো ক্ষণস্থায়ী আর পরকাল হলো অবশ্যম্ভাবী এবং চিরস্থায়ী।'

'সব সময় ইলম অন্বেষণের প্রতি তাদের উৎসাহিত করা। ইলম ও আহলে ইলমের ফজিলত তাদের কাছে বর্ণনা করা। পৃথিবীতে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট নেয়ামত আর দ্বিতীয়টি নেই—কথাটি বারবার তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া।'

একজন সুদক্ষ শিক্ষক ও উস্তাদ তাঁর ছাত্রদের ইমাম নববির নির্দেশিত এ পদ্ধতিতেই গড়ে তুলবেন। একজন মা যেমন তাঁর ছোট্ট সন্তানকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তালিবুল ইলমদেরও তিনি সেভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। দিন দিন তাদের ইলমি ও আমলি অগ্রগতি সাধন করবেন। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম কাউসারি রহ. তাঁর সর্বশেষ প্রবন্ধে (إحياء علوم السنة بالأزهر) প্র্যাকটিক্যাল কিছু নমুনা এবং কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। বলেছেন, 'একজন সুদক্ষ মুরুব্বি সর্বক্ষণ ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ করবেন। তাদের খাওয়া-দাওয়া, চলা-

ফেরা, ওঠা-বসা, পোশাক-পরিচ্ছদ, লেন-দেন, আচার-আচরণ এমনকি তাদের ভাষা ও কথাবার্তার প্রতিও খেয়াল রাখবেন। পথে-ঘাটে কীভাবে চলতে হয়, তাও তাদের শিক্ষা দেবেন। ভবিষ্যতে যেন তারা স্বচ্ছ, পবিত্র ও সচ্চরিত্রবান পথপ্রদর্শকরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য দিন-রাত তাদের ওপর নিবিড়ভাবে মেহনত করে যাবেন।

মোটকথা, একজন দক্ষ শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হলো দুটি :

১. ধীরতা ২. সামগ্রিকতা।

ধীরতা মানে, ধীরে ধীরে তাদের উন্নত থেকে উন্নত স্তরে নিয়ে যাবেন। আর সামগ্রিকতা মানে, ছাত্রদের সামগ্রিক কথা ও কাজের প্রতি তিনি খেয়াল রাখবেন। সর্বোপরি আল্লাহর তাআলার সাহায্য এবং তাঁর কাছে তাওফিক প্রার্থনা করবেন।

* * * *

দ্বিতীয় পথনির্দেশ

ইলমের আদব সম্পর্কে অবগত করা এবং সেগুলো বাস্তবায়নে তালিবুল ইলমদের অভ্যস্ত করানো

শায়খ ও মুরুব্বির অন্যতম কর্তব্য হলো, তাদের তিনি ইলমের আদব সম্পর্কে অবহিত করবেন। ইলম অনুযায়ী আমলে মনোনিবেশ করতে তাদের উৎসাহ দেবেন। এ ক্ষেত্রে পূর্বসূরি আলিম ও সত্যনিষ্ঠ ইমামদের ঘটনা এবং তাদের সীমাহীন ত্যাগের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন। এর ফলে তাদের ঈমান-আমলে তরক্কি ঘটবে। গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে তাদের মনোবল সুদৃঢ় হবে। উস্তাদ অন্তর দিয়ে তাদের জন্য দোয়া করবেন। আদর, সোহাগ আর উপদেশ দিয়ে তাদের মন জয় করে নেবেন। উস্তাদের পক্ষ থেকে এ রকম গুরুত্ব ও সহানুভূতি দেখে নিশ্চিতভাবেই তারা প্রভাবিত হবে। এভাবে ছাত্ররাও ধীরে ধীরে উস্তাদকে শ্রদ্ধা করতে থাকবে।

এ বিষয়ে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত একাধিক হাদিস এবং সাহাবি ও পূর্বসূরিদের থেকে বর্ণিত শতাধিক 'আসার' বর্ণিত রয়েছে, যাতে ইলম এবং আমলের প্রতি উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রকাশ্য-গোপনীয় সকল কথা ও কাজ পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের কথা বলা হয়েছে। উন্নত চরিত্র ধারণ এবং সব ক্ষেত্রে পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণের তাগিদ করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রমাণ ও উৎস যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীগণ খতিবে বাগদাদি রহ.-এর اقتضاء العلم العمل গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন। পূর্বসূরি আলিমদের জীবনী সংবলিত গ্রন্থগুলো একনজরে পড়ে নিতে পারেন। যেমন : আবু নুআইমের রচিত حلية الأولياء , ইবনুল জাওযির রচিত صفة الصفوة , অথবা ইমাম যাহাবির রচিত سير أعلام النبلاء ইত্যাদি।

পাশাপাশি বিশেষভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এবং ব্যাপকভাবে উম্মতের প্রতিটি সদস্যের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে বলা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলোও সব সময়ের জন্য মস্তিষ্কে ধারণ করে নিতে পারেন। কখনো আদেশ করতে গিয়ে বলেছেন, আবার কখনো কোনো কাজ থেকে নিষেধ করতে গিয়ে তিনি সেই হাদিসগুলো তাদের সামনে উচ্চারণ করেছিলেন।

প্রতিটি বিষয়েই আলোচনা আছে। প্রতিটি মানুষের জন্যই তার স্তর অনুপাতে কিছু বিশেষ উপদেশ রয়েছে। শীর্ষস্থানীয় সাহাবিগণ যেরূপ আমল করতেন, প্রতিটি হাদিসকে যেভাবে ধারণ করতেন; অন্যসব সাহাবি তেমনটি পারতেন না।

সুরা হুজুরাতের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু বকর ও ওমর রা. নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঠিক গোয়েন্দাদের মতো চুপিসারে কথা বলতেন। এক সাহাবি মসজিদে নববিতে প্রস্রাব করছে শুনে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তাকে প্রস্রাব শেষ করতে দাও!' ওই সাহাবি আর আবু বকর ওমরের মতো সাহাবিদের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

শায়খের উচিত হলো, শিক্ষার্থীদের বেশি করে পূর্বসূরিদের ইলম ও আমলের ঘটনা তাদের শোনাবেন; বরং আমলের দিক দিয়ে পূর্বসূরিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে তালিবুল ইলমদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

আগেও বর্ণনা করেছি; এখনো করছি–

খতিবে বাগদাদি রহ. ইমাম ইবরাহিম হারবি থেকে একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন, 'প্রতিটি মানুষের উচিত যখনই সে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদিস শুনবে, সঙ্গে সঙ্গে ওই হাদিসের ওপর আমলে সে মনোযোগী হবে।'

হাসান বসরি থেকেও বর্ণনা করেছেন একটি উক্তি, 'সে যুগে মানুষ ইলম তলবের জন্য এলে ইলমের নির্দশন তার স্বভাবে, চরিত্রে, চোখে, মুখে এবং কথায় ফুটে উঠত।

এরপর আবু ঈসমা আল-বায়হাকি রহ. থেকে খতিব রহ. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর কাছে রাত্রিযাপন করলাম। তিনি অজুর পানি এনে রেখে দিলেন। পরদিন ভোরে পানিকে অব্যবহৃত অবস্থায় দেখে তিনি বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ! কী আশ্চর্য, ইলম তলব করতে এসেও রাত্রিকালীন ইবাদাত করছে না, তা কী করে হয়?!

উকবা রহ. আবু আমর মুহাম্মদ বিন আবু জাফর আহমদ বিন হামদান থেকে, আর তিনি তার পিতা আবু জাফর[৫৪২] থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার আমি আবু আবদুল্লাহ আল-মারওয়াযির মজলিশে ছিলাম।[৫৪৩] তখন জহরের নামাজের সময় হলে আবু আবদুল্লাহ আজান দিলেন। আজান শুনে আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, কোথায় যাচ্ছ আবু জাফর? বললাম, নামাজের জন্য অজু করতে যাচ্ছি! তা শুনে তিনি বললেন, আমি তো

---

৫৪২ খুব সম্ভবত ২৪০-৩১১ হি.

৫৪৩ খুব সম্ভবত তিনি ইমাম মুহাম্মদ বিন নাছর আল-মারওয়াযি রহ. (২০২-২৯৪ হি.)

তোমার ব্যাপারে অন্যরকম ধারণা করতাম; নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেল আর তুমি অজু ছাড়া আছ!!

আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ ও মুরুব্বি শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. এ ধরনের ঘটনায় তালিক করতে গিয়ে رسالة المسترشدين গ্রন্থে বলেন : আমি বলব, সব সময় তাকে কঠিন মুরাকাবায় থাকতে হবে। কারণ, ডাকাডাকির পরে উপস্থিত হওয়া নয়; ডাক দেওয়ার আগেই মনিবের কাছে গিয়ে উপস্থিত থাকাটাই বরং দাসের ধর্ম।'

এখানে সুনান-রচয়িতা আবু দাউদ রহ.-এর একটি ঘটনা আমি সংযোজন করতে চাচ্ছি। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন : ইবনে আবদুল বার নির্ভরযোগ্য সনদে আবু দাউদ রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি ছিলেন নৌভ্রমণে। নদীর তীরে একব্যক্তিকে তিনি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে শোনেন। এরপর তিনি এক দিরহাম দিয়ে আরেকটি নৌকা ভাড়া করে তীরে এসে তাকে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (হাঁচির উত্তর) বলেন। এরপর তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : হয়তো ওই ব্যক্তিটি 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ' হবেন (আমার জন্য দেওয়া তার উত্তরটিই হয়তো আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে)! এরপর নৌকার সবাই যখন ঘুমিয়ে যায়, তখন সব যাত্রী ঘোষকের একটি ঘোষণা শুনতে পায়, ওহে নৌকাবাসী শুনে রাখো, আবু দাউদ এক দিরহাম দিয়ে আল্লাহর কাছ থেকে জান্নাত কিনে নিয়েছে![৫৪৪]

বিশিষ্ট আল্লাহভীরু আলিম এবং স্বনামধন্য ইমাম আবু ওসমান সাইদ বিন ইসমাইল আল-হাইরি সম্পর্কে খতিবে বাগদাদি রহ. একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যার সারমর্ম হলো : আবু জাফর আহমদ বিন হামাদান আল-হাইরি একবার সহিহ মুসলিমের ওপর ইস্তেখরাজ করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সেটি তিনি প্রতিদিন মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে মসজিদের মুসল্লিদের পড়ে শোনাতেন। ওই মজলিশে আবু ওসমানও বসতেন। ইশার পর মজলিশ শেষে প্রতিদিন আবু জাফরের ছেলে আবু আমর মুহাম্মদ বিন আবু জাফর বিন হামাদান এসে তার পিতাকে বাড়ি নিয়ে যেতেন। তো একদিন এসে দেখেন আবু ওসমান ইশার নামাজ আদায় করছে শুধু একটি লুঙ্গি ও চাদর পরে। এরপর নামাজ শেষে তিনি ঘরে চলে গেলেন। আবু জাফরের ছেলে বলেন, এরপর আমি আব্বুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসার পর আব্বুকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু ওসমান কি ইহরাম পরেছে? তিনি বললেন, না; বরং তিনি যখনই কোনো হাদিস শোনেন, এর আগে

---

[৫৪৪] فتح الباري : ১০/৬১০-৬১১ (৬২২৫)

যদি ওই হাদিসের ওপর আমল না করে থাকেন তবে ওই দিন বা রাতের মধ্যেই সেই হাদিসের ওপর তিনি আমল করে নেন। আর আজ আমি তার সামনে একটি হাদিস পড়েছি যেখানে বলা আছে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি ও চাদর পরে নামাজ পড়েছেন। এরপর যথারীতি সকাল হওয়ার আগেই তিনি ওই হাদিসের ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে লুঙ্গি আর চাদর পরে নামাজ পড়ছিলেন।[৫৪৫]

নববি আদর্শ অবলম্বন এবং সুন্নাতে রাসুল অনুসরণের ব্যাপারে ইবরাহিম বিন হানি নিশাপুরির বৃত্তান্তে আবু নুআইম এবং ইবনে আবি ইয়ালার বর্ণিত ঘটনাটিও খুব চমৎকার।[৫৪৬] ইবরাহিম বলেন, একবার আহমদ বিন হাম্বল রহ. আমাদের বাড়িতে তিন দিন আত্মগোপন করেন। এরপর বলেন, আমার জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজুন; যেন আমি সেখানে চলে যেতে পারি! আমি বলি, তা আমি নিরাপদ মনে করি না হে আবু আবদুল্লাহ! এ কথা শুনে তিনি বলেন, যদি করতে পারেন তবে আপনাকে একটি তথ্য বলব! এরপর আমি তার জন্য একটি জায়গা খোঁজ করে পেয়ে যাই। এরপর তিনি বের হয়ে আমাকে বলছিলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় তিন দিন অবস্থান করে সেখান থেকে কেটে পড়েছিলেন। আমরা কেবল নিরাপদ দিনগুলোতে রাসুলের সুন্নতের ওপর আমল করব আর বিপদের দিনগুলোতে করব না, তা কিন্তু উচিত নয়!'

আল্লাহ এসব বিদগ্ধ ও সত্যনিষ্ঠ মুসলিম মনীষীর শ্রম-সাধনাগুলো কবুল করে নিন। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমাদেরও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের সামর্থ্য দিন।

আল্লামা কাউসারি রহ. একবার আল-আযহারের তৎকালীন প্রধান শায়খ মুস্তাফা আবদুর রাযযাক বরাবর একটি চিঠি লেখেন। শায়খ আবদুর রাযযাক ১৩৬৫ ও ১৩৬৬ হি. এ দু-বছর আযহারের প্রধান ছিলেন। চিঠিতে তিনি সমসাময়িক মাদরাসার নিজাম সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেন, নামাজের আজানের সময়েও আমরা নিজামিয়া বিভাগে ক্লাস চলতে দেখি। আর মুসলমানগণ মুয়াজ্জিনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাদরাসার পাশেই ছাত্রদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে থাকে। তারপরও ওসব বিজ্ঞ শিক্ষক ও বিদ্বান লোকদের অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয় না। আল্লাহর এ আহ্বানে সাড়া দিতে তাদের একটুও মনে চায় না।'

---

[৫৪৫] الجامع للخطيب : ১৮৮

[৫৪৬] الحلية في نعيم أبو : ৯/১৮০ طبقاته في يعلى أبي ابن : ১/২৫২

সমকালীন স্বনামধন্য মুরুব্বিদের থেকেও এ রকম অনেক ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত আলিম ও মুরুব্বি শায়খ আবদুল করিম রিফাঈ রহ.-এর অন্যতম ছাত্র শায়খ ও দাঈ ডক্টর মুহাম্মদ ইওয়ায আমার কাছে বর্ণনা করেন, একবার তিনি মসজিদে চাশতের নামাজ শেষে সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে চলে গেলেন। শায়খ পেছন থেকে হা করে তাকিয়ে থেকে তাকে লক্ষ করছিলেন। একপর্যায়ে তাকে ডাক দিয়ে বললেন, হে শায়খ মুহাম্মদ, মনে হচ্ছে তুমি তোমার প্রতিপালক থেকে বিমুখ হয়ে গেছ?! এরপর ছাত্র ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় বলতে লাগল, কেন হে সম্মানিত শায়খ? তখন শায়খ বললেন, নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা (দোয়া) না করেই তুমি উঠে গেলে!!

যারা শায়খের সংশ্রব অবলম্বন করেনি তারা এ রকম সুউচ্চ এবং উন্নত চরিত্রের শিক্ষা কোথায় পাবে?! বিশেষত যারা বড়ো বড়ো কলেজ-ভার্সিটি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বা অনলাইন ইউনিভার্সিটি থেকে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন না করে নামমাত্র সার্টিফিকেটের আশায় পড়াশোনা করে, কেমন করে তারা এ রকম উন্নত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অর্জন করবে?!!

এসবের উত্তর প্রশ্নকারীকে নয়, প্রশ্নকৃতকে জিজ্ঞেস করুন!

উস্তাদের পক্ষে এ রকম গঠনমূলক শিক্ষাদান সম্ভব হলে তবে সত্বরই তার প্রভাব গিয়ে পড়বে শিক্ষার্থীদের ওপর। যেমনটি একটু আগে আমরা হাসান বসরি রহ.-এর উক্তির মধ্যে পড়ে এসেছি।

খতিবে বাগদাদি রহ. ইমাম মালেক রহ. থেকে তাঁর একটি উক্তি বর্ণনা করেন, 'যারা ইলম তলব করতে আসে, তাদের পালনীয় কর্তব্য হলো, সব সময় ইলমের প্রতি আদব, সম্মান এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় ধরে রাখা। পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।'[৫৪৭]

কিন্তু কেউ যদি ইলমকে পেশা, শিল্প বা পার্থিব লাভ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, তবে কিছুতেই তার মধ্যে কল্যাণ আসবে না। বরকত হবে না তার ইলমের মধ্যে। তার এ অন্বেষণের মধ্যে কোনো উপকার থাকবে না।

তেমনি কেউ যদি ইলমকে বিতর্ক বা সংশয় তৈরির হাতিয়ার বানায়, মানুষকে কটাক্ষ করার বা কারও মর্যাদায় আঘাত করার বাহন বানায়। অথবা নামের শুরুতে তথাকথিত টাইটেল বা খোঁড়া উপাধি যুক্ত করার উপকরণ বানায়, তবেও তার ইলম ও গবেষণায় কল্যাণ বলতে কিছুই থাকবে না।

---

[৫৪৭] في جامعه : ২১২

শিক্ষালাভ হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, উম্মতকে শেখানোর উদ্দেশ্যে। সরল ও সঠিক পন্থা অবলম্বন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষসাধনের আশায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশমতো সালাফে সালেহিনের আদর্শের ভিত্তিতে সকল কথা ও কাজ সংশোধনের লক্ষ্যে।

আমলের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে

১. تخلية বা সব ধরনের পাপকাজ বর্জন।

২. تحلية বা সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে আনয়ন।

ইমাম ইবনুল হাজ[৫৪৮] থেকে বর্ণিত; তিনি সমকালীন (হিজরি অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে) অপরাপর আলিম নামধারী কিছু ব্যক্তির কথা আলোচনা করে বলেন, 'এ কারণেই আমার প্রাণপ্রিয় মুরুব্বি আবু মুহাম্মদ ইবনে আবি জামরা রহ.[৫৪৯]-এর সামনে এ ধরনের নামধারী কোনো আলিমের আলোচনা এলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠতেন, নকলকারী..নকলকারী...!! যেন আহলে ইলমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়। এ রকম অসাধু ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডের কারণে যেন সত্যনিষ্ঠ আলিমদের প্রতি মানুষের মনে কুধারণার জন্ম না হয়। কারণ, নকলকারী ব্যক্তি কোনোভাবেই আলিম নয়; সে তো অপরাপর চাকরদের মতো একজন চাকর।'[৫৫০]

লক্ষ করুন, আলিম নয় এমন ব্যক্তিকে আলিম হিসেবে আখ্যায়িত করা তাঁর কাছে একটি জঘন্য মিথ্যা হিসেবে অভিহিত।

অনেক মুসলিম মনীষী ইলম সংরক্ষণের প্রধান উপকরণ হিসেবে পাপ বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ইমাম মালেক বিন আনাস, বিশর আল-হাফি, ওয়াকি ইবনুল জাররাহ এবং বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ উল্লেখযোগ্য।[৫৫১]

ইমাম মালেক রহ. তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র শাফেঈকে যখন মুয়াত্তার দরস দেন, তখন শুরুতেই তাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন– 'হে মুহাম্মদ, আল্লাহকে ভয় করো, পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকো, কারণ, অচিরেই তুমি উঁচু মর্যাদা লাভ করবে।'[৫৫২]

---

[৫৪৮] (মৃত্যু : ৭৩৭ হি.)

[৫৪৯] (মৃত্যু : ৬৯৯ হি.)

[৫৫০] المدخل : ১/১৭

[৫৫১] পড়ুন তাদের বক্তব্য الجامع للخطيب গ্রন্থে : ১৮৪৬ পৃষ্ঠা

[৫৫২] ঘটনা অনেক দীর্ঘ; পড়ুন ইমাম বায়হাকির রচিত مناقب الشافعي গ্রন্থে : ১/১০২

এর অব্যবহিত পরেই শাফেঈকে উদ্দেশ্য করে বলা ইমাম মালেকের অপর একটি কথা তিনি বর্ণনা করেন : 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরে আলো জ্বেলেছেন; পাপকাজে লিপ্ত হয়ে সেই আলোটি তুমি নিভিয়ে দিয়ো না!'

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, কোনো মাসআলার সমাধান বের করতে ব্যর্থ হলে তিনি ছাত্রদের বলতেন, আমার পাপের কারণেই ব্যর্থ হয়েছি আমি। এরপর তিনি ইস্তেগফার করতেন। কোনো কোনো সময় নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। সমাধান বের করার পর বলতেন, মনে হচ্ছে আল্লাহ আমার তওবা কবুল করেছেন। ফুজাইল বিন ইয়ায ইমাম আবু হানিফার এ হালত জানতে পেরে ভীষণ কেঁদেছিলেন। বলেছিলেন, যারা পাপকাজ কম করে, তাদের দ্বারাই এ রকমটি সম্ভব। এ রকমটি করার তাওফিক অন্যদের হয় না।

এ তো হলো কোনো মাসআলার উত্তর বা সমাধান বের করার সময় তাদের অবস্থা। আবার অনেক সময় তাদের জীবনী থেকে ইলম বৃদ্ধি করার অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করা গেছে। যারনুজি রহ.-এর বর্ণিত একটি উক্তি তিনি বর্ণনা করেছেন, 'আমি ইলম লাভ করেছি আল্লাহর প্রশংসা পাঠ এবং বেশি করে কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাধ্যমে। যখনই ফিকহি কোনো মাসআলা বা কোনো ইলম আমার বুঝে আসে, তখনই বলে উঠি, আলহামদুলিল্লাহ! আমার ইলম বৃদ্ধি পেয়েছে! কারণ, আল্লাহ নিজেই বলেছেন–

﴿لَئِن شَكَرۡتُمۡ لَأَزِيدَنَّكُمۡ﴾

অর্থ : 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে তোমাদের আরও দেব।'[৫৫৩]

এটি আল্লাহর কালামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

পাপ ও গুনাহ তালিবুল ইলমকে ধ্বংস করে দেয়। ইলম অর্জনের পথে অন্তরায় হয়ে যায়। এটি একটি প্রসিদ্ধ ও সার্বজনীন মূলনীতি। ইলম হলো দীপ্তি ও প্রভা। ইলম হলো মুহাম্মদি উত্তরাধিকার। অন্ধকার এবং আলো কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে না।

পাপের পরিণতি এবং শাস্তি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং–

﴿وَاتَّقُوا فِتۡنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمۡ خَاصَّةً﴾

অর্থ : 'আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষভাবে শুধু তাদের ওপরেই পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে জালেম...।'[৫৫৪]

---

[৫৫৩] সুরা ইবরাহিম (১৪) : ৭

সবশেষে..

বিশিষ্ট হাফেজুল হাদিস ও ধর্মভীরু ইমাম আলি বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-হুসাইনি আল-বাগদাদি রহ.[৫৫৫] বলেন, নফল ইবাদতগুলো ফরজের মতো গুরুত্ব দিয়ে আদায় করো। আর পাপকাজকে কুফরি মনে করো।[৫৫৬]

অর্থাৎ সব সময় নফলের ওপর আমল করো। আর কুফর থেকে যেভাবে মানুষ সতর্ক থাকে, ভয় করে—গুনাহ থেকেও তেমনি সতর্ক থাকো, গুনাহকে ভয় করো। বিশেষভাবে তালিবুল ইলম এবং ব্যাপকভাবে সকল মুসলমানের জন্য সত্যিই এটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি উপদেশ।

* * * *

---

[৫৫৪] সুরা আনফাল (০৮) : ২৫

[৫৫৫] (মৃত্যু : ৫৭৫ হি.)

[৫৫৬] تذكرة الحفاظ : ৪/১৩৬২ وطبقات السبكي ৭/২১৩:

তৃতীয় পথনির্দেশ

বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি করা

আদর্শ শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব হলো, শিক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা, সেমিনার অথবা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। সেখানে উদাহরণস্বরূপ একজনকে ইমাম বানিয়ে নামাজ পড়িয়ে দেখানো। জুমার খুতবা মুখস্থ করিয়ে মানুষের সামনে তা বলানো। বক্তব্য বা নসিহতমূলক কোনো কথা বলানো। কোনো কিতাব থেকে কিছু অংশ মুখস্থ করিয়ে শোনানো। কিছু হাদিস মুখস্থ করিয়ে শোনানো। অথবা বন্ধুদের সামনে ছাত্রের প্রশংসা করা। ভরা মজলিশে তাদের ভূয়সীপ্রশংসা করা। এ জাতীয় ঘটনা আকাবিরদের জীবনে অনেক অনেক পাওয়া যায়। দীর্ঘ কলেবরের জীবনীসংক্রান্ত কিতাবগুলোতে তা পড়া যেতে পারে। ছোটোদের থেকে বড়োরা কীভাবে রেওয়ায়াত করতেন। পুত্রদের থেকে পিতাগণ কীভাবে বর্ণনা করতেন। সব ধরনের ঘটনার বিবরণ রয়েছে সেগুলোতে। এর মধ্যে ইমাম বুখারি রহ.[৫৫৭]-এর রেওয়ায়াত তাঁর ছাত্র ইবনে খুযাইমা[৫৫৮] রহ. থেকে। ইমাম যাহাবি রহ. বলেন, ইমাম বুখারি এবং ইমাম মুসলিম উভয়ে তাদের সহিহ গ্রন্থ ছাড়া অন্যত্র ইবনে খুযাইমা থেকেও বর্ণনা করেছেন।[৫৫৯] তেমনি আবুল আব্বাস আস-সাররাজ রহ.[৫৬০] থেকেও বর্ণনা করেছেন। সাখাভি রহ. বলেন, ইমাম বুখারি রহ. তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে আবুল আব্বাস আস-সাররাজ থেকে কিছু তথ্য বর্ণনা করেছেন।[৫৬১] অপর দিকে ইমাম বুখারির অন্যতম ছাত্র হলেন ইমাম আবু ঈসা তিরমিজি রহ.। কিন্তু বুখারি রহ. তার থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে তিরমিজি রহ. তাঁর সুনানগ্রন্থে ইমাম বুখারি তার থেকে রেওয়ায়াত না করলেও তার কাছে হাদিসশ্রবণের বিষয়টি তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।[৫৬২]

---

[৫৫৭] (১৯৪-২৫৬ হি.)

[৫৫৮] (২২৩-৩১১ হি.)

[৫৫৯] السير : ১৪/৩৬৬

[৫৬০] (২১৬-৩১৩ হি.)

[৫৬১] فتح المغيث : ৪/১৭৩

[৫৬২] ৩৩০০, ৩৭২৭-নং হাদিসের অব্যবহিত পরই। সুনানগ্রন্থের শেষদিকে العلل الصغير -এ। শেষের পাতার দুই পৃষ্ঠা আগে।

ইমাম যাহাবি রহ. হাফেজ আবদুল গনী বিন সাইদ আল-আযদির বৃত্তান্তে তাঁর ও তাঁর শায়খ দারেকুতনির মাঝে ঘটিত একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন المؤتلف والمختلف গ্রন্থটি লেখা শুরু করি, তখন শায়খ দারেকুতনি আমার কাছে আসেন। আমি তাঁর কাছ থেকে অনেক হাদিস গ্রহণ করি। এরপর আমার গ্রন্থরচনা শেষ হলে তিনি আমাকে আমার লিখিত রচনাটি তাঁর সামনে পড়ে শোনাতে বলেন। আমি বলি, এর সিংহভাগই আপনার কাছ থেকে গৃহীত। তিনি বলেন, এভাবে বলবে না; কারণ, আমার কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছ বিক্ষিপ্তভাবে। আর তুমি এগুলো সংকলন করেছ একসাথে। এখানে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা তুমি তোমার অন্য শায়খদের কাছ থেকে নিয়েছ!' এরপর আমি তাকে সেটি পাঠ করে শোনাই।[৫৬৩]

বিশিষ্ট মনীষী মুযযি রহ. تهذيب الكمال গ্রন্থে একাধিক বর্ণনাকারীর বৃত্তান্তে বলেন, তার থেকে অমুক ব্যক্তি হাদিস বর্ণনা করেছেন; অথচ তিনি ছিলেন তার শায়খ।'

ইবনে হাজার রহ. আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসি রহ.-এর বৃত্তান্তে তাঁর ইলমি ও তরবিয়াতি চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : 'তিনি প্রায় সময় মেধাবী ছাত্রদের কাছে আসতেন। তাদের কদর করতেন।'[৫৬৪]

এগুলো যদিও ছোট্ট ও বিক্ষিপ্তসব দৃশ্যপট; তবে শিক্ষার্থীদের অন্তরে এগুলোর ফলে যে বিশাল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যারপরনাই অনুপ্রাণিত হয়-তা সত্যিই অভাবনীয়।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিশিষ্ট ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবিদের প্রশংসা করেছেন। অন্যদের কাছে তাঁদের গুণ বর্ণনা করেছেন। আনাস রা.-এর বর্ণনায় নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح.

অর্থ : 'আমার উম্মতের মধ্যে তাদের প্রতি সবচেয়ে দয়াবান আবু বকর, আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর উমর, লজ্জা ও সততায়

---

[৫৬৩] السير : ১৭/২৭০

[৫৬৪] الدرر الكامنة : ৪/৩০৩

সবচেয়ে এগিয়ে ওসমান, হালাল-হারামের বিষয়ে সবচেয়ে জ্ঞানী মুয়াজ, উত্তরাধিকারসংক্রান্ত বিধানে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী যাইদ বিন সাবিত, সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও সুন্দর পাঠক উবাই। প্রত্যেক উম্মতের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে, আমার উম্মতের সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হলো আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ।'[৫৬৫]

ইমাম আহমদ রহ. হুযাইফা রা.-এর হাদিস বর্ণনা করেন, 'আমার পর তোমরা আবু বকর ও ওমরকে অনুসরণ করো। আম্মারের আদর্শ আঁকড়ে ধরো। আর ইবনে মাসউদ তোমাদের যা বলে তা সত্যায়ন করো।'[৫৬৬]

এ দুটো হাদিসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে তিনি বলেন, একজন বিজ্ঞ উস্তাদের উচিত হলো, মানুষের সামনে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করা। শিক্ষার্থীদের মর্যাদার বিবরণ দেওয়া। তাদের মর্যাদা ও ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যেন মানুষ উস্তাদের মৃত্যুর পর তাদেরই অনুসরণ করে। তাদের কাছেই শিখতে আসে।'[৫৬৭]

ওমর রা. থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনাও তিনি এনেছেন এখানে : তিনি একবার ইবনে আব্বাসকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তুমি এমন ইলম জানো যা আমরা জানি না।'

কারণ, এ জাতীয় প্রশংসা এবং উৎসাহদান শিক্ষার্থীদের মনে প্রবল রেখাপাত করে। প্রচুর অনুপ্রেরণা জোগায়। ফলে উম্মতও তাদের থেকে উপকার ও খেদমত পায়। প্রতিটি মানুষের উচিত, যার কাছে ইলম আছে, উপকারী বিষয় আছে, তার ওই ইলম বা উপকারী বিষয় থেকে উপকৃত হতে কুণ্ঠাবোধ না করা; হোক না সে মর্যাদা বা বয়সের দিক দিয়ে ছোটো।

তবে ছাত্রদের প্রশংসা আর গুণ গাইতে গিয়ে যেন অত্যুক্তি না করা হয়। সীমালঙ্ঘন না হয়ে যায়। রোগীর রোগ বুঝে ওষুধ দেওয়া উচিত। যতটুকু দেওয়ার ততটুকুই; কমও না, বেশিও না।

* * * *

---

[৫৬৫] তিরমিজি : ৩৭৯০, ৩৭৯১। হাদিসটি তিনি হাসান ও সহিহ বলেছেন। নাসাঈ : ৮২৪২। ইবনে মাজাহ : ১৫৪। বুখারিতেও আছে হাদিসের শেষাংশ : ৩৭৪৪। মুসলিম : ১৮৮১ (৫৩)

[৫৬৬] মুসনাদে আহমদ : ৫/৩৮৫। হাদিসের প্রথমাংশ আছে তিরমিজিতেও : ৩৬৬২

[৫৬৭] آداب الفقيه والمتفقه : ২/২৯০

চতুর্থ পথনির্দেশ

পূর্ববর্তীকালের আচারনিষ্ঠ আলিমদের জীবনী অধ্যয়ন করা এবং ইলম অর্জনে তাদের সীমাহীন ত্যাগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা

উস্তাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো, পূর্বসূরি মহাপুরুষ ও মনীষীদের জীবনী অধ্যয়ন করতে এবং ইসলামের জন্য তাদের সীমাহীন ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের ইতিহাস পাঠ করতে তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করা। মনীষীদের ইলমি ও আমলি ঘটনাগুলো পড়তে তাদের নির্দেশ দেওয়া। যেন তাদের অন্তরেও ওসব মনীষীদের মতো উচ্চাভিলাষ এবং সুদৃঢ় মনোবল তৈরি হয়। ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. একাধিক স্থানে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন :

'পূর্ববর্তীকালের মনীষীদের মনোবল ও চেষ্টা-সাধনা ছিল আকাশচুম্বী, তাদের লিখিত রচনাবলিই এর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। তবে তাদের অধিকাংশ কিতাবই এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ, সে তুলনায় শিক্ষার্থীদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে তারা সংক্ষিপ্ত কিতাবসমূহের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ হলো তাদের লিখিত সেসব গ্রন্থ অধ্যয়ন করা। বেশি করে পাঠ করা। একাধিক বার পাঠ করা। কারণ, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আর ত্যাগ-তিতিক্ষার ইতিহাস পড়লে নিঃসন্দেহে তালিবুল ইলমদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। তাদের সংকল্পকে দৃঢ় করবে। লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলতে উৎসাহ জোগাবে। তাদের রচিত কোনো কিতাবই ফায়দাহীন নয়। অপর দিকে বর্তমান তথাকথিত যেসব নামধারী লোকদের আমরা অনুসরণ করছি, আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি; তাদের মাঝে সুউচ্চ মনোবল আর উন্নত চরিত্রের লেশমাত্র নেই। আল্লাহভীতি বলতে কিছুই নেই। প্রাথমিক ছাত্ররা এদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিপথগামী হচ্ছে। সাহসহারা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন! এ কারণে পূর্বসূরি সুউচ্চ মনোবলসম্পন্ন মনীষীদের জীবনী বেশি করে পাঠ করে তাদেরই একমাত্র আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার সংকল্প করা।'[৫৬৮]

এই হলো উম্মতের প্রতি একজন বিজ্ঞ ও দূরদর্শী মনীষীর লেখা একটি অভিব্যক্তি। পূর্বসূরিদের ত্যাগ-উৎসর্গের ইতিবৃত্ত পড়তে অকুণ্ঠচিত্তে তালিবুল ইলমদের তিনি উপদেশ করে যাচ্ছেন। কারণ, তাদের ঘটনাসমূহের মাঝেই সে খুঁজে পাবে সফলতার রাজপথ। সীমাহীন কষ্ট ও পরিশ্রমের ইতিহাসই তাদের আত্মায় এমনভাবে প্রবাহিত হবে, যেমন নদীর পানি গাছের জড়ে

---

[৫৬৮] صيد الخاطر : ৩৭৫ (৩৩৭) لفتة الكبد : ২০

প্রবাহিত হয়ে গাছকে শক্তি জোগায়, গাছের আয়ু বাড়িয়ে গাছকে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করে তোলে।

আমি আমার তালিবুল ইলম ভাইদের ইমাম আবুল কাসেম আবদুল করিম বিন হাওয়াযান আল-কুশাইরির রচিত الرسالة القشيرية -এর তারাজুমের অধ্যায়টি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করার উপদেশ দিচ্ছি। এর রচয়িতা ইমাম আবুল কাসেম আল-কুশাইরির ব্যাপারে আবু সা'দ আস-সুমআনি তার বিখ্যাত الأنساب গ্রন্থে বলেছেন :

'তিনি হলেন জ্ঞান, গরিমা আর ধর্মভীরুতায় একজন কালজয়ী মনীষী।' ইমাম যাহাবি রহ. এই সুমআনি থেকেই তাঁর অপর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন, 'পূর্ণতা আর বুদ্ধিমত্তায় তাঁর তুলনা আমি কখনো দেখিনি; তিনি দুটি বৃহৎ বিষয়, শরিয়ত ও হাকিকতকে একত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন।' অপর দিকে আল-বাখারযি থেকে ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন : 'সব ধরনের ইলম আত্মস্থ করে তিনি প্রায় মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন।'

طبقات السبكي গ্রন্থে ইমাম সুমআনি থেকে একটি দীর্ঘ বর্ণনা এসেছে। তাতে উল্লেখ আছে : একবার ইমাম কুশাইরি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে হজে গমন করেন। সে বছর হজে প্রায় চার শ জন ইমাম ও কাজির মিলন ঘটে। সেখানে তাঁরা চায় তাদের মধ্য থেকে কেউ বায়তুল্লাহয় কিছু কথা বলুক। এরপর পরামর্শ করে সবাই আবুল কাসিম কুশাইরিকেই কথা বলার জন্য এগিয়ে দেয়। মনীষীদের জীবনীতে এ ধরনের ঘটনা অপ্রতুল ও দুর্লভ।'

এ তো হলো গ্রন্থকারের কিছু বৈশিষ্ট্যের বিবরণ। অপর দিকে তাঁর রচিত এ কিতাবটিও সুনাম ও সুখ্যাতিতে এত ব্যাপকতা অর্জন করেছে যে, বিগত দশ শতাব্দী জুড়ে সকল আলিম একবাক্যে তার অগ্রগামিতা মেনে নিয়েছে। সকলেই কিতাবটির ওপর নির্ভরশীল হয়েছেন। এমনকি রচয়িতা ইমাম কুশাইরি পর্যন্ত এ গ্রন্থের মাধ্যমেই পরবর্তী আলিমদের কাছে প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করেছেন। অনেক জীবনীগ্রন্থেই কুশাইরির বৃত্তান্তের শুরুতে এভাবে লেখা থাকে, 'তিনি হলেন আবুল কাসিম الرسالة القشيرية -এর গ্রন্থকার।'[৫৬৯]

সুতরাং যে ব্যক্তিটি এ রকম ইলমি উন্নত স্তরে আরোহণ করেছেন, এত প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, যুগ যুগ ধরে সকলের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছেন, তাঁর কিতাবটির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া তালিবুল ইলমদের একান্ত

---

[৫৬৯] এভাবেই উল্লেখ আছে ইমাম যাহাবির السير গ্রন্থে : ১৮/২২৭। طبقات السبكي : ৫/১৫৩

কর্তব্য বলে আমি মনে করছি। তা থেকে ইস্তিফাদা করতে তাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

আরেকটি কিতাব তাদের আমি পড়ার জন্য বলছি, সেটি হলো ইমাম যাহাবি রহ.-এর রচিত سير أعلام النبلاء ; কারণ, কিতাবটি একটি পরিপূর্ণ আদর্শের মতো। তাতে আছে ইলম, আছে আমল, আছে সঠিক নির্দেশনা, আছে বরেণ্যদের স্মৃতিচারণ এবং তাদের ত্যাগ ও আত্মবিলীনতার অবিস্মরণীয় ইতিহাস।

* * * *

পার্থিব তুচ্ছ চাহিদা আর প্রবৃত্তিপূজারিদের অভ্যাস বর্জন করে উন্নত মনোভাব লালনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

বিজ্ঞ শায়খ ও উস্তাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো পার্থিব তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে এবং প্রবৃত্তিপূজারিদের বর্জন করে উন্নত মনোভাব গ্রহণের প্রতি শিক্ষার্থীদের গুরুত্বারোপ করা। জাগতিক লোভ-লালসা এবং দৈহিক ভোগ-বিলাসের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে যাওয়া। প্রতিটি তালিবুল ইলম এমনকি আলিমের জন্য উচিত, তিনি হবেন সর্বত্র কাঙ্ক্ষিত; আকাঙ্ক্ষাকারী নয়। হবেন উদ্দিষ্ট; উদ্দেশ্যকারী নয়। হবেন সকলের নয়নের মণি; শত্রুভাবাপন্ন নয়।

আর সে জন্য অল্পেতুষ্টি হলো একজন আলিমের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

হাদিস-বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইমাম বুখারির অন্যতম শায়খ কাবিসা বিন উকবা আস-সুওয়াই। ইবনে আবি হাতেম তাঁর বৃত্তান্ত বর্ণনা করে তার সম্পর্কে চমৎকার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনার সারমর্ম হলো, একবার আব্বাসি খলিফাদের পরিবারস্থ এক ব্যক্তি কাবিসার কাছে তার জন্য হাদিসের বিশেষ একটি মজলিশ গঠনের নির্দেশ দিলে উত্তরে তিনি বলেন; বরং আপনি নিজে আপনার লোকদের নিয়ে আমার দরসে উপস্থিত হবেন (অর্থাৎ ওই লোকের জন্য হাদিসের বিশেষ মজলিশগঠনের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন)। তা শুনে আব্বাসি লোকটি বলে, আপনি মনে হয় বনি হাশেম গোত্রকে ভালো করে চেনেননি! (তাঁকে যেন একপ্রকার হুমকি দিয়ে বসে)। লোকটির এ উস্কানি শুনে কাবিসা তৎক্ষণাৎ মজলিশ থেকে উঠে ঘরে গিয়ে রুটির একটি টুকরা এবং তার ওপর সামান্য লবণ নিয়ে এসে বলেন, দুনিয়ার এতটুকু নিয়ে যে সন্তুষ্ট থাকে, তার কাছে তোমার এই হুমকি বড়োই তুচ্ছ।'[৫৭০]

প্রায় এ রকমই ঘটনা ঘটেছিল বিখ্যাত কাজি শারিক বিন আবদুল্লাহ নাখঈর সঙ্গেও। দুর্দান্ত প্রতাপী আব্বাসি খলিফা মাহদির এক ছেলে একবার এসে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে তাঁর কাছে একটি হাদিস জিজ্ঞেস করলে তিনি তার কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ করেন না। পুনরায় জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। তৃতীয় বার সে বলে, মনে হচ্ছে আপনি খলিফাদের

---

[৫৭০] الجرح والتعديل : ٧ (٧٢٢)

সন্তানদের তুচ্ছ মনে করছেন?! উত্তরে তিনি বলেন, না! তবে আহলে ইলমের কাছে ইলম খুবই মর্যাদাপূর্ণ একটি বস্তু; যা তারা কখনো খর্ব হতে দেয় না। এ কথা শুনে ওই আব্বাসি শাহজাদা তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়ে যায় এবং তাঁর কাছে হাদিস জিজ্ঞেস করে। তখন শারিক বলেন, হ্যাঁ, এভাবেই অন্বেষণ করতে হয় ইলম।[৫৭১]

الجواهر المضية في طبقات الحنفية গ্রন্থে আবুল হাসান বিন হাসান আস-সানদালির[৫৭২] বৃত্তান্তে বর্ণিত হয়েছে, একবার বাদশাহ তাকে ডেকে বলেন, কেন আপনি আমার কাছে আসেন না?! উত্তরে তিনি বলেন, আপনি চাচ্ছেন এমন প্রতাপশালী বাদশাহ হতে যার কাছে আলিমরা এসে ভিড় করবে! কিন্তু আমি কখনো এমন (দরবারি) আলিম হব না যে সব সময় রাজা-বাদশাহদের আশপাশে ঘুরঘুর করে।'[৫৭৩]

মুহাম্মদি উত্তরাধিকারের ধারক-বাহক তালিবুল ইলমগণ যেন সব সময় ইমাম গাযালি রহ.-এর নিম্নোক্ত কথাটি স্মরণ রাখেন, যা তিনি আদর্শ শিক্ষকের দ্বিতীয় কর্তব্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, 'যে ব্যক্তি ইলমের মাধ্যমে কোনো তুচ্ছ সম্পদ অর্জন করে, সে যেন নিজের নাক দিয়ে জুতোর তলা পরিষ্কার করে। এভাবে সে সেবাগ্রহণকারীকে সেবক আর সেবককে সেবাগ্রহণকারী বানিয়ে ফেলে (সবকিছু উলট-পালট করে দেয়)।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়ে অনেক সময় আমরা তালিবুল ইলম বা জনসাধারণের পথভ্রষ্টতার আশঙ্কা করি। এমন হলে খলিফা আবু বকর রা.-এর কৃত একটি আমল আমরা অনুসরণ করব। তিনি মাগরিবের নামাজের তৃতীয় রাকাতে সুরা ফাতেহার পরে এবং রুকুর আগে এই আয়াতটি পড়তেন[৫৭৪] :

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা, সরল পথ প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে সত্যলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত করবেন না এবং আপনার নিকট হতে আমাদের অনুগ্রহ দান করুন। আপনি সবকিছুর দাতা।'[৫৭৫]

---

৫৭১ الجامع للخطيب : ৩৪৬
৫৭২ (মৃত্যু : ৪৮৪ হি.)
৫৭৩ ২/৫৫৪
৫৭৪ رواه مالك في الموطأ : ১/৭৯ (২৫)
৫৭৫ সুরা আলে ইমরান : ৮

আজকাল তো তালিবুল ইলমদের ওপর বিপদের আশঙ্কা তুলনামূলক বেশি। কারণ, তাদের আশপাশের অধিকাংশই দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করে নিয়েছে। সুনাম ও সুখ্যাতির উদ্দেশ্যে ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করছে। প্রতাপশালী ও ক্ষমতাশালী লোকদের থেকে সম্মান ও অর্থ পাওয়ার আশায় আল্লাহর দ্বীন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে। নিম্নোক্ত কবিতাটি তাদের ওপরই বেশি প্রযোজ্য মনে হয় :

يومًا يمانٍ إذا لاقيتَ ذا يَمَنٍ ☆ وإنْ لقيتَ مَعَدِّيًّا فعدناني

অর্থ : 'ইয়েমেনি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে ইয়েমেনি আর মা'দ গোত্রীয় কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তুমি নিজেকে আদনানি মনে করো?!!'

تزندق مُعْلِنًا ليقول قوم ☆ من الأدباء زنديق ظريفُ

فقد بقي التزندق فيه وصفًا ☆ وما قيل الظريف ولا الخفيفُ

অর্থ : 'সাহিত্যপ্রেমীদের কাছ থেকে 'বুদ্ধিজীবী নাস্তিক' উপাধিলাভের আশায় তুমি নিজেকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা করছ?! আজকাল নাস্তিকতা তো শুধু একটি আবরণ হয়ে রয়ে গেছে; সে জন্য কাউকে 'বুদ্ধিজীবী'ও বলা হয় হয় না এবং 'কাণ্ডজ্ঞানহীন'ও বলা হয় না।'

কথাগুলো স্মরণ রাখা দরকার প্রতিটি তালিবুল ইলমকেই। কারণ, তারাই ভবিষ্যতের কান্ডারি; উম্মতের কর্ণধার। তারাই আদর্শ; তারাই পথপ্রদর্শক। নক্ষত্ররাজি নিজেরাই যদি আলো হারিয়ে ফেলে, তবে পথচারীরা তো বিপথগামী হবেই।

কেন তাদের মাঝে আল্লাহভীতি আর প্রতিপালকের সন্তুষ্টির মানস তৈরি হবে না?! তারা কি আল্লাহর কালাম পড়েনি :

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ﴾

অর্থ : 'অথচ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে সন্তুষ্ট করা বেশি জরুরি।'[৫৭৬]

বরং সব সময় তাদের অভিপ্রায় থাকা উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা। যে পথে আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন হয় সে পথে চলা। যে পথে নিষেধাজ্ঞা আসে, সে পথ বর্জন করা। তা না করতে পারলে তাদের মাথার ওপরে থাকা ইসলামের এই সুমহান প্রতীকের কীই-বা

---

[৫৭৬] সুরা তাওবা : ৬২

মূল্য রইল?! তাদের চেহারায় থাকা নবির সুন্নাতের প্রতি তাদের কতটুকু ভালোবাসার প্রমাণ হলো?!

আমরা এমন সব শায়খ ও মুরুব্বি পেয়েছিলাম যাঁরা ছিলেন পরিবারের জন্য একদিনের খাবারের মালিক। অথচ তাঁরাই এই ইলম নিয়ে বিশ্ববাসীর ওপর গর্ববোধ করতেন। ইসলামের এই সুমহান প্রতীককে অপার সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। এ তো বেশিদিন আগের কথা নয়; এই তো কয়েক দশক আগের.. এখনো চোখে ভাসছে তাঁদের তরতাজা স্মৃতি। যাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পেরে নিজেদের আমরা ধন্য মনে করি। গর্ববোধ করি।

তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, তাদের ওপর রহম করুন!!

* * * *

ষষ্ঠ পথনির্দেশ

জ্ঞান ও পরিচর্যাগতভাবে ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ হিসেবে অভিহিত করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান

এটি তালিবুল ইলমদের প্রতি আদর্শ উস্তাদের একটি ইলমি ও বৈশিষ্ট্যের অন্যতম, যাকে সামাজিক ও কালচারাল বৈশিষ্ট্যও বলা চলে; যা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শামায়েল তথা চরিত্রসমূহের বিবরণে বর্ণিত হাদিসের একটি অংশও (যে হাদিসটি হিন্দ বিন আবু হালা রা. বর্ণনায় ইমাম তিরমিজি রহ. নিজ গ্রন্থ الشمائل -এ বর্ণনা করেছেন। হাদিসের এক অংশে হিন্দ বলেন :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفـقّد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسِّنُ الحسن ويقوِّيه، ويقبّح القبيح ويوهِّيه.

অর্থ : 'নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের খোঁজ নিতেন। মানুষের আচার-আচরণ এবং স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। ভালোকে ভালো বলে তা সমর্থন করতেন। আর মন্দের মন্দাচার করে তা থেকে মানুষকে নিরুৎসাহিত করতেন।'[৫৭৭]

এ ব্যাপারে এখানে শিক্ষার্থী ও তালিবুল ইলমদের প্রতি উস্তাদ ও মুরুব্বিদের কর্তব্যের বিবরণ দিতে গিয়ে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, একজন শায়খের উচিত সাহাবিদের সঙ্গে করা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আচরণকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরা। প্রথমত তিনি তাদের খোঁজ-খবর নেবেন। তাদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির প্রতি খেয়াল রাখবেন। অনুপস্থিত থাকলে তার খোঁজ নেবেন। তার সমস্য সমাধানে সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। প্রকাশ্য-গোপনীয় সকল বিষয়ে তাদের দিকনির্দেশনা দেবেন। দুঃখের সময় তাদের সমবেদনা জানাবেন।

তাদের কাছে মানুষের অবস্থা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। যেন সেও ভবিষ্যতে উম্মতের জন্য বিজ্ঞ ও রূহানি সুচিকিৎসক হিসেবে তৈরি হতে পারে। কারণ, এসব প্রশ্নের দ্বারাই সে মানুষের অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে অবগত হবে। এরপর যখন চিকিৎসা করবে, তখন দূরদর্শিতার সঙ্গেই চিকিৎসা করবে। এভাবে সে যেন যুগ ও পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে।

---

৫৭৭ رواه الترمذي في الشمائل المحمدية : ৮, ২২৫, ৩৩৬, ৩৫১

উদাহরণস্বরূপ আধুনিকতার এ পঞ্চদশ শতকে যেন সে দশম শতকের সব বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ না করে।

এ ধরনের উন্নত বৈশিষ্ট্যের আড়ালে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার নিহিত :

১. আলিমগণ যুগোপযোগী পন্থায় মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারবে।

২. অনায়াসে সে তাদের যাবতীয় সমস্যা ও রোগের সমাধান এবং সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে পারবে।

এরপর আরও একটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি– তালিবুল ইলমদের মধ্যে পড়াশোনা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনন্যদের মূল্যায়ন করবেন। সে জন্য তাঁকে উৎসাহ দেবেন। ওইসব বৈশিষ্ট্যের ওপর অবিচল থাকার জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করবেন। এর মাধ্যমে তাঁর সহপাঠীদেরও উৎসাহ দেওয়া হয়ে যাবে। কারণ, এর মাধ্যমে তাদের অন্তরেও ওইসব গুণাবলি অর্জনের প্রতি উৎসাহ তৈরি হবে। অপর দিকে তাদের মধ্যে কোনো মন্দ বা অসৎ স্বভাব দেখলে সেটি তাকে জানিয়ে দেবেন। জড়িতকে সে জন্য তিরস্কার করবেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে কাজ থেকে তাকে বারণ করবেন। ইশারা-ইঙ্গিতে বা সরাসরি তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন। অথবা গোপনে ও নম্র ভাষায় তাকে সতর্ক করবেন।

এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা কিছুক্ষণ আগেই পড়ে এসেছি। ইমাম বায়হাকি যা مناقب الشافعي গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক রহ. শাফেঈর মেধা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে প্রথমে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে শাফেঈ বলেন, আমি মুহাম্মদ! এরপর মালেক বলেন : হে মুহাম্মদ, আল্লাহকে ভয় করো, সব ধরনের পাপকাজ থেকে বেঁচে থেকো; কারণ, অচিরেই তুমি ইলমের উঁচু স্তরে আরোহণ করবে।'

'ভালোকে ভালো বলে তাকে সমর্থন করতেন। আর মন্দের মন্দাচার করে তার প্রতি মানুষকে নিরুৎসাহিত করতেন।' বক্তব্যটি মানুষের চরিত্র-সংশোধন ও আচার-শিক্ষাদান বিষয়ে جوامع الكلم-এর অন্তর্ভুক্ত। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সকল কথা ও কাজের ব্যাপারে এটি একটি সুন্দর ও বাস্তব ধারণা। অধীনস্তদের ব্যাপারে প্রতিটি দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য এতে রয়েছে এক অনুপম শিক্ষা; কোনোভাবেই যেন তা হেলার চোখে না দেখে। গুরুত্বহীন ভেবে না বসে একে। কারণ, দ্বীন মানেই 'নসিহত'।

* * * *

পরিশিষ্ট

সম্মানিত পাঠক ও প্রাণপ্রিয় উস্তাদবৃন্দ!

আদর্শ তালিবুল ইলম গঠনের এবং শিক্ষার্থীদের রাজপথ আলোকিত করার জন্য রয়েছে অসংখ্য পথনির্দেশ। এ পৃষ্ঠাগুলোতে আমি কেবল তার কয়েকটি সম্পর্কে সামান্য ধারণা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। আল্লাহর কাছে আশা করছি যে, আমি আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠকদের অবগত করতে পেরেছি। মহান আল্লাহ আমার তালিবুল ইলম ভাই ও আদরের টুকরো সন্তানদের এ থেকে উপকৃত করুন! আরও যেসব পথনির্দেশ ও দায়িত্বের বিবরণ এখানে অনুল্লিখিত রয়ে গেছে, সেগুলোও তালিবুল ইলমদের মস্তিষ্কে বসিয়ে দিন!

বন্ধুবর ডক্টর মুহাম্মদ বিন আযযুয এ বিষয়ে চমৎকার পুস্তিকা রচনা করেছেন। সেখানে মাগরিবি আন্দালুসি উপদেশমালার নির্বাচিত কিছু অংশ একত্র করেছেন। তা থেকে একাদশ শতকের পশ্চিম-আরবের বিশিষ্ট আলিম আবু হামিদ মুহাম্মদ আল-আরাবি বিন ইউসুফ আল-ফাসি[৫৭৮] রহ.-এর উপদেশটি আমি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি। যেন শিক্ষার্থীরা সেগুলো থেকে উপকৃত হয় এবং শিক্ষাজীবনে এগুলোকে তারা শ্রেষ্ঠ পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে। উপদেশগুলো 'ফাস' এলাকায় তাঁর কাছে পড়তে আসা সন্তানতুল্য তালিবুল ইলমদের উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেন।

সেখানে তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন :

সর্বপ্রথম আমি তোমাদের ওসিয়ত করছি প্রকাশ্যে-গোপনে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় অবলম্বনের; তাকওয়ার চাহিদাপূরণের। বিশেষত জামাআতের সাথে ফরজ নামাজগুলো আদায় এবং সাধ্যমতো ইলমচর্চায় আত্মনিয়োগের।

সব সময় তোমরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে আগে শিখবে। আর সব ইলমই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো ইলমে শরিয়ত। আজ যা শেখা সম্ভব; আগামীকালের জন্য তা ফেলে রেখো না। কোনো ইলমকেই খাটো করে দেখো না! আল্লাহ বলেন :

﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

অর্থ : 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল বুদ্ধিমানরাই করে।'[৫৭৯]

---

[৫৭৮] (৯৮৮-১০৫২ হি.)

[৫৭৯] সুরা যুমার (৩৯) : ৯

ইলমে নাহু শেখো; নাহুর মূলনীতিগুলো আত্মস্থ করার চেষ্টা করো! এ ব্যাপারে ألفية بن مالك-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। তা ভালো করে বুঝে মুখস্থ করে নাও! কারণ, ইলমে নাহুই হলো আরবিভাষীদের জন্য জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের মূল ফটক। এরপর শিখবে ইলমে সরফ।[৫৮০] এরপর তাকে পূর্ণতাদানকারী অন্যান্য ইলম। যেমন : কবিতাবৃত্তি এবং উপস্থাপনবিদ্যা; কারণ, প্রায় সময় সেগুলো দরকার হয়।

ইলমে আকায়েদ (বিশ্বাস ও মতবাদসংক্রান্ত জ্ঞান) অর্জন করো। কারণ, তা হলো দ্বীনের মূল ভিত্তি। এরপর গবেষণাকারী কোনো শায়খ পেলে তাঁর কাছ থেকে ইলমুল কালাম (তর্কবিদ্যা বা বাকচর্চা বিদ্যা) শিখে নাও। তখন যদি ইসলামি দর্শন জেনে নেওয়া সম্ভব হয়, তবে মন্দ হবে না। কারণ তা বিবেকবুদ্ধিকে স্থিতিশীল করে। চিন্তাশক্তিকে শাণিত করে। কথাবার্তায় ভরসা আসে। দৃষ্টিভঙ্গি সুতীক্ষ্ণ হয়। তার্কিকের মনোবল বৃদ্ধি করে। যে কোনো বিষয়ে বিতর্ককারীর জন্য সেটি সহায়ক। শাখাগত পর্যায়ে এর মাধ্যমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইলমে মানতিক (তর্কশাস্ত্র)।

শায়খ ইবনে আরাফা বলেন, যে ব্যক্তি ইলমে মানতিক জানল না, তার ইলম নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে না।' এ প্রকার ইলম নিয়ে অনেক বই-পুস্তক রচিত হয়েছে; সেগুলো অধ্যয়ন করো।

যথেষ্ট পরিমাণ গণিত শেখো; কারণ, তা ফারায়েজ অধ্যয়নকালে এবং হিসাবকাজ করতে গিয়ে খুব দরকার হবে। এ বিষয়ে কালাসাদীর রচিত গ্রন্থগুলো অধ্যয়নই যথেষ্ট।[৫৮১] প্রয়োজন অনুপাতে সেগুলো থেকে উপকৃত হও। অন্যসব

---

[৫৮০] যে গ্রন্থ থেকে এ ওসিয়তনামা উদ্ধৃত, সে গ্রন্থে অপর মনীষী আবদুর রহমান বিন উযরা আল-আনসারি (মৃত্যু : ৬০৬ হি.) রহ.-এর উপদেশমালাও বর্ণিত হয়েছে; তাতে ইলমে নাহুর পাশাপাশি ইলমুল্লুগাহ (ভাষাতত্ত্ব) অর্জনের ব্যাপারেও তিনি ছাত্রদের ওসিয়ত করেছেন। এরপর বলেছেন, সব সময় তোমরা লিখিত প্রমাণনির্ভর কথা বলবে। জেনে রেখো, নাহু এবং লুগাত এ দুটো পরস্পর দুধভাইয়ের মতো। ভাষার কল্যাণেই মানুষ অন্যসব প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। শরিয়ত এবং প্রাকৃতিক সকল বিদ্যার ভিত্তিও এর ওপর। এটিই সকল উৎকৃষ্ট ও উন্নত জ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। তাই ভালো করে তোমরা ভাষাবিদ্যা অর্জন করো। তাহলে বাকি সব ইলম তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

[৫৮১] তিনি হলেন আবুল হাসান আলি বিন মুহাম্মদ আলকালাসাদি। আন্দালুসিয়ান বংশোদ্ভূত। ইন্তেকাল করেছেন তিউনিশিয়ায় ৮৯১ হিজরিতে। গণিত বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইমাম সাখাভি রহ. الضوء اللامع গ্রন্থে তাঁর বৃত্তান্ত

ইলম বুঝতে যতটুকু দরকার, এ ব্যাপারে ততটুকুই শেখো! বেশি গুরুত্ব দিতে গেলে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আবার না হাতছাড়া হয়ে যায়!!

জ্যোতির্বিদ্যা এবং মহাকাশ-বিদ্যা থেকে যতটুকু শিখলে নামাজের ওয়াক্ত ও কেবলা-নির্ধারণ সহজ হয়; চন্দ্র ও সূর্যের হিসাব এবং স্বাভাবিক ঋতুসমূহ চিনতে সহায়ক হয়, ততটুকু শিখে নাও! এ বিষয়ে আবু মুকরির রচিত رجز গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। এরপর যদি আল-জারির রচিত روضة বইটি পড়া সম্ভব হয়, তবে পড়ে নিয়ো! তা ছাড়া ইবনুল বান্নার রচিত يسارة গ্রন্থটিও খুলে দেখা যেতে পারে। ব্যস, সামনে চলার জন্য মৌলিকভাবে এ ইলমগুলোই যথেষ্ট। এ ছাড়া অন্যসব ইলমে সময় নষ্ট না করাই শ্রেয়।

আর চিকিৎসাবিদ্যায় আমি ইবনে সিনার রচিত أرجوزة গ্রন্থটিই যথেষ্ট মনে করি। ওষুধবিদ্যায় এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট কোনো গ্রন্থ আছে বলে আমার মনে হয় না।

তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্যতম হলো, আল্লাহর কালাম মুখস্থ করা। কুরআনুল কারিমের তাজবিদ, উচ্চারণ ও তিলাওয়াত যথাযথভাবে আয়ত্ত করা। সবচেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে পারদর্শী কোনো কারির অনুকরণ করা। তাজবিদ ও উচ্চারণের ব্যাপারে আল-খারায এবং ইবনে বাররি'র কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

তবে এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো কুরআনুল কারিমের তাফসির ও বিধানাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। স্মরণ রাখতে হবে, অন্য কোনো ইলম যেন তোমাকে এ থেকে বিমুখ না করে দেয়। সম্ভব হলে তোমরা আমাদের শায়খ ও ইমাম সাইয়েদ আবদুর রহমানের[৫৮২] তাফসিরের দরসে অংশগ্রহণ করতে পারো। সেটি হবে তোমাদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। তাফসির বিষয়ে তোমাদের মুতালাআর জন্য আমার সেরা পছন্দ হলো تفسير ابن جزيّ।[৫৮৩]

এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করলেও কিছুতেই তার কথা আমি মেনে নেব না।

বর্ণনা করেছেন। شرح على رجز أبي مقرع গ্রন্থটিও তাঁরই লেখা; যার ব্যাপারে অচিরেই আলোচনা আসছে।

[৫৮২] তিনি হলেন আবু যাইদ আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আল-ফাসি রহ. (মৃত্যু : ১০৩৬ হি.)

[৫৮৩] সেটি হলো التسهيل, যা একাধিক বার মুদ্রিত হয়েছে। অনেকটা তাফসিরে বায়যাবি ও তাফসিরে নাসাফির মতো এটি। অপেক্ষাকৃত সহজভাবে লিখিত। তবে তা অধ্যয়নকারীকে অবশ্যই হাফেজে কুরআন হতে হবে।

এ ছাড়াও জানতে হবে ইলমুল মাআনি এবং ইলমুল বায়ান (আরবি অলংকারশাস্ত্রের দুটি শাখা)। এর দ্বারা শিক্ষার্থীরা আসমানি কিতাবসমূহের অভ্যন্তরীণ রহস্য সম্পর্কে অবগত হবে। হাদিসের শব্দ ও বর্ণনাভঙ্গির সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলো উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে আল্লামা কাযভিনির লেখা تلخيص গ্রন্থটিই সবচেয়ে উপকারী; বিশেষত যে গ্রন্থটির ব্যাখ্যা করেছেন আল্লামা সা'দুদ্দিন তাফতাযানি রহ. এবং আমাদের শায়খ আবদুর রহমানের কাছ থেকে তোমরা অনুমতি প্রার্থনা করো; বিশেষত যে ইলমের ব্যাপারে তিনি শায়খ কাসসারকে[৫৮৪] অনুমতি দিয়েছেন সে ইলম শেখার জন্যে। তা ছাড়া এ ব্যাপারে তাঁর অনেকগুলো বই-ও গদ্য ও পদ্যরূপে বের হয়েছে। তিনি যদি তোমাদেরকে তাঁর কাছে বুখারি এবং মুসলিম পড়ার অনুমতি দেন, তবে সেটা হবে তোমাদের জন্য সোনার হরিণ লাভের মতো।

আর ইলমুল ফিকহকে তোমরা তোমাদের মনোযোগের কেন্দ্রস্থল বানাও। সকল চেষ্টা-সাধনা তাতে ঢেলে দাও! এ ব্যাপারে الرسالة এবং المختصر গ্রন্থ দুটি তোমাদের মুখস্থ করা এবং তা ভালো করে বোঝা আবশ্যক।[৫৮৫] তাতে কোনো মাসআলা না বুঝে আসলে বা সমস্যা দেখা দিলে তাতে শিথিলতা প্রদর্শন করা কোনোভাবেই কাম্য নয়; বরং বিশেষজ্ঞ কারও শরণাপন্ন হয়ে উত্তমরূপে তা বুঝে নেওয়া চাই। বেশি বেশি প্রশ্ন করে মাসআলা হল করা চাই। সে জন্য একাধিক শরাহ-শরুহাত এবং বিশ্লেষণগ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করা চাই। প্রশ্ন করতে কোনোরূপ দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়। আমাদের প্রাণপ্রিয় শায়খ মুহাম্মদ আল-কাসসার রহ. প্রায়ই আমাদের এ বিষয়ে ওসিয়ত করতেন।

এরপর তালিবুল ইলম যখন মোটামোটি যোগ্য হয়ে উঠবে, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার বুঝ চলে আসবে তার মধ্যে, তখন সে কিতাবুল্লাহ বা সুন্নাতে রাসুল বা ইজমায়ে উম্মত থেকে মাসআলাসমূহের দলিল খোঁজার প্রতি মনোনিবেশ

---

[৫৮৪] তিনি হলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন কাসিম আল-কাসসার (মৃত্যু : ১০১২ হি.)

[৫৮৫] الرسالة গ্রন্থটি ইমাম ইবনে আবি যাইদ আল-কায়রাওয়ানি আল-মালেকি (মৃত্যু : ৩৮৬ হি.)-এর লেখা। তাঁকে ছোটো 'ইমাম মালেক' বলে ডাকা হতো। তাঁর এ কিতাবটিকে মানুষ বিপুলভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তা কিনতে মানুষ প্রতিযোগিতায় পর্যন্ত লিপ্ত হতো। এমনকি কেউ কেউ সেটিকে স্বর্ণাক্ষরে পর্যন্ত লিখে রেখেছিলেন।

আর المختصر গ্রন্থটি ইমাম খলিল বিন ইসহাক আল-জুন্দি (মৃত্যু : ৭৭৬ হি.) রহ.-এর রচিত। তিনি মালেকি মাযহাবের মুতাআখখির ইমামদের একজন। তাঁর রচনাসমগ্রের মধ্যে এ কিতাবটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

করবে। মূল উৎস থেকে অনুসন্ধান করে বের করবে, যেন মূলের সঙ্গে শাখা একীভূত হয়ে যায়।

তা করার আগে তাকে উসুলে ফিকহ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। সে জন্য ইবনে সুবকির রচিত جمع الجوامع গ্রন্থটি আমি আদর্শ মনে করি। মাযহাব অনুসারে ফিকহের মূলনীতিগুলো সেখানে বর্ণিত আছে। তা ছাড়া ওয়ানশারিসীর রচিত إيضاح المسالك গ্রন্থটিও এ বিষয়ে পড়া যেতে পারে। সাইয়েদ আবদুল আহাদ[৫৮৬] রহ. أرجوزة গ্রন্থে একে ছন্দবদ্ধ করেছেন এবং কিছু অতিরিক্ত বিষয়ও যোগ করেছেন। আরও ছন্দবদ্ধ করেছেন আল্লামা আবুল হাসান আয-যাক্কাক। এ বিষয়ে অধিক অধ্যয়ন করতে চাইলে قواعد القرافي এবং قواعد المقري অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

সর্বোপরি কথা হলো, এই ইলম অন্বেষণের পেছনে তোমাদের একক উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। ন্যায়নিষ্ঠভাবে দ্বীনের ইলম হাসিল করা। পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ হিসেবে কখনো তা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, ইলমের সামনে দুনিয়া অতি নগণ্য; যারপরনাই তুচ্ছ। ইলমের প্রধান উপকার হলো আমলের তাওফিক হওয়া। আর জ্ঞানীদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহকে পাওয়া। তাই সব সময় নিয়তকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে। হাদিসে আছে, 'নিশ্চয় সব কাজের মূল্যায়ন নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।' আর তাই প্রথমেই তোমরা নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নাও! তাকওয়া এবং নেক আমলের পথে চলো! কারণ, এ পথেই নিহিত দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় শান্তি ও সফলতা।

পূর্বসূরিদের শ্রেষ্ঠ চরিত্রে চরিত্রবান হও! তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করো! বিনয়, লজ্জা, গাম্ভীর্য, ধীরতা, সহানুভূতি, ক্ষমা, অন্যায় বা অনুচিত কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টি থেকে বাঁচা, পবিত্রতা অর্জন, শিষ্টাচার অবলম্বন, বিনম্র আচরণ, আত্মশুদ্ধি অর্জন, অহেতুক কথা ও কাজ থেকে সতর্কতা অবলম্বনসহ যাবতীয় প্রশংসনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনে মনোনিবেশ করো!

অহংকার থেকে বেঁচে থাকো; কারণ, তা ইলমের জন্য বড়োই ক্ষতিকর। বিরত থাকো গর্ববোধ, আত্মতুষ্টি এবং কুপ্রবৃত্তিপূজা থেকেও! সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর হলো অসৎ সঙ্গ। কারণ, তা মানুষকে পাপ কাজে বাধ্য করে। স্বভাব স্বভাবকে আকৃষ্ট করে। কিংবদন্তিতে আছে : তুমি যারই সঙ্গ অবলম্বন করতে চাও; করো। তবে

---

[৫৮৬] তিনি হলেন মুফতি আবদুল আহাদ বিন আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-ওয়ানশারিসী। তুম্বুকতি রহ. 'নাইলুল ইবতিহাজ' গ্রন্থের ২৮৯ পৃষ্ঠায় তাঁর মৃত্যু বলেছেন ৯৫৫ হিজরিতে।

মনে রেখো, যার সঙ্গেই তোমাকে দেখব, তোমাকে তার মতোই মনে করব। সব সময় অসৎ বন্ধু হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখো!

এমন কারও সংশ্রবে যেয়ো না, যাকে দেখলে তোমার আত্মার উন্নতি হয় না; যার কথা তোমাকে আল্লাহমুখী করে না। তুমি যেখানেই থাকবে, সেখানকার শ্রেষ্ঠদের সঙ্গে ওঠাবসা করবে। তাঁদের সঙ্গে ওঠাবসাকালে অবশ্যই সুশিষ্টাচার ও ভাব-গাম্ভীর্যের প্রতি লক্ষ রাখবে। কখনো সামর্থ্যের বাইরে খরচ করতে যেয়ো না; কারণ, তা নিঃস্ব করে দেয়। অন্তরে ঘৃণার জন্ম দেয়। যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে রসিকতা করে, মানুষ তাকে হালকা মনে করে। আর মানুষের প্রকৃতি সব সময় রসিকতা ও হাস্যরস করতে পছন্দ করে, তবে সেটি যেন হয় খাদ্যে লবণের পরিমাণের মতো; এর বেশি নয়।

আমার কথাগুলো তোমরা আমলে পরিণত করো! সাধ্যমতো স্বভাবের ইসলাহের ফিকির করো! কর্তব্য ও দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করো। অহেতুক বা অতিরিক্ত বিষয় বর্জন করো! কারণ, অযথা কাজ পরিত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ ইসলামি বৈশিষ্ট্য।' তোমাদের পিতৃপুরুষদের ভালোবাসা ও সুধারণার মূল্যায়ন করো!'

ওসিয়তনামা এখানেই শেষ হলো। সাথে সাথে কিতাব ও...!!

আল্লাহর কাছেই তাওফিক এবং ইখলাস প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যেন কিতাবটি কবুল করেন এবং তা দ্বারা আলেম ও তালিবুল ইলম ভাইদের উপকৃত করেন। আল্লাহই অধিক দয়াময়, তিনিই পরম করুণাময়। আল্লাহ যেন সর্বাবস্থায় উম্মতে মুহাম্মদিকে আসমানি সাহায্য এবং মহাবিজয় দ্বারা ভূষিত করেন, সে আশাটুকুই করছি তাঁর কাছে।

هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين.

লেখক

মুহাম্মদ আওয়ামা

তারিখ : ৯/২/১৪৩৪ হিজরি (মদিনা মুনাওয়ারায়)

কোনো বিষয়ে জ্ঞানী হতে হলে সে বিষয়ে অন্বেষণের জন্য থাকতে হয় অদম্য স্পৃহা, অসামান্য আগ্রহ এবং সর্বোন্নত অভিলাষ; এটিই সফলতার প্রকৃত রূপরেখা। প্রবল আগ্রহই এর মূলভিত্তি; এ ছাড়া ইলম অন্বেষণ সম্ভব নয়। পাশাপাশি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজন দূরদর্শিতা আর সঠিক দিকনির্দেশনা।

বক্ষমাণ এ গ্রন্থে শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা প্রায় চল্লিশটির মতো 'পথনির্দেশ' উল্লেখ করেছেন; যেগুলো একাধারে ছাত্র-উস্তাদ সকলের জন্যেই সমান উপকারী। সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে বাংলাভাষীদের প্রতিটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের বিশেষভাবে সকল উস্তাদের হাতে এবং ব্যাপকভাবে সকল তালিবুল ইলমের হাতে বইটি সংগ্রহে রাখা উচিত। বইটিতে বর্ণিত পূর্বসূরিদের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং ইলম অন্বেষণের পথে তাদের সীমাহীন আত্মবিলীন ইতিহাস পড়ে নিশ্চিতভাবে পাঠক অনুপ্রাণিত হবে। জীবনপথের পাথেয় খুঁজে পাবে।

–অনুবাদক